পরিচারিকা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রী জানকীবল্লভ বিশ্বাস।

চতুর্থ বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

চতুর্থ বর্ষ —দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ—কার্ত্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

-ঃ*ঃ-

পরিচারিকার—সূচী

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৪র্থ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল { ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

বাণীচরণে।

জননি তোমার চরণ সরোজে—
মজে যেন মম মানস অলি,
গীতকবিতার মধুপানে যেন
রহে কলা-কেলি কৌতূহলী॥
না মানি দৈন্যভীতি-ভ্রূভঙ্গি
সেবি যেন শত বিঘ্ন লঙ্ঘি
দুঃখেরে সদা করিয়া সঙ্গী—
পিচ্ছিল পথে নাচিয়া চলি।

স্থলভ সুখের কত প্রলোভন
ঐহিকতার শত আয়োজন
নিশিদিন মোর ভুলাইবে মন
মোহমূঢ় হয়ে না যেন টলি ॥
লভিব বিশ্বে কত লাঞ্ছনা
নিঃস্ব জীবনে কত বঞ্চনা
তোমার সেবায় জীবন যাপনা
করি যেন, সবি চরণে দলি ॥

শ্রীকালিদাস রায়

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

বিশ্বধর্ম্মের সুরই হচ্চে চলা। অবিরাম এই চলার পথের পাথেয় যদি কেউ দিন দিন তিল তিল করে যুগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে থাকে, তবে সে বিজ্ঞান। জীবনের অতি ক্ষুদ্র নগণ্য বস্তু হতে আরম্ভ করে অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিষটীরও যোগানদার সেই বিজ্ঞান। হাটে, মাঠে, ঘাটে বিজ্ঞানের পায়ের চিহ্ন যেখানে-সেখানে, কেননা সে যে মানুষের পরম হিতৈষী; একথা মানুষ স্বীকার না করতে পারেন, কিন্তু ন্যায়ধর্ম্মমতে বৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার করবেনই।

বাস্তবিক সংসারের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বর্ত্তমান সভ্যতার বাহনই হল ঐ বিজ্ঞান। সে তার বিপুল ডানা বিস্তার করে ধীরে ধীরে ঐ অনন্ত নীলাকাশের নীলিমার পানে ছুটে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জগৎটাকেও নিয়ে যাচ্ছে।

"একদিন বাষ্পই ছিল সকল কার্য্যের প্রভু; তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়ে মহারাজ ইন্দ্রের প্রধান প্রলয়-সহায় তড়িত-রাজকে সেলাম ঠুকতে সুরু করলেন, এবং কেবল বিজ্ঞান তড়িত-রাজের সহায় ছিলেন বলে। আজ বিজ্ঞানের রাজ্য-শাসন-কালে লাট্ হতে আরম্ভ করে মার্চ্চেন্ট্ আফিসের ছোট সাহেব পর্য্যন্ত রাস্তার ধূলির জয়পতাকা উড়িয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছেন। আবার নিঃশ্বাসরুদ্ধ কেরাণীকুল অফিসঘরের বদ্ধবাতাসের মধ্যে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে অনন্যমনে কলম পিষ্‌তে থাকেন, তাঁদের সেই তপ্ত-হৃদয়ের রুদ্ধ-হুতাশ্বাসের মধ্যে বাধ্য ভৃত্যের মতো বাতাস করে ঐ বিজ্ঞান। আবার দিনের শেষে আলোর খেয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, আলোও যোগায় ঐ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মুখে তুলে দেবে তবেই জোটে আহার্য্য; বিজ্ঞান বুন্‌বেন বস্ত্র, তবেই জোটে সাজসজ্জা; এম্‌নি করে বড় বড় কলকারখানা হতে আরম্ভ করে ঘরকন্নার অতি ক্ষুদ্র জিনিষ Icmic Cooker"টী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের নিকট চিরঋণী। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্যদেশ বিজ্ঞানকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেচেন বলেই আজ জগৎ-সভায় তাঁদের স্থান এত উচ্চে, জগতের রত্নভাণ্ডারে তাঁদের দাবী এত বেশী!

কিন্তু খাওয়া-পরাহীন অতিবড় সাত্ত্বিক পুরুষ, যিনি সমস্ত জগৎটার প্রতি কটাক্ষপাত করে উপবিষ্ট রয়েচেন, সেই তিলক-কাটা শুদ্ধবুদ্ধ জটাধারী মহা-বৈরাগী তার জটা দুলিয়ে হয় তো বলে উঠবেন—"ছিঃ জড়বাদ! জড়তত্ত্ব! বিজ্ঞানের আবার কি দেবার আছে? সে দেয় বিলাস, সে দেয় ইন্দ্রিয়ের সুখ, সে দেয় সংসারের ভোগ, যা তামসিক, ঘোর তামসিক।"

মানবমনের সেই বৈরাগী পুরুষটির সঙ্গেই আজ বোঝা-পড়া করতে এসেচি। এ কথা তাকে স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞানকে ঘৃণা করলে চলবে না! হে সাত্ত্বিক পুরুষ! তোমার গভীর গোপন হৃদয়পুরে বিজ্ঞান এমন এক আলোক-রশ্মি এনে দেবে যে-আলোক সম্পাতে তোমার শরণ্য, তোমার উপাস্য, তোমার নমস্যকে তুমি আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। হৃদয়মন্দিরে এমন একটি নিভৃত দুয়ার বিজ্ঞান এসে খুলে দেবে, যে দুয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের বাতাস ও আলো তোমার মনোমন্দিরটিকে আরো, আরো সুন্দর করে তুলবে।

এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, যেন আলো ও অন্ধকার। দিনান্তের ম্লান রবি যখন ম্লানতর হয়ে পশ্চিম গগন-প্রান্তে এসে ঝুঁকে পড়ে, একটা অন্ধকার যেমন তখন চার দিক্‌কার জলস্থলকে পরিবেষ্টন করে ঘনীভূত হতে থাকে, ঠিক্ তেমনি অনেকেরই এই ধারণা যে মানুষের মন যখন ঐ বিজ্ঞানের উপর গিয়ে ঝুঁকে পড়ে, চারদিক হতে ধর্ম্মহীনতার নিবিড় আবেষ্টন তখন তাকে জড়াতেই থাকে। ভিতর ও বাহির তার শুধু কালোয় কালো হয়ে ওঠে। এই যে ধর্ম্মহীনতার ভয়, এই যে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এমন একটা অপবাদ, এর বেশ একটা স্বভাবিক কারণ রয়েচে।

যা অস্বাভাবিক, যা অসম্ভব রকমের, এমন কোনো জিনিষের প্রতি নজর পড়ে সব চেয়ে আগে। তাই মানুষ যখন দেখ্‌ল সূর্য্যের কি তেজ, আগুনের কি ক্ষমতা, বাতাসের কি শক্তি, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে তাদেরি চরণে লুটিয়ে পড়ল; আস্তে আস্তে মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝল, না, সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি-বহ্নি এদের কোন শক্তিই নাই, এই সবাকার অন্তরালে একজন রয়েছেন, যিনি Super human, (অতিমানুষ) যিনি অদ্ভুত, যিনি আশ্চর্য্য। জন সাধারণের Super human-এর প্রতি যখন ভীতি-বিস্ময়ের ভাবটি পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান,—যারি দরুণ রামচন্দ্র হতে আরম্ভ করে "কচ্ছপচন্দ্র" পর্য্যন্ত অবতার হয়ে উঠ্‌লেন, মানবমনের এই অবস্থাতে গুটিকয়েক বৈজ্ঞানিক যখন প্রমাণ করে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগলেন,—যা কিছু আশ্চর্য্য দেখ্‌চ, যা কিছু অসামঞ্জস্য বা অমিল বলে বোধ হচ্ছে, এই প্রত্যেক অমিলের মধ্যে একটা মিল রয়েচেই; এক অলক্ষ্য সহজ নিয়মের সূত্রে সমস্ত জগৎটা আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা; তখন মানব-মন স্বভাবতঃই সন্দিহান হয়ে উঠ্‌ল। আর যে অবতারতত্ত্বের বন্যায় দুনিয়া ভেসে যাচ্ছিল, তাতে তখন ক্রমে ভাঁটা পড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

আকাশের তড়িতকে এমন করে বেগার খাটিয়ে নেওয়া, যত প্রয়োজনীয় জিনিষের ফরমাস সবই বিজ্ঞানকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া, প্রকৃতির কাছ থেকে এমন করে সুদেআসলে আদায় করে নেওয়া—এই সব দেখে শুনে সে সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হতে লাগল; মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া অমানুষিক কার্য্য দেখে সাধারণ লোকে আশ্চর্য্য তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসেও কেমন একটা ছায়া এসে পড়ল। মানুষ তখন ধর্ম্মান্ধ হয়ে বলে উঠ্‌ল—
"I am the monarch of all I survey."

কিন্তু মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কি মনে পড়ে না, যে প্রকৃতির এই সোজা নিয়মের মধ্যে তাঁরি নিবিড় প্রেমের সজীব চিহ্ন বর্ত্তমান, যাঁর গভীর গোপন প্রেম সমগ্র বিশ্বে আলোর মতো ছড়িয়ে রয়েচে? নাস্তিক হয় তো বল্‌বেন "আমি বিশ্বাস করি না।" কিন্তু অন্তরের মানুষ যে কিছুতেই সে কথায় কাণ দেয় না!—

"মনে করি কান্না হাসি
আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
আমারি ঢেউ খেলা।
সেই আমি যে বাহন মাত্র
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
রয় তা তোমার সনে।"

কবির এই উক্তি কি মোটেই মনে পড়ে না?

এই যে বিশ্বযজ্ঞের আমন্ত্রণচিঠি প্রতি মানবের নিকট নিত্য এসে পৌঁছায়, এই যজ্ঞ-সমাধানের ভার যে ঐ মানবের উপরেই। এ-যে বিধাতার আনন্দের খেয়াল! যা কিছু দরকার সমস্তই তো তিনি নিপুণ কারিগরের মতো সাজিয়ে রেখেচেন! শুধু তিনি চান্ আমরা একটা কিছু করি; আজ সেই "একটা কিছু করবার" অহংকারের ধোঁয়া কি এম্‌ন করেই আমাদের চোখ্‌কে ধাঁদিয়ে দেবে যে স্পষ্ট করে জবাব দেব—"নেই, নেই, তিনি নেই কেউ নেই, কিছু নেই।"

কিন্তু যাঁরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন "তিনি আছেন," "তিনি আছেন," আজ তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি ভোরের বেলা বিশ্ব-সভার আলোকদূত বহু যোজন দূর হতে প্রভাতের মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি, জাগরণের মঙ্গল-গীতি ধ্বনিত করতে না করতেই যেমন পাখীর বাসায় নড়াচড়ার সাড়া পাওয়া যায়, পল্লবিত তরু মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেম্‌নি আমাদের হৃদয়ের পাখীর বাসাটিতেও কি পাখী জেগে উঠে গেয়ে ওঠে না, যখন বিজ্ঞানের উজ্জ্বল

আলোকে, বিশ্ব-নিয়ম-সূত্রের মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তা জাগ্রত ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ প্রতিভাত হয় ?

ছেলে বেলা অবাক হয়ে ভাবতাম্, মাছেরা বাঁচে কি করে ? ছেলে বেলাকার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে বা 'বোধোদয়ের' কোনো অধ্যায়ে "মৎস্য জলচর" এই বেদ-বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো সদুত্তর তখনো পাই নি, যা শিশু-মনকে তৃপ্ত করে ; কিন্তু বিজ্ঞান অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে করে সমগ্র বিশ্বকে বলে দিচ্ছে, যে-প্রেম বিশ্বকে পরিচালনা করচে, সেই প্রেমই এমন আশ্চর্য্য রকমে জলচর প্রাণীর জন্য অন্যান্য বন্দোবস্ত করার সঙ্গেই Dissolved airএর বন্দোবস্ত করে রেখেচেন, যে মানুষ স্বতঃই বলে ওঠে "অহো কিম্ !"

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে এক বিপুল Harmony বর্ত্তমান, সেই সামঞ্জস্যের সুরটি কি আমাদের সংসারাসক্ত মনকে স্পন্দিত ও নন্দিত করে তোলে না ? এই উদ্ভিদ্ ও জীব যেন বিশ্বমাতার অনিমেষ দৃষ্টির সম্মুখে দু'টী সন্তান। তারা যেন একে অন্যের প্রতি পরম প্রীতিতে পূর্ণ। তাই কবি ব্রাউনিংএর কথায় বল্‌তে ইচ্ছে হয় :—

"We and they are His Children
One family here—"

বিশ্বজগৎ ধ্বনিত করে যে এক মহাসামঞ্জস্যের সুর অনবরত বেজে উঠ্‌চে, বিশ্বের সকল দৃশ্যে যে এক মহা আত্মীয়তার স্পন্দন,—এই স্পন্দনে কত জনের হৃদয়তন্ত্রী যে কি ভাবে বেজে উঠচে তা কে বল্‌বে ? Pythagoras—এর "Spheral music" ও Miltonএর "Heavenly tune" আমরা স্পষ্ট করে অনুভব করব তখনই, যখন সারা বিশ্বের দিকে একবার চাওয়ার মতো চাইব ; বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চশমার ভিতর দিয়ে।

তারপর মাধ্যাকর্ষণের কথা মনে করুন। বৃন্ত হতে আপেল ফলটি মাটির দিকে পড়তে দেখে Newton জগতের কাছে পৃথিবীর এই আকর্ষণী শক্তির কথা বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কি ঘোষণা করেন নি, যে গ্রহে-গ্রহে এই যে আকর্ষণ সমস্ত সৌর-জগৎটাকে এমন সামঞ্জস্যের পথে ধরে রেখেচে এর মূলে এমন এক পরম ও চরম শক্তি বিরাজ করচে, যে শক্তি শুধু Power রূপে নয় প্রেমাস্পদ-রূপে নিত্য বর্ত্তমান ?

দেহতত্ত্বের সকল কথা ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু চোখের কথা চিন্তা করি, হৃদয়ের ফুলের বাগানটি হতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি মহ-প্রেমিক যিনি, তাঁর চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে। ক্ষুদ্র চুটি চোখ, তারি মধ্যে কত ব্যবস্থা, কত আয়োজন!

এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জোরের সঙ্গেই প্রচার করেছিলেন, "Every Science Primer is a wonderful Sermon of the All wise."

তাঁর এ কথা বল্‌বার মানে শুধু মানবান্তরের সেই বৈরাগীর সঙ্গে বোঝা-পড়া—যিনি উচ্চকণ্ঠে বল্‌তে চান্—"বিজ্ঞান ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বড় একটা সহায় নয়।"

বৈরাগী তাঁর বৈরাগ্যবারিধি নিয়েই থাকুন; আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে পুরুষ ব্যক্তিরূপে অধিষ্ঠিত রয়েচেন, যে ব্যক্তিত্ব কারো বাধা মানে না, নিষেধ শোনে না, অন্তরের সেই মানব জোরের সঙ্গেই বল্‌চেন—মানুষ তোমরা, মানবত্বের পূর্ণ বিকাশের অধিকার পরিপূর্ণরূপেই তোমাদের রয়েচে। সে মানবত্ব শুধু ঘরের কোণে নয়, শুধু অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নয়, শুধু পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরে নয়, প্রদীপ্ত আলোক-রশ্মির মতো সে জগৎময় ছড়ানো।

বাস্তবিক জীবনের সার্থকতা শুধু ফাটল্-ধরা ভাঙা ঘরের কোণে নয়, বিজনঘন অন্ধকারের মধ্যেও নয়, বিশ্ব-জগতের কাছে মানবের একটি দায়িত্বপূর্ণ Mission রয়েচে, যে দায়িত্ব তাকে টেনে বার করে, ঐ মহামিলনের সদর রাস্তায়, ঐ "সবার পিছে, সবার নীচে সব-হারাদের মাঝে।" এই লক্ষ্যপথে প্রধান সহায়ই হল বিজ্ঞান।

আমরা যাকে Co-operation বলি, এই Co-operation এর ভিত্তিভূমিও ঐ বিজ্ঞান। আজ যে সুদূর পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সকলেই এক মিলন-ভূমির উপর এসে দাঁড়িয়েচি, আজ যে আমরা শুধু বাঙালী নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, জগদ্বাসী বলে নিজেরা গৌরব অনুভব করি, এই সবাকার পশ্চাতে রয়েচে ঐ বিজ্ঞান।

তারপর জ্ঞানের কথা পাড়ি। একদিন যখন "কেন"র প্রত্যুত্তরের কোন স্থানই ছিল না। "না-জানার" অতল গভীরে তলিয়ে থাকাই ছিল মানবের অদৃষ্ট, অমানিশার ঘোর অন্ধকারে মানবের প্রধানতম ধর্ম্মই ছিল—"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।" বিজ্ঞানের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তমিস্রা রজনীর সেই নিবিড় তিমিররাশি ধীরে ধীরে কোথায় বিলীন হয়ে গেল; সেই

তামস রজনীর মায়াছায়ার অন্তে প্রভাত-উৎসব সুরু হল। আজ সেই প্রভাত উৎসব-প্রাঙ্গণে, আশার রঙিন ছটায় ঘেরা পূবগগনের দিকে তাকিয়ে আমরা আরো, আরো আশন্বিত হচ্চি, উৎসাহিত হচ্চি।

এই যে নবযুগ তার নবতর আলোকবর্ত্তিকা নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, এই যে আলোয় আলোকিত বর্ত্তমান, এই যে অদূরস্থিত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এই সকলই আজ যেমন একদিকে একই কণ্ঠে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা কচ্ছে, তেমনি আর একদিকে এ কথাও উচ্চকণ্ঠে বিশ্বের বুকচিরে উত্থিত হচ্চে—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বম্ ভুবনমাবিবেশ
যো ওষধিষু বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

শ্রীসুশীলকুমার দাস গুপ্ত।

হা'ঘরেদের ভোজ।

আজ্‌কে বড়ই ব্যস্ত আছি সবে
করতে হবে নানান্ আয়োজন
হা'ঘরেদের ভোজন হেতায় হবে
গেছে তাদের করতে নিমন্ত্রণ।

(২)

উড়ন্ত ওই পক্ষীদিকে ডাকি,
দেখিয়ে দেব কেমন মোদের বাসা;
ক্ষণেক তরে স্নেহের ছায়ে রাখি
চাই যে দিতে গৃহীর ভালবাসা।

(৩)

চলন্ত ওই সজীব পোতের গায়ে
বসিয়ে দেব বন্দরেরি ছাপ্,
নিরুদ্দেশের কপোতদেরি পায়ে
ঘুঙুর দেব হয় বা হবে পাপ্।

(৪)

আজ্‌কে মোরা চঞ্চলেরে টানি
মাখিয়ে দেব অচঞ্চলের ফাগ্,
লক্ষ্মীছাড়ার যজ্ঞ তুরগ আনি
বসিয়ে দেব জয়পত্রের দাগ।

(৫)

হয় ত ও-সব ভবঘুরের মনে
জাগ্‌তে পারে এই সে দিনের স্মৃতি,
হয় ত তাদের শ্রান্তি দুখের ক্ষণে
স্মরবে পরাণ এই বাসাটীর প্রীতি।

(৬)

ঘরের সাথে হাঘরেদের চেনা
আজ্‌কে মোরা দেবই দেব করে,
অকূলেরে কূলের কাছে আনা
চেষ্টা মোদের সারা জীবন ধরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রিয়তমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:*:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত দিনের পর আরও দুই সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে, স্বামীর সহিত আর জুলিয়েনের কোন বিশেষ কথা হয় নাই, তবে তাহার মনে হয়—পূর্ব্বে তিনি যতটুকু আগ্রহে বা সম্মানের সহিত তাহার সহিত সাধারণ কথা কহিতেন এখন যেন সে মৌখিক-ভদ্রতারও হ্রাস হইয়াছে। সহিষ্ণু লিয়েন এটুকুও ধীরভাবেই গ্রহণ করিল।

আজ কয়দিন সে রুডিসডকের কোন সংবাদ পায় নাই, নানাবিধ দুশ্চিন্তার মধ্যে আজ মাতার লিখিত পত্রখানি পাইয়া লিয়েন বড় তৃপ্তি বোধ করিল। জানালার কাছে গিয়া সাগ্রহে সে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

যথোচিত স্নেহাভিব্যক্তি ও আশীর্ব্বচনের পর তিনি জানাইয়াছেন যে তাহার শরীর আজ-কাল অত্যন্ত অসুস্থ, চিকিৎসকে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু আলরিক তাহাতে সম্মত নয়, সে বলে—এখন তাঁহার কোথাও যাইবার আবশ্যক নাই। আলরিকের জ্বালায় তিনি জ্বালাতন হইয়াছেন, তাহাকে আর কোন কথা বলিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন তাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যাকে লিখিতেছেন, যে, জুলিয়েনের স্বামী তাহাকে যে টাকা পকেট-খরচ দিয়া থাকেন, তাহা হইতে এখন একশত পাউণ্ড পাঠাইলেই তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতে পারেন।"

পত্রখানি পড়িয়া লিয়েন স্তব্ধ হইয়া গেল। কি হইয়াছে মাতার? দ্বিতীয়তঃ—সে কোথায় টাকা পাইবে? হাত-খরচের সেই গিনিগুলা—ওঃ, লিয়েনের অন্তর হইতে দেহ পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। না সে অর্থে হাত দিবে না সে! মাতার এই অনুরোধে অভিমানিনীর দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল,—তবে মাতার এ সাধ সে পূর্ণ করিবে—যেমন করিয়াই হউক। মাতা বুঝুন যে তাঁহার কন্যা রাজরাণী হয় নাই।

এই চিন্তায় তাহার মনের ভাব দৃঢ় ও সুস্থ হইয়া উঠিল। সে পত্রখানি আবার পড়িয়া খামে পুরিয়া—খামখানা নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। উপরে শীল আঁটা, কিন্তু লিয়েনের মনে হইল যেন কে সেই শীল খুলিয়াছে, মোহর ঠিক্ আছে কিন্তু শীলের অবস্থা ঠিক্ নয়। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—এ বাড়ীর সমস্ত চিঠিপত্র প্রথমে হপ্‌মার্শেলের হাতেই যায়; তবে কি তিনিই এটা খুলিয়া দেখিয়াছেন? কথাটা মনে আসিতে লজ্জায় ঘৃণায় লিয়েনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে বাহিরে আসিতেই লিয়েন শুনিল আজ বৈকালে ডচেস্ অফ্ মর্টিথ শোন্‌ওয়ার্থে পদার্পণ করিয়া মাইনো জনকে সম্মানিত করিবেন। বাটীর সকলের মুখে সে ডচেস্ সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই শুনিল, ইণ্ডিয়ান হাউসের ফলফুল তুলিতে তিনি বড় ভালবাসেন, পূর্ব্বে প্রায় এখানে আসিয়া উদ্যানে বেড়াইয়া যাইতেন। বিধবা হওয়ার পর এই দেড় বৎসর আর কোথাও যান নাই,—কোন আমোদে যোগ দেন নাই,—বহুদিন পর আজ এখানে আসিতেছেন। সে আরও শুনিল, এই রাজবংশীয়া সুন্দরীকে হপ্‌মার্শেল অত্যন্ত সম্মান করেন, তাহার অভ্যর্থনায় অর্থব্যয়ে তিনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। অতিথিসম্বন্ধে কি বলিবেন বলিয়া আজ প্রভাতেই তিনি জুলয়েনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

লিয়েন যখন হপ্‌মার্শেলের কক্ষে আসিল তখন তিনি লোকজনদের ডাকিয়া ডচেসের আগমন সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিতেছিলেন, লিয়েনকে দেখিয়া বলিলেন, "এইযে ব্যারণেস্‌ও আসিয়াছেন। শোন, তোমায়ও কতকগুলা কথা বলিতে হইবে—কারণ তুমিই ত এখন এ গৃহের কর্ত্রী;—নাও ঐ কাগজটায় সব লিখিয়া নাও, অনেক খুটিনাটি—দেখিও যেন ভুল না হয়।"

জুলিয়েন মনোযোগ দিয়া তাঁহার সমস্ত উপদেশ শুনিল ও কিছু কিছু লিখিয়া লইল। আর বেশী সময় নাই; সে ভৃত্যদের আদেশ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি আসিতেছে, এমন সময় দেখিল নীচের দ্বারে দাঁড়াইয়া রাওয়েল তাহাকে ডাকিতেছেন, সে নিকটে আসিলে বলিলেন, "আজ যে মাননীয়া মহিলা আমাদের অতিথি হইবেন তাঁহার কথা তুমি শুনিয়াছ কি?

লিয়েন বলিল, "হাঁ এই মাত্র হপ্‌মার্শেল আমায় সেই কথাই বলিতেছিলেন।"

"কিন্তু আমি যে মস্ত ভুল করিয়াছি আমার উচিৎ ছিল বিবাহের পরই এখানের সমাজে তোমায় পরিচিত করিয়া দেওয়া,—কিন্তু তাহা হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম এই ভ্রমণের পর কিছু ধীরেসুস্থেই কাজটি করিব। কিন্তু হঠাৎ ডচেস্ আসিয়া পড়িতেছেন,—কি করিব আর ত উপায় নাই! যা হোক্ তাঁর অভ্যর্থনার ব্যাপারে তোমাকেও কতকগুলা ভার লইতে হইবে যে।"

"সে কথাও তোমার কাকা বলিয়াছেন, আমি সব টুকিয়া লইয়াছি।"

"কৈ দেখি।" বলিয়া ব্যারণ কাগজ পড়িতে পড়িতে তাহাতে আরও দু একটা কথা যোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা জুলিয়েন!—এই ডচেস্ সৌখিন সমাজে ফ্যাসানের রাণী, পোষাকপরিচ্ছদের প্রতি ইহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, সাদাসিদা ভাবটি ইনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

মুখ নত করিয়া মৃদু হাসির সহিত লিয়েন বলিল, "সে আর বেশী কথা কি।"

"হাঁ তোমার সাজটি যেন ভাল হয়, মনে রাখিয়ো।" বলিয়া ব্যারণ দুইটা নূতন ট্রাঙ্কের সুবিধা প্রভৃতি দেখিবার জন্য তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ব্যস্ত হইলেন। এ দুটি তাহার বিদেশ যাত্রার জন্য ফরমাস্ দিয়া আনা হইয়াছে। স্বামীর আর কোন বক্তব্য নাই দেখিয়া জুলিয়েন নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সমস্ত মধ্যাহ্নটি আয়োজনের উৎসাহেই কাটিল। প্রাসাদ হইতে উদ্যান, সর্ব্বত্র সমান-ভাবে উৎসব-সজ্জা চলিতেছে; দাসদাসীরা মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পায় নাই,—আর থাকিয়া থাকিয়া হফ্‌মার্শেলের উচ্চ আদেশ-ধ্বনি, সমস্ত কোলাহলের শব্দের উপর খন্ খন্ করিয়া বাজিতেছিল। তাঁহার এই উৎসাহ দেখিয়া লিয়েনের আশ্চর্য্য বোধ হইল। এই আগমন-সম্ভাবিতা সুন্দরীর সম্বন্ধে তাহারও যে কৌতূহল ছিল না এমন নয়; তাঁহার বিষয় যতটুকু সে জানে, তাহার মধ্যে একটি দৃষ্টি তাহার বুকে বিঁধিতেছিল,—কিন্তু তবু—তাঁহাকে দেখিবার জন্য সে অন্তরে অন্তরে চঞ্চল হইয়া প্রতিক্ষণে ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।

অপরাহ্নের পূর্ব্বেই, সে প্রিন্সের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া সুসজ্জিত বেশে হলের দিকে চলিল। স্বামীর গৃহের পানে চাহিয়া দেখিল —তিনি তখনও আপনার যাত্রার উদ্যোগ লইয়া ব্যস্ত

এই চারিদিকব্যাপী উৎসাহের সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব নাই। লিয়েন যে তাঁহার সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল না। আজ প্রভাত হইতে নানা চিন্তার জটিলতায় তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বেলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে যেন কেমন একটু অবসাদের ভাব মিশিয়া সহায়হীনা নারীর হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

সেখানে হপ্‌মার্শেল ও তাঁহার প্রিয় পারিষদ্ কোর্ট চ্যাপলিন বসিয়াছিলেন। অন্যদিন অপেক্ষা পাদ্রীর বেশভূষা আজ মূল্যবান ও সুশ্রী। লিয়েনকে দেখিয়া তিনি সম্মানের সহিত অভিবাদন করিলেন। কিন্তু পাশ হইতে হপ্‌মার্শেল বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ, এ আবার কি ঢং! তুমি কোন নাচের মজলিশে যাইবে নাকি,—যে এমন অদ্ভুত সাজ করিয়াছ?"

জুলিয়েন চমকিয়া উঠিল; সে কি কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছে তবে? কিন্তু হানা যে বলিল, এ সকল উপলক্ষে বিগতা ব্যারণেস ইহার অপেক্ষাও চাকচিক্যময় সুশ্রী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তবে তাহার দোষ হইল কেন?—সে বৃদ্ধের কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে থাকিল।

কিন্তু তাহাকে পরিহাস করিবার অবসর পাইলে মার্শেল সহজে ছাড়িবেন না, তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়াও তিনি বলিলেন, "আমার জানা ছিল যে অপরের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিবার জন্যই উৎকৃষ্ট সাজের প্রয়োজন হয়, আর এ যে নিজের বাড়ীতে বসিয়া অতিথি-অভ্যাগতের সম্মুখে নটীর বেশে অভ্যর্থনা করা,—ইহা কখনও দেখি নাই।"

কোর্ট চ্যাপ্‌লিনের সম্মুখে এইভাবে লজ্জিত হইয়া লিয়েন কি করিবে স্থির পাইতে ছিল না, বসনভূষণে তাহার স্পৃহা কোন দিনই ছিল না, অথচ তাহা লইয়াও আজ তাহার এই অপমান সহিতে হইল। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের উপর তাহার ঘৃণা জন্মিতেছিল, আর মনে পড়িতেছিল,—রুডিসডর্কের শান্ত-সুমধুর আশ্রয়টি; এখানের এই পীড়িত ভারাক্রান্ত প্রাণটাকে লইয়া যাঁহার স্নেহসুকুমার ক্রোড়ে লুটাইতে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু তৎক্ষণাৎ হপ্‌মার্শেলের কর্কশ চীৎকারে তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া নিত্যদিনের অভ্যস্তভাবে সে শুনিল, তিনি সক্রোধে বলিতেছেন;—"ও কি এ তোড়া

তুমি কোথায় পাইলে? ও যে সব আমার বাগানের ভাল ভাল ফুল! কি অন্যায় দেখ দেখি, কেন তুমি কি আর ফুল পাও নাই যে ঐ ফুল ক'টি ধ্বংশ করিয়া তোড়া হাতে লইয়া—বেড়াইতেছ?"

আঃ সাধারণ কথার সুরও কি একটু সাধারণভাবে বলা যায় না? প্রত্যেক কথার মধ্যে এত আঘাত কতক্ষণ সহ্য হয়? তবু অতি ধীরে—অতি সাবধানে লিয়েন বলিল, "ব্যারণ আমায় বলিয়াছিলেন যে এই ফুলে তোড়া বাঁধিয়া ডচেস্‌কে দিতে হইবে।"

"ডচেসের জন্য? ওঃ সে ত আলাদা কথা—ভাল কথা! ক্ষমা কর, প্রিয় লেডি, ক্ষমা কর আমায়। সুখী হইলাম তোমার এই সুন্দর তোড়া দেখিয়া।" বলিতে বলিতে মার্শেলের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তখন লিয়েন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কোথায় যাইতেছ ব্যারণেস্? বস না?"

অগত্যাই জুলিয়েন বসিল,—যদিও সে জানিত যে ইহার পরই আবার সেই শ্লেষ-বিদ্রূপের অবতারণা হইবে। বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া মরেন, অথচ তাহাকে জ্বালাতন করিবার লোভে কাছে বসাইয়া রাখিতেও ভালবাসেন; লিয়েন তাহা বুঝিত, অত্যন্ত বিরক্তিকর হইলে উত্তরও দিত। কিন্তু আজ সেই ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে নিত্যনৈমিত্তিক বিরক্তিজনক কাণ্ডের অভিনয় হইবে ভাবিয়া তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

সে ভাবিতেছিল আজ বৃদ্ধ তাহাকে যাহাই বলুন না কেন সে কোন কথার উত্তর দিবে না; তাহার স্বামী কত দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিতেছেন, এ কয় দিন আর কিছুতেই তাঁহার শান্তিতে বাধা জানিবে না;—আর আরও কত কি! আজ প্রভাত হইতে কি জানি কিসের,—বোধহয় বিফল জীবনের বিফল রোদন তাহার বুকে গুমরিয়া উঠিতেছিল, সে তাহার বেগ যেন সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না।

আবার বৃদ্ধের স্বরেই তাহার অশ্রুজালাচ্ছন্ন চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সে দেখিল টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া তিনি একটি ভগ্ন পার্শ্বেল বাহির করিয়াছেন। লিয়েন বেত্রাহতের ন্যায় চমকিয়া চিনিল—এটি তাহারই; পূর্ব্বদিন সেই ইহা তাহার মাতার নামে পাঠাইতে দিয়াছিল!

তাহা হইতে একটি অঙ্গুরী বাহির করিয়া হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "আমি তোমার পার্শেল খুলিয়াছি লেডি, বাড়ী হইতে কোন জিনিষ বাহিরে যায় সে সম্বন্ধে আমি একটু দৃষ্টি রাখি, বুঝিলে ? খুলিয়া দেখিলাম আমার ভ্যালেরীর আংটিটি রুডিসডর্কে চালান হইতেছে !"

এবার জুলিয়েন ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "না মহাশয় না, ইহা আমার নিজের আংটি যাহার কথা আপনি বলিতেছেন তাহার সহিত ইহার গঠনের সম্পূর্ণ মিল থাকিলেও এ সে আংটি নয়, দেখুন উহার ভিতরে ট্রেচেনবার্গ-বংশের চিহ্ন দেওয়া আছে, আমার পিতামহী আমায় এটি দিয়াছিলেন।"

হপ্‌মার্শেল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বুঝিলেন লিয়েনের কথা যথার্থ, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু ভ্যালেরীর আংটির সঙ্গে যে ইহার সাদৃশ্য আছে তুমি তাহা জানিলে কি করিয়া ?"

"তাহা যে আমার কাছেই আছে, আমার নিজেরটার মত অবিকল দেখিতে বলিয়া ভাল করিয়াই দেখিয়াছি সেটি কে।"

"ওঃ—ইহার মধ্যে তাহার সেই মহামূল্য জহরৎগুলা সব তোমার দখলে গিয়াছে দেখিতেছি ! খুব হুঁসিয়ার মেয়ে ত তুমি !"—

লিয়েনের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল,—

"আমি কিন্তু এ সকল চাই নাই মহাশয় ! আমার আসার পূর্ব্ব হইতেই আমার ঘরে রাখা ছিল।"

"হাঁ, যাহাকে তুমি আমার ঘর বলিতেছ, সে ঘর যে আমার ভ্যালেরীর ছিল।"

লিয়েন বলিল, "তাঁহার সমস্ত জিনিষ আমি পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি।"

"বিস্তর অলঙ্কার, না ? এটা পরিবার আর প্রয়োজন নাই—তাই ভগ্নীকে দিতেছ বোধ হয় ?" মার্শেলের কথার উত্তরে লিয়েন বলিল, "না, কেহ ব্যবহার করিবে বলিয়া দিই নাই।"

হো হো শব্দে হাসিয়া হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "না না আমারই ভুল হইয়াছে লেডি ? এটি তোমার মার সেই সৌখিন কুকুটার গলায় ঝুলিবে, না ?"

মুখ হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে লিয়েন বলিল. "সবই জানেন আপনি, পরিহাস করেন কেন? আমার মার শরীর ভাল নাই, ডাক্তারে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে যাইতে বলিয়াছেন,—তাই এটি পাঠাইতেছিলাম।"

"হুঁ, তুমি ধনবতী কন্যা, দিবে বৈ কি! তাঁর আর আর খরচও তুমি দাও বোধ হয়?"

এই সকল কথা কাটাকাটিতে লিয়েনের বড় কষ্ট হইতেছিল,—সে পলায়নের অবকাশ খুঁজিতেছিল। কিন্তু মার্শেলের অন্যায়-অভিযোগে তাহার আহত আত্মাভিমান ঘৃণায় লজ্জায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে;—কঠিন মুখে সে বলিল, "আপনি পার্শেলটা দেখিয়াছেন ত, তাহাতে আপনাদের কিছু আছে কি? আমি আপনাদের কোন কিছুই পাঠাই নাই দেখুন।"

"তাই ত ভাবিতেছি! আংটিটার দাম বড় জোড় চল্লিশ কি পঞ্চাশ পাউণ্ড, উহাতে কি মাননীয়া কাউণ্টেসের বায়ু পরিবর্ত্তনের খরচ কুলাইবে? আর এ শুক্‌না লতাপাতা কি তাঁহার ঔষধস্বরূপ যাইতেছে?"

"না. খরচ কুলাইবে না বলিয়াই ওগুলি দিয়াছি. বাজারে ঐ উদ্ভিদ্‌গুলির খুব বেশী দাম, রুষিয়ায় পাঠাইতে পারিলে আরও অনেক বেশী টাকা পাওয়া যায়।"

"কি বলিলে—কি বলিলে?—বাজারে বিক্রয়? ব্যারণেস্ মাইনো ঐ গাছগাছড়া বেচিয়া পয়সা উপার্জ্জন করেন, এ কথা উচ্চারণ করিলে কি করিয়া? স্যার প্রিষ্ট! শুনিলেন ত ব্যাপারটা? বলুন দেখি রাওয়েল এ কোন্ ইতর স্ত্রীলোক আনিয়া আমার উন্নতহৃদয়া ভ্যালেরীর আসনে বসাইয়াছে? আবার ইহারই হাতে আমার লিয়োকে—ভবিষ্যৎ ব্যারণকে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত আছে! ছি ছি—আমি কি করি এখন?"

তিনি হাতমুখ নাড়িয়া বকিয়া চলিয়াছেন, ততক্ষণে লিয়েন টেবিলের উপরের সেই মোড়কটি আবার বাঁধিতে লাগিল। তখন তিনি সেটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "থাম, আরও যে কি কি আছে দেখি, ও গোল জড়ানো মোটা কাগজখানা কি?"

খুলিতে দেখা গেল তাহা একখানি সুন্দর তৈলচিত্র, ছবিখানির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কোর্ট চ্যাপলিনও ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন। আধ মিনিট—অতি অল্পকাল ঘরখানি নিস্তব্ধ ছিল, তাহার পরই বৃদ্ধের তীব্র রোষগর্জ্জন উঠিল;—"বটে, এত দূর? তুমি ত

সাধারণ স্ত্রীলোক নও! এত দুষ্ট বুদ্ধি তোমার? আমাদের পরিবারের যে একটি মাত্র কলঙ্ক তাহা এমনি করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে চাও বুঝি?"

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে লিয়েন বলিল, "না না ইহাতে সে সম্ভাবনা কোথায়? কে চিনিবে দেখুন, কাহারও নামও ইহাতে নাই!"

"নাই বা থাকিল! তোমার বন্ধুবান্ধবরা দেখিয়া—না না এটাও যে বিক্রয় হইবে দেখিতেছি? তোমার আত্মীয়রাই কিনিবেন নিশ্চয়—"

বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "আমার তেমন ধনবান আত্মীয় কেহ নাই মহাশয়, এটিও আমি সাধারণের জন্যই দিয়াছি, যে বেশী মূল্য দিতে পারিবে—"

"আবার ঐ নীচ ব্যবসার কথা! দ্যাথ রাওয়েলের স্ত্রী, তুমি এ বুদ্ধিটি ছাড়, বরং তোমার মাতার খরচ আমি নিজেই দিব তবু এ অপমানজনক কাজ তোমায় করিতে দিব না?

"না তাহা হইবে না।"

"কি হইবে না? তুমি বিক্রয় ব্যবসা ছাড়িবে না?"

সে কথা বলি নাই,—ও ছবি আঁকিবার সময় আমি বেশী ভাবি নাই, মনে করিয়াছিলাম যাক্ বিক্রয়ের কথা বলি নাই,—বলিতেছিলাম আপনার টাকা তিনি লইবেন না।"

"কে লইবেন না—তোমার মা?"

"হাঁ, ট্রেভেনবার্গরা দরিদ্র কিন্তু কাহারও নিকট হাত পাতিতে অপমান বোধ করে।"

হপমার্শেল ও চ্যাপলিন দুজনেই লিয়েনের প্রতি চাহিলেন, রাজরাণী তুল্য বেশে সেই যৌবনপ্রদীপ্তা সুন্দরী তখন মহিমময়ী রাজ্ঞীর ন্যায় মরাল-গ্রীবা-ভঙ্গী উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে; মুখে বিজয়িনীর দর্পিত প্রতিভা, চক্ষে অবজ্ঞার তীব্র ভ্রূকুটি। বৃদ্ধ প্রথমতঃ ভীত হইয়াছিলেন, তিনি লিয়েনের অসামান্য তেজোগৌরবকে বিশেষরূপেই চিনিতেন; কিন্তু আজ যেন তাঁহারও ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল, মাননীয় বন্ধুর সম্মুখে এই ঘৃণাভাজন বালিকার নিকট পরাভবের লজ্জা তাঁহাকেও কশাহত করিয়া উত্তেজনায় অধীর করিয়া তুলিল। তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়াছিলেন, তৎপরেই ক্রুর হাসির বজ্রধ্বনি তুলিয়া—টেবিলের উপর

সেই হাসির তালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ; "অপমান বোধ করে ! ট্রেচেনবার্গ কুমারি, আমার কাছে সাহায্য লইতে তাঁহার অপমান বোধ হয় ! হাঃ হাঃ হাঃ—"

লিয়েন এ পৈশাচিক হাসির অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাই অসন্দিগ্ধভাবে বলিল— "ইহাতে হাসির কথা কিছু নাই, অপমানকে মানুষমাত্রেই অপমান বোধ করে, এমন অর্থ লইয়া আরোগ্য লাভের অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়।"

"তোমার মাতার পক্ষেও কি ?"

বার বার মাতার নামে ইঙ্গিত শুনিয়া লিয়েন বুঝিল তাহার মাতার বিষয়ে বৃদ্ধের কিছু জানা আছে, অথবা বিবাহ দিনের তাঁহার সেই প্রশ্ন—রাওয়েল কাকাকে বলিয়াছেন। মাতার প্রতিও তাহার বিরক্তি আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, "নিশ্চয় ! এমনভাবে সাহায্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। জীবনের জন্য—"

"থাম থাম, যথেষ্ট তেজ দেখাইয়াছ, এবার আমার কথা শোন দেখি। তোমার মার কথাই বলিতেছি আমি। তাঁহার কাছে জীবনের মূল্য যে কতখানি তাহা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু তুচ্ছ অলঙ্কার, সামান্য বস্ত্রের জন্যও তিনি এই ক্ষুদ্র মার্শেলের কাছে অনেক বার হাত পাতিয়াছেন—তা তুমি বিশ্বাস করিবে কি ? একবার একটা দোকানের বিল্ লইয়া তিনি বিশেষরকম বিপদে পড়েন, সে জন্য আমার নিকটেই তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন,—সেবার তাঁহার জন্য আমার হাজার পাউণ্ড্ বাহির করিতে হইয়াছিল।"

"সে কি ? কখনো না,—আমার মা—"

"হাঁ হাঁ, তোমারই জননী, কাউণ্টেস্ ট্রেচেনবার্গ ! আমি ভুল বলি নাই। বিশ্বাস হইল না বুঝি ? আচ্ছা দ্যাখ তাহার সাক্ষী এখনও আমার কাছে বর্ত্তমান।" বলিয়া বৃদ্ধ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আল্‌মারির কাছে গিয়া, তাহার ডালা টানিয়া কয়েকখানা চিঠি বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে একখানা চৌকা গোলাপী খাম লইয়া জুলিয়েনের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন ; "নাও তোমার মার নিজের হাতের লেখা,—পড়।"

"এই অভিনব কাণ্ডের জন্য লিয়েন প্রস্তুত ছিল না, বৃদ্ধের কথা তাহাকে আঘাতের [illegible] বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছিল। খামের উপরের লেখা দেখিল—তবু তাহার বিশ্বাস হইল না যে এ পত্র তাহার মাতা লিখিয়াছেন, অথবা কি লিখিয়াছেন তাহাও জানা চাই। সে

কম্পিতহস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইতেই অদ্ভুত হাস্যে বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু বলিয়া রাখি লেডি, ঐ সুগন্ধি পত্রখানি তোমার মাতার প্রেমপত্র, তাঁহার যৌবনের প্রণয়ীর উদ্দেশেই উহা লেখা হয়।"

জুলিয়েন পত্রখানি দেখিতেছিল, উপরে হপ্‌মার্শেলেরই নাম—আর তাহা কাউন্টেসের হস্তাক্ষর। তাহার মুখের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধের শেষ কথাগুলি কানে যাইতে সে কেমন বিহ্বল হইয়া গেল, অস্ফুট চীৎকারের সহিত সে পত্রখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। "ও কি ওকি, চিঠিটা কি ছিঁড়িবে নাকি? ও পত্র আমি নষ্ট করিতে দিব না।" বলিয়া হপ্‌মার্শেল তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইলেন।

জুলিয়েনের কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে জানালার প্রতি চাহিয়াছিল, কারণ সে দেখিতে পাইয়াছিল—অপর পার্শ্বের বারান্দায় রাওয়েল দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ত সকল কথাই শুনিলেন! তাহা হউক, কিন্তু তাহার এত অপমানের সময় স্বামী আসিয়া তাহার জন্য একটি কথা—একটু সাহায্যও ত করিলেন না? নিরুপায়—নিরুপায়! এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বাস করিতে আসিয়া সে কোন দিক্ দিয়া একবিন্দু স্নিগ্ধ ধারার সন্ধান পাইতেছে না! এমন করিয়া মানুষ কয় দিন বাঁচে? কত পাপের ফলে তাহার ভাগ্যে এ দুর্নিয়তির ভোগ আরম্ভ হইল? আজ যাহা সে পাইল, ইহার অধিক আর কোন অপমান কি লজ্জা মানুষের অদৃষ্টে ঘটে?

তাহার মুখ মৃতের ন্যায় পাংশুবর্ণ, ওষ্ঠাধর শুখাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা দেখিয়াও কুটিলহৃদয় নির্দ্দয় বৃদ্ধের করুণা হয় নাই, তাঁহার মুখে বিজয়গর্ব্ব ফুটিয়া পড়িতেছে, চিঠিখানিকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "কেমন, আমার কথায় বিশ্বাস হইল ত?"

কোর্ট চ্যাপলিন্ এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জুলিয়েনের অবস্থা দেখিয়া বোধহয় যেন তিনি কিছু বলিতে চান্—কিন্তু হপ্‌মার্শেলের ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল,—নিঃশব্দে রাওয়েল আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্যারণ ঘরে আসিতেই লিয়েনের ব্যাকুল চক্ষুর সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল। কিন্তু তাহাতে জুলিয়েন কিছু বুঝিতে পারিল না, স্বামীর মুখ আজ গম্ভীর—অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে

চোখ নামাইল, কিন্তু চমকিত হপ্‌মার্শেল বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক রাওয়েল! কোন খবর না দিয়া এমন নিঃশব্দে তুমি আসিয়াছ, আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে!"

একটু শুষ্ক হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "কেন কাকা, আপনার ঘরে ত আমি কোন দিনই খবর দিয়া আসি না।" বলিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া ত্বরিত স্বরে বলিলেন, "এ কি লিয়েন,—তোমার শরীর কি অসুস্থ?"

লিয়েন ঘাড় নাড়িল 'না'। তাহাতে তিনি বলিলেন, "একটু জল খাইবে কি?"

বিদীর্ণ প্রায় রোদনবেগকে সবলে থামাইয়া রুদ্ধ স্বরে লিয়েন বলিল, "না থাক্।"

"কেন থাকিবে, কেন, তোমার কষ্ট হইতেছে।" বলিয়া রাওয়েল এক গ্লাস জল আনিয়া পত্নীর হাতে দিলেন। ধীর স্বরে চ্যাপলিন্ বলিলেন, "ব্যারণেসের শরীর কিছু দুর্ব্বল।" রাওয়েল বলিলেন, "এই জানালার কাছে আসিয়া বসিলে হাওয়া পাইতে লিয়েন!"

বৃদ্ধ হপ্‌মার্শেল ক্লিষ্টা বালিকার অতটুকু যত্নও সহ্য করিতে পারিলেন না, বিদ্রূপ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রীর বিষয়ে অত সাবধান না হইলেও ক্ষতি নাই রাওয়েল. উনি অসাধারণ স্ত্রীলোক, মনের বলে পুরুষ মানুষকেও ভয় করেন না, উঁহার দুঃসাহসের কথা যদি শোন,—"

মিনতিপূর্ণ কোমলভাবে চ্যাপলিন্ বলিলেন, "আর সে সব কথা থাক্ মার্শেল।"

"কেন থাকিবে কেন? ঐ দুর্দ্ধর্ষ হিংস্র স্ত্রীলোক—আমার ঘরের কলঙ্ক বাজারে বাহির করিবে, আর আমি চুপ করিয়া তাই সহ্য করিব? দ্যাখ রাওয়েল ঐ ছবিখানি দ্যাখ।"

রাওয়েলও সেই দিকেই হাত বাড়াইয়া ছিলেন, তাহার পর ছবিখানি সম্পূর্ণ মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিত্রটি বর্ণসুষমায় অসাধারণ, কল্পিত বিষয়টিও তেমনি বিচিত্র। দেখিবামাত্র ব্যারণ বুঝিলেন সে এ দেশের দৃশ্য নয়, আকাশের সেই অপরূপ নীলিমা, মেঘ রৌদ্রের সে লীলাময় রূপ, পৃথিবীর হিমমণ্ডলে প্রকাশ পায় না। কিন্তু ও কে? লিয়েন কল্পনায় এ কোন্ দেবকন্যার মূর্ত্তি আঁকিয়াছে? চূড়াকার নীল পর্ব্বতমালার তলে তালীবনের অভিনব দৃশ্য, সম্মুখের হ্রদসলিলে তাহাদের সামান্য ছায়া পড়িয়াছে। নীলজলের মাঝ দিয়া সুধাধবল বর্ণ মরালদম্পতি পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। তীরের নিকট ঘন শ্যামল চিক্কণ পত্রদলের মধ্যে পূর্ব্বদেশ সম্ভব পূর্ণবিকশিত রক্ত-পদ্ম ফুটিয়া আছে।

সেইখানে—হ্রদ-জলে চরণ ডুবাইয়া, শ্যাম তৃণদলে অৰ্দ্ধশয়ানা এক তরুণী মূর্ত্তি চিত্রে অঙ্কিত। রমণীর রূপখানি মাধুর্য্যময় হইতে পারে চিত্রিতার লুণ্ঠিত দেহে যেন তাহাই ভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাওয়েল মনে মনে স্ত্রীর চিত্রাঙ্কন শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কল্পনার সৌন্দর্য্যকে এমনভাবে আঁকিয়া তোলা, এ তো সামান্য শক্তিতে সম্ভবে না! লিয়েন এ রূপের আদর্শ কোথায় পাইল ?

চিত্রিতার বসনভূষণও বিচিত্র! আকাশের ন্যায় কোমল নীলবর্ণের একখানি চিক্কণ বস্ত্রে তাহার সমস্ত শরীর জড়াইয়া আছে আর মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া অঞ্চলপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়াছে একখানি অতি সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত পাণ্ডুরবর্ণ ওড়না। সুন্দরীর দেহে ও বসনে স্বর্ণ মুক্তার প্রাচুর্য্য অত্যধিক। প্রভাতপদ্মের প্রথম বিকাশে মধুর নির্ম্মল হাস্য তাহার মুখখানিতে ফুটিয়া আছে; সে যেন সংসারের সুখদুঃখের কোন সংবাদ জানে না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ব্যারণ বলিলেন, "এ ছবির দোষ কি কাকা ?"

"ছবির দোষ ? হায় নির্ব্বোধ, তাও তুমি বুঝিলে না ?"

হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "ইহা ত একটি সুন্দরীর ছবি, কলঙ্কের কি আছে তাহা জানিব কি করিয়া ?"

গর্জ্জনস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "সুন্দরী! হাঁ ঐ সুন্দরের জন্যই না আমাদের নির্ম্মল নামে কলঙ্ক লাগিয়াছে! চিনিলে না রাওয়েল ? ঐ সেই রোটাস লিলি, ইণ্ডিয়ান্ উইচ্—সুন্দরী কাল-নাগিনী! তোমার স্ত্রীর অজানিত কথা ত এ পৃথিবীতে বোধহয় কিছুই নাই, আমাদের পারিবারিক সমস্ত যা কিছু—নিশ্চয় সব জানিয়া লইয়াছেন ইতিমধ্যে;—এখন ছবিতে ছড়াতে সে সংবাদ জানানো চাই ত ?"

জুলিয়েন বুঝিল এবার পিতৃব্যের ন্যায় ভ্রাতুষ্পুত্রও গর্জ্জনশব্দে তাহাকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না, ব্যারণ চিত্রটির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

হপমার্শেল বলিলেন, "আরও দেখিয়াছ ?"

রাওয়েল মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি ?" "তোমার স্ত্রীর ব্যবসার কথা শুনিয়াছ ? বেদেদের মত তিনি এই সব গাছ গাছড়া বাজারে বিক্রয় করেন ?"

"কেন ?"

"কেন তা উঁহাকেই প্রশ্ন কর। আর এগুলি রুষিয়ার বাজারে যাইতেছিল,—শ্রীমতী ট্রেচেনবার্গের বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে। ঐ ছবি ও ঔষধ বিক্রয়ে যে টাকা হইবে তাহা হইয়া মাতার চিকিৎসা চলিবে।"

রাওয়েল এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাহিরে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল, ও কোর্ট-চ্যাপ্লিন বলিয়া উঠিলেন, "ডচেস্ আসিলেন যে !" "তাইত !" বলিয়াই হপ্মার্শেল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ভৃত্যদের ডাকিতে লাগিলেন। লুপ্তপ্রায় শুভ্র কেশগুলিও যথাযথ বিন্যস্ত আছে কিনা, সম্মুখের দর্পণে তাহা দেখিয়া, পোষাকের উপর দুই চারিবার হাত বুলাইয়া, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আসন লইয়া গাড়ীবারান্দায় যাইবার জন্য ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন।

হপ্মার্শেল চলিয়া গেলে কোর্টচ্যাপলিন দাঁড়াইয়াই ছিলেন। ব্যারণ তাঁহাকে বলিলেন, "স্যার প্রিষ্ট, আপনি অগ্রসর হোন্, আপনাকে দেখিলে ডচেস্ আনন্দিত হইবেন। আমার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নাই, আমি যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইতে জানি।"

দ্বারের পর্দ্দা সরিতেই স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া রাওয়েল বলিলেন, "লিয়েন।"

মুখ তুলিয়া লিয়েন দেখিল, স্বামীর মুখ তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় এ হাসির কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না, বরং পরিহাস বা অমনি কিছু ভাবিয়া বেদনা ও অভিমানে পশ্চাৎপদ হইয়া বলিল, "কি ? ক্ষমা করিতে আসিয়াছ ? আমার নীচতার জন্য রাগ বিদ্রূপ গালির পরিবর্ত্তে মার্জ্জনা,—না রাওয়েল আমি তাও চাই না। ও ছবির আঁকায় যে আমার কোন দোষ হইয়াছে, এ আমি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিতেছি না।"

পরিত্যক্ত প্রসারিত হস্ত ফিরাইয়া লইয়া ব্যারণ বলিলেন, "তুমি বুঝিলে না জুলিয়েন।"

"কি বুঝিলাম না ? ছবির কি দোষ তাই ? কাহারও সুন্দর মুখ যদি আমার ভাল লাগিয়া থাকেই, যদিও অত্যন্ত রুগ্ন—প্রায় মৃত্যুশয্যাতেই, একদিন মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি আমি,—তবু তাহার অসামান্য রূপ,—যৌবনের সুখের দিনে কিরূপ হইতে পারিত,—সেই

কল্পনায় ঐ সুন্দরীর আকৃতি আমার চিত্রের বিষয় করিয়াছিলাম। তোমাদের যে তাহা কলঙ্ক—ইহাও আমার জানা ছিল না পূর্ব্বে, এটুকু আমার অপরাধ স্বীকার করি কিন্তু—"

বাধা দিয়া ব্যারণ ধীর স্বরে বলিলেন, "আমি সে কথা বলি নাই।"

"তবে কি বলিতেছ? না তাহাও আমি জানিতে চাহি না! এতদিন ধরিয়া আমি কেবলি তোমাদের মুখ চাহিয়া—যাহাতে তোমাদের কোন অশান্তি না জন্মায়, এমনিভাবে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি! পারিলাম না—কিছুতেই পারিলাম না আমি? ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর আমার দ্বারা কোন কাজ সম্ভবপর নয়। আর কোন প্রয়োজনও ত নাই তোমার; এবার আমার বিদায় দাও রাওয়েল্, আমি এখনি রুডিস্ডর্কে চলিয়া যাই?"

ব্যারণ উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আর না লিয়েন, এখন এসব কথা থাক্, তোমার মন এখন ভাল নাই, পরে ভাবিয়ো—"

একটু বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "আর আমার ভাবিবার কিছু নাই, বোধহয় তোমারও নাই। তুমি অনুমতি কর, ব্যারণ আমায় মুক্তি দাও এবার—আমি আর পারি না!"

"আমায় তুমি এমনি বুঝিলে জুলিয়েন? কিন্তু আর না আর সময় নাই, ঐ শোন ডচেস নামিলেন, এবার আমার হাত ধরিতে বোধহয় তোমার আপত্তি নাই?"

"কিন্তু ডচেস্ চলিয়া গেলেই আমি রুডিস্ডর্ক যাইব, একথাটি ভুলিও না।"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা করিও, এখন চল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ডচেস্ গাড়ী হইতে নামিয়াই একবার চারিদিকে চাহিয়াছিলেন। রাওয়েলকে সেখানে উপস্থিত না দেখিয়া তাঁহার সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে ভাব প্রশমন করিয়া হাস্যমুখে তিনি হপ্‌মার্শেলের সমাদর গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা সিঁড়ির নিকট আসিতেই উপরে পদশব্দ পাওয়া গেল, ব্যারণদম্পতি নামিয়া আসিতেছেন। উভয়ের বাহু মিলিত, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি তীক্ষ্নদৃষ্টি ডচেসের নিকট গোপন থাকিল না যে ঐ সমাগতপ্রায় নরনারী, উহারা পতিপত্নী সম্পর্কিত হইলেও অন্তরে বা বাহিরে তাহাদের কোন যোগ সামঞ্জস্য নাই। কাছাকাছি থাকিলেও ঐ দুটি হৃদয় যে

পরস্পরের কত ব্যবধানে চলিয়াছে, সেটুকুও তাঁহার অগোচর রহিল না। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ব্যথাপূর্ণ ম্লান চক্ষু দুটি আবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ ডচেসের বেশভূষা নূতন প্রণালীর ; অঙ্গের মধ্যে এত লালিত্যময়, তাহার প্রত্যেক বিন্যাসে সুগঠন তনুভঙ্গির ললিত লাবণ্য এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যাহার কাছে তাঁহার সে দিনের সে ঝলমলায়মান উজ্জ্বল সজ্জা হতশ্রী বলিয়া বোধহয়।

তিনি প্রফুল্লভাবে অগ্রসর হইয়া ব্যারণেসের হাত ধরিলেন। জুলিয়েন ও তাঁহার হাতে ফুলের তোড়া দিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। হাস্যমুখে রাওয়েল বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত আপনার আলাপ নাই,—আমার অবকাশ হয় নাই যে—"

বাধা দিয়া ডচেস বলিলেন, "এই ত আলাপ হইল, তার জন্য আর কথা কি ?" ইহার পর তাঁহারা উদ্যানের পথে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ব্যারণের বাহু অবলম্বনে ডচেস্, পার্শ্বে তাঁহার সহচরী ফ্রেঃ মোরা ও কোর্ট চ্যাপলিন্। ডচেসের পুত্রদ্বয় ও লিয়ো ছুটাছুটি করিয়া কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে যাইতেছিল। আর পশ্চাতে হপ্‌মার্শেলের পাশে পাশে জুলিয়েন চলিতেছিল !

হঠাৎ হপ্‌মার্শেল উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও কি ? তোমারও কি বদ্ অভ্যাস ব্যারণেস্ ? তোমায় যে আমার গায়ে হাত দিতে বারণ করিয়াছি আমি ? ও সব ত তোমার বুনো লতাপাতা নয় যে তোমার উদ্ভিদ্‌চর্চ্চার সাহায্য করিবে ?"

শুনিয়া সকলেই মুখ ফিরাইলেন। বিরক্তভাবে রাওয়েল কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লিয়েন এমন অপরাধীরভাবে মুখ হেঁট করিল যে আর কাহাকেও কিছু বলা হইল না। ডচেস্ বলিলেন, "ব্যারণেস্ বোধহয় গাছপাতা ভাল-বাসেন ?"

গম্ভীরভাবে মাইনো বলিলেন, "বোধহয়।"

সেই অনাস্থার উত্তর শুনিয়া ডচেস্ আরও উৎসাহিত আরও আনন্দিত হইলেন। বাগানের ভিতরে ঝিলের পার্শ্বে প্রকাণ্ড তাঁবু পাতিয়া আতিথ্যের আয়োজন চলিতেছে। তাহার মধ্যে আরাম ও আনন্দের সমস্ত সামগ্রীই প্রস্তুত। পার্শ্বে একটু ছোট তাঁবুতে রন্ধন হইতেছে। গৃহকর্ত্রী ফ্রোলন্ আজ স্বয়ং রান্নার ভার লইয়াছে, বাড়ীতে কোন সম্ভ্রান্ত

অতিথির আগমন হইলে লন্ নিজেই খাদ্য প্রস্তুত করিতে আসে। সঙ্গীরা সকলে ডড্রেসকে লইয়া ব্যস্ত, লিয়েন সেই অবসরে একবার রন্ধনশালার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সেখানে গেব্রিয়েলও আছে। তাহাদের দুই জনেরই চক্ষে জল।

"ও কি ফ্রোলন, কাঁদিতেছ কেন?" লিয়েনের প্রশ্নে চমকিত হইয়া ফ্রোলন্ চোখের জল মুছিয়া যেন ধোঁয়ার জন্যই কাতর হইয়াছে এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল। গেব্রিয়েলও মাথা নীচু করিয়া দূরে সরিয়া গেল। জুলিয়েন জানিত যে সেই বর্ষীয়সী নারী হতভাগা গেব্রিয়েলকে ভালবাসে, সে ধীরে ধীরে তাহাদের নিকটে আসিয়া বলিল, "আমায় দেখিয়া কি তোমার ভয় হয় ফ্রোলন্?"

লন্ তাঁহার মুখের উপর চোখ তুলিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিল, "না মা—আপনাকে দেখিয়া কাহারও ভয় হওয়া সম্ভব নয়, তবে ঐ হতভাগা—" বলিতে ফ্রোলনের আবার কণ্ঠ-রোধ হইল।

লিয়েন বুঝিল আজ তাহাদের নূতন কিছু হইয়াছে। সে গেব্রিয়েলের নিকট আসিয়া মিষ্টস্বরে বলিল, "কাঁদিতেছিলে কেন গেব্রিয়েল? তোমার মা ভাল আছেন ত?"

"হাঁ" বলিয়া গেব্রিয়েল আর একটিও কথা বলিতে পারিল না, তখন ব্যাকুলভাবে ফ্রোলন বলিল, "তাহার ভাল থাকাই ত বিপদ হইয়াছে লেডি, সে শীঘ্র শীঘ্র মরিতেছে না কেন?"

চকিত স্বরে লিয়েন বলিল, "ও কি কথা ফ্রোলন? বলিতে নাই—ও কথা ভাবিতেও নাই!"

"আছে মা আছে; ও হতভাগিনীর মৃত্যুই এখন প্রার্থনীয়। আজ যদি তাহার মৃত্যু হয় তো শেষ কালে সন্তানের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিবে।—আপনি জানেন না নিশ্চয়, কালই যে গেব্রিয়েল মঠে যাইবে?"

"কাল? এত শীঘ্র,—কেন?"

"লিলির মৃত্যুর কোন স্থিরতা নাই—তাই।" বলিতে বলিতে ফ্রোলন কাঁদিয়া উঠিলও গেব্রিয়েল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। লিয়েন হতবুদ্ধিভাবে মনে করিতেছিল, সে ইহাদের কিছুই করিতে পারে না, এ সংসারে তাহার কোন দিকেই কিছু ক্ষমতা নাই।

অন্যান্য ভৃত্যেরা আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতে আরম্ভ করিতে লিয়েন বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখস্থ একটা বড় গাছ তলায় টেবিল পাতিয়া চায়ের আসন পড়িয়াছে, সে নীরবে এক পাশে গিয়া বসিল। হপ্ মার্শেলের আনন্দের সীমা নাই, হাসি ও উৎসাহের সহিত তিনি অজস্র কথা বলিয়া যাইতেছেন, রাওয়েলও ডচেসের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সহিত শিষ্টালাপে মনোযোগ দিয়াছিলেন; লিয়েনের উপস্থিতি কাহারও লক্ষ্যে আসিল না।

চায়ের ব্যাপার শেষ হইলে বৃদ্ধ হপ্ মার্শেল বলিলেন, "আমি প্রত্যেকবারেই ডচেস্‌কে বাগানের ফল পাড়িয়া দিই, এবার আরও অশক্ত হইয়াছি—কিন্তু সে সুখটুকুতে বঞ্চিত হইব না। চল আমার চেয়ার ঠেলিয়া ফল গাছের কাছে লইয়া চল। অল্পক্ষণ পরেই ফলের ডালি পূর্ণ করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফলফুল আনিয়া ডচেসের হাতে দিলেন। সানন্দে সুন্দরী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া ফলগুলি ছুরি দিয়া কাটিতে লাগিলেন।

হঠাৎ হপ্ মার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, আমার হাতের আংটি কোথায় গেল? সে তো আমার আঙ্গুল হইতে খসিয়া পড়ে না, আজ কোথায় গেল?"

ব্যারণ বলিলেন, "সম্ভব আপনি যখন ফল পাড়িতে যান্ তখনই কোথায় পড়িয়াছে। বাগানেই আছে, সময় মত খুঁজিয়া লওয়া যাইবে।"

"বটে! খুব ভাল কথা বলিলে ত রাওয়েল! ইতিমধ্যে সেটি কোন মালী বা চাকরের পকেটে অন্তর্দ্ধান করুক, তখন বাগান কেন সমস্ত পৃথিবীটা খুঁজিলেও পাইবে না।" অঙ্গুরীর জন্য তিনি এত বেশী ব্যস্ত হইতে লাগিলেন যে ডচেসেরও আশ্চর্য্য বোধ হইল। বিরক্ত হইয়া রাওয়েল বলিলেন, "একটা সামান্য আংটির জন্য কেন অত ব্যস্ত হইতেছেন কাকা, আমি মালীদের বলিতেছি খুঁজিয়া দিতেছে।"

মার্শেল বলিলেন "ব্যস্ত হইতেছি কেন? তুচ্ছ হইলেও সে আংটির যে মূল্য আছে তাহা তো জান না তোমরা!" ওযে গিস্‌বার্টের হাতের আংটি রাওয়েল, সে যাই হোক্ তাহার মৃত্যুকালের অনুরোধ আমি কখনও অবহেলা করি নাই, সে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এটি আমার আঙ্গুলে পরাইয়া বলিয়াছিল, 'আজ দশই সেপ্টেম্বর তোমায় আমি এই স্মৃতিচিহ্ন দিলাম,

মনে রাখিয়ো,—আর এটি তুমি হাতেই রাখিয়ো।' মৃতের এ অনুরোধ আমি কখনও অবহেলা করি নাই। আজ সেই আংটি হারাইল ?"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেরই প্রাণে লাগিল। রাওয়েল ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং খুঁজিতে যাইতে উদ্যত এমন সময় দেখা গেল বিষণ্ণ-মুখ গেব্রিয়েল ধীরে ধীরে হপ্‌মার্শের নিকটে গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "এই আপনার আঙ্গটি ;—"

"তাই নাকি ? তুই কোথায় পাইলি এটা ?"

"ও পাশে বেড়ার ধারে পড়িয়াছিল।"

"যাহা হউক পাওয়া গেল ইহাই যথেষ্ট ! কিন্তু গেব্রিয়েলটার কি সাহস দ্যাথ দেখি, তোর কি একটা পাত্র জুটিল না রে নির্ব্বোধ, তুই আমার হাতে জিনিষ দিতে আসিয়াছিস ?"

লন্ তাহার দিকে একটা পাত্র আগাইয়া বলিল, "ইহার উপর রাখ।"

"আচ্ছা আচ্ছা হইয়াছে যা। হাঁ একটা কথা,—এ আংটি যে আমার তা তুই জানিলি কি করিয়া বল ত ?" বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে অপরাধীর ন্যায় স্খলিত স্বরে গেব্রিয়েল বলিল, "বরাবরই আপনার হাতে দেখি—তাই।"

"হুঁ। যা,—লন্, গেব্রিয়েলকে এক পাত্র চা আর একখানা বিস্কুট দাও গিয়া।"

তাহারা চলিয়া গেলে ডচেস বলিলেন, "ছেলেটি দিব্যসুন্দর, স্বভাবটিও মিষ্ট—না ?"

হপমার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "সুন্দর ? মাকাল ফল ! উহার পেটে পেটে দুষ্ট বুদ্ধি।—হাঁ, স্যার প্রিষ্ট, ও তাহা হইলে কালই মঠে যাইবে ?"

"মঠে ? কেন ও মঠে যাইবে কেন ?—"

ডচেসের প্রশ্নের উত্তরে মার্শেল বলিলেন, "উহাকে মঙ্ক হইতে হইবে।"

শিহরিয়া ডচেস্ বলিলেন, "ঐ বালক মঠে গিয়া মঙ্ক হইবে ? আপনি বলেন কি ? সেই সকল কঠোর নিয়ম পালন করা কি উহার সাধ্য ?"

গম্ভীরভাবে মার্শেল বলিলেন, "যেমন করিয়া হোক পালন করিতেই হইবে। উহার অভিভাবকের ইহাই ইচ্ছা, আমরাই বরং বিলম্ব করিলাম।—"

ডচেসকে গেব্রিয়েলের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া লিয়েনের সাহস হইয়াছিল, সে উৎসাহভরে বলিল, "আমি দেখিয়াছি গেব্রিয়েল সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে উহার চিত্র বিদ্যালয়ে দিলে ঠিক হইত, মঠ হওয়া কঠিন, সে বোধহয় ভাল মঠ হইতে পারিবে না নয় ?"

ডচেসের মন এতক্ষণ স্বাভাবিকভাবে গেব্রিয়েলের দিকেই ছিল, কিন্তু লিয়েনকে সে বিষয়ে পক্ষপাতী দেখিয়া সহসা তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অনাস্থার সহিত উত্তর করিলেন, "কি জানি, উহার কিসে ভাল হয় বা কিসে মন্দ হয় আমাদের মত স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা উহার অভিভাবকরাই ভাল বুঝিবেন! উহার প্রতি যদি সেইরূপ আদেশ থাকেই, অবশ্য সে তাহা করিতে বাধ্য।" লিয়েন আর কিছু বলিল না। তখন কোর্টচাপলিন বলিলেন, "কেন, মঠের সম্বন্ধে আপনাদের এত বিরূপ ধারণা কেন বলুন দেখি ?" বলিয়া তিনি মঠের ব্যবস্থা হইতে ক্রমে ক্যাথলিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের অশেষ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রাওয়েল মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; ডচেস মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন, যেন কতই ভাল লাগিতেছে। ইঁহার স্বামী প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তিনিও সেই ব্যবস্থানুসারে চলিতেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুসমাজে প্রকাশ যে ডচেস শীঘ্রই ক্যাথলিক মত গ্রহণ করিবেন। পাদ্রীও তাহা জানিতেন বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাঝে মাঝে হপমার্শেলও যোগ দিতে ছিলেন, তবে তাঁহার উক্তিগুলিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উল্লেখ অপেক্ষা ব্যক্তিগত আক্রমণের অংশেই পরিস্ফুট।

ক্রমে ক্রমে চ্যাপলিনের ভাষা এমন স্থলে উপস্থিত হইল যেখানে একমাত্র ক্যাথলিক মত ব্যতীত অন্য ধর্ম্মমাত্রকেই ভ্রান্ত ও অসত্য বলিয়া নানাবিধ গ্লানি আরম্ভ করিয়াছেন। সে প্রমাণগুলি এত তীব্র এমন স্বেচ্ছাচারী ও নিরঙ্কুশভাবে অগ্রসর যে লিয়েনের তাহা অসহ্য বোধ হইতেছিল, সহ্য করিতে করিতে আর সে থাকিতে পারিল না,—বলিল,—"ভাল আপনি কি বলিতে পারেন যে পৃথিবীর সমস্ত ভ্রান্তির মধ্যে একা আপনি অভ্রান্ত ?"

কোর্ট চ্যাপলিন, চমকিয়া উঠিলেন। লিয়েনের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রকৃতির বালিকা যে এমন ভাবে তর্কে উদ্যতা হইতে পারে; তাহাও আবার কতকগুলা অযথা প্রশ্ন নয়,—একেবারে

মর্ম্মে আঘাত দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর বাণ বর্ষণ করিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণায় আসে নাই। প্রথমতঃ তিনি বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল পার্শ্বে সম্ভ্রান্ত শ্রোতারা তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন, বিশেষ ডচেসের সম্মুখে এই নগণ্য বালিকার নিকট একটি কথায় পরাজয় স্বীকার, ইহার পর লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?" আর লিয়েন যাহাতে অন্তরের সহিত ক্যাথলিক মত গ্রহণ করে তাহাও তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি প্রবল আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের সহিত ব্যারণেসের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণেই বুদ্ধিমান পাদ্রী স্পষ্ট বুঝিলেন যে এই অল্পবয়স্কা নারী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় তরল মতি বা নির্ব্বোধ নয় যুক্তি বা বাক্যে তাহাকে পরাজয় করা অসম্ভব দেখিয়া সে পথ ছাড়িয়া প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকগণের কুৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন, উষ্ণ শোণিত জুলিয়েনও প্রতিবাদ স্থলে ক্যাথলিক ধর্ম্মে কুসংস্কার জড়বাদ ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে লাগিল। উত্তেজনায় সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে এই সকল ক্ষমতাবান্ ধর্ম্মযাজকদের নিকট ক্যাথলিক ধর্ম্মের সামান্যমাত্র নিন্দাও কতখানি বিপজ্জনক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধর্ম্মদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিতে পারেন,—সে দণ্ডের ব্যবস্থা ভয়ানক! আগুনে পোড়াইয়া বা কুকুরে খাওয়াইয়া শাস্তি দিবার প্রথা তখনও লোপ হয় নাই।

অবশেষে হপমার্শেল ও ডচেস্ পর্য্যন্ত যখন চ্যাপলিনের পক্ষে যোগ দিয়া কটু কথায় ও মধুর শ্লেষে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ন্যায় বা যুক্তির কথায় যে এ সকল অবান্তর পরিহাস কেন আসিয়া পড়িল তাহা সে তখনও বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে ডচেসের সহচরীটাও যখন এ বিষয়ে যোগ দিল তখন লিয়েন নীরব হইল।"

ফ্রোমোরা বলিল, "ভাল ব্যারণ কি বলেন? ভূত প্রেত সম্বন্ধে ব্যারণেসের ত সাহসের সীমা নাই,—আপনিও কি সেই বিশ্বাস রাখেন না কি?"

উচ্চ হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তুমি যে অদ্ভুত প্রশ্ন করিলে মোরা? ভূত হোক আর যাই হোক, পুরুষ মানুষ তাহাদের ভয় করিবে কেন? ভয় করে স্ত্রীলোকে, আর পুরুষে তাহাকে সযত্নে আশ্রয় দিবে, এই ত জানি আমি।"

"অগ্নি যাহারা ভয় না করে?" ডচেসের এই প্রশ্নের উত্তরে রাওয়েল বলিলেন, "মুখে যে যাহাই বলুক স্ত্রীলোকের প্রাণে যে ভয় নাই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; আর যদি তেমন কেহ থাকেনই,—সেই তুষার পর্ব্বতের কঠিন চূড়া, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ডচেস, কারণ তিনি আমাদের অনেক দূরে—অনেক উচ্চে!" বলিতে বলিতে তাঁহার মিষ্ট হাস্যে যেন এ প্রসঙ্গটি শেষ করিয়া দিলেন। সে হাসির অর্থ কি তাহা ব্যারণই জানেন কিন্তু লিয়েনের কাণে তাহা বিদ্রূপের বিষধারায় গলিয়া পড়িল, আর ডচেসের দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ের সে হাসির মধুর ধ্বনিতে সকল সন্দেহ মুক্তির সরস আনন্দে সিক্ত হইয়া আশার নবীন অঙ্কুরে ভূষিত হইয়া উঠিল। সে আনন্দ তিনি গোপন রাখিতে পারিতেছিলেন না, তুচ্ছ একটা অছিলায় সহচরীকে টানিয়া লইয়া তিনি উদ্যানপথে চলিয়া গেলেন। ব্যারণও দ্রুতগতিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

কোর্ট চ্যাপলিনের মুখ গম্ভীর অপ্রসন্ন; তাঁহার প্রদীপের শিখার ন্যায় দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় লিয়েনের মুখের উপরই বদ্ধ,—কিন্তু তাহার নয়নেও নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির ভস্মাচ্ছাদিত রুদ্রতেজী চিহ্ন তখনও জ্বলিতেছে দেখিয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এ অগ্নি শিখায় প্রচুর জলধারা ঢালিলে তাহা নির্ব্বাণ হইতে পারে কিন্তু তাহাকে ক্ষীণতেজ করা অসাধ্য। তাঁহার মুখে জয়ের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা হতাশার ক্ষুব্ধ নীলিমা ঘনাইয়াছিল। হপ্‌মার্শেলের গেব্রিয়েল সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে সারিয়া ধীর গতিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা ও চ্যাপলিনের এই অগ্নিগর্ভ জলদ-গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বৃদ্ধের আজ স্ফূর্ত্তির সীমা নাই, জুলিয়েনের প্রতি চাহিয়া ক্রুর হাসির সহিত তিনি বলিলেন, "অতি বুদ্ধিমতি, বিদ্যা ফলাইতে গিয়া নিজের মাথাটি আজ কতখানি ভাঙ্গিলে তাহা বুঝিয়াছ কি? আমি চুপ করিয়াছিলাম—তোমার ধৃষ্টতা কতখানি তাহাই দেখিবার ও দেখাইবার জন্য। কোর্ট চ্যাপলিনের সহিত ধর্ম্মের তর্ক! এতখানি অহঙ্কার তোমার? যাও, এইবার ইহার ফলে ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হও গিয়া। উইলি, আমার চেয়ার লইয়া যাইবে এস।"

তিনি চলিয়া গেলে সর্ব্বজনত্যক্ত লিয়েন একাকী সেখানে বসিয়া থাকিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

প্রভাত।

—:*:—

যামিনীর আঁধিয়ার গিয়াছে মুছিয়া
ওই হের এসেছে প্রভাত!
জগতের ঘুমঘোর গিয়াছে ঘুচিয়া
ধরণীতে আর নাই রাত!
তমোময়ী যেন গত নিশি
শিশু এ দিবসটীরে প্রসব করিয়া
মহাশূন্য অনন্তেতে মিশি
ধীরে ধীরে গিয়াছে মরিয়া!
তাই ছোট শিশুটীর মত
হের ওই কলরবে উঠেছে ভরিয়া!
তারপর দিবা হ'লে গত
ফুল-কলি হ'লে অবনত
পুনরায় আসিলে রজনী
ফিরে পাবে হারান জননী!

———

বঙ্গসাহিত্যে নারীসমস্যা।

———:*:———

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহ, হিন্দু সমাজের 'সনাতন' গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আমাদের অনেক প্রাচীন আদর্শ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে এই অভিযোগ আজকাল অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে। আর এই আদর্শের কথা উঠে প্রধানতঃ সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান লইয়া। সনাতনপন্থী বলিতেছেন, তোমরা এ করিতেছ কি? পশ্চিমের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের দেবীপ্রতিমা নারীদের মধ্যে আনয়ন করিয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছ! যাহারা এতদিন 'শান্তমুখে বিছাইয়া কোমল নির্ম্মল' স্নেহের অঞ্চলে আমাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিয়াছে তাহাদিগকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিদ্রোহভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছ? নারী জাতিকে লইয়া এতদিন কোন সমস্যা আমাদের সমাজকে চঞ্চল করে নাই। এখন তোমাদের কৃপায় তাহারও সূচনা হইয়াছে। সতীসাবিত্রী সীতার দেশে নারীর হৃদয়স্বর্গ হইতে দেবভাবসমূহ বিতাড়িত হইতেছে এবং তাহার স্থানে অসুরের তাণ্ডবনৃত্য সুরু হইয়াছে। এই জন্যই ত আজকাল বঙ্গরমণীর আত্মহত্যা একটা ভীষণ সংক্রামক রোগের আকার ধারণ করিয়াছে।

এই অভিযোগের মূলে যদি প্রকৃত সত্য থাকিত তাহা হইলে নব্য সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যমূলক ভাববন্যা প্রতিরোধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মহত্যা-রোগের কারণ আধুনিক সাহিত্যের স্কন্ধে আরোপ করিলে চলিবে না। পুরুষের কোঁচায় আগুন না লাগিয়া মেয়েদের সাড়ীতে লাগে কেন তাহার কারণ সাহিত্যে নয় সমাজেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর সত্যই কি আমাদের কোন নারীসমস্যা নাই? যখন বঙ্গবালার বিবাহের জন্য স্বল্পবিত্ত গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়, যখন বালবিধবাদের দুঃখকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত এবং নানা কারণে এই সীতাসাবিত্রীর দেশেও পতিতা নারীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তখনও কি বলিব যে আমরা বেশ ছিলাম, এই সাহিত্যিক-গুলাই যত নূতন নূতন সমাস্যার সৃষ্টি করিতেছে? ইঁহাদের অপরাধ এই যে সমাজের

অত্যাচার ও অবিচারসমূহ সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, আর কেহ কেহ বা সত্য ও ন্যায়মূলক নূতন সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন।

তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমস্যাটা যে একরূপ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। য়ুরোপ বিশেষতঃ বিলাতে বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহা নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য, সর্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইবার জন্য। রণরঙ্গিণী সফ্রেজীটের পুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেখিয়া যদি কেহ তখন কবির কথা ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিত।

> কোথা 'রমণীর' নব অভ্যুদয়,
> 'সমাজ' গ্রাসিতে করেছে আশয়
> হয়েছে অধৈর্য্য নববীর্য্য বলে,
> ছাড়ে হুহুকার 'রণচণ্ডীদলে'—

তাহা হইলে বোধহয় নিতান্ত মিথ্যা কথা বলা হইত না। সেদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ কবি Woman in the lesser man—নারী অপূর্ণ পুরুষ মাত্র—বলিয়া স্ত্রীজাতির অধিকার লাভ চেষ্টার উপর শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন এবং ইংরাজ দার্শনিককে Subjugation of Women লিখিয়া নারীর পক্ষে ওকালতি করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত কাণ্ড করিয়াও ইংরাজরমণী পুরুষের নিকট হইতে যাহা আদায় করিতে পারেন নাই আজ যুদ্ধাবসানে সহসা তাহা অনায়াসে তাঁহাদের করতলগত হইয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাদের জয়জয়কার হইল। এখন তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে একাসনে বসিয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়ন করিবেন। ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্টার বেসান্ট্ তাঁহার Revolt of man নামক উপন্যাসে কল্পনা করিয়াছেন যে চারি পাঁচশত বৎসর পরে ইংলণ্ডের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নারীর করায়ত্ত হইয়াছে এবং পুরুষ তখন নারীর অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। এরূপ 'তাজ্জব ব্যাপার' ভবিষ্যতে সম্ভব হউক আর না হউক, একথা সত্য যে পাশ্চাত্য সমাজে নারী আর এখন পুরুষের অধীন নহে। কিন্তু এই সাম্য ও সমকক্ষতা রাজনীতিক্ষেত্রেই সাধিত হইয়াছে। য়ুরোপের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও পাশ্চাত্য নরনারী বিবাহিত

জীবনের পুতুলের ঘর (Doll's House) সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে পারে নাই। বার্ণার্ড শ পারিবারিক জীবনের যে আদর্শ প্রচার করিতেছেন ইংরাজসমাজে এখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতেছেন

'Family life will never be decent, much less ennobling, until this central horror of the dependence of women on men is done away with'* যতদিন না এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার—স্ত্রীজাতির এই পুরুষের অধীনতা, দূরীভূত হইতেছে, ততদিন পারিবারিক-জীবন মহনীয় হওয়া ত দূরের কথা, কখনও অনুমোদনযোগ্যও হইবে না।' সামাজিক জীবনে ব্যাপার আরও গুরুতর, আরও জটিল। বিবাহ, ডাইভোর্স, কুমারী জননী—এই সব সমস্যা লইয়া ইংরাজ সমাজ বিষম চঞ্চল। সতীত্ব ও নারীধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ সমাজের এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ত ভাসিয়া যাইতেছেই; আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, যতদিন নারী তাহার নারীত্বটুকু সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে না পারিতেছে, যতদিন না সে স্বামীপুত্র, সমাজ ধর্ম্ম এক কথায় সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে নিজেকে সরাইয়া লইতে পারিতেছে ততদিন তাহার মুক্তি নাই। অতএব হে নারি, তুমি তোমার নারীত্ব ভুলিয়া যাও এবং কর্ত্তব্যের মুখে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনা হও।† রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' বলিয়াছিল—

> নাহিক করম, লজ্জাসরম,
> জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
> তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
> ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা!

---

*Introduction to Getting Married.

† Unless Woman repudiates her womanliness, her duty to her husband, to her children, to society, to the law and to every one, she cannot emancipate herself. Therefore woman has to repudiate duty altogether. In that repudiation lies her freedom.

Bernard Shaw. 'Quint Essence of Ibsenism', p. 41.

আজ পাশ্চাত্যসমাজের নারীমণ্ডলী এই অসাধ্যসাধন করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং সেখানকার নারীসমস্যা যে ঘোরতররূপে জটিল তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বড় জাতির এই সকল বড় বড় সমস্যা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন আমাদের নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন প্রথমটা মনে হয় আমরা বেশ আছি, আমাদের গৃহে সুখ ও সমাজে শান্তি আছে, আমাদের রমণীরা সতীশিরোমণি এবং পাশ্চাত্য নারীদের কাহিনী শুনিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যদি বহুকালের সংস্কারবশে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে পরক্ষণে আমাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং বুঝিতে পারিব যে আমাদের এই স্বার্থপ্রণোদিত আত্মপ্রসাদের মূলে খুব বেশী সত্য নাই। আমাদের দেশেও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। সে সমস্যা অবশ্য জীবনের চাঞ্চল্যে ও স্বাধীনতার উদ্দামতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নহে, তাহাতে মৃত্যুর অসাড়তা ও বন্ধনের নির্জ্জীবতা দেদীপ্যমান মৃতবৎ নারীসমাজ ধূলিলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার বুকের উপর শ্মশানকালীর তাণ্ডবনৃত্য হইতেছে। আর আমরা একদিকে স্ত্রীজাতির বন্দনা করিয়া গাহিতেছি

কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল
থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?
বঙ্গ কুলবধূ বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

অপর দিকে আবার এই আদর্শ-বধূ গৃহে আনিবার সময় তাহার দরিদ্র পিতার ভিটামাটি উৎসন্ন দিয়া আমরা ঐ শ্মশানকালীরই তুষ্টি সম্পাদন করিতেছি।

আমরা যতই কেন জোর গলায় প্রচার করি না যে, আমাদের ন্যায় নারীর সম্মান করিতে অন্য কোন জাতি জানে না, তথাপি উহা অর্দ্ধেক সত্য মাত্র। কারণ প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে নারীর যত অসম্মান হইয়াছে তত বোধহয় অন্য কোন দেশে হয় নাই। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীপূজা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীজাতিকে স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত করিয়া এবং অন্যান্য নানারূপ হীনতত্বব্যঞ্জক বিধিব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট

অপমানও করা হইয়াছে। আর প্রাচীন সাহিত্যে আমরা কি দেখি? রাজাদের পক্ষে বহুপত্নীত্বই ছিল সাধারণ নিয়ম। যদিও সাধারণ রমণীর অবস্থা সাহিত্য হইতে সঠিক জানিতে পারা যায় না, তথাপি শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশে ইহার একটু আভাস আছে। কণ্ব-দুহিতাকে পতিগৃহে প্রেরণকালে সপত্নীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ভুলেন নাই। এবং শেষে তিনি বলিয়াছেন যে এইরূপ করিলে 'যুবতীজন' সকলের আদৃতা হয়। সুতরাং তাঁহার কথা শুধু রাজরাণী সম্বন্ধে নয়, বিবাহিতা যুবতীজন মাত্রেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। আর স্ত্রী যে স্বামীর সম্পত্তিমধ্যে গণ্য হইত তাহার প্রমাণ মহাভারতে রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। তারপরে, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে যে সব কথা নানা উদ্ভট শ্লোকে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচারিত তাহার উল্লেখ না হয় নাই করিলাম; কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই নারীকে যখন নরকের দ্বার বা মূর্ত্তিমতী লালসারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে দেখিতে পাই তখন তাহা ত উপেক্ষা করিতে পারি না। বৌদ্ধজাতক ও অবদানগুলিতে নারীচরিত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করা হইয়াছে। আর শঙ্করাচার্য্যের 'দ্বারং কিমেতন্নরকস্য? নারী', গোঁসাই তুলসীদাসের 'ঢোল গবাঁর পশু শূদ্র নারী যে সব তাড়নকে অধিকারী' প্রভৃতি উক্তিসমূহ আমাদের নারী-সম্মানের জ্বলন্ত উদাহরণ! পরিশেষে আমাদের স্ত্রীজাতিকে অবরোধের মধ্যে পূরিয়া তাহাদের প্রতি যে আদর ও বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছি তাহারও তুলনা এক মুসলমান সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে না!

বঙ্গসমাজে নারীজাতির এই অত্যধিক হীনাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে কবি হেমচন্দ্রের লেখনীতে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কিরূপ পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা যেমন তিনি দেখাইয়াছেন, অপরদিকে, তেমনই আবার 'দুরাচার হিন্দুকুলাঙ্গার' যে 'রমণী বধিছে পিশাচ হয়ে' তাহার চিত্রও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। বিধবার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, আবার বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে সকল নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন তাহাদের উপর পশ্চাত্যপ্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই পড়িতেছিল। যে দেশে পাতিব্রত্য শিক্ষাদিবার জন্য লক্ষ হীরার উপখ্যান প্রচলিত সেই সেই দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের

উপন্যাসে লোকে দেখিল যে স্বামী অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে স্ত্রী তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। শুধু তাহাই নহে। স্বামীর ভালবাসা হারাইয়া ভ্রমর মৃত্যুমুখে পড়িল, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিল, কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করিল। যে দেশে স্ত্রীকে সকল অনাদর ও অত্যাচার সহ্য করিয়া 'পতিদেবতার' পদানত হইয়া থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহাই যেখানে সনাতন প্রথায় পরিণত হইয়াছিল, সেখানে নারীর উক্তরূপ আচরণ যে সমাজহিতৈষী পুরুষবর্গের বিশেষ অনুমোদনযোগ্য হয় নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার ফলে দেশে যে নূতন ভাববন্যা আসিয়াছিল তাহাতে যখন হিন্দুসমাজের অনেক 'সনাতন' প্রথাই ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাহিত্যিক অত্যাচার-টুকুও সমাজ সহিয়া গেল; এমন কি ক্রমে তাঁহার অঙ্কিত নারীচিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াও মানিয়া লইল।

কিন্তু সাহিত্যের কাজ এইখানেই শেষ হইল না। শুধু স্বামীর ভালবাসা পাইলেই যে নারীজীবনের পূর্ণ স্বার্থকতা হইল তাহা নহে। নারীরও যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সমাজ বা স্বামী তাহাকে যেরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে চায় সেইরূপে গঠিত হইয়া উঠাই যে তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন নয়, নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দিয়া আত্মোন্নতির প্রয়াসে যে সকলেরই সমান অধিকার, এই কথা প্রচার করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' গল্প ও উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন কিন্তু সমাজ এ কথা শুনিবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, কখন নারীর যে একটা স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে এরূপ বিসদৃশ কথা হিন্দুসমাজ কখনও শুনে নাই। কাজেই সাহিত্যজগতে এই বিষয় লইয়া খুব একটা আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। ইহাতে কার কোন ফল হউক বা না হউক নিদ্রিত সমাজের সুখনিদ্রায় যে অনেকটা ব্যাঘাত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এদিকে কিন্তু সাহিত্যে এই নূতন ভাবের স্রোত অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গও গুরুর কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং সনাতনপন্থী যে বিশেষ ভীত হইয়া পড়িবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা মনে করি ইহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। একটু উঁচু গলায় পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচারের ফলে স্বার্থপর বা উদাসীন সমাজের যদি

একটুও চৈতন্য হয়, যদি পুরুষ আপনার নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবির কথায় সায় দিয়া বলিতে পারেন।

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক্! ধিক্! অধম বাঙ্গালি!
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চূণকালী!

তাহা হইলে আমরা মঙ্গলের পথেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। স্ত্রীজাতি সংক্রান্ত সমস্ত সংস্কারের গোড়ার কথাটাই এই সকল সাহিত্যিক আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যতদিন আমরা নারীজাতিকে প্রকৃত সম্মানের চোখে দেখিতে না শিখিব ততদিন শুধু যে বঙ্গ-রমণীর উন্নতি অসম্ভব তাহা নহে. হিন্দুসমাজের মঙ্গল নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

দুঃসহ।

বুঝিয়াছি বারে বারে
আঘাতের বাণে
যত তুমি দাও ব্যথা
তত সহে প্রাণে!
মনে করি যে বেদনা
সহিবে না সহিবে না
তাও সহি অনায়াসে
কেমনে কে জানে,
যত তুমি দাও ব্যথা
তত সহে প্রাণে!

কার গুণে জানি না যে
ছেড়ে না এ তার
আঘাতে আঘাতে আরো
বাজে অনিবার !
সহাইয়া সহাইয়া
টানিয়া বাঁধিছ হিয়া
বাজাইছ নব নব
বেদনার দানে
যত তুমি দাও ব্যথা
তত সহে প্রাণে !

আজ যাহা আছে বুকে
কাল তাহা নাই
শ্মশানে পুড়িয়া শুধু
এক মুঠি ছাই !
এ জীবন মোহময়
কিছু নয় কিছু নয়
বুঝাইলে এই কথা
জীবন-শ্মশানে
যত তুমি দাও ব্যথা
তত সহে প্রাণে !

কত বার ভাবি তবু
বুঝিতে না পারি
কে সহাও এত ব্যথা
কে গো ব্যথাহারী ?
কাঁদাইয়া কেন আর
মুছাও এ আঁখিধার
মারিয়া বুলাও হাত
এ কিসের টানে
শুধু জানি যত দাও
তত সহে প্রাণে।

অল্পের উপর।

বিজয় কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া এম্‌-এ, পড়িত। পড়াশুনাটা এতকাল যতটা পুরা দমে চালাইয়া আসিয়াছিল,—যৌবনসীমায় পা দেওয়ার পর ততটা ঝোঁক আর তাহার পড়াশুনার উপর ছিল না। প্রায়ই দেখা যাইত, পাঠ্যপুস্তক তার পরিষ্কারভাবে সাজান আছে ; নিদ্রিত বিজয়ের বুকের উপর কোন দিন বা শরৎবাবুর 'গৃহদাহ' কোন দিন বা অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা'—অথবা ঐ রকমের একটা কিছু দেখা যাইত। যে এইরূপে পুস্তকের সহিত পুরাদম সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে বুঝাইতে পারিত, সে বেশ পড়াশুনা করিতেছে।

বিজয় একজন অবস্থাপন্ন জমীদারের একমাত্র পুত্র, কাজেই তাহার বিলাসিতায়, আসবাবে পানসিগারেটে, খাবারদাবারের রকমে সহপাঠী চুণীলাল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিত। হোষ্টেলের দরিদ্র ছাত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার মতে মত জোগাইয়া অসময়ে জল খাবার ও ধার-ধোরটা করার একটা পথ রাখিত।

একদিন দশটার সময় তেড়ি কাটিয়া, পাম্প-সু, চুড়িদার জামা পরিয়া, সিগারেট মুখে বিজয় সেনেট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় দেখা গেল, বেথুন স্কুলের একখানা গাড়ী তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়ী দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। সেই গাড়ীতে অন্যান্য ছাত্রীর সঙ্গে একজনকে দেখিয়া বিজয় হতজ্ঞান হইয়া যতক্ষণ গাড়ীর পেছনটা দেখা যাইতেছিল তাকাইয়া তাকাইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

সেই হইতেই বিজয়ের মন বিগড়াইয়া গেল,—যেমন করিয়া হৌক, ঐ পায়ে—জুতা, গায়ে-গন্ধ, মুখে—আনন্দ,—ঐ অনিন্দ্যসুন্দরীকে বিবাহ করিতেই হইবে!

সে পণ করিয়া বসিল,—হয় মৃত্যু, নয় বিবাহ।

সেই দিন হইতে হোষ্টেলের সমস্ত ছাত্ররা তাহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। বিজয় কাহার সঙ্গে কথা বলে না, পড়াশুনা করে না, কলেজে যায় না,—একা একা বসিয়া কেবল ভাবে।—আর হাজার কাজ থাকিলেও দশটার সময় সে প্রত্যহ মাধব বাবুর বাজারের সম্মুখে রাস্তায় হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। মেয়েদের স্কুলের গাড়ী যখন তাহার দৃষ্টিতে আসে, তখনই কত ভাব, কত কল্পনা, কত দুরাশা, কত আশা, তাহার ব্যস্ত মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া দেয়। গাড়ী ক্রমে কাছে আসিলে সে আর চখের পলকটি পর্য্যন্ত নড়ায় না।—দেখিতে দেখিতে গাড়ী চলিয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মর্ম্মান্তিক বেদনামিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সে নিজের শয্যায় শুইয়া পড়ে। এইভাবে তার দিনগুলি একটা মোহের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

(২)

একদিন সকাল বেলা বিজয় নিজের চেয়ারখানাতে বসিয়া গাহিতেছে,—

"আমার কুটীর রাণী সে যে গো
আমার হৃদয় রাণী"

এমন সময় বন্ধু অমরনাথ হাসিয়া প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল, "কি হে বসে বসে সেই কাল-নয়ন ভাবা হচ্ছে না কি ?"

বিজয় সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গাহিয়াই যাইতে লাগিল

"দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি
আমার কুটীর রাণী—সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।"

"ওগো বন্ধু এযে ঘোর সকালবেলা, কোয়াসায় ঘোমটাটানা অবগুণ্ঠিত ধরণী। ক্ষেপলে নাকি ? প্রাতে যে তিমিরের তও নেই ?"

বিজয় গাহিয়া যাইতে লাগিল,

"শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী"

হাসিয়া অমরনাথ গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, "বন্ধপাগল, গভর্ণমেণ্ট প্রেমিক পাগলদের একটা পাগলা গারদ রাখ্‌তেন যদি,—তবে বড় সুবিধে হ'তো।"

বিজয় প্রেমের দায়ে লেখাপড়া, আহারনিদ্রা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, এ কথাটা ক্রমে সমস্ত হোষ্টেলশুদ্ধ ছড়াইয়া গেল, একে একে সকলেই দল বাঁধিয়া বিজয়ের এই অপূর্ব্ব প্রেমাভিনয় দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

বিজয় তখন বেশবিন্যাস করিতেছে আর সুর করিয়া গাহিতেছে—

"ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে
আমার নামটী লিখিও তোমার মনোমন্দিরে।"

বিজয় সহজে দমিবার পাত্র নয় সে সমবেত বন্ধুবর্গের হাত এড়াইয়া হেদোর ধারে গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়াইল, —আধ ঘণ্টা বাদেই বিজয়ের সেই সোণার স্বপ্ন, মানসীপ্রতিমা,—সেই অজানিত কিশোরী আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

(৩)

দুই মাস চলিয়া গেল। সন্ধ্যা কাল, হেদোর ধারে বিজয় ভাবিতেছে, "আমরি—আমরি—Love—অর্থাৎ—Love, অর্থাৎ, Damn বাঙ্গালা ভাষা এই Love কথাটার একটা বাঙ্গালা

নেই ! ওঃ Love—Love—দেখা নাই, শুনা নাই—সেই স্কুল থেকে নাবতে দেখলুম—আর অমনি Love ঐ আজানুলম্বিত কেশরাজী, ঐ সুক্ষ্মদীর্ঘভ্রূযুক্ত পক্ষ্মসমন্বিত—আনত চক্ষু, ওঃ—আমি যদি এ সুন্দরীর পায়ের জুতা-যোড়াটা হতুম,—তা হলে একদিন অবশ্য এই প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয়ে সুন্দরী—ব্রজলীলার মতো "সখা আয়, সখা আয়" বলে আমায় জড়িয়ে ধরত !" এই বলিয়া বিজয় আবেশে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জড়াইয়া ধরিল।

বৃদ্ধ চমকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, বিজয়কে ঘিরিয়া হেদোর ঘাটে এক ভয়ানক জনতা বর্দ্ধিত হইল। সর্ব্বশেষে স্থির হইল এ পাগল,—দুএকজন বিজয়কে দুএকটা কিল ঘুসি মারিতেও ছাড়িলেন না।

বিজয় সেই জনসমুদ্র কোনমতে দুহাতে ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল, "Damn এই বাঙ্গালী জাতটা প্রেমের মর্য্যাদা বুঝলে না, বিলাতে প্রেমের জন্য সমুদ্র সাঁতার, পাহাড় থেকে লাফিয়ে মরা।—সে তুলনায় এ কিল ঘুঁসি তুচ্ছ অতি তুচ্ছ !" সে গাহিতে লাগিল—

"আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী" এমন সময় বন্ধু অমর আসিয়া পিট চাপড়াইয়া বলিল,—

"ওহে খবর ভাল, মেয়েটি আর কেউ নয় তোমার class friend সতীশের বোন।"

বিজয় উৎসাহ সহকারে—"অ্যাঁ সতীশ—সতীশ—বা—আঃ সতীশের মত ছেলে কি হয় ?—ব্যস,—তাহলে কেল্লা মার্ দিয়া,—তবে আর কি"—

"সে যে আমার কুটীর রাণী, সে যে গো আমার হৃদয়রাণী !" অমরনাথ বাধা দিয়া বলিল "কি রাস্তার মাঝখানে চেঁচামিচি কর্চ্ছো, শোনিই না"

বিজয় গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আঃ শুনব কি এর আর"—

"সে যে আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী,"

অমর বলিল, "ভাল পাগল নিয়ে পড়া গেল যা হোক্, দেখ প্রেমে পড়েছো, যাতে হাতে আসে তাই কর—তা না—কেবল দিনরাত" —"আমার কুটীরাণী'—একি হে।"

বিজয়। "সে সব ভার তোমার বন্ধু,—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই বুঝলে কি না ! কি নাম ?"

"অনিলা"

"অনিলা ?—বাঃ বেড়ে নাম, হেদোর স্কুলে পড়ে, গাইতে জানে, বাঃ—ওহো—হো—চমৎকার।—কি বলে ডাক্‌ব, অনি, না। অনিল, উঁহুঃ।—নিলা—হঁ্যা নিলা—নিলা নিল—নিল—"সে আমার কুটীররাণী—সে যে গো আমার হৃদয়রাণী—।" দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধু হোষ্টেলের দরজায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, অমরনাথ এই বিবাহের শুভ ঘটকালী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

(৪)

একদিন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে মাথা রাখিয়া আলোটা একটু বাড়াইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া বিজয় কবিতা রচনা করিতেছে নিম্নে তাহার অবিকল নকল দিলাম,—

মানসী।

চোখের দেখা পেয়েছি যদি মনের মিল্ কি মিল্‌বে না ?
সখি, হৃদয় জোড়া আসন তোমার,—তুমি কি তায় বস্‌বে না॥

নাঃ দূর ছাই,—ভাব কি ভাষায় প্রকাশ করা চলে ?—তা চলে না,—এ অনুভবের; সঙ্গীত—সঙ্গীত—গান না ? সে কি প্রাণের কথা বেড়োয় ? বলিয়াই বিজয় গান ধরিল,—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো—

বিহারী খানসামা আসিয়া বলিল, "বাবু খেতে আসুন।"

"খাবনা যাঃ ?"

"রোজ রোজ না খেয়ে না খেয়ে যে আপনার পিত্তি পড়ে শরীর মাটী হয়ে গেল।"

"তা হোক্—যা বেটা যাঃ—" বলিয়াই গান ধরিয়া বসিল,—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো ?"

বিহারী খানসামা অবাক্ হইয়া টেবিলের উপর পান রাখিতে রাখিতে বলিয়া গেল,—"লেখাপড়ার কাথায় আগুণ বাবা! বাবুদের প্রেম ও-সব আজগুবি ঢং!—আমি তো

যাবা আজ চার চার বছর এই কল্‌কাতার বাড়ীতে পড়ে আছি, কৈ—বাম্না মাগীকে তো ভুলেও একবার মনে পড়ে নি।"

বিজয় একাএকা বলিয়া যাইতে লাগিল, আঃ যদি ঐ সুন্দরীর উঠ্‌বার সিড়ী হতে পারতেম যদি ওঃ—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো

ঠিক্ এমনি সময়ে বন্ধু অমরনাথ প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বলি সত্যি করে ক্ষেপ্‌লে নাকি হে ?"

বিজয় দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া গান ধরিল।—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো ?"

অমর একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, ব'ল থাম না হে, "ও-গানের অর্থ কি জান ?"

বিজয়। "অর্থাৎ—অর্থাৎ—এই—অর্থাৎ (সুর) শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো।"

অমর কহিল—"অর্থাৎ সে যে তোমার কপালে লাথি মেরে চলে গেছে সেই শ্রীপদ চিহ্ন তোমার কপালে রাজটীকার মত জ্বল্‌ছে কেমন ?"

বিজয় একটা উদ্বেগভরে বলিয়া উঠিল,—"চলে গেছে কেমন ?"

অমর বলিল। "ভাই তোর জন্য দুঃখ হচ্ছে, কি করব ভাই উপায় নেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, আস্‌ছে বৈশাখ মাসে—

বিজয়—কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, বল কি বন্ধু না না পরিহাস ক'রো না, বলে ফেল—ও মিছে কথা।"

"না না—"এ সত্যকথা—অতি সত্য,—ভাবনা কি বন্ধু, আমি ওর চেয়েও সুন্দরীর খোঁজ কচ্ছি ভেব না, কিচ্ছু ভেব না।"

বিজয় ইজিচেয়ারে ধুম করিয়া শুইয়া পড়িয়া হতাশায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "নাঃ তা হয় না—নাঃ কখন না!—বুঝলে অমর—কবি বলেছেন "মানুষ প্রেমে শুধু একবার পড়ে।"

অজয় সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "না, না, কবিরা অমন রাতবিরুতে ঝোঁকের মাথায় কলমে যা আসে তাই লিখে বসেন,—ও ধর না, ওদের সব মিছে-কথার সর্দ্দারী !···আমি বলছি— মানুষ পাঁচবার প্রেমে পড়ে।"

বিজয় এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল, অমরের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই অমর যেমন করে হোক্ এটা তোমার কর্তেই হবে, নইলে আত্মহত্যা করব, বিষ খাব, জলে ডুবে ম'রব !"

অমরনাথ তাহাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিয়া পুনরায় চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া গেল।

বিজয়ের সহপাঠী চুনীলাল যথার্থই বিজয়ের হিতৈষী ছিল, প্রাণপণ করিয়াও যখন সে বিজয়কে এই উন্মাদ হাস্যকর ব্যাপার হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, তখন বিজয়ের পিতাকে পত্র দিল,—

শ্রীশ্রীচরণেষু :—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—আমি বিজয়ের একজন বন্ধু ! তাই বিজয়ের সম্বন্ধে কিছু জানাইতেছি, অবিলম্বে প্রতিকার করা প্রয়োজন ! আজ চার পাঁচ মাস যাবত চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে একটী মেয়েকে দেখিয়া বিজয় প্রেমে পড়িয়াছে, অনেক বুঝালেও কোন কাজ হইতেছে না। এ প্রেম-ব্যাধি ক্রমেই ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে, সে আহারনিদ্রা পড়াশুনা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে—দিনরাত্রি কেমন করিয়া সেই মেয়েকে বিবাহ করিবে সেই চিন্তা খুঁজিয়া বেড়ায় ! আপনি তার পিতা, সত্বর একটা ব্যবস্থা করিবেন।—এ অবস্থায় ব্যর্থ-প্রেমিক অনেকে আত্মহত্যাও করে। গেল বড়দিনে সে বাড়ী যায় নাই—তার কারণও—এই অদ্ভুত প্রেমাভিনয়। বিস্তারিত সাক্ষাতে বলবার ইচ্ছা রহিল। নিবেদন ইতি—

প্রণত:—শ্রীচুণীলাল মজুমদার।

হিন্দু হোষ্টেল।

(৫)

আজ রবিবার সকালবেলা বসিয়া হোষ্টেলের ছেলেরা মহা জটলা পাকাইতেছে,—জনা দুই কল-তলায় বসিয়াই পলেটিক্‌স চর্চ্চা করিতেছে,—কেউ বা রেলিং ধরিয়াই—সুরেন বাবুর চেয়ে বিপিন বাবুর বক্তৃতা ভাল, এই লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। বিজয়ের ঘরে আশু, বিপিন, হরেন, রমেশ, সুরেশ, মণি, সন্তোন সব বসিয়া বিজয়ের ভগ্নপ্রেমকে লক্ষ্য করিতেছে। ক্ষুদ্র কক্ষটী গল্পে, হাসিতে, চুরুটের ধোঁয়ায়, নাপিতের ক্ষৌর কার্য্যে,—এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছে। বি, এ, ক্লাসের ছাত্র কামাখ্যা বাবু গম্ভীরভাবে কেতাব খুলিয়া সাইকোলজি আলোচনা করিতেছেন যে,—"বিজয়ের মত এমনতর প্রেম হয়—কিনা ?—এবং যদি হয় তবে তা কতভাবে গড়াতে পারে।" এমন সময় সকলের উচ্চকণ্ঠ এক সঙ্গে থামিয়া গেল, সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বিজয়ের পিতৃদেব—শঙ্করপ্রসাদ এই মাত্র বাড়ী হইতে আসিয়া পৌঁছলেন। একজন ছেলে একখানা চেয়ার তাঁহার সম্মুখে বসিতে দিল,—তিনি না বসিয়াই ডাকিলেন।

"বিজয়!"

"আজ্ঞে।"

"Examine কবে ?"

"আজ্ঞে জুন মাসে।"

"পড়াশুনা তৈরি হয়েছে ?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ—আ"—

'খুব ভাল হয় নি বুঝি ?'

বিজয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "না বড় সুবিধে হয় নাই।"

বৃদ্ধ শঙ্করপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন :—"পড়াশুনার সময় প্রেমে পড়লে পড়া সুবিধে কখনই হয় না ?"

সমস্ত কক্ষ নীরব,—ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শঙ্করপ্রসাদ জোরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি কথা কচ্ছিস্ না যে ?"

বিজয় অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতেছিল, তবু একবার অসীম সাহসে পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা রক্ষে কর—আমার সাজান বাগান শুকিয়ে দিও না বাবা!"

বৃদ্ধ রাগে শুষ্ক পত্রের মতো কাঁপিতে কাঁপিতে সজোরে পুত্রের পৃষ্ঠদেশে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বলিলেন—"পাজী, বেহায়া, বয়াটে, নিলর্জ্জ—বেরো ও—বেরো ও এখান থেকে।" বলিয়াই পুত্রের হাত ধরিয়া যেমনভাবে তিনি ঢুকিয়াছিলেন তেমনি-ভাবেই বাহির হইয়া গেলেন। কামাখ্যা বাবু পূর্ব্ববৎ পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াই ছিলেন, চুনী তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ সাইকোলজি আলোচনা করে কি বুঝলেন কামাখ্যা বাবু।"

কামাখ্যা বাবু সশব্দে পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন,—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো।"

চুনী একটুআধটু সাহিত্য আলোচনা করিত—সে অমনি মিল দিয়া বলিল,—

"পদাঘাতে প্রেম বক্ষ ভেদিয়া পৃষ্ঠের উপরে এসেছে গো।"

নানা সুরে—নানা রকম সমবেত হাসি হাসিয়া ছেলেরা সব যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল; সেদিন হইতে এই ঘটনা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় দাঁড়াইল।

** ** ** **

কিছু দিন পরে বন্ধুবান্ধবরা সংবাদ পাইল,—"বিজয়ের শুভ পরিণয় আগামী মাসের ১৫ই তারিখে বিনোদপুর নিবাসী হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বাবু অনাদিমোহন রায়ের ভগ্নী শ্রীমতী বেলা দেবীর সঙ্গে উক্ত রায় মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইবে।" বিপিন প্রস্তাব করিল ওহে "বেচারী প্রেমের আগুণে বড় পুড়েছে মনে থাকে যেন। তখন হোষ্টেলের সমস্ত ছাত্র চাঁদা উঠাইয়া সেই দিনই সাহেববাড়ীতে একছড়া নেক্‌লেসের অর্ডার দিল তাহাতে খোদিত ছিল;—

'বন্ধু! শুধু যে রেখে গেছ চরণ রেখা গো?'

(৬)

বিজয়ের অনিচ্ছাতে আজ গোধূলীতে বেলা দেবীর সঙ্গে তার শুভ পরিণয় হইয়া গেল। বাসরঘরে রমণীর হাট বসিয়া গিয়াছে—বিজয় গম্ভীর হইয়া কেবল তাহার হতাশাময় ভগ্ন হৃদয়ের কথাই ভাবিতেছে। এমন সময় বিজয়ের শ্যালিকা কহিলেন।—

"বিজয়বাবু কথা বলছেন না যে ?"

বিজয় একটু ঢোক্ গিলিয়া করুণভাবে বলিল "কি কথা আর কইব।"

"একটা গান—গান না।"

"গানও ভাল লাগে না।"

"তবু একটা—এই দাশরথী,—নিধুবাবু।"

বিজয় একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল "ও প্রাচীন কবি ওসব গান জানিনে।"

"তবে কার গান জানেন ?"

"এই ডি এল রায়, রবীবাবু, গিরিশচন্দ্র, রজনী সেন"—

জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা অমলা দেবী বলিলেন,—"বেশ ঐ একটা গান।"

বিজয় একটু উৎসাহভরে বলিল, "শুনবেন, শুনবেন, ওঃ, রজনীকান্তের মত কবি কি আর জন্মায় ? খাঁটি মনের কথা সে বলেছে। এই বলিয়া সে গান ধরিল,—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো
মলিন স্মৃতিকণা বাসনামাখা গো।"

এমন সময়—বেলার বউদিদি—অনাদিবাবুর স্ত্রী এক গাল পান মুখে দিয়া হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন,—"বাঃ বেশ গায় ত ঠাকুরঝি ?"

বিজয়ের গান পরাজয়ের মতো কণ্ঠমধ্যে থামিয়া গেল। একজন বলিলেন "থামলেন যে ?"

"উনি কে ?"

একজন প্রাচীনা ঠানদিদি বলিলেন—"ওযে তোমার সম্বন্ধির বৌ গো ?—অনাদির বৌ অনিলা।"

বিজয় নীরব-কণ্ঠে কাঁপিতে লাগিল।—উহু-আহা করিতেও ভুলিল না।

সকলে ব্যস্ত হইয়া বলিল "ওকি! অমন কর্চ্ছেন কেন?"

বিজয় আপনমনে বলিয়া উঠিল—"নাঃ কী-চালাকী—চাতুরী,—না চল্‌লেম" বলিয়া সে তখনই নিজ গ্রামে রওনা হইতে প্রস্তুত! কার্য্যকারণে হইল অন্য প্রকার,--স্ব-ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক বিজয়ের বিজয়গর্ব্ব এক্ষেত্রে টিকিল না, বিবাহের আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারই তাহাকে স-সমারোহে সুসম্পন্ন করিতে হইল।—প্রেমিকের মর্ম্মন্তুদ পরিতাপ!

শঙ্করপ্রসাদ এ বিবাহে খুব ব্যয়-বাহুল্য করিলেন, গ্রামময় জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। বিজয়ের মা বৌ পাইয়া খুব খুসী হইলেন;—কেবল খুসী হইল না বিজয় নিজে। সে মনে করিয়াছে সংসারে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু নিজের সহধর্ম্মিণীর ভাই—অনাদি উকিল।

বেশী নয় আর একটা মাস—মাত্র দু' পক্ষ—কৃষ্ণ ও শুক্ল—অতীত হইতে না হইতেই গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টারকে বুঝিতে হইল—তাহার চিঠির থলে দস্তুরমত ভারী হইতেছে। সত্যই! অনিলার স্মৃতি কোন্ নীল-আকাশে মিলাইয়া দিয়া বেলা বিজয়ের জীবন-বেলা হাস্য-মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিজয় অভ্যাসবশে একদিন যখন গাহিতেছিল—

"দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—"

কে যেন জনান্তিকে থাকিয়া ভ্যাঙ্গচাইয়া গাহিল—

বেলা দেবী সে যে—বেলা দেবী ওগো ভালমতে আমি জানি!

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

মরণসখা।

—:*:—

ওগো আমার সাধের মরণ—

　　　ওগো পরাণ সখা,

কবে তোমার উজল রূপে

　　　দিবে আমায় দেখা ?

কবে তোমার মধুর প্রেমে

　　　প্রাণ উঠিবে ভরে,

সেই আশেতে আছি আমি

　　　সারাজীবন ধরে !

কবে আমার সাঙ্গ হবে

　　　এই জীবনের খেলা,

আস্‌বে তুমি বরের বেশে

　　　মধুর সাঁঝের বেলা।

পরিয়ে দিব বরণ-মালা

　　　কণ্ঠে তোমার হেসে,

উজল তোমার দীপ্তি সখা

　　　উঠ্‌বে হৃদে ভেসে।

তোমার সাথে হবে যখন

　　　শুভ দৃষ্টিপাত,

সকল বাঁধন এক নিমেষে

　　　টুটবে সবার সাথ।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

সাহিত্য ও সমাজ

যে অনভিভাবনীয় শক্তি ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আজকালের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখার ভিতর দিয়ে—বাংলাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে, তাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমাদের সকলের আছে কি না এতে যথেষ্ট সন্দেহ এসে পড়েছে। যদি একে নিঃসঙ্কোচে বরণ করে নেবার শক্তি আমাদের থাকবে, তবে আজ যে কথা লিখতে যাচ্ছি—তার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্রই থাকত না। এ প্রয়োজনীয়তাটা বিশেষ করে বুঝেছি যে দিন প্রবাসীতে 'দেশী ও বিদেশী' নামে মেদিনীপুর সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণটী পড়েছিলাম। সেখানকার উচ্চ আসন হতে—যে কথাগুলি বলা হয়েছে তাকে Delphia Oracle বলে বিশ্বাস করবার মত ভক্তি কিম্বা শ্রদ্ধা আমার নাই। তাই আজ কথাগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করব।

সকলদেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি উপন্যাস আছে, যাকে ইংরাজি ভাষায় Problem novels বলে। বাংলায় এর তর্জ্জমা করতে হলে একে 'সমস্যামূলক উপন্যাস' বলতে হবে। এই ধরণের উপন্যাসের সৃষ্টি অতি অল্পদিন হল আমাদের সাহিত্যে সুরু হয়েছে। সমাজের ভিতর থেকে—যখন আঘাত একেবারে হঠাৎ আমাদের হৃদয়ের উপর এসে পড়ে, আর তার প্রতিক্রিয়ায় মত—আমাদের মন যখন ফিরে আঘাত করবার জন্য চিরপুরাতন সংস্কারগুলি নিয়ে একটা বোঝাপড়া করতে চায় তখনকার সেই দ্বন্দ্ব নিয়েই সমস্যামূলক উপন্যাসের প্রাণ গঠিত হয়েছে। জীবনের পথে চলতে চলতে যে সমস্যাগুলি আমাদের কাছে সামাজিক জীব হিসাবে সত্য হয়ে উঠে তার সমাধানই এ প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য—। এ রকম লেখার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটা সব চেয়ে পাকাপাকি হয়ে পড়ে।

সমাজের সব চাইতে বড় প্রশ্ন এই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ, দাম্পত্যপ্রেম। একেই ভিত্তি করে সমাজসৌধ দাঁড় হয়ে আছে। পাশ্চাত্য সমাজে এই সম্বন্ধটা নিয়ে—নানা প্রকার

সমস্যা নানা প্রকার প্রশ্ন জেগে উঠেছে। তাই আজ চারিদিকে আমাদের জীবনের সত্যকে আবৃত করে ফুলের পাপড়ির মত যে সংস্কারগুলি বিকশিত হয়ে আছে সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাবরণ উজ্জ্বল সত্যকে গ্রহণ করবার শক্তির পরীক্ষা চলেছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যসম্বন্ধে অজিতবাবু একস্থানে বলেছেন—'হেনরিক ইবসেন, মেটর্লিঙ্ক, বার্নার্ড শ, এচ জি ওয়েলস্, হাউপ্টম্যান, বদলেয়ার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের যে কোন রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে, যে হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দ্দা তুলিয়া—সমাজের ভিতরকার জীবননাট্যলীলাকে তাহারা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ঘটিত সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের যথার্থ সম্বন্ধের নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।"

পূর্ব্বেই বলেছি যে আমাদের সাহিত্যেও—এই সমস্যামূলক উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে আর এই বিভাগের লেখকরা একেবারে নিয়ে বসেছেন স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ঘটিত সমস্যাটাই। তাই আজ আমরা সচকিত হয়ে উঠে ভাবছি এই যে পুরুষ ও নারীজাতির বিরোধ যা পাশ্চাত্যসমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সে কি আমাদের সমাজকেও চঞ্চল করেছে। সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় আমাদের আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন,—

"কিন্তু আমাদের দেশে কি স্ত্রীপুরুষের সমস্যাটা ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়েছে? আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা ও সংযম আছে তা কি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি না? ....না বিলাতী সাহিত্যে যা কিছু পেয়েছি আমাদের এখানে দেশের নাম কোরে হোক তার লীলাটা দেখাতে হবে—এই নকলবাজী না করলে আমাদের লেখকজীবন মিথ্যা হয়ে যাবে?"

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সভাপতি মহাশয় উপরের কথাগুলি দিয়ে—কোন লেখক-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছেন। আমার মনে হয় আমাদের দেশের যদি কোনও লেখক ইবসেনপ্রমুখ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ যে পথে গিয়েছেন সে পথের পথিক হয়ে থাকেন, তা হলে তারা হচ্চেন আমাদের সাহিত্যের দুটী অভ্রভেদী চূড়া—রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র। আরও অন্যান্য লেখক এ বিষয় নিয়ে—নাড়াচাড়া করে থাকবেন কিন্তু তারা আমাদের

আলোচনার মধ্যে আসবেন না। যে গ্রন্থগুলি কালের আবর্ত্তন উপেক্ষা করে জাতীয় সাহিত্যের একটা চিরন্তন সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, সে গুলিই আমাদের—পড়বার ও ভাববার বিষয়।

সভাপতি মহাশয়—আর একজায়গায় বলেছেন

"পারিবারিক স্নেহ ও প্রেম আমাদের জাতীয় তপস্যা। বিলাতে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে তর্ক উঠেছে। যে সকল জাতি বিরাট্ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন............ পারিবারিক সম্পর্ক তাদের নিকট খুব উচ্চ হতে পারে না, উহা শুধু কর্ত্তব্যের আকার ধোরে তাঁদের চোখে পড়ে—উহা তাদের জীবনের প্রেরণা বা তপস্যা নয়। কিন্তু বাংলার দাম্পত্য এখনও বাংলার তপস্যার সামগ্রী।"

এখন আমাদের সমাজের দাম্পত্যপ্রেমের বাস্তব চিত্রের কথাই বলব।

যারা কল্পনার রঙীন আলোকে জগৎটা দেখে থাকেন তারা জগতের বর্ণবৈচিত্র্যে আনন্দ পান সত্য—কিন্তু সাদা আলোক ভরা আসল জগৎটার সঙ্গে তাদের পরিচয় কখনও ঘটে না। পল্লীর ছায়া শ্যামল, পাখীর ডাকে মুখরিত কুঞ্জবন, দীঘির কালো জল, আর মৃদু বায়ু স্পর্শে হিল্লোলিত শস্যভরা ক্ষেতগুলি প্রচুর স্বাস্থ্যসম্পদযুক্ত সরলতা মাখান পল্লীবাসীগণ আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছে বটে কিন্তু কল্পনার এই মোহন চিত্রের সঙ্গে আসল পল্লীগ্রামের বাস্তব চিত্রটার বৈষম্য কতটা বেশী তা আজকাল পল্লীগ্রামে যাঁরা গিয়াছেন তাঁদের বুঝতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না। পল্লীবাসীর সরল জীবনের ও চরিত্রের মধুর সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণে সুখ এনে দেয় বটে কিন্তু "পল্লীসমাজের" নগ্ন-কদর্য্যতা বেদনার সঞ্চার করলেও তাকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা করতে ত পারছি না। বরং বলব যে আমাদের এই যুগের পল্লীর চিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে অনেকটা শরৎ বাবুর "পল্লীসমাজে", অন্ততঃ পল্লীবাসীর জীবনের দিক হতে। আমাদের পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধেও আমি অনেকটা এই রকমের কিছু বলতে চাই। কথাটা অপ্রীতিকর হতে পারে। আজ আর লিখতে বসে 'মাত্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' সংস্কৃত-বচনটীর মর্য্যাদা রাখতে পারছি না। আমরা বড়াই করে বলে থাকি যে আমাদের বাঙালীর জীবনে দাম্পত্যপ্রেমটা একটা তপস্যার সামগ্রী। নারীজাতীর পক্ষ হতে এই দাম্পত্য-সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা হয়ে থাকলেও পুরুষের দিক দিয়ে একে যে কতটা অমর্য্যাদা করা

হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। তাই বল্‌ছিলাম, শুধু ভাবের ঘোরে বসে থাকলে ঘুম বা আবেশ আসে সত্য আর তাতে কোরে পরমার্থিক তত্ত্ব জানা গেলেও যেতে পারে কিন্তু এটা জোরগলায় বলতে পারি যে পার্থিব বস্তু জানবার পক্ষে এটা একেবারেই বাঞ্ছিত অবস্থা নয়। দেখতে পাওয়া যায় সমাজের নিম্নস্তরে বিধবা স্ত্রীলোকের আজীবন বৈধব্য ব্রতপালন খুবই কম, তাদের মধ্যে ফিরে বিয়ে করবার নিয়ম প্রচলিত আছে।* আর আমাদের দেশের বিপত্নীক পুরুষরা সমাজশাসকদের চোখে অলঙ্কার শাস্ত্রের কবির মত 'নিরঙ্কুশ।' বিপত্নীক পুরুষের দারান্তর গ্রহণ আমাদের সমাজে এতটা স্বাভাবিক ও সাধারণ হয়ে পড়েছে যে আমরা এখনও ভাবতে শিখি নাই, ১৯।২০ বছর এক স্ত্রীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে তার মৃত্যুর ২।৩ মাস হতে না হতেই তার স্মৃতিটা মুছে ফেলে সে জায়গায় অন্য একজনকে এনে বসান, আর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি করা কতটা গর্হিত। আমাদের সমাজে এ প্রকার ঘটনা অহরহ ঘটছে। এখানে আমার বক্তব্য এই নয় যে বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে আজীবন বৈধব্যপালনই শ্রেয়স্কর কিম্বা বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে পত্ন্যন্তর গ্রহণটা একটা অন্যায় ব্যাপার। আমি বলছি যে—যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম গড়ে উঠেছিল সেখানে কি স্বামীর পক্ষে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কিম্বা স্ত্রীর পক্ষে অপর স্বামী গ্রহণ সম্ভব হত। শুধু স্ত্রীর অপরিমেয় ভালবাসাতে দাম্পত্যপ্রেম হয় না; স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই দাম্পত্যপ্রেম। যদি আমাদের দেশে এ রকম ব্যাপার

---

* বাঙ্গলায় কোথা? সে উদারতাটুকুও বাঙ্গলায় নাই। অচলায়তন সনাতন ধর্ম্মের চূড়া খাড়া রাখ্‌তে সনাতনী ধার্ম্মিক শতছিন্ন দড়িদড়াতে শতাধিক গ্রন্থি দিয়া বাঁধাছাঁদায় কম করছেন না। নবশাকশ্রেণী কন্যাপণের মাহাত্ম্যে নির্ব্বংশ হতে চলেছে; যে গ্রামে শতাধিক নবশাক-পরিবারের বসতি ছিল,—এখন সেখানে এক ঘরের সন্ধানও মেলা ভার। বিধবার বিবাহ হলে—তার অপবিত্র হস্তের জল অচল, অথচ সচ্ছিদ্র আবরণের অন্তরালে অবৈধ মিলন-শাপগ্রস্তা বিধবার জল চল। পশ্চিমের উদারতা—দাসদাসীর দুর্ভিক্ষের দিনে—বাঙ্গলা অবাধে মেনে লয়েছে। বিধবাবিবাহঅনুরক্ত পশ্চিম দেশের কুর্ম্মী প্রভৃতি জাতির জল বাঙ্গলায় গঙ্গোদক বা সোডাওয়াটার!—পঃ।

নিয়ত ঘটে থাকে তবে দাম্পত্যপ্রেম যে আমাদের দেশে ও সমাজে তপস্যার জিনিষ হয়ে উঠেছে তা কি ক'রে বলব? সভাপতি মহাশয় যা বলেছেন সে কথাগুলি দেশপ্রীতির পরিচয় দিতে পারে কিন্তু তার অভিজ্ঞতার একটুও পরিচয় দেয় নাই।

এই যে আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধটাকে সংস্কারহীন করে দেখবার একটা চেষ্টা চলেছে, যার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"তে আর শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"তে এই ভাবের একটা সুস্পষ্ট রেখাপাত দেখতে পাচ্ছি একে পশ্চাত্য সাহিত্যের "নকলবাজি" বলবার মত সাহস আমাদের একেবারেই নাই। আজ ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশবাসীর প্রাণে যে ভাবের প্রবাহ এসেছে, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির দিকে যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এই অনুসন্ধিৎসা, এই বিপুল আশা, সত্যকে আবরণহীন করে' দেখবার চেষ্টা তারই অভিব্যক্তি বলে আমার মনে হয়। প্রতিজাতির সমাজে ও সাহিত্যে Time spirit নামে একটা শক্তি কাজ করে থাকে। কোন বড় সাহিত্যিকই যুগধর্ম্মের প্রভাব হতে নিজকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে পারেন কিনা সন্দেহ। আগেকার দিনে যখন পৃথিবীর একজাতির সঙ্গে অপর জাতির, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের মেলামেশা এত সহজে ও এত গভীর ভাবে ঘটত না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের যুগধর্ম্ম প্রকাশ পেত। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইউরোপীয় সাহিত্যে ও সমাজে যে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তা কি আমাদের সেই সময়কার সমাজে কিম্বা সাহিত্যে একটুও চঞ্চলতার হিল্লোল তুলতে পেরেছিল? বোধ হয় একটুও পারে নাই। কিন্তু আজকাল যদি এই রকম একটা ভয়ানক ব্যাপার কোন সভ্যদেশে ঘটে তবে আমাদের গায়ে যে আঁচড়টী লাগবে না তা মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। যতই সভ্যতার বিস্তার হচ্চে ততই সকল দেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলেছে। কালিদাসের সময় কালিদাস যা লিখেছিলেন তাঁর মেঘদূত, শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি এগুলি ছিল এক ভারতের সম্পত্তি কিন্তু এই যুগের রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি সকল দেশের ও সকল জাতির। এইভাবে সমস্ত পৃথিবীটাই একটা বিশাল পরিবারে বা গৃহে পরিবর্ত্তিত হতে চলেছে। এ জন্যই আমার মনে হয়—যে পশ্চিমের ইবসেনীয় সাহিত্য আর আমাদের দেশের এই নূতন সাহিত্য একই রকম চিন্তার বা যুগধর্ম্মের ফল।

সমাজ একটা প্রকাণ্ড শক্তি। যেখানে শক্তি আছে, সেখানেই গতি আছে। যুগের পর যুগ চলেছে, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অবস্থার মধ্যদিয়ে সমাজ আপনাকে প্রকাশ করছে। আজ যে দেশের মধ্যে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব হচ্চে তাকে প্রদীপ নিব্‌বার পূর্ব্বে মরণ শিখা বলে ভুল করবার কোন কারণ নাই। এ সত্যই নবজাগরণ। অল্প কয়েকদিন হল বাঙালী ইউরোপীয় সমরলীলায় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আজ সে 'হোমরুল' পাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহ প্রচার চেষ্টা আরও কত প্রকারের পরিবর্ত্তন আজ এদেশে সম্ভব হয়ে উঠেছে, একে কি জাগরণ ভিন্ন আর কিছু বলতে পারি? আমরা এখন বুঝতে পেরেছি, যে যুগ এখন এসেছে সে যুগের মত করে সমাজকে ও জাতিকে না গড়তে পারলে আমাদের রক্ষা পাওয়া দায় হয়ে উঠবে। তাই আজ পুরাতন সংস্কারগুলিকে জ্ঞানের ও বিচারের কষ্টিপাথরে পরখ করতে ইচ্ছা জেগেছে। তাই আজ পুরাতন আদর্শগুলিকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য বাঙালী এত উৎসাহিত।

এ যুগের বাঙালীর সঙ্গে আগেকার যুগের বাঙালীর তুলনা করলে আমরা অনেকটা ব্যবধান দেখতে পাব যাঁরা যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকেন তাঁরা ভাববেন যে "এ কি নবজাগরণ, না অন্তিম চীৎকার।" এ যুগের আদর্শ সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ—চিন্তার স্বাধীনতা, কর্ম্মের স্বাধীনতা। একজন বলেছেন এ যুগটা আমাদের পক্ষে "An age of rationalistic iconoclasm"—এ ভাঙ্গবার যুগ। যেদিন জ্ঞানের ও বিচারের মাপদণ্ডে পুরাতন আদর্শগুলি আমাদের জীবনের পক্ষে অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবে, সে দিন তাকে সরিয়ে দিতে, ভেঙ্গে ফেলতে কোন কষ্টই বাঙালী অনুভব করবে না। কালে ও প্রকৃতির ধ্বংশাবশেষ হতে যে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি হবে এতে কোনই ভুল নাই। গতানুগতিক চিন্তার পথ ও যুক্তিহীন সংস্কার আর আমাদের প্রার্থিত নয়, আমরা চাই শুধু যুক্তির বাধাহীন সরল, উদার প্রান্তর। এই যে স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের প্রাণে যে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা জেগেছে এতে ভয় পাবার কোন কারণ নাই। যদি বাঙালীর ঘরের সুখ শান্তি, একটা মিথ্যাভিত্তির উপর দাঁড় হয়ে থাকে সেই সুখশান্তির উপর আমি একটুও শ্রদ্ধাবান নই। এই মিথ্যাকে দূর করে দেবার

জীন্য যদি কয়েকটা দিনের মত কোন পরিবারে একটা অশান্তির দানব এসে উপস্থিত হয়—তাও আজ আমরা স্বীকার করব। আর যদি এতে যথার্থ সত্যই থাকে তবে তার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যা এখন আমাদের চোখে পড়ছে না, তা উজ্জ্বলতর হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে একি আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নয়।

আমাদের সমাজের এই ভাব থেকেই আমাদের সাহিত্যেও এই নূতন রকমের একটা শক্তি, উদারতা সহানুভূতি ফুটে উঠেছে।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখছি।

নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্য-প্রেম নিয়েই এই "ঘরে বাইরে" রচিত হয়েছে। বিমলার একনিষ্ঠ ও একাগ্র প্রেমের উপর নিখিলেশের কেমন একটা নূতন ধরণের সন্দেহ জন্মিল। সে ভাবল—আমাদের বাঙালীর জীবনে আমাদের নিজকে দিয়ে স্ত্রীকে একেবারে ঢেকে রেখেছি, বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবার অবকাশ কোন দিনই দেই নাই,—এ জন্যই তার এতটা আনুগত্য ও একাগ্রতা। যদি পুরুষের সঙ্গে মেশবার তাদের স্বাধীনতা দেওয়া যায় তবে স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমের কতকটা পরীক্ষা হবে; নিখিলেশ সংযত ধীর পুরুষ। স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সাধারণ লোকের যেমন একটা আকুলতা বা মানসিক যাতনা জন্মে থাকে তার কিন্তু সে রকম হয়েছিল না। বিমলার সন্দীপের প্রতি সাময়িক অনুরাগ সে নীরবে সহ্য করেছিল। সে ঠিক জানত যে বিমলা যদি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকে তবে সে সন্দীপের মোহপাশ হতে একদিন তার কাছে ছুটে আসবেই আসবে। বস্তুতঃ হয়েছিলও তাই। সন্দীপ যে শুধু কথার রৌদ্রে নিজের অন্তরের আঁধারকে ঢেকে রেখেছিল তা বিমলার বুঝতে বাকী রইল না; বইখানার শেষ হয়েচে নিখিলেশ ও বিমলার এই নূতন মিলনে। আজকার এই মিলন ঐকান্তিক বিশ্বাসের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। বিমলার জয়ে আজ নারীজাতির গৌরব আরও উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠেছে।

নারীজাতির এই জয়জয়কার ঘোষিত হয়ে থাকলেও এই বইখানাকে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশদান করতে এ দেশের নীতিজ্ঞদের অনেক আপত্তি উঠে থাকে। কি ভয়ানক ক্ষোভের বিষয়।*

তারপর শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "চরিত্রহীন"। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলবার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। এক বিশিষ্ট ফাস্টগ্রেড কলেজ লাইব্রেরীতে এই বইখানা আনা

---

* সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বইখানাকে অন্তঃপুরে প্রবেশদান করতে ভয়ের কারণ আছে বা নাই একবারে অমন নিঃসন্দেহভাবে বলা কঠিন। জিনিষ ভাল হলেই তা যে-সে হস্তে নির্ব্বিচারে দেওয়া চলে না। শাণিত-অস্ত্র যোদ্ধার হস্তেই উপযুক্ত—বালকের পক্ষে জীবন-হন্তারক! অধিকারীর কথাটা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই; বাঙ্গলায় অন্তঃপুরের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাতে অত-বড় তীক্ষ্ণ শাণিত-অস্ত্র, মঙ্গলের না হয়ে ভীতির কারণই হবে। নেতারা অন্যভাবে ভীত হয়ে চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করছেন সত্য, তাঁদের সে সংস্কারান্ধ মোহের অবস্থাকে কৃপার চক্ষে কেহ দেখলে—কিছু বলবার নাই কিন্তু ছেলে-বেড়ান ঠেলাগাড়ীতে আরবী ঘোড়া জুততে কোন বুদ্ধিমানই বলবেন না! একদিন বাঙ্গলার মেয়েদের নভেল পড়াই দোষের ছিল—আজ তা অন্য আকার ধরেছে, তবু আজও বঙ্কিমের স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের চিত্র যেমন ঠিক ধরতে পারে নাই সেই মনে অতবড় সমস্যার সমাধান করে প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হবার মত অবস্থা আসে নাই! আসবে—সাড়া পড়েছে,—শিক্ষার মধ্য দিয়া—শিক্ষিত স্বামীর সাহায্যে, সখ্যে, এ-সকল জটীল তত্ত্বের একদিন পূর্ণ-সমাধান প্রাপ্ত হবে;—সত্য প্রকাশিত হয়ে সার্থক হবে—'ঘরে-বাইরে'। বিলাতীভাবে নয়—ভারতের রক্তে ভারতের ভাবে সেটা পাবে সাফল্য! যে চিত্র ঠিক সন্দীপ বিমলার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নয়—শরচ্চন্দ্র "শ্রীকান্তে' দিদি'তে যে আদর্শের ইঙ্গিত করেছেন—ভারতের নারীর সেই নিজস্ব আদর্শ—সর্ব্বকালের সেই গৌরীর চিত্র ভারতে একদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। শিক্ষিত তরুণ-প্রাণ লেখক আশায় উৎফুল্ল হয়ে তার প্রতীক্ষায় রয়েছেন—জীবন-পথের প্রায় শেষ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদেরও মনে হয়—দেখি না-দেখি—সে শুভ দিনের প্রতীক্ষা ভারতে আর কল্পনার বস্তু নয়। পঃ

হয়েচে. কিন্তু সাধারণ পুস্তকের মধ্যে এর স্থান হয় নাই, ভয় পাছে ছেলেরা পড়ে ফেলে। "ঘরে বাইরের" স্থান অন্তঃপুরিকাদের মাঝে হয় নাই, আর "চরিত্রহীন"এর নামের গুণেই বাংলার যুবকের অপাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েচে।

চরিত্রহীনকে ভাল লাগবার আমার পক্ষে একটা কারণ এই যে মানুষকে বিচার করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি প্রকাশ করেচেন, তা আমাদের সাহিত্যে অভিনব ও বিচিত্র। এই সাবিত্রীর চরিত্রে,—সাবিত্রীর জীবনে যে সত্যটা ফুটে উঠেছে তাকে মেনে নেবার মত উদারতার আমাদের এখনও একান্ত অভাব আছে। অনেকেই বলে থাকেন, যে নারী জীবনে একবার মাত্র সংযমহীনতার পরিচয় দিয়েচে, যে তার চিরদিনের ঘরের কোণটী ছেড়ে একেবারে কদর্য্য প্রকাশ্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছে, তার আবার ভাল হবার কি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তার ভিতর আর কি নারীত্ব জেগে উঠতে পারে? তার ফিরে আসবার ইচ্ছা থাকলেও তাকে জোর করে আমরা নরকে পাঠিয়ে দিবই দিব। কি ভয়ানক, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অনুদার এই সমাজ। কিন্তু কবির প্রাণও প্রতিভা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেচে এমন একখানা চিত্র—যার চরিত্রের বিমল আভায়—তার প্রথম জীবনের এক মুহূর্ত্তের মিথ্যা কলঙ্কচিহ্ন কোথায় মিশে গেছে দেখতেই পাওয়া যায় না। তাকে উপীন-দা স্নেহ করেছিল, আমাদের হৃদয়ও তাকে শ্রদ্ধা করতে বোধহয় কোনদিনই সঙ্কোচ বোধ করবে না। সে ত তাহার দেহের পবিত্রতা কোনদিনই হারায় নাই, মনও তার বেশই পবিত্র ছিল। তবুও তার দেহটাকে অনেকেই কামনা করেছিল বলে সে ত তাকে তার দেবতার পায়ে অর্ঘ্যের মত তুলে দিতে পারছিল না। এ কি অসাধারণ পবিত্রতার জ্ঞান। কি বিশাল সহানুভূতি নিয়েই শরৎচন্দ্র এই সাবিত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন।

"শ্রীকান্ত" হ'তে দু একটা স্থান উদ্ধৃত করে এই আলোচনাটা শেষ করব। অভয়া আর রোহিণীর কথা। শ্রীকান্ত যে ষ্টীমারে রেঙ্গুণে যাচ্ছিল অভয়াও সেই ষ্টীমারেই উঠেছিল—শ্রীকান্ত দেশ ভ্রমণের সপ্রতিভ আচরণ, কর্ম্মতৎপরতা আর তার দুঃখের কাহিনী শ্রীকান্তের মনে বিস্ময়জড়িত একটা করুণা জাগিয়ে দিয়েছিল। স্বামী তাকে ত্যাগ করে চাকরীর সন্ধানে রেঙ্গুণে চলে আসে, আর ব্রহ্মদেশীয় একটা রমণীর পাণিগ্রহণ করে তার

আগেকার দাম্পত্যপ্রেমের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করে! অভয়া তাদের গ্রামের রোহিণী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে এতদূরে এসেছিল।

সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে, শ্রীকান্তের চেষ্টায় সে তার স্বামীর দেখা পেয়েছিল, একরাত্রি স্বামীর ঘরে বাসও তার অদৃষ্টে ছিল কিন্তু এতদিন পরে স্বামী তাকে প্রথম সম্ভাষণ যে-ভাবে করেছিল তার পরিচয় দেবার জন্য সে শ্রীকান্তকে বলেছিল—

"কি হয়েছিল জানতে বোধ হয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে!"

এই বলে সে তার ডান হাতখানা অনাবৃত করে কয়েকটা বেতের দাগ দেখাইল।

"আমার সতীধর্ম্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার, তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী এ তারই একটু চিহ্ন।"

এ রকম ব্যাপার কি আমাদের সামনে অহরহ ঘটে থাকে না, যখন স্বামী তার স্বামীত্বের অধিকার বলেই স্ত্রীকে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান দেবার জন্য এ প্রকার পুরস্কার দিয়ে থাকেন। মদ্যাসক্ত স্বামী প্রথম রাত্রিটা কুস্থানে কাটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—কলুষিতচিত্তজাত অন্যায় সন্দেহের বশে স্ত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে থাকে। মন্ত্রশক্তি আছে কি না তা নিয়ে তর্কবিতর্ক আমি করব না কিন্তু আমার বিশ্বাস স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার সঙ্গে গোটাকতক বৈদিক মন্ত্রের কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থাপনও অনুধাবন করাটা কতটা নিরর্থক তা কাহাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না।

অভয়া বলিল "শ্রীকান্তবাবু,—তিনি তার বর্ম্মাস্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার কোরে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সে কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইছি।"

"তিনিও আমার সঙ্গে সে মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তার প্রবৃত্তিকে তার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারলে না। অর্থহীন আবৃত্তি তার

মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ বলে আমারি উপরে।............... একজন নির্দ্দয় মিথ্যা-বাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থপঙ্গু হওয়া চাই? এইজন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।"

আমাদের সমাজের যে ছবিটা একেবারে অনাবৃত করে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েচে, এটা কি নিছক কল্পনা? এই নিয়েই কি আমাদের গৌরব করতে হবে যে দাম্পত্য-প্রেম আমাদের তপস্যার সামগ্রী? এইভাবেই আমাদের বাঙ্গালীর ঘর Doll's House হয়ে দাঁড়িয়েচে। এটা চাপা দিয়ে রাখবার জিনিষ নয়, মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মত অকস্মাৎ জ্বলে উঠ্‌বেই।

এতদিন পর্য্যন্ত নারীজাতির শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে আমরা তাদের চিন্তার এবং কর্ম্মের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলাম। আজ শিক্ষার গুণে তারা তাদের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব অবগত হয়েছে। সূর্য্যমুখীর মত স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দেওয়া আর আজকাল আমাদের নারীজাতির আদর্শ নয়। দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে তাদের স্থান কোথায় তারা আজ শিক্ষার গুণে বুঝে ফেলেছে। তাই আজ তাদের Self assertion যেমন সমাজে,—তেমনি সাহিত্যে। যতই দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার চলতে থাকবে ততই এই স্ত্রীজাতি তাদের চরিত্রের বিপুল রহস্য নিয়ে, তাদের চরিত্রের অচিন্তনীয় ক্ষমতা সহানুভূতি ও প্রেম সঙ্গে করে আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের দ্বারে এসে দাঁড়াবে। এই ভাবেই সমাজের গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে—সমাজের ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের সাহিত্যে এক নবীন প্রভাতের অরুণলেখা জেগে উঠবে। আজ আমরা সে দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

শ্রীঅংশুমান দাশ গুপ্ত।

অন্ধকার বন্দনা।

———:*:———

অন্ধকার এস আজি, চির প্রিয় এস অন্ধকার,
এস শান্তি, এস সখা, এস প্রাণ, প্রিয় সাধনার,
মরম মন্দির মাঝে হে দেবতা করে তব পূজা
জনম সফল হ'বে, ওগো মোর হৃদয়ের রাজা
অর্ঘ্য আজি লহ গো আমার
জাগৃহি জাগৃহি দেব চিত্তমাঝে জাগ একবার।

এস বন্ধো, মুছে যাক আলোকের শেষরশ্মি-রেখা,
মুছে যাক্ মিথ্যা মোহ ; হৃদয়েতে থাক শুধু আঁকা—
তামসের সত্যস্মৃতি ; বন্ধনের নাহি ধারি ধার,
অন্তরের অন্তঃস্থলে ফিরিবে গো নয়ন আমার
বুঝিব গো হে বন্ধু তখন
বাহিরের আলো মাঝে পাই নাই পরশ রতন।

আলোকের তীক্ষ্ণচ্ছটা ধাঁধিয়াছে নয়ন আমার
হেরিতে পারি নি কিছু, চিরদিন চিত্তের দুয়ার—
রহিয়াছি বন্ধ করি ; ডেকে আজি লও বন্ধু মোর—
ওরে অন্ধ চলে আয়—আয় ছিঁড়ে ওই মায়া-ডোর
ছুটে যাই উন্মত্ত উধাও
শাশ্বত সত্যের লাগি মোহাঞ্জন মুছাইয়া দাও।

এস সত্য হে তামস, হে বরেণ্য, বাঞ্ছিত আমার
তাঁর সেই দিব্য আলো হেরিব গো তোমারি মাঝার,
মায়া-উর্ব্বশীর করে জ্বলিতেছে যে অনলশিখা,
সে আলো যে মিথ্যা শুধু—সত্য কভু যায় না গো দেখা,
দু'দিনের তরে শুধু হায়
আলো তরে নহে মন—আলেয়ার পিছু ছুটে যায়।

তার চেয়ে হে তামস, তোমারেই করিছি বরণ
তোমাতেই মগ্ন হ'য়ে রচিব গো ধ্যানের স্বপন,
মোহ-আলো নাই হেথা তোমা মাঝে ওগো অন্ধকার,
স্তব্ধতা ঘিরিয়া শুধু রয়েছে তোমার চারিধার
সেই ভালো—ওগো সেই ভালো
এস আজি অন্ধকার—আজি আর নাহি চাই আলো,

কিছু যে পাই নি হেথা বুঝিব গো সেই কথা আজি,
হেরিব মন্দির-মাঝে শূন্য মোর রহিয়াছে সাজি,
"কি করিনু হায় হায়" বলে কেঁপে উঠিব এবার,
আমারে ঘিরিয়া শুধু রহিবে গো তুমি অন্ধকার,
বাহিরের মোহ ঘুচে যাক্
নীরব নিথর শুধু অন্ধকার হৃদি মাঝে থাক্।

নিদাঘ সে তৃপ্ত হয় বরষার স্নিগ্ধ বরিষণে,
শীতশীর্ণ কুঞ্জখানি মুঞ্জরিত বসন্তের গানে,
না-পাওয়ার শেষ তাই পাওয়া বলে যদি কিছু পাই
সেই মোর সত্য হবে পুণ্য হবে ধন্য হবে, তাই—
মর্ম্মমাঝে বাজে তব সুর
এস আজি অন্ধকার এস মম হৃদি-অন্তঃপুরে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ কর।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহ্বানের পর কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে প্রগাঢ় স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মনে হইল যেন এ-স্তব্ধতা এল র‍্যামি আশা করিতেছিলেন এবং এজন্য প্রস্তুতও হইতেছিলেন। পালঙ্ক-গাত্রের রজতনির্ম্মিত টাইমপিসটির দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে একশত গণনা করিলেন; পরে আপন অঙ্গুলিতলে লায়িতার মণিবন্ধটি আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তাহার ললাটমধ্যভাগ স্পর্শ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা মৃদু শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঢেউ খেলিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তপরেই সোজা হইয়া বসিয়া এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন—"লিলিথ! তুমি কোথায়?"

ধীরে ধীরে সুন্দরীর ওষ্ঠাধর দ্বিধাভিন্ন হইল এবং বাঁশীর আওয়াজের মত অতি মিষ্ট উচ্চারণে উত্তর আসিল—"এইখানে!"

"খবর সব ভাল ?"

"সব ভাল"। উত্তর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি হাস্যদীপ্তিতে শায়িতার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যেন বা সে এখনই চোখ মেলিয়াই চাহিবে,—কিন্তু না, সে চক্ষু যেমন নিমীলিত ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

এল র‍্যামি পুনরায় তাঁহার আশ্চর্য্য জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।—

"লিলিথ ! কি দেখ্‌তে পাচ্ছ তুমি ?"

ক্ষণকাল সমস্ত নিস্তব্ধ; পরে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হইল—"অনেক জিনিস, অনেক আশ্চর্য্য বস্তু, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু তোমাকে তার মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি, আদেশ-পালনও কর্চ্ছি, কিন্তু তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে,—এখনও তোমাকে আমি দেখি নি।"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এল র‍্যামি স্বীয় মুষ্টিবিধৃত সেই সুকোমল হাতখানি আপনার আরও কাছে আকর্ষণ করিলেন।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"যেখানে আমার আনন্দ আমায় নিয়ে গিয়েছিল"—তন্দ্রাচ্ছন্ন অথচ প্রফুল্লকণ্ঠে উত্তর আসিল—"আমার আনন্দ আর—তোমার ইচ্ছা।"

এল র‍্যামি চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বৃত হইলেন। কেননা লিলিথও ইতাবসরে তাহার বক্ষসংলগ্ন হীরকখণ্ডটির অত্যুজ্জ্বল প্রভা সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া অপর হাত-খানি মাথার দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল।

"দূরে, দূরে, বহুদূরে"—চাপা সঙ্গীতধ্বনির মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে সে বলিতে লাগিল—"যে-রাজ্যে আমাকে পাঠানো হয়েছিল তা' ছাড়িয়ে গিয়ে,—আকাশগঙ্গার পরপারে মৃগব্যাধ নক্ষত্রও অতিক্রম করে'—দেখ্‌লুম"—অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই স্বর মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

এল র‍্যামি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃগব্যাধ নক্ষত্রও অতিক্রম করে' কি দেখ্‌লে লিলিথ ?"

"দেখ্‌লুম নূতনতর এক উজ্জ্বল জগৎ"—পরিচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে সে বলিতে লাগিল—"এক অভিনব নক্ষত্র-ভুবন; এক অনাবিষ্কৃত তারকারাজ্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্র তার বক্ষে,—অসংখ্য নদনদীর মিলিত কল্লোল তার চতুর্দ্দিকে,—শিল্পশোভায় অপরূপ বড় বড় সহর তার সাগরতটে। কনক-খচিত কত না মন্দিরচূড়া, মণিমুক্তায় সাজানো কতই না প্রবাল-প্রাসাদ-তোরণ যে দেখ্‌লুম, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। দেখ্‌লুম, নগরে নগরে পতাকা উড়্‌ছে—বাতাসে বাতাসে সঙ্গীত-ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে, আর যুগল-সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ সারারাজ্যটিকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আরও দেখ্‌লুম, সুন্দর ও সন্তোষামৃত-তৃপ্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রসারিত শস্যক্ষেত্রে ইতস্ততঃ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে নৃত্যগীতে নিমগ্ন,—নতজানু হয়ে কখনও বা তা'রা অনির্ব্বাণ গৌরকিরণের উদ্দেশে, আবার কখনও বা অমর জীবনের স্রষ্টাকে, প্রণাম কর্চ্ছে।"

"অমর জীবনের!"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে সব নরনারী কি আমাদের মতন মরে না?"

একটা বিষণ্ণ বিস্ময়ভঙ্গী বালিকার সুন্দর ভ্রূযুগলের মাঝখানে ফুটিয়া উঠিল।

"মরণ বলে' কিছু নেই—এখানেও না সেখানেও না"—দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল—"কতবার একথা তোমায় বলেছি, তবু তুমি বিশ্বাস কর্‌তে চাও না। ক্রমাগতই তুমি আমাকে মৃত্যুর অন্বেষণে পাঠাও,—আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোনখানেই তাকে খুঁজে পাই নি।"

লিলিথ ও এল র‍্যামির ভিতর হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস একইকালে বাহির হইয়া আসিল।

"ইচ্ছা হয়"—বিষণ্ণকণ্ঠে কিশোরী বলিতে লাগিল—"ইচ্ছা হয় যে তোমাকে একবার দেখি, কিন্তু আমাদের মাঝখানে কেমন যেন একটা মেঘের পর্দ্দা ঝুলছে; আমি তোমার স্বর শুন্‌তে পাই, কিন্তু স্বর যেদিক থেকে আসে সেদিকে কিছুই দেখ্‌তে পাই নে।"

বিহগ-কূজনবৎ সুশ্রাব্য হইলেও এল র‍্যামিকে এ-সকল উক্তি একটুও আকৃষ্ট করিল না,—অধিকন্তু মনে হইল যেন স্বকীয় শক্তিতলে তন্দ্রাস্পৃষ্টা সেই প্রাণীটার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিবার দৃষ্টিও তাঁহার নাই। আদেশসূচক কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আমার কথা ছেড়ে নিজের কথা কও লিলিথ! কেমন করে' তুমি বল্‌তে পার যে মৃত্যু বলে' কিছু নেই?"

"যা সত্য তাই আমি বল্‌ছি—মৃত্যু নেই।"

"এখানেও না ?"

"কোনোখানেই না ”

"স্বপ্নকুমারী তুমি, অন্ধ তোমার আধ্যাত্ম-দৃষ্টি," ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"যাও, আবার খুঁজে দেখ ! মৃত্যুই যদি না থাক্‌বে তবে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি মৃত্যুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে কেন ?"

"বড় নিষ্ঠুর তুমি"—ক্ষোভের সহিত লিলিথ বলিল—"যা সত্য নয় তাই কি আমার কাছে শুন্‌তে চাও ? বল্‌তে চাইলেও তা' যে আমি বল্‌তে পারি নে। মৃত্যু নেই—আছে শুধু পরিবর্ত্তন। মৃগব্যাধের অপর পারে তা'রা ঘুমিয়ে থাকে।"

এল র‍্যামি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে আবার থামিয়া গেল।

"বলে যাও," —তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু কেন,—কখন ?"

"যখন তারা শ্রান্ত হয়"—লিলিথ উত্তর করিল।" তা'রা যা' কিছু করতে পারে তার সমস্তই যখন করা হয়ে যায়, যখন তাদের বিশ্রামের দরকার হয়, তখন তা'রা ঘুমোয় ; আর সেই ঘুমের মাঝখানে পরিবর্ত্তন ঘটে ;—সে পরিবর্ত্তন হচ্ছে—”

স্বর থামিয়া গেল।

"সে পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে মৃত্যু" দৃঢ়তার সহিত এল র‍্যামি বলিলেন—"কারণ মৃত্যু সর্ব্বব্যাপী।"

"তা' নয়"—রৌপ্যনিক্কণের মত সুমিষ্ট কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল—"সে পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে জীবন, কারণ জীবন সর্ব্বব্যাপী !"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। বালিকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া এবং শিরোভাগে প্রসারিত হাতখানি আবার বুকের উপর সরাইয়া আনিয়া বক্ষসংলগ্ন হীরকখণ্ডটীর উপর রক্ষা করিল। এল র‍্যামি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

"তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছো লিলিথ"—যেন স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কার্য্যে তাহাকে বাধা করিবার জন্যই তিনি বলিলেন—"তোমার উক্তিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেই, উপরন্তু তা' অসংলগ্ন।"

তথাপি নিরুত্তর।

"লিলিথ! লিলিথ !"—এল র‍্যামি ডাকিলেন।

উত্তর নাই ;—কেবল তনুখানির সুন্দর আভা, ওষ্ঠলগ্ন মৃদুহাসি ও পরিপুষ্ট বক্ষখানির ধীর উত্থান-পতন হইতে অনুভূত হইতে লাগিল যে সে জীবিতা।

"চলে গেছে!" এল রামির ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল। স্বহস্তবিধৃত মণিবন্ধখানি পূর্ব্ব ভঙ্গীতে রাখিয়া দিয়া একাগ্র অপলক দৃষ্টিতে তিনি শায়িতার দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিলেন —"অথচ এত দৃঢ়বিশ্বাসভরা এর উক্তি!—ফেরাজের কল্পনা যেমন, এ উক্তিও ঠিক তেমনিই নির্ব্বোধ। মৃত্যু নেই? না, তার চেয়ে এই সত্য যে জীবন নেই। এ-জগত থেকে আমাদের চলে যাওয়ার মূলে যে রহস্য আছে তা' আজও এ তলিয়ে দেখে নি; না,—যদিও মুগ্ধবোধ-নক্ষত্ররাজ্য পর্য্যন্ত এর গতি-শক্তি প্রসারিত হয়েছে, তবুও না।

"অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এক মহাভয়
ঘিরে যদি না থাকিত মৃত্যু-পরপার!
সে অনাবিষ্কৃত দেশ, সে অজ্ঞাত দিক,
যেথা হতে ফেরে না পথিক,
বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে; আর—"

"হাঁ, স্তম্ভিত করেই বটে; কিন্তু আমার চেষ্টা কি তবে ব্যর্থ‌ই হবে? কিম্বা এই যে আমি বিশ্বাস করতে পারিনে, একি আমার নিজেরই দোষ? আমার সঙ্গে যে কথা কইছে সে কি বাস্তবিকই ওর আত্মা?—না; তা'র মন্ত্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে আমারই মস্তিষ্কের ক্রিয়া? কিন্তু শেষেরটাই যদি সত্য হয় তবে এমন কথা সে কোথা থেকে বলে যা আমি স্বপ্নেও ভাবি নে বা আমার যুক্তি যা' সম্ভব বলে' স্বীকার করে না? পক্ষান্তরে এটা যদি বাস্তবিকই তা'র অদৃশ্য ভ্রাম্যমাণ আত্মাই হয়, তবে সে মৃত্যু বা দুঃখ বুঝ্‌তে পারে না কেন? তবে কি তার কল্পনা শুধু সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য-দর্শনেই অভ্যস্ত?........."

সহসা কি মনে করিয়া শায়িতার প্রশান্ত মুখখানির উপর তিনি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার যুগল মণিবন্ধ বিধৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"লিলিথ! লিলিথ! আমার ইচ্ছাশক্তি ও তোমার জীবনের ওপর আমার প্রভুত্বের অধিকারে আমি আদেশ কর্চ্ছি, ফিরে এস আমার কাছে! ফিরে এস তুমি চঞ্চলা অশরীরিণী,—সুখান্বেষণের চেষ্টা

ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে আজ দুঃখের রহস্য প্রকাশ কর! এস, শোন আমার আহ্বান, ফিরে এস!"

সুখশান্তিভার সুন্দর তনুভঙ্গিমা একটা প্রচণ্ড কম্পনে নড়িয়া উঠিল এবং তাহার ওষ্ঠ সংলগ্ন হাস্যদীপ্তিটুকু নিমেষেই মিলাইয়া গেল। সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাসের সহিত উত্তর আসিল--"এসেছি!"

"শোন আমার আদেশ!"---ধীর অথচ কতকটা যেন পরুষকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"পরিপূর্ণতার অবর্ণনীয় উচ্চস্তর থেকে পরিশূন্যতার নিম্নতম তলদেশ পর্য্যন্ত উত্থান-পতন যখন তোমার পক্ষে সম্ভব, তখন দুঃখকে অন্বেষণ কর, তাকে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর—যন্ত্রণার মূল আবিষ্কার কর, নিষ্ফল-ক্ষোভের কারণ কি, জানাও! এ সমস্তই আছে; একমাত্র আমার কণ্ঠস্বর ছাড়া এই-যে গ্রহের কিছুই তোমার জানা নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনোখানে না থাক্‌লেও আমাদের এই গ্রহে দুঃখের অবধি নেই। এখানে আমরা আহার করি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে, পান করি চোখের জলে ভেসে। মীমাংসা করে দাও, কি সে রহস্য যা' এই বেদনার—এই অবিচারের--নিরীহ শিশুর এই মৃত্যু যন্ত্রণার মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে! এ-সংসারে ভাল মানুষের সর্ব্বনাশ--মন্দবুদ্ধি নারীর উন্নতি—হতাশা—আত্মহত্যা—এই দুঃখের ওপর দুঃখের স্তূপ, যা' পার্থিব জীবনের বর্ত্তমান উপাদান--কেন এ সব? শোন তুমি বিশ্বাসপরায়ণা-সুখবাদিনী,—আমাদের মধ্যে এম্‌নি একটা উপখ্যান প্রচলিত যে, ভগবান বলে একজন আছেন—একজন জ্ঞানময় প্রেমময় ভগবান,—আর তিনি,—এই জ্ঞানী ও প্রেমিক,---স্বীয় বদান্যতাগুণে তাঁর সৃষ্ট জীবদের কষ্ট দেবার জন্যে 'নরক' নামক একটা ব্যাপার উদ্ভাবন করেছেন! যাও লিলিথ, খুঁজে বের কর এই নরক, প্রমাণ কর এর অস্তিত্ব! আগে এই পৈশাচিক ব্যাপারের খবর নিয়ে এস; আর, আত্মার পক্ষে যদি অসম্ভব না হয়, তবে অন্যের যন্ত্রণার অংশী হও! পালন কর আমার আদেশ,—নরক খুঁজে বের কর—স্বর্গের মূল্যবিচার পরে করা যাবে!"

আবেগোচ্ছল দ্রুতকণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া এল র‍্যামি কিশোরীর হাতদুটী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সে এবার আর আগেকার মতন তাহা বুকের উপর রক্ষা না করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গীতে

উর্দ্ধোত্থিত-যুক্তকর-পল্লবে একটী কাতর শব্দ করিল। তাহার মুখ পাণ্ডুর ও মলিন হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এমন একটী প্রশান্ত-গম্ভীর কারুণ্য-বিমণ্ডিত জ্ঞানোজ্জ্বল পবিত্রতা সে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যেন বা কোনো পরমজ্ঞানী স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জ্জনেই প্রস্তুত হইয়াছে। মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে থামিয়া আসিবার মতন হইল,—ওষ্ঠ-দু'খানি যেন কোনো গভীর অন্তর্নিহিত যাতনায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,—অবশেষে কি-যেন উচ্চারণও করিল। শুনিতে না পাইয়া এল র‍্যামি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

"কি হ'ল ?" সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌লে ?"

"কিছু না…… …শুধু ……. বিদায় !" কক্ষব্যাপী স্তব্ধতার উপর তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বরখানি যেন কোনো করুণ সঙ্গীতের রেশটুকুর মতই ধ্বনিত হইল—"তবু……. আর একবার……..বিদায় !"

হটিয়া আসিয়া এল র‍্যামি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মর্ম্মর-প্রতিমা দু'খানি ক্ষুদ্র, শুভ্র, উর্দ্ধোত্থিত যুক্তকরে কতকাল ধরিয়া এমনিই পড়িয়া আছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্মরণ হইল যে এই দেহ-মধ্যপথে আত্মার বাণী গ্রহণ করিতে হইলে দেহযন্ত্রখানিকে সজীব রাখিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ আপন বুকপকেট হইতে একটী ছোট শিশি বাহির করিয়া আবশ্যকীয় যন্ত্রসাহায্যে তিনি শায়িতার বাম বাহুখানিতে বিদ্ধ করিলেন, এবং শিশির ভিতরকার স্বর্ণবর্ণ কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ তাহার ধমনীতে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার হাত দুটী ধীরে ধীরে পূর্ব্ব-অবস্থায় বক্ষের উপর লুটাইয়া আসিল—শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত ও লঘু হইতে লাগিল—অধরপুটের বর্ণরাগ সজীব হইয়া উঠিল এবং এল র‍্যামি সতর্কতার সহিত আপন কার্য্যের ফলাফল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"এ-উপায়ে নিশ্চয়ই দেহখানিকে চিরকাল রক্ষা করা যায়"—অর্দ্ধ স্বগতঃ ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন—"পেশীগুলিকে এমনি নবীভূত করে'—রক্ত-প্রবাহের মধ্যে এমনি বিশুদ্ধি-সঞ্চার করে'—আর খাদ্য বল্‌তে যা' বোঝায় এবং যাতে দেহযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদানও

অন্ন থাকে না, তা'র এক কণাও এ যন্ত্রে প্রবেশ করতে না দিয়ে; বস্তুতঃ, ফুল যেমন অনায়াসে পাপ্ড়িগুলির ছিদ্রপথে বাতাসের ওপর সুগন্ধি নিশ্বাস ছাড়ে, এই সুন্দর দেহযন্ত্রটীও তেমনি করেই লোমকূপের ছিদ্রপথে ভেতরকার অনাবশ্যক অংশ বের করে' করে' চলেছে। অত্যাশ্চর্য্য এ আবিষ্ক্রিয়া! যদি সকলেই এ প্রক্রিয়া জান্তো, তা' হ'লে কি বাস্তবিকই এই জগতেও তা'রা নিজেদের অমর মনে কর্‌তো না? এই ছ' বছর সে এই ভাবে বেঁচে আছে বটে কিন্তু কে বল্‌তে পারে যে এর ওপর বাস্তবিকই মৃত্যুর কোনো অধিকার আছে কি না? এই ছ' বছরে এর পরিবর্ত্তন হয়েছে—বালিকা থেকে এই যে আজ এ, যুবতীতে পরিণত, এটা কি বয়োবৃদ্ধির পরিচায়ক নয়?—তা' যদি হয় তবে বয়সের একটা সীমায় মৃত্যুও অবশ্যই বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে' অপেক্ষা করছে! .....অটল এই মৃত্যু......কিন্তু কর্‌তেই হবে এই মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার; এমন কি সে চেষ্টায় যদি আমাকে মর্‌তেও হয়, তবু—" সহসা যেন কি নূতন কল্পনায় চমকিত হইয়া এল র‍্যামি পালঙ্ক পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিলেন।

"কি বল্‌লুম,—'সে চেষ্টায় যদি মর্‌তেও হয়,' না?—কিন্তু মৃত্যু কি আমার পক্ষেও সম্ভব? এই আত্মার ধারণাই কি ঠিক? আমার যুক্তি কি ভ্রান্ত? কোনোখানেই কি কোনো সমাপ্তি নেই? চিন্তাশক্তির বিরতি, উচ্চাভিলাষের অন্ত কি কোনো সীমাতেই নেই? চিন্তা আর কার্য্য আর জীবন—এই কি চিরকাল-ব্যাপী?"

আপন নিত্যতার সম্ভাবনা-স্মরণে এল র‍্যামি শিহরিয়া উঠিলেন। রূপার ফ্রেমে-বাঁধানো একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ কক্ষপ্রাচীরে লম্বিত ছিল—সহসা তাহার মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া তিনি সেইদিকে চাহিলেন;—শুভ্রায়িত কেশদামের নিম্নে শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল,—ছু'খানি কৃষ্ণতার আয়ত নয়ন,—সুন্দর অথচ ব্যঙ্গবক্র ওষ্ঠযুগল সমান ব্যঙ্গভরে দর্পণের ভিতর হইতে এল র‍্যামির দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আপন মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ যে তুমি এল র‍্যামি,—ব্যঙ্গ-নিপুণ ও বৈজ্ঞানিক,—এমন কতকগুলো সাধারণ সম্মোহন-রহস্যের অধিকারী যা' আধুনিক সভ্যতার যুগে সর্ব্বসাধারণে৷ পরমাশ্চর্য্য বিবেচিত হলেও পুরাকালে ইজিপ্ট-পুরোহিতদের কাছে খেলারই সামগ্রী ছিল!...... তার পর? তোমার মনের আভ্যন্তরীণ

হিসাবনিকাশ কি শেষ হবে না? চিন্তা আর কার্য্য আর চিরন্তন জীবন? বেশ তো,—মন্দ কি? হাজারখানেক গ্রহউপগ্রহের রহস্য যদি আয়ত্ত করতে পারি, তাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে না? নিশ্চয়ই না! তখন আমি আরও হাজারখানেকের রহস্য-মীমাংসার জন্যে সচেষ্ট হব।

কক্ষত্যাগের পূর্ব্বে একবার তিনি ঘরটির চারিদিক দেখিয়া লইলেন--পালঙ্কপৃষ্ঠে মন্ত্র-নিদ্রিত সুন্দরীমূর্ত্তি--গৃহকোণে সুখসুপ্তা জ্যারোবা—স্ফটিকে ও স্বর্ণে, পুষ্পাধারে ও কারু-বৈচিত্র্যে, ঝালরে ও আলোকমালায় ইন্দ্রপুরীবৎ কক্ষশোভা। ভেলভেটের পর্দ্দাখানি নিঃশব্দে টানিয়া দিয়া তিনি পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং শ্লেটখানি টানিয়া লইয়া লিখিলেন—

"আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে এখানে ফিরবো না। ইতিমধ্যে ঘরে যথেষ্টপরিমাণে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দিও। সতর্ক থেকো এবং ওকে স্পর্শ ক'রো না——'এল র‍্যামি।'"

উপদেশ লিপিবদ্ধ করার পর সোপানপথে নীচে নামিয়া তিনি পূর্ব্ব-দৃষ্ট শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং আলো নিভাইয়া দিয়া অনতিকাল-মধ্যেই ক্যাম্পখাটের উপর গভীর নিদ্রা-নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

স্বাস্থ্যের কথা।

(গর্ভিণীর খাদ্য।)

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দুইটী প্রাণীর খোরাক যোগাইতে হয়,—তাহার নিজের ও তাহার গর্ভস্থ শিশুর। মানব-জীবনে যদি এমন কোন সময় আসে, যখন তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থার কাল। কথাটি অতি সোজা এবং অতি সত্য। ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না; অন্ততঃ হওয়া ত উচিত নহে।

যখন আহার করিয়া একজন মানুষকে দুইজন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য? সে কি একলা দুইজনের খোরাক খাইবে? তাহা অবশ্য নয়; কারণ, সে একলা যাহা খাইতে পারিবে, তাহা ত তাহার নিজেরই খোরাক। একজন মানুষ কখনও

দুইজন মানুষের খাদ্য খাইতে পারে না। অথচ, একজনকে খাদ্য গ্রহণ করিয়াই দুইজনের খাদ্যাভাব মিটাইতে হইতেছে! অতএব এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? সে কর্ত্তব্য হচ্চে, খুব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা। সে খাদ্য এমন পুষ্টিকর হইবে, যাহাতে দুইজনের শরীর পোষিত হইতে পারে। অতএব, গর্ভিণী স্ত্রীলোককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থে রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য নহে;—সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর উপাদান যে খাদ্যে খুব বেশী পরিমাণে আছে, তাহাই গর্ভিণীর খাদ্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, গর্ভিণীর নিজের এবং তাঁহার প্রিয়জনের অজ্ঞতা, উপেক্ষা, অবহেলা, অথবা অর্থাভাববশতঃ অনেক গর্ভিণী তাঁহাদের উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হন না। চিকিৎসকগণ প্রায় দেখিতে পান যে, শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মহিলা কেবল উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যথোচিত ভাবে সন্তানপালনের উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন না। গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা, এবং নব প্রসূতিরা যে প্রায়ই পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহার কারণ প্রধানতঃ 'উপযুক্ত' খাদ্যাভাব। পাঠকপাঠিকাগণ এই কথাটির উপর একটু লক্ষ্য রাখিবেন। অনেকে হয় ত ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পান; ধনীগণের পরিবারভুক্তা মহিলারা হয় ত সাধারণের পক্ষে দুর্লভ খুব মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য মুখরোচক খাদ্য ভক্ষণ করিতে পান; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পরিমাণে প্রচুর, মূল্যবান, মুখরোচক এবং দুষ্প্রাপ্য হইলেই যে গর্ভিণীর 'উপযুক্ত' খাদ্য হইবে, তাহা নহে। গর্ভিণীর 'উপযুক্ত' খাদ্য তাহাকেই বলিব, যদ্দ্বারা গর্ভিণীর এবং তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের দেহের সম্যক প্রকারে পুষ্টিসাধন হয়; তা সে খাদ্য সুলভই হউক, সহজ লভ্যই হউক এবং পরিমাণে যতই অল্প হউক। সুতরাং ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, গর্ভিণীদিগের অধিকাংশ পীড়াই নিবার্য্য ব্যাধি। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার কাল তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্রতম কাল; অথচ, দেখা যায় এই সময়েই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রয়া থাকেন। গোড়াতে একটু সাবধান হইলে, খাদ্যাখাদ্যের একটু তদ্বির করিলে অধিকাংশ ব্যাধি হইতেই তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

সভ্যতার খাতিরে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে, স্বভাবজাত খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ, এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য কারণে সভ্য মানব সমাজে অধুনা কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবহার অত্যন্ত

বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণকেও জীবন ধারণের জন্য এই কৃত্রিম খাদ্যের উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ জননীর ভুক্ত কৃত্রিম খাদ্য হইতে নিজের শরীর পোষণোপযোগী যথেষ্ট উদাদান পায় না। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, আগাছা যেমন মূল বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নিজে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল বৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে থাকে, ভ্রূণও তদ্রূপ মাতৃদেহের tissue সমূহ হইতে নিজের শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহ করে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের খাদ্য কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, স্বাভাবিক বলিয়া, তাহারা যখন গর্ভধারণ করে, তখন তাহাদের গর্ভস্থ শাবক জননীর দেহকে উত্তেজিত ও সতেজ অবস্থায় রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। মানব-জননীর সম্বন্ধেও স্বাভাবিক ভাবে এইরূপই ঘটিবার কথা ; কিন্তু মানব বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জীব বলিয়া তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই কৃত্রিম হওয়ায় মানবী গর্ভধারণ করিলে ভ্রূণ-শরীর পোষণার্থ জননীর দেহের সারভাগ ব্যয়িত হওয়ায়, জননী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; অবশেষে নানা ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ভ্রূণ প্রথম প্রথম মাতার শরীর শোষণ করিয়া নিজে পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু জননী দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িলে, ভ্রূণেরও শরীর-পোষণোপযোগী পদার্থের ক্রমশঃ অভাব হওয়ায়, সেও অবশেষে দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অতএব, এরূপ বিসদৃশ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায়,—শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও—অর্থাৎ যতদিন সে জননীর স্তন্য পান করিয়া থাকে ততদিন—জননীর পক্ষে খুব বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য নিতান্তই আবশ্যক! যে খাদ্যে জননীর দেহের tissueগুলি পুষ্টিলাভ করিয়া সতেজ থাকিবে,—যে tissue হইতে ভ্রূণ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিবে—জননীর খাদ্য সেই tissue-পোষক খনিজ লবণ ও ভাইটামাইন-বহুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। অপর সকল প্রকার খাদ্যকে গর্ভিণীর পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আর, এইরূপ খাদ্য না পাইলে গর্ভিণী ও ভ্রূণ উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবে।

গর্ভিণী ও ভ্রূণের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞতা যেরূপ মারাত্মক ব্যাপার, এমন আর কিছুই নহে। কারণ, ইহাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। কেবল গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর খাদ্যের তদারক করিলে চলিবে না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর জননীর খাদ্যের উত্তমরূপ ব্যবস্থা থাকা চাই। যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করিবে, গর্ভস্থ ভ্রূণ জননীর

tissue হইতে যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্তন্য হইতেও সেই উপাদান গ্রহণ করিয়া শিশু জীবিত থাকে ও পরিপুষ্ট হয়। জননী সন্তান পালনার্থ দুগ্ধ প্রদান করিবে আর পুষ্টিকর খাদ্য পাইবে না, তাহা হইলে তাহার স্তনে দুগ্ধ জমিবে কোথা হইতে? যেখানে আয় নাই শুধু খরচ আছে, সেখানকার অবস্থা ঘটিবে; তাহা ছাড়া আর কিছুই ঘটিতে পারে না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য-বিবরণীতে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। এবং এই রোগে স্ত্রীলোকেরাই অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা বিচিত্র নহে। পর্দ্দা ইহার ততটা কারণ না হউক, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব, এবং কৃত্রিম খাদ্যের বাহুল্যবশতঃ সন্তান প্রসব করিতে করিতে মহিলারা ক্রমশঃ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। কারণ, প্রায়ই দেখা যায়, দুই তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এমন মহিলাদিগের মধ্যেই যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। সন্তানের জননী হইতে গেলে নারী দেহকে কি যে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন। যে নারী যত অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসব করে, সে তত বেশী পরিমাণে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই; এরূপ যক্ষ্মারোগ নিবার্য্য;—গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান পালনকালে মহিলাদিগকে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিলে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইতে পারে।

আসল কথা এই—গর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃ-রক্ত হইতে ক্যালসিয়ম সল্ট নামক খনিজ লবণ গ্রহণ করে। জননীর রক্তে এই পদার্থের অভাব ঘটিলে নবপ্রসূতিরা প্রায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্তা হইয়া থাকে। যাঁহারা সৌখীন খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত, সৌখিন খাদ্য না হইলে যাঁহাদের খাওয়াই হয় না, "মোটা ভাত" যাঁহাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, তাঁহারাই প্রায় এইরূপে স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কারণ, সৌখিন খাদ্যে এই স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির একান্ত অভাব। তাহার উপর যাঁহাদের স্তনে দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া সন্তান পোষণার্থ সেই দুগ্ধ ব্যয় করিতে হয়, তাঁহাদের রক্তে স্বভাবতঃই ক্যালসিয়ম সল্টের অসদ্ভাব ঘটে। তাহার ফলে যক্ষ্মা বীজাণুর আবাসস্থলগুলির চূর্ণ সহযোগে কাঠিন্য প্রাপ্তি

(Calcification) ঘটে না ; এদিকে যক্ষ্মা বীজাণুর দমনের পক্ষে Calcificationই প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা সোজা উপায়। কাজেই, স্বভাবকে তাহার কার্য্য সাধনে বাধা দিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা হয়। এইরূপেই সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির দেহ যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় ; এবং তাহার সন্তানসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, যক্ষ্মা বীজাণুরও তদনুপাতে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাদের প্রায়ই তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর মৃত্যু হইয়া থাকে।

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির দেহের যে রস-রক্ত ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহা পূরণ কার্য্য যতদিন ধরিয়া চলিতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে প্রসূতির খাদ্যে ঐরূপ লবণ এবং স্বভাবজাত ভাইটামাইন নামক পদার্থের অসদ্ভাব বা অপ্রাচুর্য্য ঘটিলে, তাহার ক্ষতিপূরণ কার্য্যেই কেবল যে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে ; বরং রোগিণীর স্বাস্থ্যের অধিকতর ক্ষতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রসূতি যতটা সৌখিন খাদ্যের ভক্ত তাঁহার আরোগ্যলাভে তত বিলম্ব ঘটে। খুব বেশী রকম সৌখিন খাদ্যপ্রিয় হইলে তাঁহার উৎকট পীড়া জন্মিবারও সম্ভাবনা। বহু পরীক্ষার পর এই সত্যটি অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ন আমাদের প্রধান খাদ্য। ধনী ও দরিদ্র ভেদে দুই প্রকারের অন্ন আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রদের অন্নের নাম "মোটা ভাত", আর ধনী লোকেরা, এবং অবস্থার অতিরিক্ত হইলেও, ধনীদের অনুকরণে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সরু চালের সাদা ধবধবে ভাত ভিন্ন খাইতে পারেন না। গরীব লোকেরা যে মোটা চাউল খায়, তাহা তত পালিস করা নহে। এই চাউলের দানার উপরে একটী সূক্ষ্ম আবরণ থাকে। এই আবরণটিতেই চাউলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ভাইটামাইন ও লবণাদি থাকে গরীব লোকেরা সুতরাং চাউলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত সরু, সাদা, মাজা চাউলে ঐ সূক্ষ্ম আবরণটি না থাকায়, তাঁহারা অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর অংশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। গরীবদের অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া চাউল কিনিয়া খাইলেও তাঁহারা দেহকে একরূপ উপবাসী রাখেন বলিলেও হয়। অপর লোকের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আটার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। গরীব লোকেরা যদি কখনও

আটার রুটি খায়, তাহা হইলে যত কম দামের আটা বাজারে পাওয়া যায় তাহাই তাহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই আটার রুটী তত পরিষ্কার নহে; অর্থাৎ ইহাতে কিছু ভুসি সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে মিশ্রিত থাকে। এই আটার রুটী প্রায় লাল্‌চে রঙের হয়। কিন্তু ইহাতে যতটা পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, ধনী লোকের ব্যবহার্য্য পয়লা নম্বরের সাদা ধবধবে আটা ততটা পুষ্টিকর নহে। যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, কিম্বা আজ কাল সহরের স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র ঘরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ছোট ছোট ময়দার কল চালাইয়া মাড়োয়ারীরা যে আটা প্রস্তুত করে, তাহা তত সূক্ষ্ম বা সাদা ধবধবে না হইলেও খুব পুষ্টিকর (অবশ্য, যদি তাহাতে ভেজাল মিশ্রিত না থাকে! কারণ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিতে মাড়োয়ারীরা আজকাল অদ্বিতীয়!)। কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য সূক্ষ্ম সৌখিন খাদ্য পুষ্টিকারিতায় এতটাই হীন যে, তাহাকে খাদ্য না বলিয়া অখাদ্য বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। অথচ, ইহাই উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর গার্ভিণীদেরও একমাত্র খাদ্য। সুতরাং তাহারা যে যক্ষ্মা বা অপরাপর রোগে ভুগিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

নারীদেহের যে tissueগুলি উপর ভ্রূণের পুষ্টি, এমন কি জীবন নির্ভর করে, সেই টিস্যু গঠনে এবং তাহাদের পুষ্টিসাধনে খনিজ লবণ অপরিহার্য্য উপাদান। সন্তান পালনের সময়েও জননীর দেহের টিস্যুগুলির শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ভ্রূণের ও শিশুর খাদ্য যোগাইতে এই সকল টিস্যুর নিত্য ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য, খনিজ লবণ ও ভাইটামাইন-বহুল খাদ্যই গর্ভিণী ও নবপ্রসূত সন্তানের জননীর রক্ত ও টিস্যুগুলির দৈন্য অনিবার্য্য। গর্ভিণী ও জননীর খাদ্য নির্ব্বাচন কালে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। Wellman, Little, Funk, Foster, Gourand, Starling প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনুষ্যদেহে এবং অশ্ব, গো, মুরগী, ইন্দুর, পারাবত, কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর দেহে খাদ্যের এই সকল গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সমান ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সকল বিবেচনা করিবার পর প্রশ্ন এই দাঁড়াইতেছে, কোন্ কোন্ খাদ্য গর্ভিণী ও প্রসূতির পক্ষে প্রশস্ত? আমরা একে একে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এরূপ খাদ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান খাদ্য দুগ্ধ। ইহাতে উৎকৃষ্ট খাদ্যের সকল প্রকার উপাদান প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে বর্ত্তমান আছে। তারপর, শাক শব্জি, তরকারী, ফলমূল, বিশেষতঃ কমলা লেবুর

রস। সকাল বেলায় খালি পেটে এক গ্লাস মিষ্ট কমলালেবুর রস গর্ভিণী ও জননীদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

তারপর, গর্ভিণীদের প্রায় নানাপ্রকার খাদ্য খাইতে 'সাধ' যায়। এই 'সাধ' কেবল কৌতূহলের ফল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। প্রকৃতি দেবীই গর্ভিণীদের হৃদয়ে এইরূপ 'সাধে'র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গর্ভিণীদের যে সকল জিনিস খাইতে 'সাধ' যায়, সেগুলি তাঁহাদের দেহ রক্ষার্থ, গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টিসাধনার্থ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং গর্ভিণীর অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়; বরং যথাসম্ভব তাঁহাদের এই সকল 'সাধ' পূরণ করিবার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

'স্বাস্থ্য সমাচার।'

গোড়ার কথা।

আমরা জাগ্রত হইয়াছি; বহির্জগতের কোলাহলে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে,—ঘুমঘোর এখনও কাটে নাই, শরীর ও মনের আলস্য এখনো আমাদিগকে অলস করিয়া রাখিয়াছে! সুযোগ হইলে এখনো আমাদের নিদ্রালস্যে পড়িয়া থাকিবার চেষ্টা!

এমনি হয়! স্বভাবের পরিতৃপ্তি না হইলে, সুনিদ্রার পর স্বাভাবিক জাগরণ না ফিরিয়া আসিলে শরীর মন কার্য্যকারী হইতে চায় না, জাগরণে সুপ্তির প্রভাব কাটে না—মুখে বলি জাগিয়াছি,—মানব-ধর্ম্ম দশকে কর্ম্মে ব্রতী দেখিয়া লজ্জা বশে বলে—কর্ম্ম করিতে হইবে,—মন বলে আর একটু ঘুমাই—মন মুখ এক হইতে পারে না!

প্রাণ কর্ম্মী,—সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেও চায় কর্ম্ম—ধর্ম্মই তাহার তাই; শরীরকে সে নির্জ্জিত করিয়া কর্ম্মজগতে ছুটিতে চায় ফল তার হয় পতন,—তন্দ্রালস্যে যে প্রতি পদে হুঁচোট খাইয়া মরে! ছুটাছুটীর ফল ফলে বিপরীত।

আমাদের এ অস্বাভাবিক জাগরণ আসিয়াছে, জড়তা আজও কাটে নাই! কাটিতে পারে না—উষার বিমল আলোক গৃহে গৃহে দেখা দিয়াছে—তাঁহার প্রভাবে আলস্য বিজড়িত মনে প্রাণ-ধর্ম্মের একটা সাড়ার অনুভূতি আসিয়াছে সত্য—কিন্তু রজনীতে যাহার সুনিদ্রা হয় নাই তাহার জড়তা কাটিতে—শক্তি ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব যে স্বাভাবিক!

তাহাকে দোষ দিয়া ফল কি? বাহিরের কোলাহলে সে যোগদান করিবে কি করিয়া! দীর্ঘ শীতের রাত্রি—উপযুক্ত শয্যাহীন, অর্দ্ধ উলঙ্গ, অনাহারক্লিষ্ট যে—তাহার সুনিদ্রা কোথা হইতে আশা করা যায়? কোটী প্রাণীর এই অবস্থা,—দু'চারিজন ঐশ্বর্য্যশালী ভাগ্যবান

রজনী শেষে স্বাভাবিক জাগরণে জাগ্রত হইয়া আপনার দৃষ্টান্তে,—কেন ভাবিয়া লইতেছ—সকলেরি অবস্থা তোমাদেরই মত ! বাহিরের কাজে জগতের সঙ্গে ধাবিত হইতে দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছ ভাল—শুভ ইচ্ছা ! কিন্তু তাহাদের শক্তির কথা চিন্তায় আন নাই ।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে—চৈতন্য সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা কর,—তাহাদের শরীর মন যাহাতে জগতের আহ্বান শুনিবার মত উপযুক্ততা লাভ করিতে পারে তাহার পন্থা নির্ণয় কর,—দেহে মনে শক্তি সঞ্চারিত হক্—তবে না স্বাভাবিক জাগরণের আনন্দ ! নতুবা আনন্দময়ের রাজ্যে আনন্দহীন জড়ালস-বিজৃম্ভিত জাগরণে ফল কি !

প্রাণ জাগ্রত হইলে স্বাভাবিকই হউক অস্বাভাবিক উপায়েই হউক সে যে নীরব থাকিতে পারে না ! যেখানে স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই, পুষ্টির অভাবে শরীর মনে শক্তি নাই, উৎসাহ নাই—জ্ঞানের অভাবে হিতাহিত বোধ নাই,—সেখানে এ ভারী দেহটাকে টানিয়া ফিরিলে লাভ কি ?

যে দেশে বার আনার অধিক লোক অজ্ঞ, আত্মজ্ঞান হীন, আধিব্যাধিতে ক্লিষ্ট, মরণোন্মুখ, অসহায় যে দেশের নারীর জীবন মাতৃশক্তি পশুশক্তির দ্বারা নিষ্পেষিত ব্যবস্থা ; পশুর অধম ব্যবহার যাহাদের গৃহে,—চিরকৃষ্ণ ঘোর অন্ধকারে চির রজনী যেখানে, ঊষার আলোক, পাখীর কল্লোল, পুষ্পের সুবাস, বাহিরের আহ্বান সেখানে কি করিবে ! দ্বার উন্মুক্ত কর, আলোক প্রবেশের সুব্যবস্থা হউক, শিশুর ক্রন্দন, অকাল মৃত্যু,—দরিদ্রের মৃত্যু নিবারিত হউক, পীড়ন হইতে দেশকে পরিত্রাণ কর ! তারপর না আহ্বান !

আর্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, বি-বস্ত্র, অশিক্ষিতকে হুজুকে নাচাইয়া আর বিড়ম্বিত করিও না। যথেষ্ট হইয়াছে !

ঘুমাক তবুও সে ; তন্দ্রায় নিজকে যে ভুলিয়া আছে, এ নরক যন্ত্রণা সে ভুলিয়াই থাকুক আর জাগাইও না, যদি আভ্যন্তরিক উন্নতির উপায় না করিতে পার তবে বড় গলায়, বড় কথায় তাহাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভি বাজাইয়া চির অশান্তির দেশে আর নারকীয় চীৎকারের আয়োজন করিও না !

জাগিয়া থাক যদি—জাগ, যেমন করিয়া জাগাইতে হয় জাগাও, স্বাস্থ্যহীন তন্দ্রা লোপ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে নিরাময় কর।

নতুবা মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। তন্দ্রাঘোরে অসার যে—মৃত্যুকে সে বরণ করুক ?

বৃদ্ধ।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
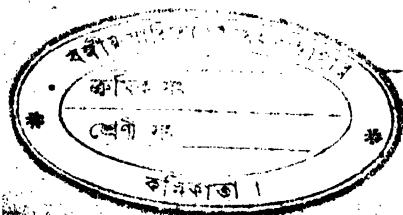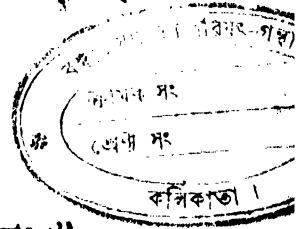
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৪র্থ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩২৭ সাল। { ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চল্‌তে হবে।

—:*:—

এলিয়ে কেন পড়্‌লি কবি ?

চল্‌তে হবে—চল্‌তে হবে !

কেউ না শোনে প্রাণের বাণী,

ডাক ছেড়ে তাই বল্‌তে হবে।

পরাজয়ের দুঃখজ্বালা

করতে হবে কণ্ঠমালা,

ফুল ছড়ায়ে পথের মাঝে

পথের কাঁটা দলতে হবে।

বক্ষে চাপা পাষাণ টুটে
পাগলা ঝোরা! বইবি ছুটে ;
উধাও হয়ে উল্কাসম
আকাশ জুড়ে জ্বল্‌তে হবে।

ডাক দিয়েছে প্রভাত-রবি,—
কোথায় কবি—কোথায় কবি !—
থাকনা বুকে অগ্নিদহন,
হাসির লীলায় ছল্‌তে হবে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

'দিদি' প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীকে লিখিত—

বারীন্দ্রকুমারের পত্র।

সবিনয় নিবেদন,—

আপনার পত্র পাইলাম, প্রীতি-উপহার বইগুলিও আসিয়াছে। অবসরের ফাঁকে ফাঁকে পড়িব। আপনার দাদা বিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়ের আমি ও উপেন্দ্রনাথ দুই জন গুণগ্রাহী ভক্ত। তাঁর লেখায় অসাধরণ শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও তারকনাথ ছাড়া এমন চরিত্রশিল্পী আমি আর দেখি নাই। আলাপ করিতে ইচ্ছা করে, হইতে পারে কি ? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায় বলিবেন। আমি গিয়া দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসিব। তাঁর 'স্বেচ্ছাচারী' পড়িতেছি, সমালোচনা লিখিব।

আপনি সামান্যা দীনা হইতে পারেন, কিন্তু এমনই দীনা হিন্দুর অন্তঃপুরলক্ষ্মীরই তো এই কাজ! মায়ের শ্রীহস্ত বিনা এ দেবীপীঠ তো রচিয়া উঠিবে না। সংসারজালে আপনি জড়িত, সে তো আনন্দময়ের সহিত নিবিড় পরিচয়, যাহার তাহা ঘটে নাই তাহার তো জগতকে দিবার বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমতী * * ও * * বেশ,—সব বিষয়েই ভাল। কিন্তু ঠিক অন্তঃপুরলক্ষ্মী হিন্দুরমণীর স্নিগ্ধ ছবি তো নহেন। অবশ্য বাঙ্গালীর মেয়ের কমনীয়া দেবীছবি কোথায় যাইবে, সে তো এ দেশের অতি অধমারও সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া জ্বল্‌জ্বল্ করে। কিন্তু আমাদের এই মাতৃবোধন-যজ্ঞ অন্তঃপুরে আপনার মত দীনা স্নেহপ্রতিমার হাতেই সফল হউক, এই চাই। আপনি ও আপনার চিত্রশিল্পী দাদা পরামর্শ করিয়া একটা পথ স্থির করিবেন, এবং আপনাদের সমস্ত শক্তিটুকু মেয়েদের আদর্শ গড়িতে নিয়োগ করিবেন—এই প্রার্থনা। আমার "মায়ের কথা"র পর আষাঢ়ে "মায়ের শৃঙ্খল" লিখিয়াছ। আমি মেয়েদের বড় ভক্তি করি, তাহাদের দেখিলেই আমার ভগবত পূজার কাজ আপনি হইয়া যায়। আমার বলিবার কথা এই যে মেয়ে পতিতপাবনী গঙ্গা, সহস্রবার কলুষবাহিনী হইয়াও সে তাহাই, পতিত তরাইবার শক্তি তাহার যাইবার নহে। কন্যাদায় বলিয়া কিছু নাই, ওটা জুজুর ভয় মাত্র। মেয়ে লক্ষ্মীর প্রতিমা, ভগবান তাহাকে এই লীলা সৃষ্টি ও রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই শক্তি সে। সে যতদিন ঘরে থাকে তাহাতে মা-বাপের ঘর পবিত্র থাকিবে, কন্যাদায়ের ভয়ে তাহাকে চির-জন্মের মত অপাত্রস্থ করিয়া কন্যাঘাতী হইতে নাই। কন্যা অনূঢ়া রাখিলেই জাতি যায় না, তাহার কুসুমকোমল জীবনটুকু দুঃখের পাপের কুণ্ডে ফেলিলেই মানুষের জাতি তো তুচ্ছ কথা,—ধর্ম্ম ও ইহপরকাল সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়।

ভগবানের রাজ্যে মানুষ পড়ে এবং ওঠে তাঁর বিধানে, এ চক্রের তিনি চক্রী। পাপ ও পুণ্য তাঁর দুইটি লীলা-বাহু, তিনিই কাঁদাইয়া সান্ত্বনা দেন। নারী ও পুরুষ উভয়েরই পক্ষে ইহা সত্য, আমরা সকলেই গলিত শব বুকে করিয়া গণিকাগৃহে পরম বঁধুকে খুঁজিতেছি। পাপকে ঘৃণা করিলে পাপ নরকের সৃষ্টি করে, আমাদের সমাজে তাহাই হইতেছে। নারী নাকি নরকের দ্বার, তাহার ছায়া মাড়াইলে মোক্ষ হয় না, সে একবার পড়িলে আর তাহার ইহ-পর কোন কালই নাই। এইগুলিকে আমাদের পরমার্থ-রসে

ভরিয়া নির্ম্মল গঙ্গোদক-পূত করিয়া বলিতে হইবে। বিভূতি বাবুর মত চরিত্রশিল্পী আমি নই, নহিলে আমিই করিতাম।

আমাদের ব্রতের কতদূর কি হইল আপনাকে মাঝে মাঝে জানাইব। টাকা চাই, পবিত্র নিবেদিত-জীবন মেয়ে চাই, নারীসঙ্ঘ গড়া চাই, সহজ অনায়াসলভ্য পরমার্থ-রসপূত শিক্ষা চাই, সস্তা বই চাই, এত একা পারিব না। আপনারা জাগুন, নিজের কাজ—শ্রীদুর্গা আপনারা—দশহস্তে করিয়া লউন। আমি দেখিয়া ধন্য হই, তাহার পর মরি—বড় সুখে মরিব। ইতি—

আপনার সহায়তার কাঙ্গাল :—

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

অদর্শনে।

—:•:—

নিত্য এতই চাঁদপানা মুখ যায় কোথা ?
কাল্‌কে ছিল অস্ফুট যা, আজকে দেখি নাইক তা।
বুঝতে নারি যায় তারা কোন দূর দেশে ?
অশ্রু ঝরে কিসের তরে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে।
কোথায় ন'বত বাদ্যঘটা, থাম্‌লো কি ?
বরের নীরব পাল্‌কী এসে খিড়কী দ্বারে নাম্‌লো কি !
উৎসব হায় কোথায় এসব জল্পনা !
বসুধারা নয়কো ওরা, অশ্রুধারার আল্‌পনা !
সঙ্গী তাদের আর দেখা হায় সন্দ' রে
ধরার গৃহের কন্যারা আজ বউরাণী কোন্ অন্দরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রিয়তমা ।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

যোড়শ পরিচ্ছেদ ।

না, সত্য-সত্যই সে এখানে নিঃসঙ্গী নিরাশ্রয় ? যে পথ দিয়া যতখানি আঘাত আসুক না কেন স্বামীর তাহাতে কোন আপত্তি নাই, একটী অঙ্গুলী তুলিয়াও তিনি তাহার সাহায্য করিবেন না। বরং অতি দুঃখের—অতি অপমানের সময় তাঁহার এ হাসি—আঃ আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে যে, হতভাগিনী লিয়েন এখনও কেন শোনওয়ার্থের পাষাণবক্ষে পড়িয়া আছে ? কেন, কিসের জন্য ? কে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে ? কাহারও কোন উপকারেই ত সে লাগিবে না—কেহ চাহেও না তাহা, তবে আর প্রয়োজন কি এখানে ?

কথাগুলা ভাবিবার সঙ্গেই জুলিয়েনের চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পাদরীর সঙ্গে তর্কের কথা মনে পড়িয়া তাহার লজ্জা আসিতেছিল, কেন তাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল ? ধর্ম্মের নামে কালি ঢালিলে কি সে বর্ণে তাহার মালিন্য ঘটে ? আর যদি তাহাই হয়, ক্ষুদ্র নারীর দুর্ব্বল চেষ্টায় তাহার কতটুকু প্রতীকার সম্ভব ? না না না, সে ভুলই করিয়াছে, ইঁহাদের প্রত্যেককে চিনিয়া-জানিয়াও এত বড় ক্ষিপ্ত বুদ্ধি তাহার মধ্যে জাগিল কোথা হইতে ? কাহারও দোষ নাই, এ অপমান সে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে ? আর ত উপায় নাই, যাহা বলিয়াছে তাহা তো আর মুছিয়া যাইবে না।

সে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, এ তীব্র বেদনাকে ঢাকিবার জন্য প্রকৃতির স্বহস্তসৃজিত কোন সুন্দর চিত্র যদি তাহার দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের উপরেও আবরণ ফেলিতে পারে !

দূরে গেব্রিয়েল্ ও ক্রোলন, রমণীর মুখের দিকে ব্যথাতুর দৃষ্টি তুলিয়া বালক চুপি চুপি তাহাকে কি বলিতেছে। দৃশ্যটিতে লিয়েনের চিত্ত আরও কাঁপিতে লাগিল, তাহার বিতৃষ্ণার

ফলে এই বালকের অনিষ্টাশঙ্কা আরও বাড়িয়াছে, হপ্ মার্শেলের শেষ কথা কয়টিতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই ভাবনাটি মনে আসিতে সে আরও কাতর হইয়া পড়িল. নিরুপায় বেদনার উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল গোপন করিবার জন্য সে ছুটিয়া উদ্যানের নিম্মল অংশের দিকে চলিল।

ঝিলের পাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছে স্থানটি যেন অন্ধকার, তলায় পাথরের গায়ে শ্যাওলা জমিয়া আছে, স্থানটি দেখিয়া লিয়েনের রুডিস্‌ডর্কের প্রাচীন উদ্যানকে মনে পড়িয়া গেল। একটা পুরাণো গাছের গ্রন্থিবহুল দেহে ভর দিয়া সে অনন্যমনে যেন কোন অসীম পুরাতন—জটিল সমস্যার চরণেই আপনাকে ছাড়িয়া দিল; তাহার চোখ দিয়া তখনও যে অশ্রুধারা নামিতেছে, সে কথাও বুঝি তাহার অনুভবে ছিল না।

সহসা সে চমকিয়া শুনিল, স্বামী তাহাকে বলিলেন, "লিয়েন্ এখানে যে!"

সে অপ্রস্তুতভাবে মুখ ফিরাইতেই হাসির স্বরে আবার তিনি বলিলেন, "এ কি, কাঁদিয়াছ না কি? তোমার চোখেও জল—লিয়েন্, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না?" বলিয়া তিনি জুলিয়েনের হাত ধরিয়া অপর হস্তে রুমাল বাহির করিলেন। কিন্তু লিয়েন তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর!"

"কি অপরাধ করিয়াছ তাহা তো জানি না, তুমি—"

"হাঁ রাওয়েল্ আমি অন্যায় করিয়াছি, যাহা আমার করা উচিত নয় তাহাই করিয়াছি? আমার মাথা বুঝি ঠিক নাই,—আমার অনুতাপ হইতেছে?"

রাওয়েল্ বলিলেন "অনুতাপ? কিসের জন্য বল দেখি?"

"কোর্ট চ্যাপলিনের সহিত তর্ক করিলাম কেন আমি? কোন প্রয়োজন ছিল না, অন্যায় সে উত্তেজনা আমার?"

রাওয়েল্ আবার হাসিয়া বলিলেন, "বটে? তোমার কথা শুনিলে চ্যাপ্লিন খুসি হইবেন এখন, তাঁহাকে ডাকিব কি?"

বিরক্তভাবে লিয়েন বলিল, তাঁহার বিরক্তি বা আনন্দে আমার কিছু ক্ষতি হইবে না, আমি ভাবিতেছি গেব্রিয়েলের কথা, আমার এই দুর্ব্বুদ্ধিতে তাহার অনিষ্ট হইবে বোধ হয়।

"না সে ভয় তোমার মিথ্যা, তাহার ইষ্টানিষ্টে আর কাহারও হাত নাই লিয়েন, তার জন্য আর মন খারাপ করিবে না তুমি।"

জুলিয়েন আর কিছু না বলিয়া কি ভাবিতে লাগিল? রাওয়েল বলিলেন "এইবার চল জুলিয়েন, ডচেস্ কোথায় গেলেন দেখি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিয়েন বলিল, "চল যাই, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কথা শুনিবে?"

"বল" লিয়েন মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা উদ্বিগ্ন চাঞ্চল্য তাঁহার তরল হাস্যপূর্ণ মুখশ্রীতে ব্যস্ততার ছায়া ফেলিয়াছিল। লিয়েন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। যাহা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে তাহা বলিয়া ফেলাই ভাল—ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, "একটা কথা,—একটা কথা আমার! আমি যখন ক্লোডিসর্ডকে যাইব, রাওয়েল্ তখন লিয়েনকে আমার সঙ্গে যাইতে দিবে কি?

রাওয়েল এবার মুক্ত হাসিয়া বলিলেন, "কি বলিতেছ তুমি? পাগল হইবে না কি?"

"আমায় একটু দয়া কর, বেশি দিন না—কিছুদিনের জন্য, অল্পদিনের জন্য"—বলিতে বলিতে লিয়েন স্বামীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু ব্যারণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া পিছাইয়া মুখ ফিরাইলেন, পার্শ্বে ডচেস দণ্ডায়মানা। তাঁহার গোলাপী পোষাকের আভাষেই লিয়েন চমকিয়া দূরে সরিয়াছিল,—এবার একেবারে নিকটে দেখিয়া সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। আগ্রহে হাত বাড়াইয়াও সে যে স্বামীর হাত পায় নাই স্ত্রীলোক হইয়াও স্ত্রীলোকের নিকট এ লজ্জা কে সহিতে পারে? বিশেষ ডচেসের মন তো তাহার অজানা নয়!

ডচেস্‌ও ব্যাপারটি বুঝিয়া লইয়াছেন, হর্ষে তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্ত, লিয়েনকে নীরব দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রিয় ব্যারণেস্, আমি তোমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তুমি এমন একলা থাকিতে ভালবাস কেন বল দেখি?"

জুলিয়েনের মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না দেখিয়া রাওয়েল কথার সুর ফিরাইয়া বলিলেন "আঃ লিয়োর কুকুরটাও তোমায় বড় ভালবাসে জুলিয়েন, সেই অবধি তোমার পোষাকের তলায় তলায় ঘুরিতেছে? না উহাকে অত আদর দিও না, তুমি যদি রুডিসডর্কে ফিরিয়া যাও, লিয়ো তখন কিছুতেই উহাকে ছাড়িয়া দিবে না।"

এই কথাটিতে লিয়েন স্পষ্ট বুঝিল কুকুরের উপলক্ষে ব্যারণ তাহার পূর্ব্ব কথার উত্তর দিলেন। লিয়োকে তিনি তাহার সঙ্গে দিবেন না। কেন দিবেন? সে কি কেহ কখনও দিয়া থাকে? শুধু তাহাকে যাইতে হইবে, সব ছাড়িয়া একা তাহাকে যাইতে হইবে। সব ছাড়িয়া,—হাঁ সমস্ত বন্ধন একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এখান হইতে যাইতে হইবে তাহাকে। এতদিন ধরিয়া শোনওয়ার্থের সুখদুঃখের ভিতর দিয়া যেটুকু সঞ্চয় ছিল তাহার, একটি একটি করিয়া গুণিয়া হিসাব মিলাইয়া সব ফেরৎ দিতে হইবে; ইহার জন্য তাহার নিজের যেটুকু খরচ হইয়াছে—সেটুকুও ঐ হিসাবে খরচ হইয়া গিয়াছে, তার জন্য কেউ কিছু প্রতিদান দিতে আসিবে না। তাহার জীবনের খাতায়—জমার অঙ্কে এই প্রকাণ্ড শূন্যটি মাত্র তাহার সম্বল!

ডচেস্ বুঝিলেন ইহাদের মধ্যে বিবাহভঙ্গেরই আলোচনা হইতেছিল। আর এ তো অসম্ভব কথাও নয়, চঞ্চল প্রকৃতি ব্যারণ ঝোঁকের মাথায় একটা দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া কি চিরদিন সেই বোঝা বহিয়া বেড়াইতে পারেন? এই দরিদ্র গৃহের গর্ব্বিতা নারী ঐ লালচুল ট্রেচেনবার্গ, সে কি ব্যারণ মাইনোর যোগ্যা? আর এ গোঁড়া প্রোটেষ্টাণ্ট রমণী ব্যারণ-তনয়ের ধাত্রীরও অযোগ্যা, ইহাকে বিদায় দেওয়াই সর্ব্বাংশে নিরাপদ। আনন্দে তাহার মন যেন উছলিয়া উঠিতে লাগিল, বলিলেন, "ব্যারনেস্ কি শীঘ্রই চলিয়া যাইবে তবে? তাহাকে লইয়া একদিন আমার বাড়ী চল না ব্যারণ?"

রাওয়েল কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা ফ্রোলনের চীৎকারে সকলেই চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। সে যথাসম্ভব ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকে আসিতেছে ও বলিতেছে, "সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন—আপনারা শীঘ্র আসুন?"

তাহার পশ্চাতে পাদরী হিউগোও আসিলেন ও ত্বরিতভাবে জানাইলেন যে, লিয়ো ও প্রিন্সদ্বয় বিপদাপন্ন, শীঘ্র তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, ব্যারণ শীঘ্র চলুন।"

সকলেই দ্রুতগতিতে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে চ্যাপলীন ও ফ্রোলন্ যাহা বলিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—বাগানের পূর্ব্বাংশে যে একজন ডাকিনী বাস করে, বালকেরা পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিত। এখন ইণ্ডিয়ান হাউসের দিকে খেলা করিতে

গিয়া তাহারা বুদ্ধি বাহির করিয়াছে যে ঐ ডাইনীকে তাহার ঘরশুদ্ধ উড়াইয়া দিতে হইবে। উদ্যানতত্ত্বাবধায়ক ডামার্ডের ঘর হইতে তাহারা বারুদ লইয়া যাইতেছিল, ডামার্ড ধরিতে যাওয়ায় পলাইয়া গিয়াছে।—খবর এই পর্য্যন্ত।

ডচেসই শুনিয়া অস্ফুট চীৎকারে বসিয়া পড়িতেছিলেন, রাওয়েল তাঁহাকে ধরিয়া অনতিদূরের লৌহাসনে বসাইলেন, ও কোর্ট চ্যাপলিনের উপর তাঁহার শুশ্রূষার ভার দিয়া উদ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন। পুত্রের বিপদাশঙ্কায় তাঁহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে।

লিয়েন ও ফ্রোলন্ তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছিল। ডচেসও আত্মসম্বরণ করিয়া চ্যাপলিনের বাহু অবলম্বনে ইণ্ডিয়ান হাউসের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বালকেরা ইতিমধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া আগুন জ্বালাইয়া লইয়া যাইতেছে, ব্যারণ সেই সময়ই গিয়া প্রিন্সের হাত হইতে দীর্ঘ সলিতাটি কাড়িয়া লইলেন। চারিদিকে বারুদের ছড়াছড়ি, শিশুরা তাঁহাকে দেখিয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দুইজনের দুই বাহু ধরিয়া ফ্রোলনকে বলিলেন, "ধর,—উহাকে পলাইতে দিও না?"

ডচেসও আসিয়া পড়িলেন, বালক দুটিকে নিরাপদ দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাদের শাসনে মন দিলেন। যথারীতি প্রহারের পর আদেশ হইল—প্রিন্সদের রাত্রির আহার ও সকালের ভ্রমণ বন্ধ থাকিবে!

রাওয়েলও লিয়োর কান ধরিয়া পিঠে দুই তিন কীল বসাইয়াছিলেন। অবশেষে যখন নির্দ্দয়ভাবে তাহার দুই হাত ধরিয়া পিঠের দিকে মোচড় দিতে লাগিলেন তখন লিয়েন আর থাকিতে পারিল না, "আর না—আর না—ছাড়িয়া দাও এবার!" বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। বালক এতক্ষণ কাঁদে নাই, এইবার মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া তাহার কাঁধে মাথা লুকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

লিয়েন তাহাকে আদর করিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিতেছিল, লিয়ো তাহার গলা জড়াইয়া আদর করিয়া বলিল, "আমি বড় দুষ্টু ছেলে মা! তুমিও আমায় মারিবে?"

তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া লিয়েন বলিল, "না মারিব না, কিন্তু এই খেলায় কি বিপদ হইত বুঝিয়াছ ত? তোমার হাত পা পুড়িয়া যাইত যদি? আর এমন কাজ করিবে না বল?"

"না আর করিব না, কখনো করিব না—তুমি আমায় বকিয়ো না ?" বলিতে বলিতে শিশু লিয়েনের মুখে চুম্বন দিতে লাগিল। ডচেস দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিলেন, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল একদিন তিনি আদর করিয়া কোলে লওয়ায় এই বালক বিরক্তিভরে হাত ছাড়াইয়া দূরে পলায়, তাহার পর আজ এই দৃশ্যটি তাঁহাকে ভাল লাগিল না। তিনি লিয়েনের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন, "একি,—ব্যারণেস! পিতা তাহার পুত্রকে শাসন করিতে চান,—সে সময় তুমি তাহাকে প্রশ্রয় দিতেছ কেন ? ইহাতে তাহার ক্ষতি হইতেছে যে!"

লিয়েন এ কথার উত্তর দিল না।—এই সময় হপ্‌মার্শেলেও আসিয়া পৌছিলে উদ্যান-রক্ষক ডামার্ড তাঁহার চেয়ার ঠেলিয়া লইয়া আসিতেছে, দৌহিত্রের বিপদ্‌সম্ভাবনায় তিনি একান্ত ভীত হইয়াছেন। এখানে আসিয়া লিয়োকে সুস্থ দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা বারুদ কোথায় পাইল ?" উত্তরে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিল, "ডামার্ড আমাদের দিয়াছিল।"

"দূর, ডামার্ড কখন্ দিল ? মিথ্যাকথা!—সে তো আমাকে কত বকিল, আমি বলিলাম আমায় ধরিলে আমি দাদা মহাশয়কে বলিয়া দিব, তিনি সে দিনের মত তোমার মুখে চাবুক ভাঙ্গিবেন; তবু সে বকিতে লাগিল—বলিল, 'সব কটাই সমান পাজি—'"

লিয়োর শেষ কথাগুলি শুনিয়া মার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "কি-কি, ডামার্ড কি বলিল ?"

লিয়ো উত্তর দিল, "হাঁ দাদা মহাশয়, সে বলিল সব কটাই সমান পাজি, সে আরও কত কি বলিয়াছে আমায়।" বালকের শেষ কথা কেহ শুনিতে পাইল না—হপ্‌মার্শেলের সিংহগর্জ্জনে তখন উদ্যান কাঁপিয়া উঠিয়াছে। "কী এত বড় স্পর্দ্ধা! ডামার্ড, বদ্‌মায়েস,—তুই কাহাকে পাজি বলিয়াছিস্ ?—"

ডামার্ড চেয়ার ছাড়িয়া সরিয়া গিয়া বলিল, "খবরদার,—গালি দিবেন না আমায়,—মনে রাখিবেন—আমি ভদ্রসন্তান!"

হপ্‌মার্শেল পায়ের বেদনা ভুলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভদ্রসন্তান! নীচ বংশের নীচ,—ছোট লোকের ছেলে ছোট লোক ? তুই আবার ভদ্র-সন্তান হইলে কবে হইতে রে ? আমার মুখের উপর জবাব দিবার ক্ষমতা হইল তোর এত-খানি সাহস ? চোর—হারামজাদা—পাজি বজ্জাৎ, তুই —"

তেমনি গর্জ্জনের সহিত ডামার্ড বলিল, "ঢের হইয়াছে আর না!—থামুন আপনি, আপনার গালি আমি আর শুনতে চাই না। বুড়া বাপের খাতিরে সে দিনকার চাবুক আমি সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আর না, এ মিছামিছি কটুকথা—এত ইতর গালি আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না—তাহাতে না খাইয়া মরি তাও ভাল। আজ হইতে আমি আর আপনার চাকর নই—যান্!" বলিয়া সে মার্শেলের চেয়ারে এক ধাক্কা দিয়া বাগানের দিকে ছুটিল।

"তবে রে রাস্কেল্, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা!" বলিয়া ব্যারণ একটা ভাঙ্গা ডাল লইয়া তাহার পশ্চাত ছুটিলেন। মুহূর্ত্তে ডামার্ড ধরা পড়িল ও শুখনা ডালের আঘাতে তাহার গাল ফাটিয়া রক্তপাত হইল।—তাহার পর তাহাকে টানিয়া আনিয়া সম্মুখে ফেলিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "কেমন, আর বলিবি? মানবকে গালি দিবার ফল কি তা এখন বুঝিয়াছিস্ ত?" বলিয়া আবার সেই ডাল আছড়াইয়া তাঁহার মুখে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেই লিয়েন্ আসিয়া হাত বাড়াইল।—"ক্ষমা কর রাওয়েল, যথেষ্ট হইয়াছে।"

এই অবসরটুকু পাইয়াই ডামার্ড পলায়ন করিল। কিন্তু রাওয়েলের উদ্যত যষ্টির সমস্ত আঘাতটি পড়িল লিয়েনের হস্ততলে সে "উঃ,—" বলিয়া হাত টানিয়া লইল। তাহার সুকুমার করতল ফাটিয়া চামড়া উঠিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া ব্যারণের মুখ সাদা হইয়া গেল। ডামার্ড দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি লিয়েনের দিকেই হাত বাড়াইলেন।

"আবার,—ব্যারণ মাইনো! ধিক্ থাক্ আপনাকে!" পাদরীর ভর্ৎসনায় চমকিত হইয়া ব্যারণ বলিলেন "কি?"

"আপনি কি উঁহাকে হত্যা করিতে চান্? হাতখানির দিকে একবার দেখুন দেখি!"

"ওঃ,—" বলিয়া হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন "ভুল বুঝিয়াছ স্যার প্রিষ্ট! কিন্তু আমি বিস্মিত হইতেছি যে এক জন বিধর্ম্মীর হাতের জন্য আপনি ব্যস্ত হইয়াছেন?"

"এখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন কথা নাই, স্ত্রীলোককে আঘাত করাই অন্যায়।"

লিয়েন এবার তাহার হাতখানি ঢাকিয়া মৃদু স্বরে "না আমার বেশী লাগে নাই।"

শুষ্ক হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "শুনিলেন ত? আমি জানি, ঐ আহত আঙ্গুল একটু পরেই তাহার কলম বা তুলি ধরিবে, কিন্তু আমি ধর্ম্মাত্মা,—আমি বোধ হয় এ জীবনে ভুলিব না যে ভুলে হোক্ যাই হোক্,—এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলার দেহ হইতে আঘাত দিয়া রক্তপাত করিয়াছি!—এজন্য আমি অনুতাপ করিতেছি জানিবেন।"

রাওয়েলের এই সাধারণ কথাটিও ডচেসের সহ্য হইল না. তিনি উগ্র পরিহাসের স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ব্যারণেসের কিন্তু সবটাতেই অন্যায়—অনধিকার চর্চ্চা দেখিতেছি! চাকরে দোষ করিলে প্রভু তাহার শাসন করিবেন, স্ত্রীলোকের সেখানে বাধা দিতে যাওয়াই অনুচিত। সত্য, আজ আমি এখানে আসিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি, সব দিকেই যেন এক-একটা হাঙ্গাম বাধিয়া যাইতেছে। আর কাজ নাই,—এবার আমি বাড়ী যাইতে চাই। স্যার গ্রিষ্ট, আপনি আমায় গাড়ীতে দিয়া আসিবেন কি?"

"নিশ্চয় যাইব, চলুন।" পাদ্রীর সহিত ডচেস চলিয়া যাইতেই,—"কেন আমিই আপনাকে পৌঁছাইয়া আসিতেছি।" বলিয়া রাওয়েলও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ব্যস্ততার আর লিয়েনের কথা জিজ্ঞাসা করাও হইল না।—

হপ্‌মার্শেলের গাড়ীও প্রস্থানোদ্যত, লিয়েন মুখ নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রতি চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কেমন, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাইলে ত? কাণ্ডটা দ্যাখদেখি! দুটি যোদ্ধার মাঝখানে সহসা রমণীর আবির্ভাব, এতো থিয়েটারেই দেখা যায়! তুমি ও-অপরূপ পার্টটি লইতে গেলে কেন? ঐ দুর্দ্দান্ত ভৃত্যটা অতখানি দোষ করিয়া সাজা পাইতেছিল, নিজের ক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাওয়ার এই উপযুক্ত প্রতিফল, বুঝিলে? যাও ঘরে গিয়া একটু চিন্তা কর এবার।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হপমার্শেল চলিয়া গেলে লিয়েন একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ রৌদ্র ইণ্ডিয়ান-হাউসের ভগ্নপ্রায় গৃহখানির গায়ে পড়িয়া তাহার মুমূর্ষু নিরানন্দতার উপর ক্ষণিক আদর ঢালিয়া তাহাকে যেন হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতির শেষ স্নেহ প্রকাশ,—মানুষের অন্তর আর তাহার দিকে হাত বাড়াইবে না? লিয়েন

দেখিল কয়েকটি ময়ূর আসিয়া সম্মুখের বারুদরাশির নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা ভিন্ন ঐ ভগ্ন গৃহটির সমীপস্থ আর কেহই নাই,—আর তাহারও বুঝি কেহ নাই, কোথাও কিছুই নাই! ব্যারণেস মাইনো আহতা, কিন্তু একটি ভৃত্য পর্য্যন্ত তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইল না, কেনই বা হইবে? তাহার অবস্থার কথা দাসদাসী কে না জানে? স্বামী যাহার উপর হতশ্রদ্ধ, অন্যের উপর ভরসা সেখানে নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

যন্ত্রণা প্রচুর, হাত জ্বলিয়া যাইতেছে,—কিন্তু লিয়েনের চক্ষে জল ছিল না। খানিকক্ষণ পরে সে গিয়া ইণ্ডিয়ান হাউসের পার্শ্বের কৃত্রিম নির্ঝরের জলে হাতখানি ডুবাইয়া বসিল। ময়ূর কয়টা তখন সেই বারুদগুলা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

খানিকক্ষণ জলে থাকিয়া হাতের বেদনা কিছু কমিল; কিন্তু আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না, ঘরে গিয়াই কি শান্তি আছে? লিয়োর খোঁজ লওয়া প্রয়োজন মনে হইতেছিল, কিন্তু— সে মায়াই বা কেন? কাল,—হয় তো আজই তো তাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে? সব মিথ্যা—সব ভুল, তাহার সমস্ত জীবনটাই বুঝি মিথ্যার ভুলে ভরিয়া গিয়াছে। সত্যের সকল সম্পর্ক শেষ, এখন মিথ্যার উপর ভর দিয়া যে ক'দিন যায় যাক্!

এমন সময় মানুষের আহ্বানে সে চকিতভাবে মুখ ফিরাইল। ফ্রোলন,—সে তাহার পাশে আসিয়া বলিল, "আহা মা, এত আঘাত লাগিয়াছে? একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিই।"

"না বেশী না,—যন্ত্রণা কমিয়া গেল।"

ফ্রোলন্ জুলিয়েনের মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, তাহারবেদনা যে কোথায়, সে কথা সে স্পষ্ট বুঝিল। খানিকক্ষণ—নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এই স্বর্গের কন্যাকে ভগবান কেন যে এখানে পাঠাইলেন তাহা তো জানি না! কেন মা, আপনিই বা কেন ইঁহাদের কথায় কথা দিতে যান? যারা আপনার মর্ম্ম বোঝে না তাদের সঙ্গে বিতণ্ডার প্রয়োজন কি বলুন ত?"

"হাঁ ফ্রোলন্ আমি ভাল কাজ করি নাই।"

"নিশ্চয় না, উঁহাদের কাছে গেব্রিয়েলের নাম করাই বিপদ। আপনিই যখন হতভাগ্যের জন্য বলিতেছিলেন, আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে আপনার পায়ের তলায় গিয়া পড়ি;

কিন্তু তাঁহাদের প্রাণে সে কথা লাগিবে কেন? তাঁদের কাছে এ প্রসঙ্গ যে বিষ, যে বলে সেও বিষ হইয়া যায়। আমি ভাবি শুধু ব্যারণের কথা, তিনি যদি আপনার পক্ষে থাকিতেন তবে বুঝি এ সংসার স্বর্গই হইত।"

লন্ তখন জুলিয়েনের হাতে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে ছিল, সে স্তব্ধ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া আছে—দেখিয়া বলিল, "শুধু আপনার প্রতি নয়, প্রভুর আমার স্বভাবই ঐ; স্বর্গীয়া ব্যারণেস্‌কেও যে ভালবাসিতেন এমন ত বোধ হইত না। তাঁর যত ভালবাসা—" বলিয়াই লন্ যেন অপ্রস্তুত হইয়া কথাটি সামলাইয়া বলিল, "হাঁ তবু তাঁহার অবস্থা আপনার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভাল ছিল। দুঃখ করিবেন না লেডি, আমার মুখে হয় ত এ সব কথা মানায় না,— কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম, সে ব্যারণেস্‌কে প্রভু যথেষ্ট ভয় করিতেন, তিনি মাইনো বংশের কন্যা, বিশেষতঃ মার্শেলের দুলালী, তাঁহার কথার উপর এ বাড়ীতে আর কাহারও কথা চলিত না। রাগ হইলে নিজের পিতার মত তিনি হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া অস্থির হইতেন। হাতের কাছে বাসনকোসন ছুরিকাঁচি যা থাকিত তাই ছুঁড়িয়া দাসীচাকরদের মারিতেন। ব্যারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিলেও এত বেশী সম্ভ্রম করিতেন যে সর্ব্বদাই তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন। দেখিয়াছেন ত প্রভুর আমাদের স্বভাবতঃই মিষ্ট স্বভাব, কাহারও মনে কষ্ট দিতে তিনি পারেন না। কিন্তু স্ত্রীলোক কি শুধু ঐ বাহিরের হাসিতে কথাতে ভোলে না? ব্যারণেসও এক-এক দিন পাগলের মত হইয়া যাইতেন।"

লিয়েনের বুকে যেন বড় একটা ঘা লাগিল। অবহেলার মধ্যেই সে নিজেকে দুঃখী মনে করিয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সোহাগের মধ্যেই নারীজীবনের ব্যর্থতা কিছুতেই সার্থকতা দিতে পারে না ইহা সে বুঝিল। ফ্রোলন বলিতেছিল, তবু, তাঁর মত তেজী মেয়ে হইলে আপনার এত কষ্ট থাকিত না, এই নম্র-মধুর দয়ালু স্বভাব কি এই রাক্ষসপুরীর উপযুক্ত? ঐ একটা হত ভাগিনীর—আঃ, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন, তার নাম করাই আমার ভুল হইয়াছে। বলিতে বলিতে ফ্রোলন শিহরিয়া উঠিল।

লিয়েন বলিল, "কাহার কথা বলিতেছ, রোটাস লিলির কি?"

"হাঁ তাহারই কথা সর্ব্বদা মনে আসে যে। তার মত কষ্ট বোধহয় আর কেহ পায় নাই।"

"কিন্তু ফেলন, সে তো নিজের পাপেরই ফল ভোগ করিতেছে।"

"পাপ ? লেডি, আপনি ত তাহাকে দেখিয়াছেন, সে মুখে কি কোথাও পাপের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় ? ওঃ—ওঃ তাহার কথা আর কি বলিব আপনাকে, সে যে একটা উপন্যাস ! তার জীবনের প্রত্যেক দিনটি পর্য্যন্ত আমার মনে আছে। বন্ধ গাড়ী হইতে প্রভু গিলবার্ট যাইনো যখন তাহাকে নামাইলেন, সে যেন একটি দেবকন্যা ! সরল শিশুর মত নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক মুখ, এখনও কি তাহার এতটুকু ব্যত্যয় হইয়াছে ? আপনাকে কে বলিল এ কথা ?"

"আমি শুনিয়াছি।"

"ঐ বাড়ীতে ত ? যেখানে উঁহার নাম হইয়াছে—ডাইনী ! হায় মা, কি আর বলিব বলুন, গিল্‌বার্ট প্রভু যে উহাকে কি ভালই বাসিতেন,—আর এও যে তাঁহাকে কি চক্ষেই দেখিয়াছিল ! হিন্দু স্ত্রীলোকদের পতিভক্তির গল্প আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন ? আমি রোটাস লিলিতে তা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বামী ভিন্ন সে অপর পুরুষের ছায়াও সহ্য করিতে পারিত না,—স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ যে পৃথিবীতে আছে, এ বুঝি সে জানিত না। আর মানুষকে যে মানুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে, তাঁহার প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত দেববাক্য বলিয়া মানিতে পারে,—সে যে কী অদ্ভুত ভালবাসা ; যে তাহা স্বচক্ষে না দেখিয়াছে সে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।"

হাতের কথা ভুলিয়া জুলিয়েন্ তাহার কথা শুনিতেছিল, স্বামির উপর স্ত্রীর এই অপরিসীম প্রেমের উচ্ছ্বাসময় অনুভব তাহার অন্তরে আছাড় দিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষে জ্বালা দিয়া তপ্ত অশ্রু ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে তাহা সবলে রুদ্ধ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "তারপর কি হইল ?"

"তার পর মা, প্রভুর সেই পীড়া। একদিন হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, চব্বিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান হয়—কিন্তু সে আর পূর্ণজ্ঞান নয় ; চলৎশক্তি একেবারেই ছিল না—কথাও ভাল করিয়া বলিতেন না। ছয় মাস বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু ইহারি মধ্যে লিলির সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।"

"কি হইল তাহার মধ্যে ?"

"যা হইবার নয় তাও হইল। ঐ পাদরী আর হপ্‌মার্শেল, সর্ব্বদাই প্রভুর কাছে থাকিতেন আর লিলির নামে যাহা ইচ্ছা বলিতেন। আমার স্বামী ;—কি আর বলিব লেডি, অর্থের লোভে তিনিও উহাদের বশ হইয়াছিলেন। তিনি গিস্‌বার্ট প্রভুর নিজের ভৃত্য ছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে লিলিকে আনার তিনি প্রধান সহকারী। তাঁহাকে প্রভু যে কি বিশ্বাসই করিতেন?" বলিতে বলিতে ফ্রোলন হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। লিয়েন বিস্মিতা হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল।—

খানিক পরে ফ্রোলনই বলিল,—"সে বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়িলে আমি যে মরিয়া যাই। নির্দ্দোষীর মাথায় এতবড় অপরাধের বোঝা চাপাইলেন আমার স্বামী,—আর মা, সেই রুগ্ন শয্যাশায়ী প্রভুরই কি কম কষ্ট? রোগযন্ত্রণার সঙ্গে দিনরাত সেই মর্ম্মভেদী শেলের মত কথার অপ্রমাণ ও প্রমাণ এই ত ছিল তাঁহাদের আলোচনা! ভাবিয়া ভাবিয়া প্রভুর মাথা খারাপ হইয়াছিল।"

"আঃ—ফ্রোলন্, সত্যই তবে লিলির স্বভাবে কোন দোষ ছিল না?"

"দোষ! লেডি—তবে বলি সব কথা। আর কাহারও নিকট সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমার ভয় হয়—কিন্তু আপনি—আপনি যে এ পৃথিবীর মানুষ নন্ তা আমি বুঝিয়াছি। লিলির ভাগ্যে এত দুর্দ্দশা কেন—তাহা আপনাকে খুলিয়া বলি। আমি যে স্বচক্ষে দেখিয়াছি মা, অন্যের কথা মানিব কেন? হপ্‌ মার্শেলের যে সব-বিদ্যাই সমান, যৌবনে উহার চরিত্র যে কতখানি কদর্য্য ছিল, তাহা ত কেউ জানে না। "ও কি আপনার শীত করিতেছে না কি?"

লিয়েন শিহরিয়া উঠিয়াছে, মুখচক্ষুর ভাব অপ্রকৃতিস্থ। অতি কষ্টে সে ভাব দমন করিয়া সে বলিল, না কিছু না, তুমি বল।"

"হাঁ, মার্শেলের পাপ চক্ষু ঐ নারীরত্নের উপরও পড়িয়াছিল। ভ্রাতার সুস্থাবস্থায় ত তাহার দিকে মুখ ফিরাইবারও উপায় ছিল না, তাঁহার রোগের পর সে দুর্ব্বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিল। সে অনেক কথা, তাহাকে কত প্রলোভন দেখান হইয়াছে—সে কথাই বা কি বলিব! অবশেষে একদিন দেখিলাম মার্শেল লিলির পায়ের তলায় জানু পাতিয়া কি বলিতে বলিতে তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিতেই লিলি তাঁহাকে পদাঘাত করিল।—"

"তার পর—তার পর?"

"তার পরই বোধহয় তার নিজের অবস্থা স্মরণ হইল ! কি বেগেই সে ছুটিয়া পলাইল—উঃ ! ঐ হাল্‌কা শরীর, আমার প্রভু যখন-তখন তাহাকে 'সোনার পাখী' বলিয়া আদর করিতেন। সত্য, সে যেন পাখীর মত উড়িয়া ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। দিনমান আর কপাট খোলে নাই,—অবশেষে সন্ধ্যার সময় গেব্রিয়েলের কান্নায় বাহিরে আসিয়া শিশুকে কোলে লইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।—মা, সে কান্না যে কি বুক-ফাটা দুঃখের,—ভগবান ! যে জীবনে দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না, তাহার ভাগ্যে একেবারে আকাশ-ভাঙ্গা দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দিলে কেন ?"

ফ্রোলানের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। লিয়েন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাঁহার ইচ্ছার মর্ম্ম তিনিই জানেন ফ্রোলন, আমরা শুধু দুঃখের ভাগী,— যাক্ তারপর কি হইল ?"

চোখের জল মুছিয়া লন্ বলিল, "দুঃখ ভোগ ত কত লোকেই করে মা, কিন্তু যেখানে হোক্—যার কাছে হোক্ সে দুঃখে একটু 'আহা' শব্দ কানে গিয়াও তাহার প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু এ অভাগিনীর কষ্ট যে কোথায়, পৃথিবীর একটি প্রাণী ছাড়া এই শক্তিহীন বিধবা দাসী লন্ ব্যতীত আর কেহ সে কাহিনীর বাষ্পও জানে না। দীর্ঘ বারটি বৎসর আমি দেখিতেছি, ও সহ্য করিতেছি, কি করিব ? লেডি আপনি বিরক্ত হইতেছেন কি ?"

স্নিগ্ধভাবে লিয়েন বলিল, "না লন্, তুমি বল।"

"বলি শেষটা শুনিতে আপনার ঔৎসুক্য হইতেছে বোধ হয় ? ঐ কাণ্ডের পর লিলিরও মাথা একটু চঞ্চল হইয়াছিল। প্রভুকে না দেখিয়া সে এক দণ্ডও থাকিতে পারিত না, তাঁহার আর সাক্ষাৎ নাই, অথচ সকলের মুখে তাঁহার ভীষণ রোগের কথা শুনিতেছে ;—থাকিত-থাকিত—এক এক দিন শোনওয়ার্থে পলাইয়া যাইত, রেড্‌রুমের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সময় এক দিন দেখিলাম, লিলি একেবারে অজ্ঞান—চাকরেরা তাহাকে চেয়ারে বহিয়া আনিয়া ইণ্ডিয়ান হাউসে রাখিয়া গেল।"

চমকিয়া জুলিয়েন বলিল, "সে কি ? কি হইয়ছিল তাহার ?"

"কি জানি কি হইয়াছিল, চাকরেরা বলিল রেড্‌রুমের বারাণ্ডায় তাহাকে এমনি অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম তাহার গলা বেড়িয়া একটা কালো দাগ,

ফুলিয়াও ছিল তেমনি ; ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন 'ইহারও পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।' তার পর তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল কিন্তু কথা বলিবার শক্তি ফিরিল না। গেব্রিয়েলকে কাছে লইয়া গেলে প্রফুল্ল হইত। আমাকে দেখিলেও সুস্থ মনে ঘুমাইত, বুঝিতও সব—শুধু কথা বলিবারই ক্ষমতা ছিল না। পরে এক দিন কোর্ট চ্যাপলিন আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কি বলিলেন, লিলি তাহাতে খুব কাঁদিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গেল।"

লিয়েন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল "ডাক্তারে যখন সে রোগকে পক্ষাঘাত বলিয়াছিলেন তখন তুমি তাহা স্বীকার করিতেছ না কেন?"

"এ-যে একটা সাদা কথা মা, ওর তখন যে বয়স আর যেমন শরীর, তাহাতে কি পক্ষাঘাত সম্ভব? আর সে গলার দাগটা কিসের?—ডাক্তারের চক্ষু দু'টি তখন যদি অনেকখানি সোনার বর্ণে ঝলসিয়া না থাকিত তবে সে দাগের মধ্যে দশটি আঙ্গুলের চেহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইত।"

"সে আবার কি! কেউ কি তাহাকে মারিয়াছিল তবে? কে সে—কার—"

"যার বাঁকা বাঁকা আঙ্গুল!—যে হাত দেখিয়া আমি, আপনি—পৃথিবীর সবাই ভয় পায়।"

"ওঃ, ওঃ—ভগবান! ফ্রোলন, সে দাগও কি বাঁকা—"

"হাঁ লেডি, স্পষ্ট বাঁকা; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি সে আঙ্গুলের দাগ মার্শেলের।"

ফ্রোলন নীরব হইয়া গেল, দুঃখের পরিবর্ত্তে এবার তাহার মুখে রোষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। লিয়েনও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল; তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল "এ সকল কথা ব্যারণকে বল নাই কেন ফ্রোলন,?"

"ব্যারণকে? তিনি ত তখন বালক,—"

"না তারপর, পরে তাঁহার নিকট সব খুলিয়া বলা উচিত ছিল।"

একটু চিন্তা করিয়া লন্ বলিল "তাহাতে কোন ফল হইত না নিশ্চয়। সেই তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার কানে এমন সব কথা গিয়াছে যাহাতে আমার কথার কোন মূল্য থাকিত না। তিনিও যে লিলিকে প্রাণপণে ঘৃণা করেন দেখিয়াছি, তাহার নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে

পারেন না। তবু এ যে তাঁহার কাকাকে কতখানি ভালবাসিত, তাহার একটি প্রমাণ তাঁহারও জানা আছে।"

"সে কি আমি তাহা জানি না!"

"আপনার জানার সম্ভাবনা কোথায় লেডি,—তবে মনে আছে কি, প্রথম দিন যখন আপনি এখানে আসেন, সে দিন রাত্রিতে লিলি খুব কষ্ট পায়—দেখিয়াছেন ত? পরদিন ৫পমার্শেনের কাছে তাহার কারণ বলিতেছিলাম,—"

"হাঁ তাহা আমার স্মরণ আছে, তুমি বলিয়াছিলে ডচেসের ঘোড়ার শব্দ শুনিয়া সে অত কষ্ট পাইয়াছিল।"

"ঠিক তাই। ডচেসের গায়ের বাতাসটি পর্য্যন্ত সে চেনে, অত অচৈতন্যের মধ্যে এটিতে তাহার ভুল হয় না। সে হইয়াছিল কি জানেন? লিলির বিছানার পাশেই তখন পথের জানালা ছিল, বাগানের বুনো পথ, মাঝে মাঝে সেইখান দিয়া তখনকার কুমারী ওফেলিয়া—ব্যারণ মাইনোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সেদিনও ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি গেলেন, লিলি তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার অনেকক্ষণ পরে আমিই তাহাকে বারান্দার ধারের বড় জানালাটার কাছে আনিয়া একটা আরাম কেদারায় শোয়াইয়া দিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাগানের সম্মুখ দিকটা প্রায় সমস্তই দেখা যায়। তারপর ব্যারণ,—আমাদের যুবা প্রভুর নিকট ওফেলিয়াকে দেখিয়া—বুঝি ব্যারণের কাঁধে মাথা রাখিয়া তিনি কি বলিতেছিলেন, আর প্রভুও এমন দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, যাহা দেখিয়া লিলি চীৎকার করিয়া তখনি অজ্ঞান হইয়া গেল।"

লিয়েনের মুখখানি নত, সে তখন মনোযোগ দিয়া হাতের ব্যাণ্ডেজের গ্রন্থি পরীক্ষা করিতেছে। ফ্রোলেন থামিতেই মৃদুস্বরে বলিল, "তাহার কারণ?"

"কারণ, হাঁ আপনি তাহাও জানেন না যে। আমাদের ব্যারণের আকৃতি ও মুখ যে প্রায় তাঁহার গিস্বার্ট কাকার মত, বয়সও তখন তাঁহার সেইরূপ হইয়াছে। লিলি মনে করিল তাহার স্বামীই বুঝি অন্য রমণীতে আসক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাই ত ডচেসের উপর উহার অত রাগ,—তাঁর ঘোড়ার পায়ের শব্দটি পর্য্যন্ত সে চিনিয়া রাখিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আভাস পাইলে সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে।"

লিয়েন বলিল, "এ কথা বুঝি তাঁহারাও জানেন?"

"জানেন বৈ কি, লিলি, যেদিন যাহা করে, বস্তুতঃ আমি ডাক্তারকে সব বলিয়া ফেলি।"

"হুঁ," বলিয়া লিয়েন চুপ করিল। ফ্লোলন বলিল, "ব্যারণকে বলিবার কথা বলিতেছিলেন আপনি, কিন্তু তাঁহার স্বভাব কি আপনি বুঝেন নাই? এ হতভাগাদের কথা কি তাঁহার চিন্তা করিবার অবকাশ আছে?"

কথাটায় লিয়েন একটু বিরক্ত হইল, ধীরস্বরে বলিল, "তাঁহার স্বভাব যে নিতান্তই নিষ্ঠুর তাহা ত আমার মনে হয় না।"

বুদ্ধিমতী ফ্লোলন বুঝিয়া লইল, অনাদৃতা হইলেও নারী, স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে পারে না ও শ্রোতৃ তাহার কথায় বিরক্ত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ কথা ফিরাইয়া সে বলিল, "আর উহাদের কথায় প্রয়োজন কি মা? অদৃষ্টই তাহাদের আপন পথে লইয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কি করিবে? বড় যন্ত্রণায় প্রাণ—তাই যায় না, তবু দেখিয়াছেন ত—লিলির বিলম্ব নাই। আর বাংলো,—কালই ত তাঁহার এখানের বাস ফুরাইল।"

"উঃ কি ভীষণ! আমি ভাবিয়া পাই না যে ঐ রুগ্ন বালক কি করিয়া অমন কঠোর নিয়ম পালন করিবে। ব্যারণের কাকা কেন এমন ভয়ানক উইল করিয়াছিলেন? এ ব্যাপারটিতে ত ইঁহাদের অপরাধ দেওয়া যায় না।"

অতি মৃদুস্বরে ফ্লোলন বলিল, "সে উইল কি ব্যারণ নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন—জানেন?"

"আঃ তুমি কি বল ফ্লোলন?" লিয়েন চমকিয়া উঠিতে ব্যস্ত হইয়া জন্ বলিল,—"না না কিছু না, লেডি, আর এ আলোচনায় কাজ নাই। দেখি আপনার হাত।" তাহার পর যথাসম্ভব শীঘ্র ফ্লোলন সে স্থান ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মৃত্যুমণি।

এবার মরণ-মণি দিলে আমার
 মাথার মুকুট করে
বেঁধেছি এই তারের ভূষা
 আঁখিজলের ডোরে !
তোমার এ দান—তোমার এ দান
ভাঙ্গে যদি ভাঙ্গুক্ এ প্রাণ
প্রাণের সাথে মান দেব নাথ
 আমার শিরে ধরে
ব্যথার মণি রাখ্‌ব তবু
 মাথার ভূষণ করে !

একটুখানি চোখের আড়াল
 সইত না যার লাগি
তার [illegible]
 সারা জীবন দা...
মন বুঝেছে এই কথাটি
মাটির ঘরের রতন খাঁটি
অমর করে রাখ্‌লে তোমার
 রত্নাগারে ভরে
মরণ-মণি রাখ্‌ব আমার
 মুকুটমণি করে !

ত্রিপুরার শিল্প।

——:*:——

প্রত্যেক দেশে দেশীয় ধরণের শিল্প বর্ত্তমান ছিল, কালপ্রভাবে শিল্পজগত হইতে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বদেশী শিল্প অদ্য পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, যদিও বিলাতী শিল্প অনেক পরিমাণে স্বদেশীয় শিল্পের স্থান বিচ্যুতি করিয়া নিজ প্রভাব স্থাপন করিয়াছে তথাপি প্রাচীন দেশীয় রাজ্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সম্পূর্ণ রকমে পারে নাই।

"ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট দেশের লোকের নিকট ভারতবর্ষের দ্রব্যগুলির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য লর্ড কার্জ্জন গত ১৯০২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লীতে ভারত-শিল্প প্রদর্শনী খুলিবার সময় দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীকে, বিশেষতঃ ভারতের রাজন্যবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আমরা আশা করি পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেগুলি স্মরণ রাখিবেন। Tottenham Court নিবাসী গৃহসজ্জা নির্ম্মাতাদের কারুকার্য্যের তুলনায় তিনি এ দেশের দ্রব্যগুলির সমাধিক সম্মান দিয়াছিলেন—ঐ সব দ্রব্যের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, সেজন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। ইহাতে Tottenham Court হইতে তাঁহাকে গালি পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। Tottenham Court চটিলেন—ভারতের বড় বড় রাজ রাজরা তাঁহাদের খরিদদার, পাছে লাট সাহেবের যুক্তিতে খরিদদার ছুটিয়া যায়। কিন্তু লাট কার্জ্জনের ঐরূপ ভাষা প্রয়োগের কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি অনেকানেক দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছেন;—আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজভবনে প্রাচীন ভারত-শিল্পের সমাদর ও শোভা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তৃপ্তি লাভ দূরের কথা, তাঁহার বিরক্তি ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতী গৃহসজ্জায় রাজাবাস সজ্জিত, অতি কদর্য্য বিলাতি টুন্‌টাম্ দ্রব্যাদিতে কলঙ্কিত,—নকলের নাকাল গ্রাসের জিনিষে শ্রীভ্রষ্ট এবং নিতান্ত শ্রীহীন, বিলাতী গালিচায় গৃহ প্রাঙ্গণ মণ্ডিত। সোণা ফেলিয়া রাংতার আদর—মণিমাণিক্যের স্থানে কুৎসিত নকল

সাজ। সর্ব্বোপরি অতীব আদরের দেশীয় বস্ত্রাদির কিংখাব, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভারতের নমুনার সঙ্গে অসংলগ্ন জার্ম্মেণি নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে ইংরেজ দর্জ্জির নির্ম্মিত রাজবেশ; রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতি নমুনায় গঠিত। আবার কোন রাজ অন্তঃপুরে বিলাতি সাটিন-মখমল রাজরাণীদের পরিধেয় পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সব দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন—ভারত শিল্পের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন।" *

ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প যাহা এখনও আছে তাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিল্প কলা বলা যাইতে পারে। মৎ প্রণীত "রিয়া" নামক পুস্তিকায় আমি ত্রিপুরা মহিলাগণের বক্ষোবন্ধনী সম্বন্ধে বলিয়াছি "এই রিয়া যাহাতে ত্রিপুরায় জীবিত থাকে, তাহার উপায় করা রাজ সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে রিয়া এক্ষণে আর ব্যবহৃত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছু দিন পরে ইহা ব্যবহার হইবে না ইহা নিশ্চয়। ত্রিপুরার মহিলাগণ যখন আপনা-আপনির মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁহাদের বেশভূষাও আপনার ধরণের ছিল। এক্ষনে বর্ত্তমান জগতের বেশভূষা ক্রমে আসিতেছে ও আসিবে। সেই সঙ্গে "রিয়া" আর ব্যবহৃত হইতে পারিবে না; অর্থাৎ বক্ষোবন্ধনীরূপে ইহা ত্রিপুর-মহিলাকুলে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে কিনা আমি সন্দেহ করি। (রিয়া ৮ পৃষ্ঠা) বর্ত্তমান সময়ে আমি ত্রিপুরায় সূচিকা কার্য্যের শিল্প "সুজনী" অর্থাৎ বসিবার আসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। একবার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় পুত্র ও পুত্রবধূসহ এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের মহারাণীগণ কতকগুলি শিল্প সামগ্রী বউ মা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে উপহার দেন। তন্মধ্যে "রিয়া" এবং "সুজনী" ছিল। এই সুজনীখানা রবীন্দ্রবাবু দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছিলেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখার জন্য দেশ দেশান্তরের লোক উপস্থিত হন। এবার ফেব্রুয়ারী মাসে আমি দেখিয়াছি সেই বেদ-বিদ্যালয়ে জনৈক মান্দ্রাজী ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি ত্রিপুরার শিল্প দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন "এই মূল্যবান শিল্প মরিতে আপনারা কখনও দিবেন না।" আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"Mother Art does not die but slumbers." বোলপুর

* বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩১১ নবম সংখ্যা ৪৮২ পৃষ্ঠা

ষ্টেশনে বসিয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং মান্দ্রাজী ভদ্রলোকটির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করিয়াছিলাম। মান্দ্রাজের অনেক শিল্প হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এখনও সেগুলি বিদেশে এবং ভিন্ন রাজ্যে পাওয়া যায়। সেই মান্দ্রাজী ভদ্রলোক আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করেন ত্রিপুরার শিল্পাদর্শ সংগ্রহ করিবার জন্য ও অবশেষে মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় নিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যে পরিচারিকার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। একই গাড়ীতে আমরা রওয়ানা হইয়া এক সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিলাম। পথে ৫।৬ ঘণ্টাকাল এই ভদ্রলোকের সহিত আনন্দে কাটাইয়াছিলাম। বালি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জনতা দেখিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম Aeroplane শূন্যমার্গে উড়িতেছে। তাহাই জনতার কারণ। তখন বন্ধুবর মান্দ্রাজী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলাম "Aeroplane আমাদের শিল্পাদর্শ চুরি করিয়া নিশ্চয় লইয়া যাইবে, পাখী যেমন দেশদেশান্তরে বৃক্ষের বীজ লইয়া যায়।" তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। সে হাসির জোয়ার হাবড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য সাম্রাজ্যের ন্যায় ছিল। আরাকাণ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ছিল। ত্রিপুরার আর্ট এই সুবিস্তীর্ণ দেশপ্রদেশের আচার ব্যবহার বক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বর্ম্মার আর্ট বঙ্গদেশের আর্টের সহিত মিল হইয়া গেল। বর্ম্মাদেশ, চীন, লোসাই প্রভৃতি দেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ দেশ স্বীয় স্বীয় কলাবিদ্যা দ্বারা সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরপতিকুলের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। এই সব দেশের শিল্পই আমাদিগকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত একটা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র এই গতি। Queen Victoria জার্ম্মেণ রাজপুত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহে উপহার পাইলেন জার্ম্মেণীর আর্ট ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় রাণীগণকর্তৃক শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে ;---

"আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন,
তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল আপনী।
খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমণী,
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্মাযে আপনি।" (রাজমালা)

ইহা পৌরাণিক কালের কথা (Prehistoric সংবাদ)

ত্রিপুরা রাজ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুতর রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ত্রিপুরার রাজাগণ ঐ সব দেশ বিদেশের সুন্দরী কন্যাগণকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইতিহাসের পূর্ব্বসময়ের (Prehistoric) কথা বলিতেছি ত্রিপুরার মহারাজা প্রতীত সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ (এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গ) জয় করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গকুললক্ষ্মী গ্রহণ করেন। সেই দিন ত্রিপুরা এবং বঙ্গদেশের পক্ষে স্মরণীয় দিন। একদিকে হেরম্ব অধিপতি এবং অন্যদিকে ত্রিপুরাধিপতি মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন —

"সীমানা করিল রাজ্যের সত্য নির্ব্বন্ধিয়া,
রাজত্ব করিব ভোগ সুখেতে বসিয়া।
দুই ভাই কহিলেক একত্র হইয়া,
কখন সীমানা কার না লঙ্ঘিব গিয়া।
দৈবে যদিত কাক ধবল বর্ণ হয়,
তথাপি প্রতিজ্ঞা দুইর না লঙ্ঘি নিশ্চয়।
তোমা আমা দুইজনের যদি সত্য টলে,
বংশ নাশ হইবেক আসিবে যে কালে।

(রাজমালা ৫৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু বঙ্গ সুন্দরী এই দুই রাজার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

"তাহারা শুনিয়া বার্ত্তা মন্ত্রনা করিয়া,
পরমা সুন্দরী নারী দিলা পাঠাইয়া।"

(রাজমালা ৫৫ পৃষ্ঠা)

ভেদ জন্মান ব্যতীত উভয় রাজার ভাষা হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইবে। তাই বঙ্গদেশবাসী ভেদনীতির আশ্রয় লইলেন। এই বঙ্গ সুন্দরী মহারাজা প্রতীতের অঙ্কশায়িনী হইয়া ত্রিপুরার মহারাণী হইয়াছিলেন। সেই কাল হইতে বঙ্গদেশের শিল্পকলাদেবীও ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইল এবং অদ্য পর্য্যন্ত সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিবাহ উৎসব রাজরাজরার পক্ষে রাজনৈতিক উৎসব। সেই উৎসবে উভয় জাতির রাজনীতি,

সমাজনীতি এবং অর্থনীতির আদানপ্রদান হইয়া থাকে। Stateএ Stateএ বহুবিধ রাজনৈতিক উপঢৌকন আদানপ্রদান হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলা সর্ব্বাঙ্গে বিভূষিতা করিয়া দিয়া থাকে। "কলাবউ" ঘরে আসিলে পরে যেমন জয় জয়কার (জুকার) দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়, তখন যেমন উৎসবের বাদ্য বাজে, সময়ে পুত্রবধূ যখন রাজরাণী হন তখন Order of knighthood উভয় দেশে বিশিয়া প্রস্তুত হয় এবং আদানপ্রদান করা হয়। Heraldic উপায়ে সম্মানের তারতম্য সর্ব্বরাজ্যে হইয়া থাকে। Artই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে। British রাজ্যে knight of garter সর্ব্বোচ্চ উপাধি। মেয়েলোকই garter এই উপাধির মূল কারণ। ইহা ঐতিহাসিকগণ জানেন। আমাদের দেশায় রাজ্যে রাজরাণীগণের পূজা হইয়া থাকে এবং সে উপলক্ষে তাহাদের অলঙ্কার বস্ত্রাদির পূজা হওয়া বিচিত্র নয়।

১৮০৬ খৃঃ ৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ত্রিপুরার দেওয়ান রামরতন ত্রিপুরা জাহাঙ্গীর নগরের আপীল আদালতে সাক্ষ্য দিতেছেন (তামা তুলসী এবং গঙ্গোদক হস্তে লইয়া)

Question :—Was the mother of the four Rajahs Ruttun Manicko, Mahendra Manicko, Dhurmo Manicko, and Mokoond Manicko the daughter of a Bengalee or of the Tippera caste ?

Answer: I have heard that Dhurmo Manicko's mother was the daughter of a Bengiee, and the remaining three brothers' mother was the daughter of Tippera caste : thus I have heard.

(Appendix I of Court decision) (Page 30).

সেই মোকদ্দমার অধিনায়ক মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্য যখন শ্রীহট্ট প্রদেশস্থ বঙ্গকন্যা চন্দ্রতারা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বাঙ্গালী শাস্ত্রীয় মতে, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীহট্ট প্রদেশীয় সূচিকা কলা শিল্প আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশের সূচিকা কার্য্য একটী সুকুমার শিল্প বিশেষ। মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী গরিবের ঘরের মেয়ে ছিলেন, ছিন্ন বস্ত্রদ্বারা তিনি কাঁথা সিলাই করিতেন এবং এই কার্য্যই তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি

সঙ্গে আনিয়াছিলেন দুইজন শিল্প-অভিজ্ঞা সহচরী এবং পাক কার্য্যে নিপুণা। সুমজাতের মেয়ে না হইলে বাঙ্গালী ভদ্রলোক কখনও আহার করিতে পারে না। কাজেই সহচরী রন্ধন কার্য্যে ঢুকিয়া রামগঙ্গা মাণিক্যকে রাজভোগের সহিত বাঙ্গালার প্রিয় খাদ্য মিশাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা হইলেন রান্ধনী। একজন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বলরাম দেওয়ানের মাতৃদেবী আর একজন ছিলেন আমার পিতামহী সরস্বতী দেবী। ইনি খর্ব্বাকৃতি এবং রূপবিহীনা। যৌবন লাভের পূর্ব্বেই তাঁহাকে পাত্রস্থ করিতে হইয়াছিল।

আমার পিতামহের বয়স ছিল ৪০ বৎসর। প্রাপ্ত হইলেন কনেবউ সরস্বতী দেবী। দেবী সূচীকার্য্যে এবং ব্রতের আলিপনা চিত্রকর ছিলেন। এই জন্য তিনি লক্ষ্মীপূজা ও মনসাপূজা করিবার জন্য একটী জমিদারী পাইয়াছিলেন চন্দ্রতারা দেবীর অনুগ্রহে। পিতামহ ছিলেন সৈনিক বিভাগের সেনাপতি এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও আলং নাংক কারাগারের অধ্যক্ষ, প্রচুর-পায়ী ছিলেন। সরস্বতী দেবী ছিলেন ধার্ম্মিকা, ধর্ম্মকর্ম্মে সদারতা। এই জন্য তিনি দেশের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সূচকার্য্যে নিপুণা এ রাজ্যে কম ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত সূচি কার্য্যের দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই নাই। আমার জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গৃহদাহ হয়, ঐ সঙ্গে শিল্পাদর্শ অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কন্যা সন্ধ্যামালা দেবীর নিকট তাঁহার একখানা সুজনী মাত্র আমরা পাইয়াছিলাম। ১৯১৫ খৃঃ মাতৃদেবী যখন তীর্থদর্শনে বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন সে সময় এই শিল্পাদর্শ সুজনীখানা তিনি নারায়ণকে দান করিয়া আসেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শিল্প দ্রব্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়া নানা শ্রেণীতে ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক জিনিস ব্যবহার হইতেছে। রাজার রাণী যাহা ব্যবহার করিতেন রাজপুত্র বধূগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। ভিন্ন আদর্শে তাহাদের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইত অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগানুসারে শিল্পাদর্শও বিভিন্ন ছিল। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে রাজ অন্তঃপুরে দেখা যাইত শিল্পাদর্শ অনুসারে রাজরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর শ্রেণীর মহিলাগণের ব্যবহারিক জিনিস দ্বারাই তাহাদিগকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাইতে পারিত। রাজরাণীর ব্যবহার্য্য সুজনী আসনখানা দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইত ইহা রাজমহিষীর আসন। সুজনী

ইতঃপূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল মহারাণী চন্দ্রতারা দেবীর আদর্শ অনুসারে ; পূর্ব্বে ছিল পান-কাটা অর্থাৎ পানপাতার আদর্শে প্রস্তুত হইত। ত্রিপুরা রাজ্যের State colour ছিল ধবল। এই ধবল রংএর জিনিষ ব্যবহার করা অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। ছত্র, আরাণী, পতাকা প্রভৃতি ধবল রংএর। অদ্য পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান আছে। এই পানকাটা আদর্শই রাজার ব্যবহারের জিনিষের আদর্শ। রাণীগণের সূক্ষ্ম মস্‌লিনের উপর সোনালী বাদ্‌লা কারুকার্য্য দ্বারা তাঁহাদের শাড়ী প্রস্তুত হইত এবং ইহাই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য ছিল। রাজঅন্তঃপুরে ইহা প্রস্তুত হইত এবং কারুকার্য্য দ্বারা চিহ্নিত হইত। এখনও অতি প্রাচীন সাড়ী ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় রাজরাণীর পোষাক বটে। প্রত্যেক জিনিষের এক একটা Design হইত সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী এবং ঘোড়া কারুকার্য্যময় চিত্রে। সেই রকম রাজপুত্র এবং রাজকন্যার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ছিল। রাজার রাণীর জিনিষ পূজিত হইত ; এখনও মামুলীভাবে হইয়া থাকে বটে। এই বিষয় মংপ্রণীত রিয়া নামক পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে "এই অর্চ্চনা যদিও আজকাল তেমন সমারোহে সম্পন্ন হয় না কিন্তু State ভাবে রাজসিংহাসনের সম্মুখে এখনও এই পূজা হইয়া থাকে। এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই রাজার দর্পণ এবং রাণীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ঐসব জিনিষের পূজা পৃথক ভাবে হইয়া থাকে। রাজার দর্পণ এবং আইদেবতার রিয়া পূজা হইবে না তবে পূজা হইবে কোন্ দেবতার ? মাতা ঈশ্বরীর বক্ষোবন্ধনী দেবোপচারে পূজা হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ? রাজবাড়ীতে সময় সময় বিশেষতঃ মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভ বিবাহাদির কার্য্যে "লামপ্রা" পূজা হইয়া থাকে এই পূজা বিনাইগর অর্থাৎ বিনায়ক গণেশ পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রীমতী ঈশ্বরীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখনও মামুলী রূপে রিয়া দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক প্রাচীন বিষয়ে যদি আমরা অনুসন্ধান লই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই Tradition মধ্যে ঐতিহাসিক কাণ্ড বর্ত্তমান আছে।" সেইরূপ রাজরাণীর আসন, ব্যবহারীয় বস্ত্র, চন্দ্রাতপ এমন কি শুইবার মশারি পর্য্যন্ত নানা দেবকার্য্যে দেওয়ার প্রথা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি লক্ষ্মী পূজার আলিপনার সূক্ষ্মাদর্শ। আমার জেঠিমা অতি পরিপাটি আলিপনা শিল্পী ছিলেন। ৺শাশুড়ীর নিকট হইতে শিক্ষিতা বলিয়া গর্ব্বিতা ছিলেন।

আমাদের যে সুজনী আদর্শ ছিল তাহাতে দেখিয়াছি সুজনীর ৪কোণায় ৪টী মৃগ এমনভাবে আলিপনা আঁকা হইত যে ৪টী মৃগ এক হইয়া মধ্যস্থলে সম্মিলিত হইত এবং একটী মুণ্ড যাহা অঙ্কিত হইত তাহাদ্বারা ৪কোণা হইতে অঙ্কিত ৪টী মৃগকে এমনভাবে দেখা যাইত যে ৪টী মৃগই যেন ৪কোণ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। রাজবর্ণ ধবল। কিন্তু আমাদের সেই ধবল রংএর ব্যবহার করা হইত না। এজন্য আবির, ঝাইয়ের কালী, সিন্দুর এবং বিল্বপত্র শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ইহাদ্বারা লক্ষ্মীর আসন ও মনসার আসন প্রস্তুত হইত যাহা দেখিলে-পরে স্বতঃই যেন মনে হয় একখানা গালিচা সদ্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং মনে হয় যেন এক্ষণই দেবী এখানে আসিয়া বসিবেন। আমাদের স্বজাতীয় সমশ্রেণীর ঘরে দেখিয়াছি অনেকে এমন সুন্দর রচনা করেন পদ্ম এবং পদ্মের মৃণাল ও পদ্মপত্র এমন Design এ পরিণত করিতে পারিত যেন ইহাও একখানা পদ্মের আসন। কাহারও কাহারও বাড়ীতে ২টী ঘোড়া ঐ ৪টী মৃগের ন্যায় অঙ্কিত হইত ঠিক যেন মনে হয় একখানা আসন প্রস্তুত হইয়াছে আমি যাহা দেখিয়া বলিতাম "ঘোটকাসন"। এইক্ষণে আমরা ঐসব আদর্শ চিত্র প্রায় ভুলিয়াগিয়াছি। মামুলী আসন অঙ্কিত হইয়া বর্তমানে পূজাকার্য্য সমাপন হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার শিল্পকলারও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়া ছিলাম পদ্ম আঁকিয়া নানা বর্ণের গুঁড়িদ্বারা সুসজ্জিত হইত এবং মধ্যস্থানে ধানাদ্বারা এমন সাজ প্রস্তুত হইত দেখিলে মনে হইত যেন একটী সূর্য্যমুখীফুল দেবীর আসনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফরমাইস মত আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও একখানা আদর্শ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি যে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অভাবে যেমন স্বভাব নষ্ট হয় তেমন আদর্শও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেকালের আদর্শ আমরা আর পাইব না বলিয়া মনে করি। ত্রিপুর মহিলাগণ দীর্ঘ অবসর পাইতেন, তাঁহারা স্বহস্তে কারুকার্য্য করিয়া সময় কাটাইতেন, সহচরীগণ সাহায্য করিতেন তখন মনে হয় রবীবাবুর কবিতা :—

"হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদ, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।

হায়রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল!"
(ক্ষণিকা ৭২ পৃষ্ঠা)

কিন্তু কবীন্দ্রের এই কবি-উক্তিতে আমার প্রাণ শান্ত হইবার নহে। ইতিবৃত্ত শিল্পকলা দ্বারা সুশোভিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আমাদের সুজনী কাঁথা এবং আলিপনার সূক্ষ্ম কার্য্য অবশ্য ফিরিয়া আসিবে। আমরা আবার আমাদের দেব দেবীর অর্থাৎ রাজারাণীর পূজা করিব—আমাদের কলাদেবী আবার গাত্রোত্থান করিবেন। কোন্ দিন তাঁহাদের গাঢ়নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। আমাদের প্রাচীন রাজ্যের প্রাচীন আদর্শ আবার আমরা ফিরিয়া পাইব কখন এবং কোন্ দিন, আমি দৈবজ্ঞ নহি বলিতে পারি না। অদ্য পৃথিবীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের কলাদেবী অবশ্য গাত্রোত্থান করিবেন। আমি এই স্বপ্ন সত্য হইবে এই শিল্প আদর্শ একদিন গাত্রোত্থান করিবে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এই জানিতে পারিয়াছি "Art never dies but slumbers." পার্ব্বত্যাঞ্চলে যাহাদের বংশ হইতে সতীদাহ হইয়াছিল সেই সব বংশে এখনও তালাস করিলে অনেক শিল্পাদর্শ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ ৺সতীর বংশের নাম রক্ষার্থে অনেক সুজনি ও আলিপনা দ্বারা সেই স্মৃতিকে রক্ষা করিতেছে ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। শিল্পাদর্শ সংগ্রহ করার জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার শিল্প সম্বন্ধে লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি, ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইবে।

প্রতীত দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। বয়স ছিল ৩৭ বৎসর, যুবক বলিলেও হয়। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিল। তিনি পারস্য ভাষা এবং ভূমি পরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনি শাস্ত্র ও মল্ল যুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শীছিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রাসবিহারী দেবমূর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বামুটীয়া পরগণা দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়া

গিয়াছেন। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামানুসারে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, আগরতলায় স্থাপন করেন।"

(রাজমালা ১৫৮ পৃঃ)

৺কৈলাশচন্দ্র সিং কৃত।

তিনি বহুদার পরিগ্রহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাঙ্গালী কন্যাকে গৌরীর ন্যায় দান পাইয়াছিলেন। চন্দ্রতারা দেবীর নামে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমাদের ঘরে আছে এবং কলিকাতা Museumএ আছে। তাঁহার (রাণী চন্দ্রতারা দেবীর শিল্প কলা বিদ্যা সম্বন্ধে) অনেক কথা বলিবার আছে।

লাম প্রা অর্থ কি তাহা লিখিতেছি। ত্রিপুর ভাষায় "লামা" অর্থ রাস্তা আর প্রা অর্থ সুগম অথবা বিপদ শূন্য হউক। যেমন "খুম্ভু প্রা" একটী গন্ধযুক্ত বৃক্ষ; যাহার পাতা যুবতীগণ বিশেষতঃ বিবাহিত যুবতীগণ ফুলগুচ্ছ সহ কর্ণে ধারণ করে। ত্রিপুরা ভাষায় খুম্ভু অর্থ কান, প্রা অর্থ সুগম অর্থবৎ কর্ণ মূলে কোন সংক্রামক ব্যারাম ঢুকিতে পারে না। কারণ এই খুম্ভু প্রা বৃক্ষ Equiliptus বৃক্ষের ন্যায় antiseptic প্রত্যেক যুবক স্বামী প্রত্যহ ইহার পাতা জোগাইয়া থাকে ইহা স্বামীর কর্ত্তব্য; স্বামী ভিন্ন অন্যে দিতে পারে না। ইহা বিশদ ভাবে "পুষ্প রচনা" প্রবন্ধে পরে লিখিতেছি।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

N. B. "চরমাবস্থায় মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য যুবরাজ কাশীচন্দ্রের হস্তে রাজ্য ও জমিদারীর শাসনভার সমর্পণ করেন। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের একমাত্র পত্নী চন্দ্রতারা মহাদেবীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। সেই বালক কৃষ্ণকিশোর আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামগঙ্গা কৃষ্ণকিশোরকে বড় ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। রামগঙ্গার জীবিতাবস্থায় মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী মানবলীলা সংবরণ করেন।

জ্যোতিঃহারা।

জীবনের জ্যোতি ফিরেছ দ্যুলোকে
অন্ধ করি এ আঁখি
কুল-গৌরব নিয়ে গেছ সব
তমাল তিমির রাখি।
বুকের পাঁজর শূন্য পিঁজর
বৃথা বহে মরি ভার,
শোণিতবিন্দু শোক-শায়কের
ক্ষতে ঝরে অনিবার।
এ গৃহজীবনে এইহ ভুবনে
স্পৃহা আর বলো কিসে ?
পলে পলে দহি তিলে তিলে সহি
শত শত অহি-বিষে।
ভব-তটিনীর খেয়াঘাটে যাপি
দুর্য্যোগ বিভাবরী
ঐ পরপারে আবার বাছারে
মিলনের আশা ধরি।

শ্রীকালিদাস রায়।

চিররহস্য-সন্ধানে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"দেখুন, পরকালে আমার বিশেষ আস্থা নেই ; এ বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে।"

বক্তাটী ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদে সজ্জিত মোটা-সোটা এক ভদ্রলোক—মুখখানি নিতান্ত মন্দ নয়—বেশ ফিটফাট সহজ চালচলন। টেবিলের ধারে উপবিষ্ট এস র‍্যামিকে সম্বোধন করিয়া তিনি কথাগুলি বলিলেন।

চোখের কোণে ভদ্রলোকটীকে একবার দেখিয়া লইয়া এসর‍্যামি পত্রস্তূপ হইতে একখানি চিঠি বাছিয়া লইলেন ; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ-চিঠি আপনিই কি আমাকে লিখেছিলেন ?" চিঠিখানির দিকে ঈষৎ হেলিয়া ও আপন হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া তিনি সহাস্য-সম্মতি জানাইলেন।

"আপনারই নাম রেভারেণ্ড ফ্র্যান্সিস্ এ্যাস্টুথার ?—শুনেছি, আপনার এলাকার বিশপ-মহাশয়ের খুব প্রিয়পাত্র আপনি।"

একটু সবিনয় হাস্যসহ ভদ্রলোকটী মুখভাবে যথেষ্ট পবিত্রতা আনবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—"অর্থাৎ, প্রিয়পাত্র ছিলুম এককালে,—এখনও সম্ভবতঃ আছি, তবে ভয় হয় পাছে এই বিবেক-সম্পর্কিত ব্যাপারটা"—

"ও, ব্যাপারটা তা' হ'লে বিবেক সম্পর্কিত ?" মৃদুকণ্ঠে এস র‍্যামি বলিলেন—"আপনি নিশ্চিত জানেন ?"

"সম্পূর্ণ নিশ্চিত !" বলিয়া এ্যাস্টুথার একটী বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

"—'বিবেক, সে এইরূপে ভীরু করি' তোলে জনে জনে'—"

"মাফ করবেন,—কথাটা"—যাজক মহাশয়ের চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত হইল।

"আপনিই মাফ করবেন, আমি হ্যামলেট আওড়াচ্ছিলুম।"

"ও !"

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। ইতিমধ্যে এল র‍্যামির তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে ভদ্রলোকটী যেন একটু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন।

"আমাকে খুঁজে বের করবার কারণ ?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"বিশেষ এমন কিছু নয়—দৈবাৎ এটা"

"অবশ্য—অবশ্য" এল র‍্যামির মুখে একটু বক্রহাস্য দেখা দিল।

"সেদিন প্রসঙ্গক্রমে লেডী মেলথর্পের কাছে আমার বিপদের কথা পেড়েছিলুম। তিনিই আপনার নাম করে বললেন যে আপনি নিশ্চয়ই আমার সংশয় দূর করতে পারবেন—"

"একেবারেই না। নিজের সংশয় দূর করতেই আমি সময়ে কুলিয়ে উঠিতে পারি নে।"

ধর্ম্মযাজক বিস্ময়ে অবাক হইলেন; পরে বলিলেন—"কিন্তু তিনি যে রকম বললেন—তাতে আমি ভেবেছিলুম যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনি নিশ্চিত যে—"

"কি সম্বন্ধে ?" বাধা দিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"নিজের ? নিশ্চয় জানবেন যে আমার নিজের মেজাজের মতন অনিশ্চিত দুনিয়ার আর কিছুই নেই ! অপরের ? মানুষের মতিগতি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। জীবনের ? মৃত্যুর ? কোনোটাই না। আমি শুধু মৃত্যুর পর কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কি না তাই প্রমাণ করবার চেষ্টায় আছি—কিন্তু নিশ্চিত কোনো বিষয়েই নই কিম্বা প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাসও কিছুতে করি নে।"

"কিন্তু"—উদ্বিগ্নকণ্ঠে এ্যাস্টুথার বলিলেন—"শুনতে পাই যে আপনার কথা শুনে লোকের মনে এর উল্টো ধারণাই জন্মে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঐ লেডী মেলথর্পই"—

"লেডী মেলথর্প যা' বিশ্বাস ক'রে সুখী হন তাই বিশ্বাস করেন"—সংযতকণ্ঠে এল-র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"চপলস্বভাব স্ত্রীলোকমাত্রেই তা' করে থাকে। এ থেকে প্রমাণ হয় এই যে স্ত্রীজাতির মনে রোম্যাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব অপরিসীম। বস্তুতঃ,

ধন্মটা বেশ আরামের—তা' ছাড়া স্ত্রীজাতির উপযোগীও বটে। লেডী মেলথর্প একটু বেশী মাত্রায় কল্পনিক—তা' এতে বিশেষ ক্ষতি নেই—দীর্ঘজীবী হ'য়ে তিনি কল্পনা নিয়ে খেলা করুন, আপত্তি দেখ্‌ছি নে।"

"কিন্তু লেডী মেলথর্প বলেন যে আপনি মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন"—ধর্ম্মযাজক প্রতিবাদ করিলেন—'এমন কি বর্ত্তমানও গুণে বলতে পারেন; তা' যদি হয়, তবে আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি দুইই আছে বলতে হবে!"

এল র‍্যামি, বক্তার মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন; পরে বলিলেন—"আপনার বর্ত্তমান আমি পাঠ করিতে পারি, অতীতও বলে দিতে পারি—আর এই দু'য়ের যোগাযোগ থেকে ভবিষ্যতটাও কষে বার করতে পারি; তবে এই শেষোক্ত বিষয়ে আমার গণনা ভুলও হতে পারে। অবশ্য অতীত বা বর্ত্তমান সম্বন্ধে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কেননা, এমন একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে যাতে করে' আমার কাছে আপনি আত্মপ্রকাশে বাধ্য!"

এ্যান্সট্রথার ভিতরে-ভিতরে কেমন যেন একটা অশোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তুলিলেন যেন তিনি বিস্মিত ও কৌতূহলীই হইয়াছেন।

"এই প্রাকৃতিক নিয়ম" টেবিলের এককোণ হইতে একটা গ্লোব টানিয়া লইয়া এল-র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—'মানুষ সৃষ্ট হবার প্রারম্ভ থেকেই বলবৎ আছে, কিন্তু আমরা মাত্র কিছুকাল আগে থেকে এটার আবিষ্কার সুরু করেছি। আবিষ্কার না বলে' পুনরাবিষ্কার বলাই ঠিক, কেননা প্রাচীন ঈজিপ্টের পুরোহিতেরা এটা মোটামুটি একরকম জানতেন। এই গোলকটা দেখ্‌ছেন" গ্লোবটাকে দু'একপাক ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন—"এটা হচ্ছে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের ছোটখাটো এক নমুনা। পারস্যের এক প্রাচীন কবি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে লিখিয়াছিলেন যে মোটের মাথায় সৌরচক্রটাকে আকাশের মস্তিষ্ক মনে করা যেতে পারে, আর নক্ষত্রগুলি হচ্ছে সেই মস্তিষ্কের চিন্তাশীল সচল পরমাণুকণা। একালের সবজান্তা সমালোচকেরা হয় তো কথাটার মধ্যে কষ্ট-কল্পনাই দেখতে পাবেন, কিন্তু

আমার বক্তব্য এই উপমায় আপাততঃ অনেকটা বিশদ হ'তে পারবে। আকাশের এই মস্তিষ্ককে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিলে আমরা দেখ্‌তে পাই, যে আমাদের যথেষ্ট ক্ষুদ্রতা ও দৈন্য সত্ত্বেও এই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-রহস্যের কিছু কিছু আমরা নিঃসংশয়ে আয়ত্ত করতে পেরেছি—এমন কি, এই সমস্ত চঞ্চল জ্যোতিষ্কের চলাচল-পথের একটা নক্সা গড়্‌তে পারাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এদের চিন্তাপ্রণালী আমরা লক্ষ্য করতে পারি—এদের উদয়াস্ত আমরা গণনা কর্‌তে পারি—তারপর, যখন এদের কার্য্যাবলী চোখে দেখ্‌তে পাই নে তখনও এদের আলোক-তরঙ্গ এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারি যে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও যা নজরে পড়ে না, এমন কোনো-কোনো গ্রহের ফটো তুলে নেওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।...আপনি হয় তো ভেবে পাচ্ছেন না যে কি বল্‌তে চাইছি আমি ?...বেশ, আকাশের মস্তিষ্ক থেকে আলোক-তরঙ্গের সঞ্চরণ কথাই আমি বল্‌ছি—এ তরঙ্গের অস্তিত্ব শুধু যে আমরা জানি তাই নয়, ফটোগ্রাফির সাহায্যে তা' প্রমাণও কর্‌তে পারি ; আর হাতেকলমে ফলাফলগুলো প্রত্যক্ষ করি বলেই আমরা তা' বিশ্বাসও করি। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন সমস্ত তরঙ্গও আছে যার ফটো তোলা যায় না,—যে তরঙ্গ মানব-মস্তিষ্কের,—যা বাইরের এই তরঙ্গগুলিরই মতন আলোকে ও অগ্নিতে পরিপূর্ণ এবং যা' আমাদের চিন্তার সুস্পষ্ট চিহ্ন বা নমুনা বহণ করে' থাকে। কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে চিন্তা-চালনার কথা অবশ্যই শুনে থাক্‌বেন,—এমনভাবে এ-সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা'কওয়া হয়ে থাকে, যেন ব্যাপারটা নিতান্তই সাময়িক ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-ঘটনার প্রতিরোধ আপনি কর্‌তেই পারেন না—কারণ, রাগ বা স্বাস্থ্যের বীজাণুগুলোরই মতন এর স্পন্দন-তরঙ্গও বাতাসে ছড়িয়ে আছে—কিছুতেই এ-নিয়ম পরিবর্ত্তিত হবার নয়।"

"আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে আপনার কথা"—কতকটা বিহ্বলভাবে ধর্ম্মযাজক জানাইলেন।

"অর্থাৎ যা' কেবলমাত্র একটা কাল্পনিক তথ্য বলেই মনে হচ্ছে, হাতেকলমে তা'র দৃষ্টান্তটাও দেখ্‌তে চান—কেমন, এই তো ?...শক্ত কিছুই নয়"...বলিয়া এল র‍্যাম্‌ টেবিলের দিকে একটু অগ্রসর হইলেন এবং ভদ্রলোকটীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ

করিয়া বলিতে লাগিলেন—"নক্ষত্রগুলো যেমন আকাশের গায় নানা আকারের নক্সা ক'টচে, তেমনি আপনার মস্তিষ্কও অতীত ও বর্ত্তমানের বিচিত্র চিত্রমালায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে। আপনার সমস্ত অতীত, তার প্রত্যেকটা দৃশ্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে দৃঢ়মুদ্রিত হয়ে আছে; হয় তো তার অনেক ঘটনাই আজ আপনি ভুলে গিয়েছেন কিন্তু যদি কখনও ডুবে মর্‌তে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হয় তা'হলে প্রত্যেক চিত্রটি বায়স্কোপের ছবির মতই আপনার স্মৃতিপটে জেগে উঠ্‌বে, কারণ শ্বাসরোধ-মুহূর্ত্তে স্মৃতি-চিত্রাগারের তুচ্ছতম কণিকাটীও অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তে বাধ্য। স্বভাবতঃ, আপনার বর্ত্তমানই আপাততঃ আপনার চিত্তপটে খুব স্পষ্ট; সুতরাং আশা করা যায় যে সেইটে নিয়েই পরীক্ষায় অগ্রসর হ'লে আপনি অধিকতর খুসী হবেন?"

"পরীক্ষায় অগ্রসর? কেমন ক'রে?"... ....অধিকতর বিহ্বলকণ্ঠে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেন—আপনার মস্তিষ্কের রেখা-চিত্র আমার মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত ক'রে। এ-ব্যাপার খুবই সহজ, তা' ছাড়া বিজ্ঞান-সম্মতও বটে। আপনি যেন ফটোগ্রাফির কাঁচ আর আমি প্রতিচ্ছবি নেবার কাগজ! একটা ঝাপ্‌সা রকমের ছবি নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে পার্‌বো, যদিও নিতান্ত ঝাপ্‌সা হবে এমন ধারণা আমার নয়। তবে আপনি যদি আমার কাছে কিছু গোপন করতে চান সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার মতে বাঞ্ছনীয় হবে।"

"বাস্তবিক মশাই—এ ভারী আশ্চর্য্য! আমি ঠিক ধারণা করতে পাচ্ছিনে যে"—

"কোনো চিন্তা নেই, এখুনি আমি জলের মতন বুঝিয়ে দিচ্ছি"—ঈষৎ হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"এর মধ্যে কোনো চাতুরী বা ফাঁকি একেবারেই নেই—বিজ্ঞানের অতি সহজ ক খ গ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। দেখুন—রাজী আছেন? অবশ্য আমার পরীক্ষাফল আপনাকে 'পরলোক' সম্বন্ধে সজ্ঞান করতে পার্‌বে না, তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ও শরীরবিজ্ঞান-ঘটিত পারিপার্শ্বিকগুলোর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে দেবে।"

রেভারেণ্ড এ্যাল্সট্রথার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এল র‍্যামি যেরূপ সহজ প্রত্যয় ও সংশয়-পরিশূন্যতার সহিত কথা কহিতেছিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত হইতেছিলেন; অপরপক্ষে তাহা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেও পারিতেছিলেন না। অবশেষে এই ভাবিয়া তিনি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন যে এই প্রাচ্যদেশবাসী তাঁহাকে যখন পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই বা তাঁর পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে কিছু জানাও এর পক্ষে যখন সম্ভব নয়, তখন কথাগুলো নিশ্চয়ই ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

"প্রস্তাবিত পরীক্ষা অবশ্যই আমি খুব উপভোগ্য মনে কর্‌বো"—ম্লানহাস্যসহ তিনি বলিতে লাগিলেন—"যেহেতু, ব্যাপারটায় আমি ভারী কৌতূহলী হয়েছি। আমার মস্তিষ্কের বর্ত্তমান চিত্র বা ফটোগ্রাফ-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে ঐ বিশপ-সম্বন্ধে একটা চিত্তচাঞ্চল্য বা মতের অস্থিরতা—"

"কিম্বা বিবেক"—এল র‍্যামি বাধা দিলেন—"যখন নাকি আপনার মতে ব্যাপারটা বিবেক-সম্পর্কিত।"

"তা' বটে—তা' বটে! বিবেকই হচ্ছে মানুষের কর্ম্মপ্রেরণার প্রবলতম শক্তিকেন্দ্র—বুঝ্‌লেন কি না! প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তুই তো ভগবদ্বাণী।"

"সেটা নির্ভর কচ্ছে তার বক্তব্য বিষয়ে আর কি ভাবে তা' শোনা যায় তারই ওপর"—শুষ্কভাবে জবাব দিয়া এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"এখন, যদি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতেই হয় তবে আপনার বাঁ হাতের করতলটি আমার এই বাঁ হাতের করতলে রাখুন;—একটু চেপে—হ্যাঁ ঐতেই হবে। বেশ, অবস্থানটা লক্ষ্য করুন এবার। দেখছেন যে আমার আঙুলগুলি আপনার কব্জির ওপর রেখেছি—উদ্দেশ্য, আপনার হৃদয় ও মস্তিষ্ক মধ্যপথে যে-সমস্ত শিরা ও ধমনী বেরিয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে সংলগ্ন রাখা। পূর্ব্বোক্ত উপমা-অনুসারে এ-যেন আপনি, কি না ফটোগ্রাফির কাঁচটা, আমায়—কিনা ছবি তোলবার কাগজখানির ওপর ছাপ দিচ্ছেন; ফলে, একটা স্পষ্ট ছবি যে পাওয়া যাবেই, তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তাতরঙ্গ আমার মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হওয়ার পথে পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে, এজন্যে আর একটু সাবধানতা দরকার"—বলিয়া এল র‍্যামি

তাঁহাদের সম্বদ্ধ করযুগলে একটী ইস্পাত-বেষ্টনী আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন—"একরকম হাতকড়ি আর কি ; এর সঙ্গে আমাদের পরীক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই—তবু, পাছে কোনো অপ্রিয় সত্যকথা শুনে হঠাৎ আপনার হাত টেনে নেবার প্রবৃত্তি আসে, সেইজন্যেই এটা লাগানো ; কেন না সেক্ষেত্রে আমাদের ভেতরকার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে।...যাক্, এখন আপনি প্রস্তুত ?"

ধর্ম্মযাজকের মুখখানি বেশ একটু বিবর্ণ হইয়া উঠীল। পরীক্ষাফল-সম্বন্ধে এল র‍্যামির অতটা দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার পক্ষে কতকটা অস্বস্তিজনক মনে হইতেছিল—তথাপি একবার সম্মতি দিয়া এখন পশ্চাৎপদ হওয়াটা ভাল দেখায় না বলিয়াই অগত্যা তিনি ঘাড় নাড়িলেন।

অতঃপর আপনার দীপ্ত নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া এল র‍্যামি প্রায় দুইমিনিট কাল স্তব্ধ ও স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। অপরপক্ষে এ্যাজ্টুপারের মধ্যে এই সময় একটা আশ্চর্য্য চাঞ্চল্য দেখা দিল—তিনি কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ব্যাপার, নিজের সঙ্গে সংশ্রবশূন্য যা' তা' কতকগুলো বিষয় ভাবিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু বৃথা, বৃথা,—তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত জীবন, সমস্ত সুগোপন লক্ষ্য একেবারে যেন ভিড় করিয়া তাঁহার চিত্তপটে ঠেলিয়া আসিল। অনতিবিলম্বেই তাঁহার বাহুমূলে যেন সূচ-ফোটার যন্ত্রণা অনুভূত হইল—মনে হইতে লাগিল যেন এল র‍্যামির করতল-লগ্ন হাতখানায় হঠাৎ আগুন ধরিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ এল র‍্যামি চাপা গলায় কথা কহিলেন, কিন্তু চোখ খুলিলেন না—

"কোনো একজন স্ত্রীলোকের প্রতিচ্ছবি,—সুকেশী, দীর্ঘায়তলোচনা,—হৃদয়হীনা, তবে দেহ-সৌন্দর্য্যে মনোরম। ইনিই আপাততঃ আপনার চিন্তারাজ্যের অধিকারিণী।"

ধর্ম্মযাজকের সর্ব্বাঙ্গে একটা তাড়িৎ-শিহরণ খেলিয়া গেল,—হায়, যদি হাতখানা টানিয়া লইবার উপায় থাকিত !

"ইনি আপনার স্ত্রী নন"—এল র‍্যামি বলিয়া চলিলেন—"আপনার সম্পন্ন প্রতিবেশীর পত্নী। আপনার নিজের স্ত্রী রুগ্না—তা' ছাড়া আপনার আটটী ছেলেমেয়েও আছে,—

কিন্তু তা'রা আপাততঃ এ-চিত্রে স্পষ্ট নয়। ঐ স্ত্রীমূর্ত্তিটাই এখানে প্রধান ছবি। আপনার মতলব যা' কিছু তা' ঐ—"

এল র‍্যামি থামিলেন, এবং হতভাগ্য এ্যান্সট্রুথার আবার শিহরিয়া উঠিল :

"দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না !"—সহসা প্রফুল্লকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিয়া উঠিলেন—"এইবার খুব স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আপনি 'চার্চ্চ'এর সংস্রব ত্যাগ করাই স্থির করেছেন,—তা'র কারণ এ নয় যে আপনি পরলোক মানেন না, যেহেতু সেটা কোনোকালেই আপনি মানেন নি—কারণ হচ্ছে এই যে আপনি কি নৈতিক কি পরমার্থিক সকল দায়িত্বই ঝেড়ে ফেলতে ইচ্ছুক। আপনার মতলব খুবই পরিষ্কার,—ওপরওয়ালাদের কাছে বিবেকের দোহাই পেড়ে আপনি কাজে ইস্তাফা দেবেন—তারপর স্ত্রীপুত্রদের পরিত্যাগ করবেন,—শেষে আপনার ঐ গোপন প্রণয়িনীটাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবেন—"

"থামুন !"—রাগে মুখ লাল করিয়া আবদ্ধ হাতখানা সরাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে এ্যান্সট্রুথার চীৎকার করিল—"থামুন ! সমস্ত মিথ্যাকথা আপনার ! এল র‍্যামি নয়ন উন্মীলন করিয়া ক্ষণকালের জন্য বিস্ফারিত বিস্ময় দৃষ্টিতে এ্যান্সট্রুথারের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—পরমুহূর্ত্তেই সে দৃষ্টিতে একটা নিদারুণ ঘৃণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইস্পাত-বেষ্টনীটা খুলিয়া, টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"মিথ্যা ?"—আরক্তমুখে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তোমার সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে মিথ্যার আধার ; কি প্রকৃতি কি বিজ্ঞান তা' প্রতিফলিত করতে বাধ্য। স্পর্দ্ধা তোমার যে সনাতন শক্তিগুলির সঙ্গে লুকোচুরি চালাবার বাঁদরামিতেও তুমি সফলকাম হবার প্রত্যাশা কর ! যে সর্ব্বজ্ঞ শক্তি-তলে গ্রহতারা থেকে আরম্ভ করে' প্রত্যেক তুচ্ছতম ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত বিধৃত, যে সর্ব্বব্যাপী চেতনার অসীম প্রসারে সূক্ষ্মতম পরমাণুটীও এমনভাবে জড়িত যে কোনোখানেই কিছু গোপন থাকবার উপায় মাত্র নেই, তাকেও তুমি ফাঁকি দেবার কল্পনা করতে চাও ?......দরকার বোধ করতে হয়তো বা 'তোমার' ভগবানকে, তোমার 'চার্চ্চের ভগবানকে,' প্রতারিত করবার ভাণ তুমি করতে পার—কিন্তু সাবধান, আসল ভগবানের, ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাসমষ্টির সঙ্গে চালাকী করবার চেষ্টা ক'রো না।"

কক্ষব্যাপী স্তব্ধতার উপর এল র‍্যামির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর গম্ গম্ করিতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকটীও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং কম্পিতহস্তে গ্লোব্ আঁটিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিবার সাহসটুকুও আর যেন তাঁহার ছিল না।

শান্ত সংযত কণ্ঠে এল র‍্যামি পুনরায় আরম্ভ করিল—"আপনার সম্বন্ধে যা সত্য, তাই আমি বলছি—আপনিও যে মনে মনে তা' না জানছেন এমন নয়। তবে কি জন্যে আমার ওপর এই মিথ্যাভাষণের দোষারোপ? যদি নিজেকে বা নিজের উদ্দেশ্যকে আমার কাছ থেকে গোপনে রাখাই আপনার অভিপ্রেত ছিল, তবে কেন এখানে এসেছিলেন? আমার মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত আপনার নিজ মস্তিষ্কের পরিচয়-পত্রটাও কি আপনি অস্বীকার করতে চান? আসুন,—কিছুক্ষণের জন্যেও অন্ততঃ ভদ্র হোন্—বলুন, অস্বীকার করেন?"

"সমস্ত অস্বীকার করি"—ধর্ম্মযাজক উত্তরে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর ভারী ও অস্পষ্ট বোধ হইল।

"তবে তাই হোক্"—অবজ্ঞাভরে হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"আপনার বিবেকের তাগিদ খুবই বেশী দেখ্ছি। যান আপনার বিশপের কাছে—বলুন গিয়ে তাঁকে যে পরলোকে আপনার বিশ্বাস নেই—আমি অবশ্যই সে রহস্য উদ্ভেদে আপনাকে সাহায্য করতে পারিনে। তা' ছাড়া, মৃত্যুর পর কোনো কিছুর অস্তিত্ব-সম্ভাবনা আপনার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর হবে না। হাঁ—স্বাধীনতা আপনি পাবেন; যা' কিছু আপনার লক্ষ্য তা' অবশ্যই জুটে যাবে,—কিছুকাল এই সূক্ষ্ম আত্মসম্মানবোধের আর উদ্দেশ্যের এই সরলতার জন্যে আপনি সব-চিন হয়েও উঠ্বেন। তারপর, আপনার চরম লক্ষ্য, অর্থাৎ প্রতিবেশীর স্ত্রীটীকে নিয়ে পলায়ন, আর একদিক দিয়ে আপনার খ্যাতি বাড়িয়ে তুলবে। প্রত্যেকেই আপনাপন ভাগ্যসূত্র বয়ন করতে বাধ্য; আপনিও তাই কর্চ্ছেন—যখন সে সূত্র শেষে আপনাকে এমন করে' বেড়াজালে ঘিরে ফেল্বে যে পালাবার আর কোনো পথই থাক্বে না, তখন যেন আশ্চর্য্য না হন, এই হচ্ছে আমার কথা। এ সব কথা অবশ্য আপনার শ্রুতিসুখকর মনে হ'চ্ছে না—কিন্তু কি করবেন, দুর্ভাগ্য আপনার যে আমার কাছে এসেছেন!"

দস্তানার বোতাম আঁটা শেষ করিয়া এ্যান্সট্রুথার বলিলেন—"সেজন্যে আমি একটুও ক্ষুব্ধ নই; অন্য লোকে হয় তো এতে নিজেকে অপমানিত মনে করতো, কিন্তু"—

"কিন্তু আপনি এ সব বিষয়ে একেবারে যীশুখৃষ্ট, তাতে আর সন্দেহ কি"—শ্লেষের সহিত এল র‍্যামি বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার অসীম সহনশক্তির জন্যে ধন্যবাদ! তা' হলে এ-সাক্ষাৎ এইখানেই শেষ করা যাক"। তিনি ঘণ্টা টিপিতে উদ্যত হইতেই, ধর্ম্মযাজক তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আশা করি, আজকার ঘটনার গোপনীয়তা আপনার কাছে অক্ষুণ্ণই থাকবে?"

"গোপনীয়তা!" ঘৃণাভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"গোপনীয়তা বলতে আপনি কি বোঝেন বলতে পারিনে, তবে এই যদি আপনার বক্তব্য হয় যে আপনার বা আপনার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধেই আমি আলোচনা করবো, তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আপনার কথা আমি আর মনেও রাখবো না। নিজেকে একটা মস্ত লোক ভেবে অহঙ্কার করবেন না; অবশ্য খবরের কাগজওয়ালারা শীঘ্রই ও নাম ছাপাবার জন্যে লোলুপ হবে। আমার কিন্তু অন্য কাজ এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, পাদরীদের বিবেক-ঘটিত ব্যাপার আমার বিস্ময় বা প্রশংসা আদৌ উদ্রিক্ত করে না!"—এইখানে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তিনি দ্বারপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিবামাত্র বলিলেন—"ফেরাজ! বেরিয়ে যাবার পথ!"

রেভারেণ্ড এ্যান্সট্রুথার টুপিটা তুলিয়া লইয়া নবাগত ফেরাজের অতুলনীয় গঠনসৌন্দর্য্যটার দিকে চাহিয়া লইলেন; পরে সাহসে ভর করিয়া এল র‍্যামির দিকেও একবার তাকাইলেন। এই প্রাচ্য পণ্ডিতের জ্ঞানোজ্জ্বল দৃষ্টি—প্রশান্ত মুখভাব—ঈষৎ গর্ব্বিত দণ্ডায়মানভঙ্গী ও দীর্ঘোন্নত ঋজু অবয়বখানির পার্শ্বে ভদ্রলোক যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। কতকটা চেষ্টাকৃত হাস্যসহ, যেন ঢোক গিলিতে গিলিতে তিনি বলিলেন—"আপনি—আপনি বড়ই আশ্চর্য্য লোক মিষ্টার এ—এল র‍্যামি! আজকের সকালটা বেশ উপভোগ্য মনে হোল—তা' ছাড়া শিক্ষাপ্রদও বটে!"

এল র‍্যামি কোনো জবাব না করিয়া একটু ঘাড় নাড়িলেন।

টুপিটার ভিতর একবার উঁকি মারিয়া ধর্ম্মযাজক বলিতে লাগিলেন—"অবশ্য এত বড় কথা আমি বলতে পারিনে যে আপনার সকল কথাই অভ্রান্ত সত্য, তবে আপনার কোনো কোনো ইঙ্গিত কতকটা ঠিক হয়েছিল—অর্থাৎ অতীত জীবন-সম্বন্ধে তাদের আরোপ করলেও করতে পারা যায়—বুঝলেন কিনা !......"

এল র‍্যামি তাঁহার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"খবর্দ্দার,—আর একটাও মিথ্যে কথা নয়। বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—যান্।"........

এতই বেগে কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে ভদ্রলোক সহসা ভয় পাইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাত্যহিক প্রথামত আজ বৈকালে আহারান্তে এল র‍্যামি বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। যতক্ষণ তিনি পানাহারে ব্যাপৃত ছিলেন, ফেরাজ ঠিক ভৃত্যটিরই মত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঐকান্তিক অনুরক্তির সহিত তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে ফেরাজই তাহার জ্যেষ্ঠের একমাত্র গৃহ-ভৃত্য; জ্যারোবাও ছিল বটে, কিন্তু তাহার দায়িত্ব দ্বিতলের ঐ রহস্যময় কক্ষগুলি ও ততোধিক রহস্যময়ী অধিব সিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ্যান্সট্রুথারের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে এল র‍্যামির মেজাজ বিগড়াইয়াছিল—সারাদিনের মধ্যে তাঁহাকে বড় বেশী কথা কহিতে দেখা যায় নাই। যাহা হউক, গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সহসা তাঁহার চিত্ত কতকটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং ফেরাজকে সশঙ্কিত সতৃষ্ণনয়নে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া তিনি বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমার সম্বন্ধে তোমার সহিষ্ণুতার সীমা নেই ফেরাজ! অথচ আমি যে নিতান্তই পেচক-স্বভাব তাতে ভুল নেই।"

নম্রকণ্ঠে ফেরাজ জানাইল—"তুমি বড্ড বেশী চিন্তা কর; তা' ছাড়া পরিশ্রমও কর অতিরিক্ত।"

"চিন্তা আর পরিশ্রম, এ দুটোই যে দরকার ভাই; ছাগল গরুর মত অলস জীবন যাপন অবশ্যই তুমি চাও না।"
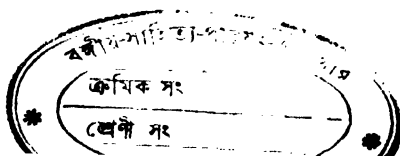
"তা' নয়, বিশ্রামও তো চাই; শ্রান্তি দূর করবার জন্যে স্বয়ং ভগবানও বোধ হয় ঘুমিয়ে থাকেন"—ফেরাজের স্বর ক্ষুব্ধ।

"তোমার এ রকম মনে হয় না কি?"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"তা যদি হোত, তবে তাঁর নিদ্রা বা বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে জীবনের কাজে পদে পদেই ত্রুটী ঘট্‌তো; অজ্ঞানে, অন্ধকারে সৃষ্টি ছেয়ে আস্‌তো। ভগবান কখনও ঘুমুতে পারেন না।"

"কেন পার্ব্বেন না, যদি স্বপ্নদর্শন তাঁর পক্ষে অসম্ভব না হয়? ভাব যদি বস্তু হয়ে উঠ্‌তে পারে, তবে ভগবানের স্বপ্নই কি জীবন হয়ে উঠ্‌তে পারে না?"

"কবিত্বপূর্ণ!"—এল র‍্যামি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তবু তোমার কল্পনা হয় তো অসঙ্গত নয়। ভাস্করের চিন্তা, বস্তুও ভাবে পরিণত হয়ে পাষাণমূর্ত্তিতে সাকার হয়—কবির অস্পষ্ট কল্পনা কালিকলমের সাহায্যে কেতাবরূপ কঠিন পদার্থে পরিণতি-লাভ করে; তেমনি, ভুবনসম্বন্ধে ভগবানের 'কল্পনা'ই হয় তো গ্রহে উপগ্রহে 'বস্তু' হয়ে ওঠে। আমার নিজের ধারণা যে, অণুপরমাণুর মত চিন্তাও অবিনাশী—আর স্বপ্ন যখন ঐ চিন্তারই রূপান্তর তখন ওরও বিনাশ নেই; কিন্তু থাক—এখন আর কথা কইতে গেলে চল্‌বে না—বেরুবার সময় হ'ল। আজও রাত্রে যেন আমার জন্যে বসে থেকো না, আমি আজ ফিরবো না সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত যাবো।"

"ইলফ্রাকোম্বে নাকি?"—"শুধু সেই পাগল বেচারীটিকে দেখ্‌বার জন্যে এতদূর না গেলেই নয়?"

"তোমার তারার দেশের ধারণা-সম্বন্ধে তুমি যতখানি পাগল, তা'র চেয়ে এ পাগলামি বেশী নয় ফেরাজ! যে বৈজ্ঞানিক, স্ফটিক-স্বচ্ছ চুম্বুক-চক্রে আলোর প্রতিবিম্ব নিয়ে পরীক্ষা মগ্ন, তা'কে 'পাগল' বলি কি হিসেবে? পঞ্চাশ বছর আগে এডিসনের বৈদ্যুতিক-আবিস্কার-গুলো হয় তো 'অসম্ভব' মনে হয়েছিল—লোকে ভেবেছিল, আবিষ্কারক নিতান্তই উন্মাদ। কিন্তু আজ ঐ দৃশ্যতঃ অলৌকিক ব্যাপারগুলোকে যথার্থ বলে' জানা গেছে বলে,' আমরা আর আশ্চর্য্য হইনে। তা' ছাড়া, আমার বন্ধু বা তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটী কারুর কোন ক্ষতি

করছ না—তার পাগলামি, যদি 'পাগলামিই' বলা যায়, ঠিক তোমারই ধারণার মত নিরীহ।"

"কিন্তু আমার 'পাগলামি' কিছু নেই" ধীরকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"আমি যা' কিছু দেখি বা জানি, সে সমস্তই ছন্দের মত আমার মস্তিষ্কে জীবন্ত। যদিও তা' স্পষ্ট মনে করতে পারি, তবু সেই 'অতীত-কাহিনী' নিয়ে কাউকেই আমি বিরক্ত করিনে।"

"তিনিও, যা' 'ভবিষ্যত-কাহিনী' হ'তে পারে বলে' মনে করেন, তা' নিয়ে কাউকে বিরক্ত করেন না। কোন নূতন ধারণা কারুর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে বলে' তাঁকে 'পাগল' বলা ঠিক নয়; কেননা সময়ে এমনও প্রমাণ হ'তে পারে, যে, সে ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তসঙ্গত। যাক্—আমি যাই, তা' নইলে আবার ট্রেণ পাবো না"।

"ওয়াটালু থেকে 'ছটো-চল্লিশের গাড়ী' যদি হয় তা' হ'লে এখনও সময় আছে, এখন সবে দুটো বেজেছে। জ্যাকোবাকে কিছু বলতে হবে কি?"

"না; যা' বলবার তা' আমি বলেছি"।

ফেরাজ পূর্ণদৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চাহিল; তাহার সুন্দর আনন-খানি সহসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

"আমি কি কখনই তোমার বিশ্বাস-পাত্র হ'ব না?" নতমুখে, মৃদুকণ্ঠে সে বলিল—"জ্যাকোবার মত আমাকেও কি তোমার ঐ অতি-গোপন-রহস্যের রক্ষা-ভার দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পার না?"

মুহূর্ত্তেক গম্ভীর হইয়া, এল র‍্যামি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রলেন।

"আবার এই পাপ কৌতূহল? আমি ভেবেছিলাম, এতদিনে তোমার এ দোষ হয় তো শুধরে গিয়েছে!"

"হোক্, তবু শোন এল র‍্যামি"—ভ্রাতার নয়নে ক্রোধের লক্ষণ-দর্শনে বিপন্ন হইয়া ফেরাজ আকুল-কণ্ঠে বলিল—"এটা ঠিক কৌতূহল নয়, আর কিছু—এমন কিছু যা' আমি ঠিক প্রকাশ করে' উঠতে পারছিনে; বোধ হয়……না, বললে হয়তো তুমি হেসে উঠবে—কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?" ক্রুদ্ধস্বরে এল্‌র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার যেন মনে হ'ল"—স্বপ্ন-জড়িত-কণ্ঠে ফেরাজ উত্তর করিল—"মনে হ'ল, ঐ দোতালার রুদ্ধ-ঘরখানির ভেতর থেকে একটী স্বর আমাকে আহ্বান কর্‌ছে—সে স্বর যেন শান্তি চায়, স্বাধীনতা চায়। বড় করুণ সে স্বর, কিন্তু মধুর, যে-কোনো-সঙ্গীতের চেয়ে মধুর। আমি কচিৎ তা' শুন্‌তে পাই বটে, তবু যখন শুনি, তখন ক্রমাগতই সে আমাকে ডাক্‌তে থাকে। জানি, ওখানে তুমি কোন মহৎ কাজেই নিযুক্ত আছ—কিন্তু শুধু একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে কি ও-রকম স্বর সৃষ্টি করে' তুলতে পারা যায় ?—একি, রাগ করছ তুমি !"

তাহার ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চক্ষুদুটী কাতরভাবে, ভ্রাতার কঠিন ও পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল।

"রাগ কর্‌ছি !" যেন কতকটা চেষ্টার সহিত এল্‌র‍্যামি উত্তর করিলেন—"কখনও কি তোমার কবি-কল্পনার ওপর আমি রাগ করেছি ? এটাও ঐ কল্পনা। ফেরাজ—যে স্বর তুমি শুন্‌তে পাও, তা' তোমার সেই তারার দেবতার ধারণার মতনই অলীক—তোমার মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবি আর প্রতিধ্বনি—অন্য কিছুই নয়। যা'কে তুমি 'মহৎ কাজ' বল্‌ছ তা'র মধ্যে এমন কিছুই নেই যা' তোমার কাছে উপভোগ্য হ'তে পারে। সে শুধু একটা পরীক্ষা—পরীক্ষা, যা'র নিষ্ফলতার অর্থ আমারও নিষ্ফলতা ; যা'তে অকৃতকার্য্য হ'লে আর আমি এল্‌র‍্যামি থাক্‌বো না, গাধারও অধম হয়ে যাবো।" শেষোক্ত কথাগুলি ফেরাজ অপেক্ষা যেন আপনাকেই তিনি অধিক করিয়া বলিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে এতই অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল যে, সহসা চমকিয়া হাস্য না করা পর্য্যন্ত, বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি আপন অবস্থানের কথাও ভুলিয়া গিয়াছেন।

"এখন তবে আসি, ভাই !" আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তথ্য নিয়ে আমি যতটুকু সুখী, স্বপ্ন নিয়ে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী সুখী—এ সুখ ছেড়ে মিথ্যা কৌতূহল আর অলস প্রশ্নে জীবনকে দুঃখময় করে' তুলতে চেও না।"

এল র‍্যামি বাহির হইয়া গেলেন এবং দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়া ফেরাজ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে কিয়ৎকাল কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত বাড়ীখানা তাহার নিকট অত্যন্ত নিস্তব্ধ মনে হইতে লাগিল—বাতাসটাও যেন হতাশাব্যঞ্জক! তাঁহার এত প্রিয় যে সঙ্গীত তাহাও যেন এখন আর ভাল লাগিতেছিল না!

অন্যমনে ভ্রাতার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া, সে স্থির করিল ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কিছু পড়িবে এবং পছন্দসই কোনো গ্রন্থের অনুসন্ধানে চারিদিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, টেবলের উপর একখানা বই পাতা-খোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পুস্তকখানি আরবী ভাষায় চর্ম্ম-পত্রের উপর হস্তাক্ষরে লিখিত—এবং চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার আশ্চর্য্য হরফ ও মসীচিত্রে বিচিত্র চিহ্নময়। এল র‍্যামি ভ্রমবশতঃই এখানা আজ বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছেন—নতুবা এই বিশেষ মূল্যবান সামগ্রীটী প্রায়ই তিনি চাবী বন্ধ করিয়া রাখেন। গ্রন্থখানিকে সম্মুখে লইয়া ফেরাজ উপবেশন করিল এবং দুই হাতের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া ঐ খোলা অংশটা পড়িতে লাগিল। যদিও আরবীই তাহার মাতৃভাষা, তথাপি বর্ত্তমান গ্রন্থের ঐ বিশেষ ভাষাভঙ্গী আয়ত্ত করিতে তাহাকে কতকটা বেগ পাইতে হইতেছিল—কারণ, অক্ষরগুলো বিশেষ স্পষ্ট ছিল না, অধিকন্তু যেন ক্রমাগতই চোখের উপর অদৃশ্য হইয়া হইয়া যাইতেছিল। এটা আশ্চর্য্যও বটে, বিরক্তিকরও বটে—কিন্তু ঐ অদৃশ্য অক্ষরগুলো পরক্ষণেই স্বস্থানে অবস্থিত হইতেছে দেখিয়া, সে স্থির করিল, হয় তো ইহা তাহারই দৃষ্টি বা মস্তিষ্কের কোনো প্রকার ত্রুটী। অগত্যা বইখানা হাতে করিয়া সে খোলা জানালার ধারে উঠিয়া আসিল এবং পূর্ণ আলোকের সাহায্যে এমন একটা অংশের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইল যাহা তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। অংশটী এইরূপ :—

"অতএব, মর্ম্মস্পৃক দৃষ্টি বিভ্রম বা ধারণা, তথা ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রবল চিত্তবৃত্তি বা স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি, স্বেচ্ছা-সঙ্কেতের সাহায্যে মানব হইতে মানবান্তরে সহজেই পরিচালিত করা যায়। দর্শন-স্নায়ুকে চেতনা বিরহিত করাই ইহার সর্ব্বপ্রথম উপায়; ইহা দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে—প্রথম, মনে-মনে-দুইশত-গণনা-কাল-পর্য্যন্ত, একটী উজ্জ্বল ও গোলাকার চুম্বক-প্রস্তরাধারের প্রতি কাহাকেও নিবদ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া—

দ্বিতীয়, ইচ্ছ বলে আপন চক্ষুকে ঐরূপ চুম্বক-গুণ-সম্পন্ন করতঃ কাহাকেও তৎপ্রতি চাহিতে বাধ্য করিয়া। এতদুভয়ের যে- কোনো একটী উপায়ে দর্শন-স্নায়ুর সাময়িক অসাড়তা ঘটিবে এবং তৎসংক্রান্ত শিরাভিমুখে রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এতদ্বারা মস্তিষ্কের বহির্জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় কেবল মাত্র আন্তর সঙ্কেত অন্তমুখেই তাহা জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং অনায়াসেই যে-কোনো ভ্রান্ত- সঙ্কেত গ্রহণ করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায়, তুমি যাহা কিছু দেখাইতে ইচ্ছা কর, যাহা কিছু শুনাইতে ইচ্ছা কর, অথবা যাহা কিছু করিতে আদেশ কর, তোমার শক্তি-সমাচ্ছন্ন-ব্যক্তিটী তাহাই দেখিবে, শুনিবে বা করিবে। যদি আলোক বাত স অথবা শব্দতরঙ্গের প্রাকৃতিক নিয়ম তোমার জানা থাকে, তবে এই সাময়িক-শক্তিকে তুমি অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্তও রক্ষা করিতে পার। এই একই সম্মোহন শক্তি ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও যেরূপ, জন-সংঘ-সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযোজ্য"।*

ফেরাজ বারংবার অংশটুকু পাঠ করিল—পরে, টেবিলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় বইখানি তদুপরি রাখিয়া দিল; তাহার সমস্ত চিত্ত আজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

"আমাকে তিনি স্বপ্নচারী বলেন, খেয়ালী বলেন"—অনুপস্থিত ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া ফেরাজ ভাবিতে লাগিল—"কবিতা, সঙ্গীত আর কল্পনা লইয়াই আমি মত্ত; বেশ, এক্ষণে এমন হইতে পারে না কি যে আমার ঐ স্বপ্নও তাঁহারই প্রদত্ত খানা? এই যে আমি তাঁহার এতটা অনুগত ইহা কি স্বেচ্ছাক্রমে না তাঁহারই প্রভাব ফলে? আমার এই উন্মাদনা বা খেয়াল অথবা যাহাই হউক—ইহা কি তাঁহারই দান? যদি স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে কি জন-সাধারণের মতই একজন হইয়া উঠিতাম না?.........কিন্তু আমাকে সুখী করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিই বা তিনি করিয়াছেন? গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত দেখিতেছি এরূপ কোনো সম্মোহন-শক্তি কি তিনি আমার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন?...... কৈ, তাহা তো মনে পড়ে না। নিঃশব্দ আহ্বান শুনিতে পাইব বলিয়া তিনি আমার অন্তরের

* "The natural Law of Miracles, written in Arabic 400 B. C."

অনুভূতিটুকুই সহজ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। এই যে আমি এমন অনেক অদৃশ্য সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই বা জানিতে পারি যাহা স্থূল-চিত্তের অগম্য—ইহা কি তৃপ্তিকর নয়?—নিশ্চয়ই তৃপ্তিকর, অন্ততঃ আমার উচিৎ ইহাতে তৃপ্ত হওয়া,.........কিন্তু তথাপি কখনও কখনও মনে হয়, কি-যেন কোথায় হারাইয়াছি, কি-যেন ঠিকমত মিলাইয়া নিতে পারিতেছি না!"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ফেরাজ পুনরায় উভয় হস্তের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিল। কেমন একটা নিরানন্দ ভাবে আজ তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; বাতায়নপথে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল—তাহাও যেন আজ ঔজ্জ্বল্য-হীন!

সহসা ফেরাজের স্কন্ধের উপর একখানি হস্ত রক্ষিত হইল; চমকিত হইয়া সে থতমতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—পরে পশ্চাত ফিরিয়া অপ্রতিভ-হাস্য করিল—কারণ, আগন্তুক অন্য কেহই নহে, জ্যারোবা-মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জ্যারোবামাত্র;—কৃশাঙ্গী, বৃদ্ধা, ভয়ঙ্কর-লোচনা, কুৎসিত দর্শনা ও ভীষণাকৃতি জ্যারোবা; লোহিত-বন্ধনী-পরিবেষ্টিত পিঙ্গল তাহার পরিচ্ছদ—ধূসর-শিরোবেষ্টনীতলে গ্রন্থিবদ্ধ ধূম্র কেশজাল—সগর্ব্ব বর্ব্বর-ভঙ্গিমায় ঋজুভাবে সে দণ্ডায়মানা। তাহার কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে বিগত-রজনীর তুলনায় আজ অধিকতর সজীবতা সপ্রকাশ, এবং পার্শ্বস্থ যুবকের নয়নরম্য দীপ্ত-সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহার কণ্ঠস্বরও যেন আজ রুক্ষতা-লেশ পরিশূন্য।

"এল র‍্যামি গিয়াছে?" সে প্রশ্ন করিল।

ফেরাজ গ্রীবাভঙ্গী করিল। সাধারণতঃ ইসারা ইঙ্গিতেই সে জ্যারোবার সহিত কথা-বার্ত্তা চালাইত।

"কোথায় গেল?"

ফেরাজ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে তিনি সহর-বহির্ভাগে কোনো বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছেন।

"আজ রাত্রে আর ফিরছে না তা' হলে"—চিন্তিতভাবে জ্যারোবো বলিল—"আজ আর ফিরছে না।"

সে উপবেশন করিল এবং জানুর উপর হাত রাখিয়া কয়েক মিনিট আপন মনে দুলিতে লাগিল; পরে, শ্রোতা অপেক্ষা যেন আপনাকেই অধিক করিয়া শুনাইয়া, বলিল :—

"সে, হয় দেবতা না হয় দানব—কিম্বা হয়তো দুইই একাধারে। একবার আমাকে সে মরণের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে, সে কথা কখনই আমি ভুল্‌বো না; তা' ছাড়া, কাল রাত্রে তা'র কৃপায় আমি জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছিলাম—কালো চুলের খোঁপাখানিতে সোণার ফুল গুঁজে', মুক্তোর মালা দুলিয়ে, কত গানই কাল গেয়েছি, কত হাসিই না হেসেছি—হারানো-যৌবন আবার কাল ফিরে এসেছিল!"—সহসা উন্মত্ত চীৎকারে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সে প্রবল বেগে হাততালি দিয়া উঠিল—রূপার চুড়িগুলো বাজিয়া উঠিল, ঝন্ ঝন্ ঝন্ —

"আবার—আবার সেই হারানো যৌবন!·········তুমি জানো, যৌবন কা'কে বলে"—টেবিল-পার্শ্বোপবিষ্ট ভীত-বিস্মিত ফেরাজের প্রতি ঈর্ষাকটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া সে আবেগভরে বলিতে লাগিল—"অন্ততঃ জানা তোমার উচিত!·········শিরায় শিরায় উষ্ণ-রক্তস্রোত—প্রাণে প্রাণে আনন্দের ছন্দতাল—ফুলে ফুলে সখিত্বের অভাব-পূরণ—পাখীর গানে হৃদয়ের আকুলতা—মৃত্তিকাকে বায়ুভ্রমে লঘু চরণক্ষেপ—প্রণয়াস্পদের বহ্নিভরা নয়নে নয়ন-সংযোগ আর সর্ব্বাঙ্গে পুলক-শিহরণ, একেই বলে যৌবন!—আহা হা, যৌবন—মধুর যৌবন!—এই যৌবন আবার কাল ফিরে এসেছিল। আবার আমার প্রিয়তম, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব কাল পাশে এসে বসেছিলেন—মধুর, মধুর চুম্বনে আমাকে আকুল করে' দিয়ে কত সোহাগেরই কথা বল্‌ছিলেন! 'জ্যারোবা, প্রাণেশ্বরী আমার! মরুভূমির মধুনির্ঝর আমার! ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ নয়ন বহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি; তোমার ঐ সুগোল-বাহু-কারাগারে হৃদয়খানি আমরণ বন্দী করে' রাখি; কি রূপ তোমার, জ্যারোবা, কি সুন্দরী তুমি!'—এম্‌নি কতই কথা। এল র‍্যামির কৃপায় কাল আমি সুন্দরী হয়েছিলাম—শুধু একটী রাতের জন্যে"—

করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে তাহার স্বর মিলাইয়া গেল ; করুণা-ভরা দুটী চক্ষে ফেরাজ অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। বহুবিধ আশ্চর্য্য ও জটিল মনোভাবের মধ্যে অনেকবার তাহাকে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এতটা উত্তেজিত পূর্ব্বে কখনও সে হয় নাই।

"কি, তুমি হাস্‌ছো না যে এখনও ? উপহাস কর্‌ছো না যে আমাকে ?"—উত্তেজিত কণ্ঠে জ্যারোবা বলিতে লাগিল—"একটা লোলচর্ম্মা বিকটাকার বৃদ্ধা, একটা স্বজন-পরিত্যক্তা হতভাগিনী তা'র বিনষ্ট যৌবনের স্বপ্ন দেখ্‌ছে,—বল্‌ছে, যে এককালে সে সুন্দরী ছিল, এককালে তা'র প্রণয়পাত্র ছিল, এককালে তা'র রূপের স্তাবক ছিল—এতেও তোমার উপহাস কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না ? এ যে উপহাসেরই কথা !"

ফেরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধার সম্মুখে নতজানু হইয়া শ্রদ্ধানম্র ধীরতার সহিত তাহার লোলহস্তখানিতে আপন ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। আর বৃদ্ধা ?—এই করুণা-বিগলিত বিনম্র ব্যবহারে সে শিহরিয়া উঠিল ; তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রান্ত ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"হতভাগ্য বালক !" গভীর অনুকম্পাভরে জ্যারোবা বলিল, "হতভাগ্য বালক !—বালক আমার কাছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে তুমি যুবক—হাঁ, নিশ্চয়ই যুবক !"......সে থামিল এবং অপলক-বিস্ময়-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমাকে ক্ষমা কর ফেরাজ—বড়ই অন্যায় করেছি—জানি, বয়স্থাকে তুমি বিদ্রূপ কর্‌তে পার না, দুঃখিনীকে উপহাস-পাত্রী মনে করা তোমার স্বভাবই নয়—অতি ভদ্র, অতি সহৃদয় তুমি। যথার্থ বল্‌তে কি, আমার মনে হয়, এত কোমলতা তোমার না থাক্‌লেও চল্‌তো—এত নারী প্রকৃতিক না হ'লেই বুঝি—"

"নারী প্রকৃতিক !"—কশাঘাত অশ্বের মত, কেন বলা যায় না, ফেরাজ সহসা যেন লাফাইয়া উঠিল ! তাহার বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল—হৃৎপিণ্ড দ্রুত-স্পন্দিত হইল—ভাবে বোধ হইল, যেন হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিলে এই মুহূর্ত্তেই সে তাহা টানিয়া বাহির করিত ! এত সুন্দর তাহাকে কখনও দেখায় নাই ; তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া, বিজয়িনী পিশাচীর মত উচ্চহাস্য-সহকারে জ্যারোবা করতালি দিয়া উঠিল।

"তাইতো বলি!" হর্ষভরে সে চীৎকার করিল—"এই যে পৌরুষেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে! তা' হ'লে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুও তোমার ভেতর রয়েছে—এমন কিছু যা' তোমার অস্তিত্ব-রহস্য পরিস্কার করে, তুলবে—যা' বল্‌তে চায়—ফেরাজ, অদৃষ্টের ক্রীতদাস তুমি—ওঠো, তা'র প্রভু হও! ফেরাজ, নিদ্রিত তুমি—জাগরিত হও, জাগরিত হও!'...... দৈবাদেশ-প্রচার-নিরতা আবিষ্টা পিশাচসিদ্ধার ন্যায়, মর্য্যাদা-গর্ব্বে অটল দণ্ডায়মান হইয়া জ্যারোবা ক্রমোচ্চতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ফেরাজ, যৌবন আছে তোমার—সফল কর! ফেরাজ, জীবনের একমাত্র আনন্দ যে প্রেম, সেই প্রেম-বঞ্চিত তুমি—তা'কে জয় কর, তা'কে আপন কর!"

নির্ব্বাক-বিস্ময়ে ফেরাজ, তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এরূপ ভাষায় সে পূর্ব্বে কখনও জ্যারোবা-কর্ত্তৃক সম্বোধিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি কেমন একটা উৎকণ্ঠায় তাহার চিত্ত যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রেম? অবশ্য এ কথার অর্থ সে বুঝিত; ইহা একটী আদর্শ হৃদয়বৃত্তি; প্রার্থনার দ্বারা যেমন আত্মোন্নতি ঘটে, ইহাতেও সেইরূপ চিত্তের উৎকর্ষ ঘটিতে থাকে। ভ্রাতার মুখে কি সে অনেকবার শ্রবণ করে নাই যে পূর্ণপ্রেম এ পৃথিবীতে দুর্লভ?—ইহা কি সেই অনির্ব্বচনীয় কিছু নয় যাহার আভাসটুকু মাত্র সঙ্গীতে প্রকাশ পায়? যতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া ছিল ততক্ষণ ঐ চিন্তা সমূহ তাহার মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল—অতঃপর জ্যারোবার আবেগময়ী ভাষার প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত হইয়া, সে টেবিলপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল এবং পেন্সিল লইয়া লিখিল—

"তোমার উক্তি প্রলাপবৎ জ্যারোবা—সম্পূর্ণ সুস্থ নও তুমি। আর কিছু আমি শুন্‌তে চাই নে—আমার মনের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। ভালবাসা যে কি, জীবন যে কা'কে বলে তা' আমার জানা আছে; কিন্তু আমার জীবন ও ভালবাসার উৎকৃষ্টতম অংশ এখানে নেই—তা' অন্যত্র।"

কাগজখণ্ডটী তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া জ্যারোবা পাঠ করিল, এবং রাগে অধীর হইয়া, উহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"নির্ব্বোধ যুবক!" সে গর্জ্জিয়া উঠিল—"তোমার ভালবাসা, স্বপ্নের ভালবাসা—তোমার জীবন, স্বপ্ন-জীবন! তুমি দেখ অপরের চোখ দিয়ে—তুমি চিন্তা কর অপরের মস্তিষ্ক নিয়ে;

অন্যের ইচ্ছা-চালিত একটা যন্ত্রমাত্র তুমি ! কিন্তু চিরদিন এ প্রতারণায় তুমি ভুলে থাক্‌বে না—না, কখনই না,—"এইখানে, ঈষৎ শিহরিয়া সে একবার ভয়ে ভয়ে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, যেন এখনই কেহ হঠাৎ গৃহপ্রবেশ করিলেও করিতে পারে ; পরে বলিল—"শোন ! আজ রাত্রে আমার কাছে এস—রাত্রে, যখন সমস্ত স্তব্ধ, সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসবে—রাস্তায় যখন জনমানবের সাড়া থাক্‌বে না,—সেই সময় এস—এমন কিছু তোমাকে দেখাব যা' বিশ্বের বিস্ময় ! - যা' ঠিক তোমারই মত স্বপ্ন-জীবনের আর একটা দৃষ্টান্ত !" সহসা থামিয়া জ্যারোবা ভয়-চকিতবৎ আবার চারিদিকে চহিল,—পরে, সাহসে বুক বাঁধিয়া পুনরায় সঙ্গীর দিকে, কতকটা ঝুঁকিয়া কাণে কাণে বলিল—"এস !"

"কিন্তু কোথায় ?" ফেরাজ ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল।

"ঐ দোতালায় !" ফেরাজের বিপুল বিস্ময়ের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া দৃঢ়স্বরে জ্যারোবা উত্তর করিল—"দোতালায় যেখানে এল র‍্যামি তা'র মহারহস্য গোপনে রেখেছে। আমি জানি, ওখানে যাওয়া তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ,—ঠিক তেমনি, ও সম্বন্ধ কথা কওয়াও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ,—কিন্তু আমরা দু'জন কি তা'র হুকুমের চাকর ? চিরকালই কি তা'র হুকুম তামিল করবে ? তোমার ইচ্ছে হয় করতে পার—কিন্তু আমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হ'তাম, তা' হ'লে দেবতাই হোন্ কি দানবই হোক্, আমার স্বাধীনতায় যে হস্তক্ষেপ করতো, তা'কেই আমি হেলায় উপেক্ষা করতাম। আমি, জ্যারোবা, আমার নিজের রুচির কথা বল্‌লাম—এখন তোমার যা' খুসী কর্‌তে পার,—ইচ্ছে হয়, বসে বসে জীবনের স্বপ্ন দেখ, আর না হয়, এস, জীবনকে উপভোগ কর ! বিদায়—রাত না হওয়া পর্য্যন্ত !"

বিস্মিত ফেরাজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই জ্যারোবা দ্বারপার্শ্বে অন্তর্হিত হইল, এবং একাকী দাঁড়াইয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলে সে অস্থির হইয়া উঠিল। "পাপ কৌতূহল !" এই একটু পূর্ব্বে ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক উক্ত ভাষায় সে তিরস্কৃত হইয়াছে, তথাপি এল র‍্যামির ঐ মহারহস্যটী জানিবার বর্ষব্যাপী কৌতূহলে, পুনরায় এত শীঘ্র সে বিসর্জ্জিত চিত্ত ?

ক্লান্তভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, ব্যাপারটার আগাগোড়া ফেরাজ চিন্তা করিতে লাগিল। সে চিন্তা এইরূপ :—

প্রথমতঃ, ঐ কয়েক বৎসরের জ্যেষ্ঠ ভাইটী ছাড়া আর কোনো বন্ধু বা অভিভাবককে সে জানে না। কিরূপে বা কবে, স্মরণ নাই, এবং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেহ বলেও নাই, প্রাচ্য-ভূখণ্ডের কোনো একটা জায়গায় জনক-জননীর একই কালে হঠাৎ মৃত্যুর পর হইতে ঐ ভ্রাতার কোলেই সে মানুষ হইয়াছে—তাঁহার সহবাসে সর্ব্বদাই আনন্দ পাইয়াছে, এবং তাঁহার সহিত প্রায় সমস্ত পৃথিবীই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। তাহারা কোনো কালেই ধনী নয় সত্য, তথাপি সুখে কাল কাটাইবার কোনো উপকরণেরই এ যাবৎ অভাব ঘটে নাই—যদিও কোথা হইতে তাহা সংগৃহীত হয় সে বিষয়ে ফেরাজ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার ভ্রাতার জীবনই যে বিশেষ অসাধারণ ছিল এমনও নয়; কেবল একবার যখন উভয়ে সিরিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় একদল রুগ্ন শীর্ণ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আরব পথিকের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাত হয় এবং এল র‍্যামি সেই দলের জনৈক বৃদ্ধা ও লিলিথ নাম্নী একটী বালিকার মৃত্যু-কাতরতা দর্শনে দয়া পরবশ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে চিকিৎসায় ব্রতী হন। দু'একদিনের মধ্যেই বৃদ্ধা আশ্চর্য্যরূপে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে, কিন্তু বালিকাটী—বছর বারো তাহার বয়স—মারা যায়। এইখান হইতেই রহস্যের সূচনা। যে দিন বালিকাটীর মৃত্যু হইল, ঠিক সেই দিনই এল র‍্যামি হঠাৎ তাঁহার ভাইকে কতকগুলো দলিল-পত্রের বহন-ভার প্রদান করিয়া আলেকজেণ্ড্রিয়ায় প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে ঐ সকল দলিল অতীব মূল্যবান ও আবশ্যকীয়, অতএব সাইপ্রাস দ্বীপের কোনো বিশিষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে উহা পৌঁছিয়া দিবার জন্য এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। ফেরাজ অনুমতি-পালন করে; পুনরাদেশ পাইয়া উক্ত ধর্ম্মসংঘে কিছুকাল অবস্থিতিও করে; পরিশেষে এল র‍্যামির প্রেরিত লোকের সহিত লণ্ডনে আসিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হয়।

এখানে আসিয়া ফেরাজ সবিস্ময়ে দেখিল, এল র‍্যামি এই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে অবস্থান করিতেছেন—সঙ্গে সেই সিরিয়া-মরুর মৃত্যু-কবল-মুক্তা বৃদ্ধা জ্যারোবা! জ্যারোবার উপস্থিতিই তাহার অধিকতর বিস্ময়ের কারণ হইল, কেন না সে দেখিল, উপরের কয়েকটী

ঘর সুবিন্যস্ত রাখা ছাড়া এ বাটীতে তাহার অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই, অথচ ঐ বৃদ্ধা বিম্বা সিরিয়া-মরুভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করার পর যাহা কিছুই ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে এল র্যামি নিতান্তই গম্ভীর! প্রথম প্রথম কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া ফেরাজ নানারূপ প্রশ্ন করিত, কিন্তু এল র্যামির দিক হইতে দ্ব্যর্থক উত্তর বা সম্পূর্ণ নীরবতার অতিরিক্ত কিছুই পাইত না। ক্রমে ব্যাপারটা তাহার সহিয়া আসিল, এবং যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে ভ্রাতার একান্ত ইচ্ছানুগ হইয়া পড়িতে লাগিল—এ আনুগত্যের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা কোনোমতেই সে খুঁজিয়া পায় নাই। অবশ্য, শারীর-মোহিনী-বিদ্যায় এল র্যামি যে কিয়ৎ পরিমাণে দক্ষ তাহা সে জানিত এবং আপনাকে সে শক্তির পরীক্ষাধীনও করিয়াছিল,—এমন কি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ শক্তি যাহাতে বিকাশ-লাভ করে সে বিষয়েও তাহার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত--কারণ, সে দেখিত, যে সকল বিষয় এল র্যামি সাগ্রহে অধ্যয়ন করেন, ইহাও তন্মধ্যে একটা। তাহার ভ্রাতা যে দূর হইতে চিন্তা-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতে সক্ষম একথাও সে জানিত; কিন্তু এ শক্তি তাহার জাতির মধ্যে অনেকেরই আয়ত্তীভূত থাকায়, বিশেষতঃ প্রাচ্য-প্রদেশ সমূহে প্রচুর প্রচলন লক্ষ্য করায় এ বিদ্যাকে সে বিশেষ কিছু বলিয়া মনে করে নাই। একাধারে সঙ্গীত, কবিত্ব, সৌন্দর্য্যানুভূতি, কলাবিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিভার দানে অলঙ্কৃত ফেরাজ আপনিই আপন শান্তিনীড়খানি রচনা করিয়া লইয়াছিল—কেবল ঐ জ্যারোবা পরিরক্ষিত দ্বিতল কক্ষগুলির দুর্ভেদ্য রহস্যই সর্পের ন্যায় মাথা তুলিয়া তুলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার শান্তিনীড়ে সংশয় ও কৌতূহলের ফণা বিস্তার করিত; অথচ এ প্রসঙ্গের উত্থাপন মাত্রেই এল র্যামি বিরক্ত হইতেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল তাহারা এ বাটীতে একত্র বাস করিতেছে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর কয়েকবার মাত্র সে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছে—অপর পক্ষে, জ্যারোবাও বিশ্বস্তভাবে এ যাবৎ সকল রহস্যই তাহার নিকট হইতে গোপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ কিন্তু সে এই বহুকালের সুরক্ষিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে উদ্যত,--ফেরাজ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

"এল র্যামি যে বলে, সমস্তই অদৃষ্ট—তাহা কি ঠিক?" সে ভাবিতে লাগিল—"কিম্বা 'হাসামুখে অদৃষ্টেরে করবো আমি পরিহাস'? প্রলোভনের স্রোতে ভাসিয়া যাইব—না,

প্রলোভনকে জয় করিব ? তাহার আদেশ অমান্য করিয়া, তাহার স্নেহ হারাইয়া স্বাধীন হইব—না, এখনও তাহাকে মানিয়া চলিব, তাহার ক্রীতদাস-স্বরূপ থাকিব ? কিন্তু যদিই বা স্বাধীনতা পাই, তাহা লইয়া করিব কি ? নারীপ্রকৃতিক ! উঃ, কি নিষ্ঠুর বাক্য ! সত্যই কি আমি নারীপ্রকৃতিক ?" বিরক্ত ও অধীর পদক্ষেপে সে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ;—পিয়ানোটী উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহার সুদৃশ্য হস্তীদন্ত-বিনির্ম্মিত চাবিগুলি আজ তাহাকে আকর্ষণই করিতে পারিল না,—তাহার মস্তিষ্ক আজ এমন কতকগুলি অভূতপূর্ব্ব ধারণায় অনুপ্রাণিত যাহার পার্শ্বে মধুর সঙ্গত সৃষ্টির বিন্দুমাত্রও স্থান নাই !

"মিথ্যা কৌতূহল আর অলস প্রশ্নে জীবনকে দুঃখময় করে' তুলতে চেও না"।

বিদায়ের পূর্ব্বে তাহার ভ্রাতা ঐরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা ও উদ্বেগের ঘাতপ্রতিঘাতে চঞ্চল-চিত্ত ফেরাজ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা ভাবিতে ভাবিতে, উত্তেজিত অধীর চরণক্ষেপে যতই পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভ্রাতার ঐ শেষকথা কয়টী ততই যেন তাহার কর্ণে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে অপরাহ্নের ম্লানায়মান শেষ দীপ্তি একেবারেই মিলাইয়া গেল এবং ধরণীবক্ষে তিমিরাঞ্চল লুটাইয়া পড়িল ।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সৃষ্টি বৈচিত্র্য।

নিশীথের অন্ধকার মাঝে,
প্রভাতের আলোক ঘুমায়।
ক্রীড়ারতা বালিকাতে যথা,
মাতৃমূর্ত্তি সদা শোভা পায়।
জগতের হাসির মাঝারে,
বিষাদের ক্রন্দনের গান।
বিনাশেতে সৃষ্টির অঙ্কুর,
বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান।
নীলানন্ত লবণাম্বুতলে,
শুক্তিগর্ভে জন্ম মুকুতার।
নরেশের কিরীট ভূষণ
মণি হাসে খনিতে আঁধার।
তপ্ত রবি রশ্মি ধরি বুকে,
জ্যোৎস্না সুধা দেন হিমকর।
পঙ্কে জন্মে পঙ্কজ সুষমা,
বসুধার বৈচিত্র্য সুন্দর।
তা হ'তেও আশ্চর্য্য সৃজন,
আমার এ ভাল মন্দ সব।
তোমারি যে বিচিত্র স্বরূপ,
আমি তব বিশ্বেতে সম্ভব।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

বাঙ্গলায় বাচ্যান্তর।

ঠিক চারি বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এইরূপ একটা প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল "নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর। আমি সেই সময় হিতবাদী পত্রে লিখিয়াছিলাম "বাঙ্গলায় বাচ্যান্তর কি ঠিক সংস্কৃতের মত? 'তস্কর পুস্তক অপহরণ করিয়াছে' এখানে 'কৃ' ধাতুর রূপ ছাড়া সবগুলিই সংস্কৃত কথা, এমন কি আসল ক্রিয়া ঠিক 'করিয়াছে' নয়, 'অপহরণ করিয়াছে'। সুতরাং এরূপ বাক্যের কর্ম্মবাচ্য হইবে 'তস্কর কর্ত্তৃক পুস্তক অপহৃত হইয়াছে'। কিন্তু 'অপহরণ' না থাকিয়া যদি 'চুরি কথা থাকে তাহা হইলে চুরি গিয়াছে' বা 'চুরি হইয়াছে' বলিলে কি বাচ্যান্তর হয় না?"

এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, বাঙ্গলায় এই রূপই ঠিক কর্ম্মবাচ্যের রূপ। "আমি তাহাকে দর্শন করিলাম" এই বাক্যে দর্শন কথাটি সংস্কৃতের খাঁটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সুতরাং ইহার কর্ম্মবাচ্যে "সে দৃষ্ট হইল" বলিলে সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই বাচ্যান্তর করা হইল। কিন্তু "দেখিলাম" এই বাঙ্গলা কথাটি ব্যবহার করিলে বাচ্যান্তরে দাঁড়াইবে "তাহাকে দেখা গেল" বা "আমার দেখা হল"।

বাঙ্গলা ভাষার বাচ্যের প্রকৃত ও নিয়ম নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে বাচ্যের একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই। হিন্দী ও ইংরাজীতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তর হয় না। সংস্কৃতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে ভাববাচ্য এবং সকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য। অথচ বাঙ্গলায় অকর্ম্মক-সকর্ম্মক নির্ব্বিশেষে একরূপে বাচ্যান্তর হয়—'হ' বা 'যা' ধাতু যোগ করিয়া। সুতরাং এক কথায় উভয় বাচ্য বুঝাইবার জন্য আমি "হওয়া-বাচ্য" বলিব। কারণ এরূপ বাচ্যে কর্ত্তার বড় কর্ত্তৃত্ব থাকে না; কাজটাই হয়, তা সেটা অকর্ম্মক ক্রিয়ার কাজই হউক আর সকর্ম্মক ক্রিয়ার কাজই হউক। যথা, শোওয়া হইল বা গেল, চুরি হইল বা গেল। যেখানে কর্ত্তা একেবারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সংস্কৃতে সেখানে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য বলে। আমি সেগুলিকেও এই হওয়া বাচ্যের অন্তর্গত করিতে চাই। যথা

হাসি পায়, খিদে লাগে, মাথা ধরিয়াছে, পয়সা জুটল না ইত্যাদি। ইহাদের কর্ত্তৃবাচ্য হয় না। আর যেখানে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্পষ্ট, কাজটা কেহ করিতেছে, তাহার নাম দিব "করা-বাচ্য"; যথা, আমি শুই, সে পুথি পড়ে।

এখন দুইটা অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ক্রিয়া লইয়া তিন কালের অনুজ্ঞা বা বিধি অর্থে—দুই বাচ্যের রূপ দেখা যাক্—

	করা-বাচ্য	হওয়া-বাচ্য
বর্ত্তমান	আমি শুই।	আমার শোওয়া হয় বা শোয়া যায়।
অতীত	আমি শুইলাম	আমার শোওয়া হলো বা শোওয়া গেল।
ভবিষ্যৎ	আমি শুইব	আমার শোওয়া হবে বা শোওয়া যাবে।
বিধি	(আমি) শুই (তুমি) শোও (সে) শুউক	(আমার, তোমার, তাহার) শোওয়া হউক বা শোওয়া যাউক।
বর্ত্তমান	সে পুথি পড়িতেছে	তাহার পুথি পড়া হইতেছে বা পুথি পড়া যাইতেছে।
অতীত	সে পুথি পড়িতেছিল	তাহার পুথি পড়া হইতেছিল বা পুথি পড়া যাইতেছিল।
ভবিষ্যৎ	সে পুথি পড়িবে	তাহার পুথি পড়া হইবে বা পুথি পড়া যাইবে।
বিধি	পুথি পড়ি, পড়, পড়ুক	পুথি পড়া হউক বা যাউক।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, 'হ' ধাতুর যোগে "হওয়া-বাচ্য" হইলে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয় কিন্তু 'যা' ধাতুর যোগে হইলে কর্ত্তার উল্লেখ একেবারে থাকে না। করা-বাচ্যে যাহা

কর্ম্ম ছিল, হওয়া-বাচ্যে তাহাতে সংস্কৃতের মত ১মা হয় কি? স্বর্গীয় পণ্ডিত নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি বাঙ্গলা রচনা পুস্তকে কেবল 'হ' ধাতুর যোগে বাচ্যান্তর করা হইয়াছে। তাহতে আছে কর্ম্ম-বাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা হয়। "আমি রামকে মারিলাম" ইহার হওয়া-বাচ্যে যদি কর্ম্মের পূর্ণ রূপ রাখিতে হয় তাহা হইলে দাঁড়াইবে "রামকে মারা হল" কিংবা "রামকে মারা গেল"। অন্ততঃ ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য কর্ম্ম হইলে হওয়া-বাচ্যেও ২য়া বিভক্তিই থাকে।

হওয়া-বাচ্যে বিহারীভাষায় "সুতল জায়" "পঢ়ল জায়" ইত্যাদি এবং হিন্দী ভাষায় "শোওয়া" "পড়া"র সহিত যা ধাতুর যোগ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় 'হ' কিংবা 'যা' এই দুই ধাতুর যোগে বাচ্যান্তর হয় কিন্তু হিন্দী ও বিহারী ভাষায় কেবল 'য' ধাতুর যোগ হয়। বাঙ্গলাতেও 'হ' ধাতু অপেক্ষা 'যা' ধাতুর ব্যবহার অধিক বলিয়াই মনে হয়। হিন্দী, বিহারী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষাতেই বাচ্যান্তর কালে ও অন্য সময়ে অপূর্ণভূত কাল ব্যতীত অন্য ভূতকালে 'যা' ধাতুর স্থানে 'গম্' ধাতু হয়।

রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা ব্যাকরণে (১০ পৃঃ) লিখিয়াছেন "শব্দ শোনা যায়, চাঁদ দেখা যায় প্রভৃতি উদাহরণে যায় ক্রিয়ার কর্ত্তা শোনা দেখা।......যায় ক্রিয়ার মুখ্য কর্ত্তা শোনা হইলেও শব্দও কর্ত্তা।" এগুলি যে কর্ম্ম বাচ্যের প্রয়োগ তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কেহ না কেহ চাঁদ দেখে বা শব্দ শোনে। সুতরাং চাঁদ বা শব্দ কর্ম্ম, কর্ত্তা নহে।

হিন্দীভাষায় 'পঢ়া' 'শোওয়া' ও বিহারীভাষায় 'পঢ়ল' 'সুতল' বিশেষণ সুতরাং বাঙ্গলাতেও হওয়া-বাচ্যের 'পড়া', 'শোওয়া' বিশেষণ বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলাতে অন্যত্র পড়া শোওয়া, বিশেষ্যও হয়।

এখন দেখা যাক, হওয়াবাচ্যে 'হ' ধাতু বা 'য' ধাতু কোথা হইতে আসিল। সংস্কৃতে দুই প্রকারে বাচ্যান্তর হইত। প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞায় কৃত্য-প্রত্যয় যোগে এবং সকর্ম্মক ধাতুর অতীতকালে ক্ত-প্রত্যয় যোগে। দ্বিতীয়তঃ লট্, লোট্, লঙ ও বিধিলিঙে ধাতুর উত্তর যক্ বা য আদেশ করিয়া আত্মনেপদের বিভক্তি যোগে। কৃৎ-প্রত্যয় যোগে

বাচ্যান্তর ঘটিলে ভূ ধাতুর রূপ কখনও দেওয়া হইত, কখনও বা উহ্য থাকিত। বাঙ্গলায় হওয়া-বাচ্যের 'হ' ধাতুর ইহা হইতে উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু 'যা' ধাতুর রূপ সাক্ষাৎভাবে আসিতেছে না। 'যা' ধাতুর মূল অর্থ 'পাদচালনা' এখানে প্রয়োগ করিলে অর্থসঙ্গত হয় না।

প্রাকৃত প্রকাশ ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে (৭।৮) "ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে বিহিত 'যক্' স্থানে 'ঈঅ' ও 'ইজ্জ' এই দুইটি আদেশ হয়। যথা সং পঠ্যতে প্রাঃ পঢ়ীঅই, পঢ়িজ্জই বাং পড়া যায়। এবং অপর একটি সূত্রে আছে (৭।২০) "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনদ্যতন কালে এবং বিধ্যাদি অর্থে বিকল্পে জ্জ ও জ্জা প্রত্যয় হয়।" আমার অনুমান হয় প্রাঃ 'পঢ়ী-অই' হইতে বাঙ্গলা 'পড়া হয়' এবং 'পঢ়িজ্জই' হইতে বাঙ্গলা 'পড়া যায়' আসিয়াছে। একটা সাদৃশ্য ও প্রণিধান যোগ্য। প্রাকৃত অতীতকালে ইজ্জ, জ্জ বা জ্জা হইত না বাঙ্গলাতেও অপূর্ণ ভূতকাল ব্যতীত অন্য ভূতকালে 'যা' ধাতু না হইয়া 'গম্' ধাতু হয়। যথা সে পুস্তক পড়িল, বাচ্যান্তরে 'পুস্তক পড়া গেল'। কিন্তু এখানেও 'গম্' ধাতু না দিয়া 'হ' ধাতু দিলে ভাল বাঙ্গলা হয়। যথা পুস্তক পড়া হল।

অতঃপর "বৌদ্ধগান ও দোহা" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত) হইতে আমার অনুমানের সমর্থনকল্পে কয়েকটি প্রয়োগ তুলিতেছি।

শব্দ	টীকায় অর্থ।
বক্খানিজ্জই	ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে।
কহিজ্জই	কথ্যতে, কথয়ামি।
কিজ্জই / করিজ্জই	ক্রিয়তে
ধরিজ্জই	ধার্য্যতে
গোইজ্জই	অবগন্তব্যং
খজ্জই	ভক্ষণ ক্রিয়তে
খজ্জই পিজ্জই	খাদয়ন্তি পিবন্তীতি কর্ম্ম ক্রিয়তে।
বিলিজ্জই	বিলয়তে (বাং মিলিয়ে যায়—মিনতি স্থানে মিনতিয় থায় ব স্থানে ম্)

এই উদাহরণগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে "কর্‌জ্জই" হইতে বাঙ্গলায় হওয়া-বাচোর "করা যায়" এবং "লিজ্জই হইতে হিন্দীর "কিয়া জায়" আসিয়াছে। বাঙ্গলাতেও বোধ হয় প্রথমে "করা যায়" লেখা হইতে পরে জখন জেমন প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী বানান শুদ্ধ করিবার সময়ে বোধ হয় "করা জায়" এর "জায়" সংস্কৃতের গমনার্থক "যা" ধাতু জাত মনে করিয়া ইহাকেও শুদ্ধ করিয়া 'যায়' করা হইয়াছে।

একটা কথা মনে পড়িল। শুভঙ্করের বিঘাকালির আর্য্যার প্রথম পংক্তিতে আছে,—

"কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে।"

কোন শুভঙ্করীর গ্রন্থকার এই "লিজ্জে" কথাটার অর্থ করিয়াছেন হিন্দী "লীজিয়ে" অর্থাৎ "আপনি লউন"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতুটি সংস্কৃত 'নী' ধাতু জাত মাগধী "লী" ধাতুর হওয়া-বাচোর রূপ "লীজ্জই" অর্থ 'লেওয়া যায়" বা আধুনিক দক্ষিণ বঙ্গের "নেওয়া যায়"। এবং "কুড়া" শব্দ যে বিঘা অর্থে পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত ছিল তাহা কবি-কঙ্কনে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারী।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

আশা।

—:*:—

লোকে বলে মিথ্যা তুমি, মায়াময় মরুমরিচীকা!
দরিদ্রের সুখ স্বপ্ন! আঁধারেতে আলেয়ার শিখা!
কবি কিন্তু, ওগো আশা, সত্যরূপে পেয়েছে তোমারে
বিশ্বের আনন্দমাঝে অফুরন্ত অচঞ্চল-ধারে!

তার কাছে সত্য তুমি। নহ মিথ্যা—নহ প্রবঞ্চনা
নহ শুধু স্বপনের আধ-ঢাকা মধুর সান্ত্বনা !
প্রকৃতির সুখ-রাজ্যে মুগ্ধ-আঁখি দেখেছে তোমায় ;
ফুটন্ত ফুলের মাঝে গন্ধ-বর্ণ-শোভা-সুষমায়
পেয়েছে সে তব দরশন। উষার তরুণ সাজে
দেখেছে সে তব ছবি। বিহগের প্রভাতীর মাঝে
শুনেছে সে তব সুখ-গান। আত্মগত মুগ্ধসুখে
হেরেছে তোমার ছটা অকলঙ্ক শুভ্র শিশু মুখে
অচপল অচঞ্চল। বরষার নব মেঘোদয়
তোমার প্রাণের গূঢ় অভিনব সত্য পরিচয়
দিয়ে গেছে তার কাছে। নির্ঝরের স্বচ্ছ স্রোতধারে
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তব দেখেছে সে কত বারে বারে !
একি সব মিথ্যা কথা ? সব মায়া ? সব প্রতারণা ?
একি শুধু কবিতার কল্পনার দুরূহ ধারণা ?
এত গান এত শোভা—এত ছন্দ গন্ধময়ী কথা
সকলি কি মিথ্যা ওগো—প্রাণহীন ব্যর্থ বিফলতা !

"বনফুল"

স্বাস্থ্যের কথা।

—— ঃ*ঃ ——

শিশুর খেলা-ধূলা।

সুস্থ সবল শিশু। এখনও আঁতুর-ঘরে। তাহার খাবার সময় হইয়াছে, সে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। মা তাহাকে মাই দিলেন। স্তন্য পান করিয়া শিশু তৃপ্ত হইল। জননী নিজের পার্শ্বে খোকার ছোট্ট বিছানাটিতে তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। শিশু হাতপা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। জননী একদৃষ্টে শিশুর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ছেলের খেলা দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। শিশুর ক্রীড়ার ইহাই প্রথম সূচনা।

ক্রমে শিশুর বয়স তিন মাস হইল। তৃপ্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ পানের পর শিশু তাহার নিজের বিছানায় শুইয়া চারিদিক দেখিতেছে, আনন্দে হাতপা নাড়িতেছে; আর মুখ দিয়া কত রকমের আওয়াজ বাহির করিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া জননী আনন্দে অধীরা হইতেছেন। মাঝে মাঝে মুখ নীচু করিয়া শিশুর গালে চুম্বন করিতেছেন। শিশুও আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছে। আরও নানা রকম আওয়াজ বাহির করিতেছে! জননী তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। শিশুও তাহার জবাব দিতেছে। মায়ে-পোয়ে কথা হইতেছে। এ দেবভাষা বুঝা অপর কাহারও সাধ্য নহে। মায়েরও না,—শিশুরও না। মা বুঝেন শিশুর কথা, শিশু বুঝে মায়ের কথা। জননী ও শিশুর এই কথোপকথনের কোন ভাষা নাই, আছে কেবল শব্দ; ইহার কোন অর্থ নাই; ইহাতে আছে কেবল আনন্দ;—পবিত্র, স্বর্গীয়, অনাবিল আনন্দ। শিশুর ক্রীড়াপ্রবৃত্তির ক্রম-অভিব্যক্তির ইহা দ্বিতীয় স্তর।

বস্তুতঃ, ক্রীড়া করিবার প্রবৃত্তি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক। যাঁহারা গৃহপালিত পশুপক্ষীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, ছাগল, গোবৎস—কেবল গৃহপালিত পশুর শাবক নহে, বন্য জন্তুর— এমন কি, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুরও শাবকগুলি এইরূপ ক্রীড়াপ্রবণ।

"Play is the highest phase of child-development."—*F. Froebel.*

"শিশুর ক্রমবিকাশের পক্ষে খেলাধূলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান।"

প্রত্যেক পিতামাতা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন,—তাঁহারা নিজেরা শৈশব-কালে যে সকল খেলা খেলিয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যারা সেই সকল খেলার কতক আয়ত্ত করিয়াছে, আর কতক নূতন খেলা তাহারা নিজেরাই আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদনুসারে,—তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিশুরাও নিজেদের জন্য সেইরূপ নূতন নূতন ক্রীড়া-কৌতুক আবিষ্কার করিয়া লইয়া থাকে।

এই, ক্রীড়া-কৌতুক, এবং তাহাদের উপকরণগুলির দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হয়;—ভবিষ্যতে সে মানুষ হইবে কি পশু হইবে, তাহা স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রীড়া কৌতুক এবং ক্রীড়নক পিতামাতার উপেক্ষার বিষয় ত নহেই, বরং তাহার উপর তাঁহাদের খুবই লক্ষ্য রাখা উচিত। আর, সেই আঁতুড়-ঘর হইতেই জননীকে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। শিশুর ক্রীড়া, শিশুর ক্রীড়নক হইতে তাহাকে কত প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এফ, ফ্রোয়েবেল নামক একজন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ভদ্রলোক শিশুর খেলা-ধূলা হইতে শিশুর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া, খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া তাহাদের শিক্ষাবিধানের একটি নূতন শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাহাই আজকালকার বিশ্ববিখ্যাত কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষাপ্রণালী।

শিশু যে খেলা করে, যে জিনিস লইয়া খেলা করে, তাহাতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশাভাষ দেখা যায়। এবং ইহা হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শিশুর ভবিষ্য-জীবনের পরিচয় পূর্ব্বাহ্ণেই পাইয়া থাকেন। নানা শ্রেণীর নানা প্রকার খেলনার একত্র সমাবেশ করিয়া, কিম্বা বিবিধ প্রকার খেলানা সাজানো আছে এমন এক দোকানে লইয়া গিয়া, কোন শিশুকে তাহার ভিতর হইতে একটী বা একাধিক খেলানা বাছিয়া লইতে বলা হইল। তাহাকে এই নির্ব্বাচন-ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা হইবে না,—সে সম্পূর্ণ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক খেলানা নির্ব্বাচন করিবে। তদনুসারে, শিশু যে যে খেলানা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তখন, সেই শিশুকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাও স্থির হইয়া যাইবে।

খেলা ও খেলানার অনেক প্রকার শ্রেণী ভেদ আছে। কোন খেলা একলা, কিম্বা দুইজনে, কিম্বা তিনজনে খেলিতে হয়; কিন্তু এই তিনজনেই স্বতন্ত্রভাবে খেলা করিবে, দল বাঁধিয়া খেলা করিবে না। আবার কতক আছে, যাহা দল বাঁধিয়া খেলা করিতে হয়। দলের সকলেরই একই লক্ষ্য থাকে, এবং সকলেই কতকগুলি নিয়ম মানিয়া খেলিয়া থাকে। কতক খেলার উপকরণ আছে, কতক খেলার উপকরণ নাই। কতক খেলা ঘরে বসিয়া (indoor) খেলিতে হয়; কতক খেলা মুক্ত স্থানে (outdoor) খেলিতে হয়। কতক খেলা আনন্দজনক; কতক খেলা বলবৰ্দ্ধক। বয়োভেদেও খেলার ও খেলানার তারতম্য হয়।

আমাদের দেশে বালিকাদের খেলানা এবং খেলিবার প্রণালীর গুণে তাহারা গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মে নিপুণতা লাভ করে, এবং সামাজিকতা শিক্ষা করে। তাহাদের হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া খেলা Miniature গৃহস্থালী মাত্র। তাহাদের পুতুলের বিয়ে সামাজিকতার মাত্রা ভেদ। অনেক জননী স্বীয় কন্যাগণের এইরূপ খেলায় উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাহাদের পুতুলের সাজপোষাক, খাট-বিছানা, লেপ-বালিস তৈয়ার করাইয়া দেন; পুতুলের বিবাহে সত্যকারের ভোজের আয়োজন করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের (কন্যার বন্ধুদের সঙ্গে নিজেদেরও!) নিমন্ত্রণ করিয়া অর্থব্যয়ও কিছু কিছু করিয়া থাকেন। মেয়েরা যখন তাহাদের গৃহস্থালীর সরঞ্জাম লইয়া খেলা করে, তখন তাহাদের জননীরা অনেক স্থলে তাহাদিগকে সত্যকারের চাল ডাল ঘি ময়দা দিয়া যতটা সম্ভব খেলাতে সত্যের আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মে নিপুণতা লাভে অনেকটা সহায়তা হইয়া থাকে। চড়াই-ভাতিও খেলাচ্ছলে এইরূপ শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছেলেদের খেলাধূলার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থার একান্তই অভাব দেখা যায়। সেই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের ছেলেরা মেয়েদের মত অতটা নিপুণতা বা চতুরতা দেখাইতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে কোন রকমে তাহারা সংসারে টিঁকিয়া থাকে মাত্র। আমাদের ছেলেদের খেলার ভিতর শিক্ষার এই ত্রুটিটুকু আমাদের মা-জননীদেরই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। কন্যার সম্বন্ধে তাঁহারা যেটুকু পক্ষপাত করেন,—পুত্রের খেলার ব্যবস্থা করিবার ভার পুত্রের জনকের হাতে ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন, তাহাতে আর চলিবে না—তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু অবহিত হইতে হইবে।

এই বিশেষ বিষয়টি ছাড়া,—ছেলেমেয়েদের খেলা ও খেলানার ব্যবস্থা প্রায় সমানভাবেই করিতে হয়,—অন্ততঃ যতদিন না ছেলে বুঝিতে পারে যে সে ছেলে, এবং মেয়ে বুঝিতে পারে যে সে মেয়ে। সেই আঁতুড় ঘর হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের পার্থক্য না করিয়া তাহাদিগকে সমান ভাবে খেলা দিতে হইবে। এক মাস হইতে আট মাস বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের দৃষ্টি, শ্রুতি ও স্পর্শ-শক্তির বিকাশসূচক খেলা চাই। তাহারা হাত পা নাড়িয়া, চারিদিকে চাহিয়া, জিনিসপত্র স্পর্শ করিয়া এবং ক্রমশঃ ধরিয়া খেলাচ্ছলে শিক্ষা লাভ করিবে। বুকে হাঁটিয়া শিশু যখন কোন দূরস্থিত দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, জিনিসটি ধরিবার জন্য তাহার মনে কত না আগ্রহ জন্মিয়াছে। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত শিশুমাত্রেরই প্রকৃতি বর্ত্তমান কালের বোলশেভিকদিগের মত; অর্থাৎ যে-কোন জিনিস তাহারা হাতের কাছে পাইবে, তাহাই ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবে। টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি যে সব জিনিস নাড়িবার সামর্থ্য তাহাদের নাই, সেই সব জিনিসও ধরিয়া দু'চারবার নাড়া দিবার চেষ্টা করিবে, এবং না পারিলে হয় নিরস্ত হইবে, না হয় কান্না জুড়িয়া দিবে। জননী তখন তাহার মন বিষয়ান্তরে লইয়া গিয়া তাহাকে শান্ত করিবেন; কিন্তু কদাচ তাড়না, তিরস্কার বা প্রহার করিবেন না। আট মাস বয়স হইতে জননী শিশুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলিবেন, 'টু' দিবেন, শিশু যাহাতে তাঁহাকে খুঁজিবার চেষ্টা করে, এমনভাবে তাহাকে অল্প দেখা দিয়া আবার লুকাইবেন। এইরূপে শিশুর সঙ্গে অন্য খেলানা লইয়া খেলা করিতে হইবে। ছেলে যখন মায়ের আঁচলের চাবির রিং ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিবে, তখন সেই চাবির থলো তাহাকে চুষিতে না দিয়া, রোগ বীজাণু উদরস্থ করিতে সহায়তা না করিয়া, তাহার ব্যবহার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একটা চাবি তাহাকে ধরাইয়া দিয়া সেই চাবিটা যে তালার বা কলের সেই তালা বা কলে চাবি পরাইতে দিবেন। ইহাতে খেলার সঙ্গে তাহার একটা শিক্ষা হইয়া যাইবে। এইরূপে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বুদ্ধির যতই বিকাশ ঘটিবে, তাহার ক্রীড়ারও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন শিশুর মনে দুষ্টবুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়, তাহা হইলে, খেলানার সাহায্যে এই সময় হইতেই তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"বাক্[illegible]চার"

যৌবন গীতি।

——:*:——

(গান)

(ঝিঁঝিট)

জাগ' যৌবন-বন-দেবতা !
মম অন্তরে গাহে অহরহ পিক তোমার স্বাগত বারতা,
আকুল পিয়াসে দিবসরাত্র
ভরিয়া তুলিছে সুধার পাত্র
আজি উন্মাদ গোপন গহন মন-মন-বন জনতা।
মথি' চঞ্চল মরণ-সাগর
ভর'গো জীবন-ভাণ্ড, অমর,
তব উৎসব কলরবে কর' নীরব সকল দীনতা।
নীল-অম্বর কর' গাঢ়তর
ঢাল' চুম্বন ছাপায়ে অধর
নয়নের মোহ নিবিড় করিয়া আন' মদির মত্ততা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জয়দেব।

-ঃ*ঃ—

সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব নামে কয়েক জন কবির অভ্যুদয় হয়। তন্মধ্যেই দুইজন প্রধান, প্রথম গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব, দ্বিতীয় প্রসন্ন-রাঘবের লেখক জয়দেব; বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রসন্ন-রাঘবের রচয়িতা জয়দেব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, প্রসন্ন-রাঘব ও গীতগোবিন্দ একই ব্যক্তির দ্বারা রচিত। পরলোকগত মহারাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিষ্ণু শাস্ত্রী মহাশয়ও এইমতের পোষকতা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা অমূলক। উভয় কবিই এমন পরিষ্কারভাবে আপনাপন পরিচয় দিয়াছেন, যাহাতে ইহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না যে, উক্ত গ্রন্থদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত। উভয় পুস্তক-পাঠে জানা যায় যে, গীতগোবিন্দের জয়দেবের মাতার নাম রামদেবী ও পিতার নাম ভোজদেব ছিল। প্রসন্ন-রাঘবের জয়দেবের মাতার নাম সুমিত্রা এবং পিতার নাম মহাদেব ছিল; গীতগোবিন্দের জয়দেব কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, আর প্রসন্ন-রাঘবের রচয়িতা জয়দেব রামোপাসক ছিলেন। গীতগোবিন্দের জয়দেব ও প্রসন্ন-রাঘবের রচয়িতা জয়দেব যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কবিদ্বয় নিজ নিজ পরিচয় এমন স্পষ্টভাবে প্রদান করিয়া গিয়াছেন যে আর অন্য প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

জয়দেব যে একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত প্রসন্ন-রাঘব তাঁহার পরিচয়। শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, জয়দেবের কাব্যে তাহার অভাব নাই; পদমৈত্রী, অনুপ্রাস, অলঙ্কারাদি সমস্ত গুণেই তাঁহার কবিতা সমৃদ্ধিশালী; যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিতেও জয়দেব বিশেষ পটু ছিলেন। বর্ণন গুণে জয়দেবের কবিতার মাধুর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; প্রসন্ন রাঘবের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রেমরস ও চতুর্থ এবং সপ্তম অঙ্কে

বীর-রসপূর্ণ কবিতা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দুশ্চরিত্র লোকের সহিত জয়দেবের যে সর্ব্বদা কলহ হইত সে কথা এই শ্লোকটি পাঠ করিলে জানা যায়,—

"নিন্দান্তে যদি নাম মন্দমতিভির্বক্রাঃ কবিনাং গিরঃ
স্ময়ন্তে ন চ নীরসৈর্মৃগদৃশাংবক্রাঃকটাক্ষচ্ছটাঃ।
তদ্বৈদগ্ধবতাং সতামপি মনঃ কিং নেহতে বক্রতাং
ধত্তে কিং ন হরং কিরীটশিখরে বক্রাং কলামৈন্দবীম্ ॥"

প্রসন্ন-রাঘবের প্রথমেই জয়দেব রামচন্দ্রের স্তুতি করিয়াছেন, জীবনে তিনি রাম নামই সার বলিয়া বুঝিয়াছেন ;—

"ঝগিতি জগতী মাগচ্ছন্ত্যাঃ পিতামহবিষ্টপান্
মহতি পথি যো দেব্যা বাচঃশ্রমঃ সমজায়ত।
অপিকথমসৌ মুঞ্চেদেনং ন চেদবগাহতে
রঘুপতি গুণগ্রামশ্লাঘাসুধাময়দির্ঘিকাম্ ॥"

বিশ্বামিত্রের পরিচয় কবি এইরূপ দিয়াছেন ;—

"যঃ কাঞ্চনমিবাত্মানং নিক্ষিপ্যাগ্নৌ তপোময়ে।
বর্ণোতকংগতঃ সোহয়ং বিশ্বামিত্রোমুনীশ্বরঃ ॥"

অর্থাৎ, যিনি আপনার স্বর্ণের মত শরীর তপরূপী অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া, উত্তমবর্ণ পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহামুনী বিশ্বামিত্র। প্রসন্ন-রাঘবের অনেক অংশ উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত, কিন্তু বাহুল্য বোধে তাহা করিলাম না।

জয়দেব যে প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু নাটক রচনায় তিনি তেমন সুনিপুন ছিলেন না। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের নিয়মানুসারে, তাঁহার রচিত নাটকে বিস্তর দোষ পরিলক্ষিত হয়। প্রসন্ন-রাঘবের প্রথম দোষ, ইহার রচনা প্রণালী; ইহার কথাক্রম বড়ই বেখাপ্পা। প্রস্তাবনার মুখ্য উদ্দেশ্য এই, যে নাটকখানি

অভিনীত হইবে, দর্শকদিগকে সেই নাটকের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া। সাহিত্যদর্পণের অনুসারে প্রস্তাবনার পরিভাষা এইরূপ,—

"নটো বিদূষকো বাঽপি পারিপার্শ্বক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতা সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাঽপি সা॥"

সংস্কৃত নাটকে প্রস্তাবনার দ্বারা যে কার্য্য লওয়া হইত, বর্ত্তমানে থিয়েটারে প্রোগ্রামের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ নাট্যকার গেটে (Goethe) প্রস্তাবনার নিয়ম সাদরে মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বরচিত নাটকে উহাকে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু প্রসন্নরাঘবের বিস্তৃত প্রস্তাবনায় নাটকের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

সর্ব্বসমেত সাতটি অঙ্কে এই নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে। সীতা-স্বয়ম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কা হইতে সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে সীতা-স্বয়ম্বরের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ এবং বাণাসুরের বাক্‌বিতণ্ডার ভিতর দিয়া এই অঙ্ক শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে রামচন্দ্র ও সীতার প্রেমালাপের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানের শোভা এবং বসন্ত বর্ণনায় কবি তাঁহার কৃতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু দর্শকগণের সমক্ষে ধনু ভঙ্গ করান হয় নাই। বিশ্বামিত্র, রাম, শতানন্দ ও জনক রাজের মধ্যে কতক্ষণ বাক্যালাপ হয়। চতুর্থ অঙ্ক লক্ষ্মণ ও পরশুরামের তর্কাবিতর্কে খরচ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে গঙ্গা, যমুনা, সরযূ ও সাগরের অনুরোধে, কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরদানের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন; দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন। কবি এই অঙ্কে রাবণের দ্বারা সীতাহরণও করাইয়াছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে সীতা-বিয়োগ-ব্যথিত রামচন্দ্র ভগ্ন হৃদয়ে বিলাপ করিয়াছেন, লঙ্কারও সমান্য পরিচয় কবি দান করিয়াছেন। সপ্তম অঙ্কে রাবণবধান্তে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্য-মুখ্য ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া, কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে কবি এই নাটকখানি রচনা করায়, পাঠকালে অত্যন্ত বিরক্তি

বোধ হয়। ধনুর্ভঙ্গ, সীতানুগমন, দশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাব, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, রামের বনগমনকালীন দৃশ্য, লক্ষ্মণ শূর্পণখা সংবাদ, খরদূষণের যুদ্ধ, স্বর্ণ মৃগের আগমন, সীতাহরণ, সুগ্রীব-মিলন, সেতুবন্ধন, অঙ্গদ দরবার প্রভৃতি দৃশ্য বা ঘটনা প্রসন্ন-রাঘবে একেবারেই নাই। অনাবশ্যক অত্যধিক বর্ণনার দোষে, এই নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বিরক্তি এবং আলস্য বোধ হয়। ভাবের অভাবে ভাষাকে লইয়া কবি অনর্থক খেলা করিয়াছেন।

নাটকান্তর্গত পাত্রপাত্রীও নাট্যকারের অক্ষমতার পরিচায়ক। রামায়ণের প্রসিদ্ধ পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশ জয়দেব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছে। দশরথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, শত্রুঘ্ন, নিষাদ, সুমন্ত্র, বালি, অঙ্গদ, জাম্বুবান, খরদূষণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী প্রসন্ন-রাঘবে নাই। ইহাদের ছাড়িয়া কবি, নূপুরক, মঞ্জীরক, বামনক, কুঞ্জক, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি অনেকগুলি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। কাহার দ্বারা কিরূপ কথা বলান উচিত, সে সম্বন্ধে জয়দেবের ধারণা নাই বলিলেও চলে। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগত ভ্রাতা ও ভক্ত ছিলেন; কিন্তু জয়দেবের রাম ও লক্ষ্মণের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শৃঙ্গার রসের আধিক্য প্রসন্নরাঘবের আর একটি প্রধান দোষ। নাটকখানি শৃঙ্গার রসে ভরা নাটকের প্রথম শ্লোকে কবি বলিয়াছেন, "কস্তুরীসকরী পয়োধরযুগে গণ্ডদ্বয়ে চ শ্রিয়ঃ" নাটকের অন্তিম শ্লোকের শেষ চরণে, "কান্তাবাহুলতাবিলাসমহিমাশ্লেষান্...." পুস্তকখানির নানাস্থানে এইরূপ শব্দের ছড়াছড়ি, সমগ্র গ্রন্থখানি এই দোষে পূর্ণ। নাটকারম্ভে সূত্রধার বলিতেছে, "চন্দ্রে চ রামচন্দ্রে চ কান্তানাঞ্চ দৃগঞ্চলে। নীলোৎপল সুহৃদকান্তৌ কস্য নামোদতে মনঃ।"

অন্যান্য প্রাচীন কবিগণের মত জয়দেবেরও স্থিতিকাল অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে অনুমান ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহার সময় নিরূপিত করা যাইতে পারে। প্রসন্ন-রাঘবের লেখক জয়দেব "চন্দ্রালোক" নামক একখানি অলঙ্কার শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

প্রদ্যোতভট্ট চন্দ্রালোকের একটী টীকা রচনা করেন ; ১৫৭৭খ্রীঅব্দে বুঁদেলা রাজা বীরভদ্রের সভায় ইনি কবি ছিলেন ; সুতরাং জয়দেব ১৫৭৭খ্রীঅব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ডাক্তার হল তাঁহার বিব্লিয়োগ্রাফিকাল ইনডেক্সে (Bibliogrophical Indix) লিখিয়াছেন, জয়দেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায় চিন্তামণি নামক গ্রন্থের আলোক নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ানলিটরেচরের অনুসারে গঙ্গেশ উপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব ১২০০হইতে ১৫৭৭খ্রীঅব্দের মধ্যভাগে কোন সময় জয়দেব বিদ্যমান ছিলেন। প্রসন্ন-রাঘবের শেষে সুগ্রীবের দ্বারা কবি বলাইয়াছেন,—"দেবে কৌস্তুভধাম্নি চন্দ্রমুকুটে২প্যৈক্য ভূতিৰ্ভবতু।" ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই নাটক রচনার সময় শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে উত্তর ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় নাই। ১৪৮৫খ্রীঅব্দ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল, তাঁহাকে জনসমাজে পরিচিত হইতে অন্ততঃ ২০বৎসর লাগিয়াছিল ; সুতরাং ১৫০৫হইতে ১৫৭৭খ্রীঅব্দের মধ্যে জয়দেব বিদ্যমান ছিলেন।

ডাক্তার পিটার্সন বলেন, জয়দেব বিদর্ভদেশের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু প্রসন্ন-রাঘবের প্রস্তাবনার একস্থানে সূত্রধার বলিতেছে, "কেনাপি দাক্ষিণাত্যেন নটালমদেন...বিদ্যাধরা-খ্যাতিরপহ্নুতা।" ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, জয়দেব উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

পরলোকগত রামকানাই দত্ত।

—:*:—
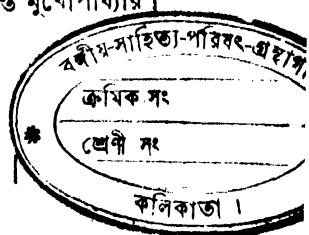
আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রবীণ উকীল অদম্য উৎসাহী স্বদেশ-সেবক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রামকানাই দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ১৫ই বৈশাখ

বুধবার রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। রামকানাই বাবু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আদালতে ওকালতি করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সকল সৎকার্য্যের নেতা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। কৈশোর বয়সেই ভক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দীর জীবনের প্রভাবে তাহার চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস গঠিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের ঔদার্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছিল। তাহার সাহিত্য-অনুরাগ ও জ্ঞান-স্পৃহা অতুলনীয়। এই বৃদ্ধ বয়সে রুগ্ন দেহে সাহিত্যচর্চ্চায় ও শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। গদ্য ও পদ্য নানা বিষয়ে প্রায় ৩০খানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ মধ্যে "সন্তানের রামায়ণ" "ত্রিপুরা কাহিনী" খুব বড় পুস্তক। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাময়িক কবিতা ও সামাজিক প্রবন্ধ লিখিতেন—কিন্তু এইরূপ লেখাতে তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইত না। অবশেষে নিজে "ঊষা" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঊষা ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা। ঊষা ত্রিপুরার সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন তৎপর কয়েক বৎসর সন্তান নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া সন্তান পত্রিকা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাকে অনেক প্রকার লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি তাহার সরকারী ওকালতির পদ হারাইয়াছিলেন। এই বিষাদের ও বিবাদের কাহিনী বর্ণনার কথা এ সময়ে বলিতে চাই না। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এড্ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন রামকানাই বাবুর অতুল কীর্ত্তি। ১৯০১ সালে কতিপয় বন্ধুর সাহায্য নিয়া তিনি এড্ওয়ার্ড ইন্ষ্টিটিউসনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সকল বাধা বিঘ্ন অপমান নির্য্যাতন মস্তকে ধারণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্কুলের সেবা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠা তাহার অন্যতম কীর্ত্তি।

সাহিত্য সেবার জন্য বাল্যকালে তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ী হইতে উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, মধ্য বয়সে ত্রিপুরার মহারাজা ৺রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন; তাহা ব্যতীত মহারাজা, রামকানাই বাবু দ্বারা "গিরিবাসী" নামে একখানা

পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে শ্রীশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি রামকানাই বাবুর "বড়লোক" বহিখানা প্রকাশের মুদ্রণ-ব্যয় দিয়া উৎসাহ দান করিয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে একটী কবিতা পুস্তক লিখিয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।

রামকানাই বাবুর পরলোক গমনে ত্রিপুরা জিলার একটী আলোকস্তম্ভ খসিয়া পড়িল। ত্রিপুরার রামকানাই বাবুর শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে কি না জানি না—সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ গুণবান পুরুষ দুর্লভ। রামকানাই বাবুর অভাবে ত্রিপুরা ত দীনা ক্ষীণা হইল—জননী বঙ্গভূমিও আজ একটী সেবক হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। গুণীর মৃত্যু নাই—গুণে যে সে অমর!

জনৈক ত্রিপুরাবাসী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আমরা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শিশুপাঠ্যগ্রন্থাবলী ও খুকুমণির ছড়া ইত্যাদি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচক আমরা নই,—যে সকল প্রাণের সুখদুঃখ হাস্যকৌতুক শিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার তাঁহার শিশুর মতই কোমল অন্তরের অনিন্দ্যসুন্দর পুষ্পসম্ভারে সাজি সজ্জিত করিয়া বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার গ্রন্থরাজির সমালোচক। ছাপার অক্ষরে সে সার্টিফিকেট মুদ্রিত হইবার উপায় না থাকিলেও প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারের কর্ত্তাদের জানিতে হইয়াছে, যোগীন্দ্র বাবুও না জানেন তাহাও নয়—যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থের দুর্দ্দশা সে সকল অনবধান সমালোচকগণের হস্তে কিরূপ! হাতেখড়ি হইবার পরই তাহারা যোগীন্দ্র বাবুর অজগরের অত্যাচারে অস্থির!—"অজগর আসছে তেড়ে"—পরক্ষণেই 'আমটি' খাইবার আশায় উৎফুল্ল! হারাধনের দশটি ছেলে—ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে মারিয়া বাঁচিয়া গৃহস্থালীকে সময়ে অসময়ে

এরূপভাবে মুখরিত করিয়া তুলে যে, যোগীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, এসকল বৃদ্ধের কর্ণে তাহা অসহ্য ! খোকাটি 'হাসিখুসি' লইয়া ছবি দেখিতে ব্যস্ত—খুকুর হাতে 'ছবির বই'—'হাসি ও খেলা'য় মেজ মেয়েটির নিব্যূঢ় স্বত্ব—ছোট্ট খোকাটি আজও অক্ষরের 'অ'ও চেনে না অথচ আউরে চলেছে—

"গল্ গল্ গল্ কাঠের গাড়ী
টান্‌চে অতুল তাড়াতাড়ি
খানিক দূলে দোলে গিয়ে
ঠেকল চাকা ইটে !"

গাড়ী ও বইয়ের একই দশা ; দুদিনেই অচল ! যোগীন্দ্র বাবুর নিকট আমাদের অনুরোধ—বইগুলোর 'বাঁধা' আর একটু শক্ত হইতে পারে কি না—গাড়ী যখন থামিলে রক্ষা নাই, বুড়োদের তা' চালাইতেই হইবে,—তখন দুদিন তা' যা'তে ভালভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের সানুনয় অনুরোধ !

প্রত্যেক গ্রন্থের নাম ধরিয়া,—কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির কথা বলিব—আলোচনার পথ নাই—গ্রন্থকার শিশু-সাহিত্যে সব্যসাচী !—তিনি যখন যেটি ধরিয়াছেন, তাহাতেই শিশুর চিত্ত হরণ করিয়া তাহাদের মুখ দিয়া বলাইয়া লইয়াছেন—

'অবাক্ কাণ্ড ভাই,
এমন ব্যাপার আর কখনো জন্মে দেখি নাই !'

তাঁর লাভ "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ"। "জয়পরাজয়" কা'র বা কোথায় বুঝি না, তবে আমাদের 'আশ্চর্য্য পরিত্রাণ।' মানিয়া লইতেই হইতেছে—শিশুর জন্য যোগীন্দ্র বাবুর আয়োজন অতুল। তিনি শিশুর শিক্ষা, আনন্দ আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়া অভিভাবকগণের পরিত্রাণের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।—তাঁহার শ্রম সার্থক। প্রমদারঞ্জনের 'সখা'য় যে উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় 'মুকুল'এ যে সুষমার অস্তিত্ব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, যোগীন্দ্র বাবু তাহার পূর্ণতা দান করিয়া শিশুর ও শিশুর অভিভাবকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কি বিষয়নির্ব্বাচনে, কি ভাষায়, কি ছবিতে যেমনটি হইলে শিশুর সরল সুন্দর নির্ম্মল মনে 'দোল' দেয়—যোগীন্দ্র বাবু তাহার আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার

'আশীর্ব্বাদ' সার্থক হউক—

"হ'ক ভাই তোমাদের পবিত্র জীবন,
স্বরগের নন্দন কানন !
ন্যায়, সত্য, সরলতা,　　বিকশিত হ'ক তথা
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন—
তোমাদের পবিত্র জীবন।"

নারীর উক্তি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-য়্যাট্‌ল। ৩ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকর্ত্রী—নারীর উক্তি উৎসর্গ করিয়াছেন—'শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়, স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য্য যাঁদের অসীম, কর্ম্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম্ম যাঁদের রক্ষক, মন যাঁদের সরল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত, যাঁরা আত্ম-সুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া সেকালের আদর্শস্থানীয়া পরিচিত অপরিচিত বঙ্গনারীকুলের উদ্দেশে।' তাঁহার এই উৎসর্গ পত্রে তিনি নারীকুলের উদ্দেশে যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—নারীর আদর্শ সম্বন্ধে এই মনস্বিনী মহিলার কি মত। যে একদিন নারী দেবীরূপে পূজিতা হইয়াছিলেন এই সকল গুণে,—নারীর এতগুলি গুণ প্রকটিত প্রস্ফুটিত হইয়া একদিন ভারতে সংসার স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল—তাঁহাদের জীবন-ইতিহাস, কার্য্যাবলী আজও আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন করিতেছে অথচ তাহা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। নবযুগে সে আদর্শ একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে এ কথা যিনি বলেন বলুন আমাদের মনে হয়—নারীর হৃদয়ে যে যুগে নারীর এরূপ উচ্চ আদর্শ আজও বর্ত্তমান—সে যুগে নারী-হৃদয় নিষ্পিষ্টা দলিতা,—ঘটনাও অভাববশে আত্ম-শক্তিতে আস্থাহীনা হইলেও—তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃতিগত মূলবৃত্তি হারান নাই। গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমরাও আশা রাখি—যদি নারী-প্রকৃতির সম্যক্ বিকাশের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যদি পুরাকালের নারীর আদর্শ—তাঁহাদের যথাযথ কার্য্যাবলীর আদর্শ নহে—মূল প্রকৃতিগত নীতি আদর্শে বর্ত্তমানে নারী যদি অনুপ্রাণিত হ'ন, তাহা হইলে

ভারত আবার সুখের সংসারে পরিণত হইবে। এই হিসাবে গ্রন্থকর্ত্রী পুরাতনে আস্থাবতী,—বর্ত্তমানের সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ নন; তাঁহার প্রার্থনা—"তাঁহাদের (পূর্ব্বকালের নারীর) সঞ্চিত পুণ্য যেন আমাদের একালে দিক নির্ণয় করবার আলো দেখায়, তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি যেন আমাদের নবযুগের পথে চল্‌বার বল দেয়।" তাঁহার প্রার্থনা ভগবান সফল করুন।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা বিচার প্রবন্ধে তিনি এই তথ্যই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাতনকে নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিয়া নূতনে পুরাতনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা-সমাধানে তিনি অতি ধীরভাবে সুযুক্তির সাহায্যে যত্নবতী হইয়াছেন। তাঁহার উক্তি ও যুক্তিতে কোথাও বিরোধের চেষ্টা নাই—কথা কাটাকাটি করিয়া আসর জমাইয়া বাগ্‌জাল বিস্তারে বাজিমাৎ করিবার প্রয়াস নাই। নারী-প্রকৃতির যেটী বিশেষত্বঃ সেই ধীরতা, নম্রতা, তাহার লেখার প্রধান গুণ—তাঁহার উক্তি যথার্থ নারীর উক্তি—পুরুষের পৌরুষ-গর্ব্বিত উক্তি নহে। অমৃত কোন্ কালে বিষক্রিয়া করিয়াছে? শিক্ষায় সংসারে অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিতেছে—শিক্ষার এ দোষারোপে মূল্য নাই,—'শিক্ষার আশা কার যায়, 'তাহাদের নারীত্ব মধুরতর, গভীরতর, উচ্চতর, উদারতর, স্নিগ্ধতর হইবে, যদি না হয়, তাহা শিক্ষার দোষ নহে, শিখাইবার দোষ। আদর্শ ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। আমাদের বর্ত্তমান ভাবুকগণ, কবিগণ, আমাদের বর্ত্তমান কালের আদর্শ গড়িয়া দিন,—যাহা সময়োপযোগী হইবে, দেশকালপাত্রোচিত হইবে,—আমরা তাহাই অনুসরণ করিব।' আমাদের নেতাগণ ইহার উপর আর কি বলিতে চান,—বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে চান—ভাল—কিন্তু নারীর শিক্ষায় নারীর অধোগতি ইহা আর তাঁহারা বলিবেন কোন মুখে! গ্রন্থকর্ত্রী শিক্ষিতা অথচ ছাত্রীর ন্যায় জিজ্ঞাসু,—সুশিক্ষার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত। এমন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত হইয়াও যদি কোন পুরুষ পণ্ডিত তাঁহাদের শিক্ষায় উদাসীন থাকেন সে মহাপাপ তাঁহাদেরই,—নারীর কিছুতেই নহে। ভারতে এরূপ ধীর নম্র জ্ঞানপিপাসু নারীর অভাব আজও হয় নাই। আমরা কেহবা সনাতন পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া কৃতার্থ—কেহবা বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিক্ষার স্রোতে 'হাবুডুবু' খাইয়া আমাদের জীবন-সঙ্গিনীদিগকেও

নিমজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে ব্যস্ত,—নিজের ভাবে নিজে মত্ত! পুরুষ কবে নিজেকে খুঁজিয়া পাইয়া—আত্মচিন্তায় সবুদ্ধ হইয়া নারী প্রকৃতির মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে!

আশা হয়—সে দিন সুদূর নহে,—উচ্ছৃঙ্খলতা নারী প্রকৃতির নয়—যদি তাহাদের জীবনে তাহা ঘটিয়া থাকে তাহা সংসর্গ দোষে, মনে মুখে, ইচ্ছায় কার্য্যে পুরুষ এক হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক, এযুগে পুরুষ, নারী-প্রকৃতির, (বিশেষতঃ স্ত্রীর) নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইতেছেন, গ্রন্থকর্ত্রী এক কথায় সমস্তই পুরুষের মনোভাব মূর্ত্ত করিয়া বলিতেছেন—"একেলে পুরুষেরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সহধর্ম্মিণীর পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগত ঠাকুরমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন।"

পুরুষেরা ইহার উত্তরে কি বলিবেন! নীরব!

স্ত্রীপুরুষ ওতঃপ্রোত ভাবে সংসারক্ষেত্রে জড়িত! স্ত্রী যেস্থলে পুরুষ, পুরুষ যেস্থলে স্ত্রী হইতে ব্যস্ত সে দেশ যত উন্নত হউক, অগ্রসর হউক—সে সখের পরিণামে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবনতি অবশ্যম্ভাবী! অনেক স্ত্রীও আজকাল ইউরোপীয় আদর্শে এই উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়াছেন। নারীর উক্তির লেখিকা কিন্তু স্পষ্ট বলিতেছেন, "সব কাজ একের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে, কার্য্য বিভক্তিতেই কার্য্যসিদ্ধি! লক্ষ্য ঠিক হইলে তাহার সাধনে কোন খণ্ড কাজই তুচ্ছ নহে। গৃহরচনা বূ্যহরচনা অপেক্ষা কিছুমাত্র সহজসাধ্য নহে, এবং জীবনসংগ্রামের পক্ষে বোধহয় বেশী বই কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য যেমন পুরুষে অর্জ্জন এবং স্ত্রীলোকে বণ্টন করে, তেমান মানসিক খোরাকও পুরুষকে অধিকাংশ যোগাইতে হয়। সত্যরাজ্যের সীমানা বাড়ানো তাঁহাদের কাজ, কিন্তু যে সত্যরত্ন মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করাও জীবনে প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কাজ! সেইজন্য সব দেশে ও কালে স্ত্রীলোক রক্ষণশীল, পুরুষ গতিশীল!......তাই নারী শক্তিরূপিণী!"

উপদেশ দান কালে দেশকালপাত্র, উপযুক্ত আধারের কথা আমরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হইয়া বকিয়া যাই। গ্রন্থকর্ত্রী কোন স্থলেই 'তাল' হারান নাই,—নারী, নারীর মত ধৈর্য্যে

কেমন স্পষ্ট কথায় তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিয়া গিয়াছেন। পুরুষ যদি এরূপভাবে ভাবিতে চাহিত,—নারীকে মুখে 'সম্মান করি' জাহির না করিয়া তাঁহাদের উক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিত তাহা হইলে এদেশে সীতা সাবিত্রীর অভাব কল্পনা করিয়া গগন ভেদ করিবার তেমন প্রয়োজন হইত কিনা সন্দেহ! একালের সীতা, রাক্ষস রাবণ-আলয়ে নিপীড়িতা,—উদ্ধারের শক্তি একেলে রামের নাই—আছে বাক্য—তাঁহাদের ইচ্ছা,—নির্জ্জিতা সীতা নিজেই কেন তাহার উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করুক না! শক্তিউপাসকের কি শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস!

নারীর উক্তির প্রত্যেক প্রসঙ্গ, প্রত্যেক উক্তির আলোচনার ক্ষেত্র এ নহে—তাহা বুঝিবার আশা করি প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকপাঠিকা নিজ 'নারীর উক্তি' পাঠ করিয়া তাহার গুরুত্বের অনুভব করিবেন। উপন্যাস রচনায় অনেক মহিলা বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, নারী আপনার ভাবে আপনাদের স্বভাবিক বলিবার ভঙ্গী রক্ষা করিয়া, সরস সুন্দর ভাবে কি করিয়া আত্মসমস্যা—নারীজাতির উন্নতির চিন্তা করিতে সমর্থ—নারীর উক্তি পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। নারীর উক্তি পাঠে জনৈক প্রবীণ সমালোচক একখানি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখিয়াছেন—"* * আর এও সত্য কথা যে তিনি জোর করে কোন কথাই বলেন নি, দু'পক্ষের উল্টো উল্টো কথার সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। * * এই গুণ দুটিই নারীচরিত্রের পাকা স্বাভাবিক। আমরা পুরুষেরা হচ্ছি লড়াকে জাত। আমরা আত্মশক্তিকে সকল ক্ষেত্রেই জয়ী করতে চাই, তাই আমাদের শক্তি হয় বিরোধের মধ্যে ফুটে ওঠে নয় ত—চেপে যায়। এক কথায় আমরা, পুরুষেরা শক্তির উপাসক—আর মেয়েরা করেন শিবপূজা। উভয়ের চরিত্রের এই মূল প্রভেদটা যদি আমাদের সাহিত্যে স্পষ্ট অধার পায় তাহলেই এদেশে পুংসাহিত্যের পাশাপাশি একালের স্ত্রীসাহিত্য গড়ে উঠবে। আজকাল বাজারে যে লেখা সাহিত্য বলে চলে যাচ্ছে, তা না পুরো পুরুষালি না পুরো মেয়েলি, সেই জন্যই বাঙলা প্রবন্ধাদির নাম স্বাক্ষর না দেখা তকু বোঝা যায় না সে লেখাটি আজকাল পুংহস্তের না স্ত্রীহস্তের।" সত্যই।

(নব পর্য্যায়)
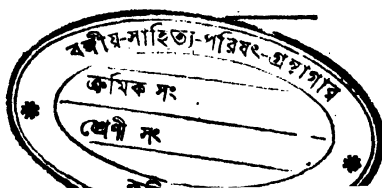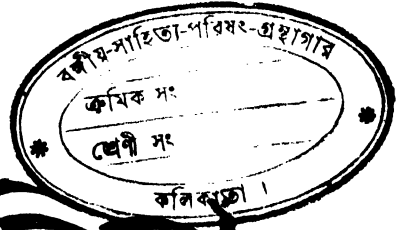
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৪র্থ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল। | ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

পাওয়ায় খোঁজা।

তোমারে খুঁজিয়া বঁধু সুখের অবধি নাই
হারাবার তৃষা ভরি অফুরন্ত করে পাই ;
অনিমেষ আঁখি নিয়া
কে যেন আছে চাহিয়া
সে সরম সুষমায় আমি রে বিবশা তাই।

মোর নয়নে যৌবন সাধ নিবিড় নিশার পারা,
বরাঙ্গ ভরিয়া ওগো তার সাড়া তার সাড়া ;

আমি রে মুগধা মেয়ে
কারে পেয়ে কারে পেয়ে !
কার প্রেম বাহু বেড়ে চিরদিন পথহারা।

মোর নিদ ভরি ওগো সে বুঝি থমকি রয়,
কলঙ্ক বেদনা দিয়ে কি তীর্থ রচিয়া লয়।
বুক ভাঙা এত কাঁদা
তাহে সে পড়েছে বাঁধা,
আমার লাজের মাঝে রহি রহি কথা কয়।
নিভায়ে সকল দীপ সে দীপালী মহোৎসব—
জগত লীলা মুখরে কিবা কব কিবা কব ?
সারাটা স্বজন জুড়ি
দু'জনার লুকোচুরি,
সে আমারে পেয়ে গেছে আমি তারে খুঁজে লব।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রিয়তমা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ডচেসের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে ও ব্যারণ মাইনো তাহাকে পৌছাইয়া দিতে তাঁহার বাড়ী গিয়াছেন, এই সংবাদটি শুনিয়া জুলিয়েন নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই. কিন্তু. সমস্ত দিনের কোলাহলের পর এখন পুরী নীরব। লিয়ো হপ্‌মার্শেলের নিকট আছে জানিয়া সে একটু বিশ্রাম লইতে বসিল।

আজিকার দিনমানের যত যা কথা লিয়েনের নিকট এখন স্বপ্নের মতই লাগিতেছিল। উপর্যুপরি ঘটনার পর ঘটনা, তার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি কথা মনে পড়িলেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শিথিল হইয়া আসে।—কিন্তু লিয়েন তখন নিজের সব কথা ভুলিয়া ভাবিতেছিল হতভাগিনী লিলির কথা। ভগবান যাহাকে অতখানি দিয়াছিলেন, তাহার কাছ হইতে কি আবার এমন করিয়াই কাড়িয়া লইয়াছেন? এতখানি বিড়ম্বনা মানুষের ভাগ্যে ঘটে? লিয়েন নিজের ভাগ্যের সহিত তাহার অদৃষ্ট তুলনা করিয়া বুঝিল—ফ্রোলেন্ যথার্থই বলিয়াছে,—'বুকের ভিতর ভাঙ্গিয়া চুর হইলেও সে ভাঙ্গাচুরা ফেলিবার একটা স্থান তাহার আছে, তাহার স্নেহের আলিঙ্গন আর কিছু না পারুক্ তাহার নয়নের উষ্ণধারা চুম্বন-স্পর্শে মুছাইয়া দিবে।' কিন্তু ঐ বজ্রাহতা পুষ্প—ও!

লিয়েন শিহরিয়া উঠিল। মানুষের অত্যাচারে সে এত দুরবস্থা ভোগ করিতেছে। হাঁ মানুষেই করিয়াছে বৈ কি। কি ভীষণ—কি রাক্ষস্ প্রবৃত্তি! ভাবিতে ভাবিতে হপ্‌মার্শেলের মুখ মনে পড়িয়া সে ভীত হইয়া উঠিল। কোথায় সে বৃদ্ধ শোকাতুর লিয়োর মাতামহ? এ নররাক্ষস কে? যে নারীহত্যার ভয় পায় না,—বালককে পীড়া দিতে ব্যথিত নয়, আর ফ্রোলেন্ যাহা বলিল—উঃ! সেই সঙ্গে তাহার স্মরণে আসিল—ঐ দানব তাহারও শত্রুরূপে দেখা দিয়াছে, তাহার সহিত প্রকাশভাবে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। কি জানি কেন প্রথম দৃষ্টিতেই মার্শেল তাহাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর আজিকার সেই দারুণ লজ্জাজনক ঘটনা। ভগবান, তাহাকে এ কোথায় আনিয়া ফেলিলেন।

তাহার স্বামীর মূর্ত্তি মনে আসিল। এখানে আসিয়া দারুণ বেদনায় বুক ফাটিয়া যায় যে! তিনি তাহার কথা দিনান্তে স্মরণ করেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সে কি তাহা পারিতেছে? অন্য কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে লিয়েনের কর্ণে তাহা অমৃত বর্ষণ করে। কেন এমন হয়? নামমাত্রের বিবাহ, স্বামীর কাছে শুধু ভদ্রতা ভিন্ন সে এখন আর কি পাইয়াছে যে এ অকারণ বেদনার বিদ্যুৎসঞ্চার? কিসের জন্য—কেন এ?

তাহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত; অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—স্বামী ডচেসের সহিত চলিয়া গিয়াছেন—যদি আর না ফিরেন? যদি অনুরোধে বা আর কিছুতে

দু'চার দিন থাকিয়া যান ?—কি হইবে ?—কি জানি কি হইবে, ঐ বৃদ্ধ দানবের নিকট—তাহার পরম শত্রুর সহিত একই বাড়ীতে বাস করা কি নিরাপদ ?—না কালই সে রুডিস্‌ড্রর্কে ফিরিয়া যাইবে। লিয়োকে ফেলিয়া যাওয়া,—এই এক পাষাণভার তাহার বক্ষে চাপিয়াছে ; কিন্তু সে আঘাতও তাহার নিয়তি, ইহা সহিতেই হইবে। তাহার যাওয়া না যাওয়ায় স্বামীর আপত্তি নাই, ইহা তিনি ডচেসের সম্মুখেই এক প্রকারে জানাইয়াছেন। তবে আর কেন! তিনি আসিলে তাঁর অনুমতি লইয়া সে চলিয়া যাইবে।

তাহার এই পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের কল্পনা আল্‌রিককে জানানো উচিত মনে করিয়া লিয়েন আপনার লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। উপস্থিত দুর্ভাবনা জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যও তাহার এমনি একটা কিছু করার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু খানিকটা লিখিতেই তাহার হাতের যন্ত্রণা আবার বাড়িয়া গেল ; হাতের কলমটা ফেলিয়া দিয়া সে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "উঃ মাগো, কি ব্যথা !"

ঠিক্ সেই সময়েই বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বেগে দ্বারোদ্ঘাটনের প্রবল শব্দ, লিয়েন চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল,—রোটাস্ গিলির কণ্ঠরোধ ; সেও আজ একাই আছে !

কিন্তু তৎক্ষণাৎ পাশ হইতে ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন, 'কেন লিয়েন্—কেন ? এই যে আমি আসিয়াছি।' তাঁহার স্বর স্নেহপূর্ণ, তিনি যেন বলিতে চান যে তাঁহার উপস্থিতিতে লিয়েনের আর কোন ভয় থাকিতে পারে না।

লিয়েনের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, বিবাহের পরদিন সেই একবার ছাড়া তিনি আর এ গৃহে পদার্পণ করেন নাই, তাহার এখানে আসার কোন সম্ভবনা ছিল না। সে বিস্ময়-স্ফুরিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিল।

"ও কি, কি দেখিতেছ তুমি ? কি হইয়াছিল যে অত ভয় পাইলে বল দেখি ?" বলিয়াই রাঁওয়েল জুলিয়েনের আলুলায়িত কেশরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অস্তমান সূর্য্যের শেষ রৌদ্রাভা লাগিয়া সে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ স্বর্ণ সূত্রের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল,

স্বল্প পরিচ্ছদা তরুণীর উন্মুক্ত বাহুতে স্কন্ধে সই গুচ্ছ গুচ্ছ সুবর্ণ কেশ দুলিতেছে, উচ্চভাব-মণ্ডিত কমনীয় মূর্ত্তি জুলিয়েনকে তখন যেন বিচ্ছুরিত কিরণজালবেষ্টিতা দেবীমূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল ; ব্যারন সবিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিলেন।

লিয়েন কিন্তু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার চুলের উপর ইঁহাদের যে কতখানি ঘৃণা, তাহার জন্য কত লজ্জাই সহিতে হইয়াছে তাহাকে, সব মনে পড়িয়া গেল। নানা কারণে আজ তাহার মস্তিষ্ক চঞ্চল, আবার এই চুল লইয় পাছে কিছু সহিতে হয় ভাবিয়া তাহার মুখ শুকাইল। টুপি,—তাহার টুপি খানা কোথায় রাখিয়াছে? এদিক ওদিক চাহিয়া সে কিংকর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া একখানা তোয়ালে টানিয়া মাথা ঢাকিল।

"কেন বল দেখি, আমার কাছেও অত আদবকায়দার প্রয়োজন কি জুলিয়েন? তা ছাড়া দেখি আজকালকার নূতন ফ্যাসানে খোলা চুলে সাধারণের সম্মুখে বাহির হওয়া দোষের নয়!" বলিয়াই লিয়েনের মাথা হইতে কাপড়খানা ফেলিয়া তাহার চুল নাড়িয়া ব্যারণ বলিলেন, "কি সুন্দর চুল তোমার, যেমন সুন্দর—তেমন নরম।"

"হাঁ, লাল লো ট্রুচেনবার্গদের অপেক্ষা কিছু ভাল!"

স্ত্রীর মুখের এই মৃদু স্বরটিতে রাওয়েল্ চমকিয়া উঠিলেন, এ যেন তাহারই মুখের কথা! কিন্তু কোথায় বা কবে এ কথা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ হইল না। আর লিয়েনই বা তাহা শুনিল কি করিয়া? তাহার সম্মুখে ত তিনি কখনও চুলের উল্লেখ করেন নাই!—

সঙ্কোচে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া শান্তভাবে বলিলেন "দাঁড়াও, আমি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনি"

"ডাক্তার! কেন?" লিয়েনের কথায় হাসিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "তোমার হাতখানা একবার দেখাইতে হইবে যে. আঘাতটি ত কম লাগে নাই?"

"না না সে সারিয়া গিয়াছে, আর ত যন্ত্রণা নাই। ডাক্তারে প্রয়োজন কি?"—

"তোমার না থাক্ আমার প্রয়োজন আছে, নিজের মনের—তাঁকে একবার ডাকি লিয়েন।" মৃদু হাসিয়া লিয়েন বলিল, "পাগলামি করিয়ো না রাওয়েল, সত্যই আমি ভাল আছি। এই-টুকুর জন্য আবার ডাক্তার! না, ডাক্তার ডাকা আমার মোটে অভ্যাস নাই, রুড়িসড়র্কের

কাছে ডাক্তার নাই, আর আমাদের যা অবস্থা তাহাতে কথায় কথায় ডাক্তার ঔষধ চলেও না।”

রাওয়েলের মুখ ভার হইল, গাঢ় স্বরে তিনি বলিলেন, “দূর—আমার তাহা চলে।”

“চলে চলুক, তুমি আর হাসাইও না ত! তার চাইতে এখানে একটু বস।” অন্যমনস্কে কথাটা বলিয়া লিয়েন লজ্জিত হইল, ‘একটু বস’—বলিবার সময় সে অভ্যাস্ত সাধারণকে যেমন বলা যায় ঠিক সেই ভাবেই উচ্চারণ করে। কিন্তু বাক্যশেষে নিজেই বুঝিল শব্দ দুইটার সহিত অনেকখানি আগ্রহও বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি আবার বলিল, ‘না—ডাক্তারের কাছেই যাও, তাঁহাকে বারণ কর আসিতে।”

“না ভাবিলে তিনি আসিবেন না, ভয় নাই, তিনি কাকার কাছে বসিয়া আছেন আমারও এখন কাজ নাই, একটু বসিই না।” বলিয়া ব্যারণ হাসিতে লাগিলেন।

কড়িগার হারমার বলিতেন, “রাওয়েলের হাসি—স্ত্রীলোকদের প্রাণঘাতী অস্ত্র বিশেষ।” সেই মুখে সেই সুমিষ্ট হাসি;—চকিত নয়নে একবার দেখিয়াই লিয়েন মুখ নামাইয়া লইল।

চেয়ারে বসিয়া রাওয়েল্ তাহার দিকেই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাকে নীরব দেখিয়া চোখ তুলিয়া ঘরখানির চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। ‘বাঃ জুলিয়েন, তুমি যে এ ঘরের সমস্তই বদলাইয়া দিয়াছ দেখিতেছি? ভ্যালেরি যখন থাকিত, তখন চব্বিশ ঘণ্টা এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরিয়া থাকিত; আর কি সে তার একঘেয়ে শুইয়া থাকা,—দেখিয়া দেখিয়া যেন আমাকেও ক্লান্ত করিয়া দিত। হাঁ জানালার ধারে ধারে ঐ অ্যাজালিয়ার গাছগুলি বেশ্ দেখাইতেছে, তোমার যদি আরও কোন গাছ প্রয়োজন হয় ত আমায় বলিয়ো।”

লিয়েন কথা কহিল না। ব্যারণ উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বলিলেন, “কিন্তু তুমি সে সব কোথায় কর? ঐ ছবি আঁকা টাকা, তাহার সরঞ্জাম ত দেখিতেছি না!”

লিয়েন আঙুল দিয়া পাশের একটা ছোট ঘর দেখাইয়া বলিল, “ঐ ঘর।”

ঐ আঁধার ঘরটায়! আরে ছি ছি, লিয়েন্—ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে—না আলো না চিমনি ও ঘরে তুমি বস কি করিয়া?”

"কি করিব, ও সব কাজ যে সকলে পছন্দ করেন না, ও ঘরে ত কারু প্রয়োজন নাই—তাই।"

রাওয়েল একটু অপ্রতিভ হইলেন এদিক ওদিক চাহিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন "এখন না হয় কোনমতে চলিবে কিন্তু শীত কালে কি করিবে? ওঘরে ত আগুন থাকিবে না?"

লিয়েন উত্তর করিল, "কেন তুমি দেখ নাই, রুডিস্ ডর্কের হলটায় খুব বড় একটা চিম্‌নি আছে, সেইখানে বসিয়া আমি ও আলফ্রিক কাজ করিতাম, এখনো সেইখানেই বসিব।"

"ওঃ"—! বলিয়া ব্যারণ পা দুখানি প্রসারিত করিয়া আলস্য ভঙ্গীতে চেয়ারের গায়ে মাথা হেলাইলেন। লিয়েনের মাথাটি আরও নীচু—মুখ দেখা যায় না। খানিকক্ষণ পরে রাওয়েলই ডাকিলেন, "লিয়েন!"

"কেন।" "মুখ তোল—শোন।" "বল না শুনিতেছি।" ব্যারণ তখন চেয়ার লইয়া লিয়েনের পাশে আসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "তোমার কপালে এ দাগ কেন? সর্ব্বদা বুঝি এই কথাই ভাব?"

লিয়েন সবেগে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না না না,—আমি কোন কথা ভাবি না, ভাবিতে পারি না—ভাবিতে ভাললাগে না আমার!"

"তবে বার বার ওকথা বলিতেছ কেন?"

"বলিব না? যাইবার পূর্ব্বে তোমার অনুমতি লইব না? আমি যে কালই যাইতে চাই।"

"কাল—লিয়েন!"

"যত শীঘ্র হয় তাই ভাল, কেন তুমি ত আমায় যাইতে বলিয়াছ রাওয়েল।"

"আমি যাইতে বলিয়াছি—কখন?"

"ডচেসের সম্মুখেও বলিয়াছ, মনে করিয়া দ্যাখ।"

"ও:—হাঁ বুঝিয়াছি। তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ—না? রাগ করিয়াই যাইতে চাহিতেছ!"

ব্যথিত স্বরে লিয়েন বলিল, "রাগ করিয়াছি?—না তুমি হাসিও না, হাসির কথা নয় এ, রাগ করি নাই বলিলাম, বিশ্বাস কর বা না কর।"

"করিয়াছ লিয়েন—করিয়াছ। ডচেসের আসার সময় আমি যে তোমায় এতটুকুও ভাল কথা বলি নাই সদ্ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ করি নাই, ইহাতে তোমার দুঃখিত হইবার কারণ আছে! কিন্তু দেখিয়াছিলে কি, সেই গর্ব্বিতা উদ্ধতা স্ত্রীলোকটি—আমার প্রত্যেক ভাবটুকুকেও গোগ্রাসে গিলিয়া যাইতেছিল? তাহার সম্মুখে তোমায় কিন্তু—যাক্। তবে সে জন্য তুমিও যদি রাগ কর—"

"রাগ নয়—রাগ নয়, আমি যথার্থ কথা বলিতেছি; তবে এখানের সমস্ত ঘটনা মিলিয়া আমায় ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। আর আমি সহ্য করিতে পারি না, তাই আলুরিককে লিখিতেছিলাম।"

"আলুরিককে চিঠি লিখিতেছিলে? কি লিখিয়াছ? আঃ তা হইলে ত আমার অপেক্ষা ঐ চিঠিখানাই অনেক কথা জানে, উহা আমায় দেখিতে হইবে।" বলিতে বলিতে ব্যারণ গিয়া টেবিলের উপর চাপা দেওয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন।

লিয়েনও ব্যস্তভাবে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "দেখিও না, মিনতি করি তোমায়,—ও পত্র পড়িও না রাওয়েল!"

"কেন পড়িব না আমার কোন দোষের কথা লিখিয়াছ বুঝি?"

লিয়েন সকাতরে বলিল, "না না তা নয়, কিন্তু পড়িও না—কথা রাখ।"

"কেন পড়িবনা? তুমি আমারই কথা লিখিয়াছ—তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি।"

লিয়েন আরও নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "সে যাই থাক্—ও চিঠি আমায় দাও!"

রাওয়েল সরিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কখনই না, ইহা আমায় দেখিতেই হইবে। আমি বরং স্পষ্ট করিয়া পড়িতেছি, তুমিও শোন।" ব্যারণ পত্র পড়িতে লাগিলেন,— তখন জুলিয়েন হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

"আলরিক্,

ঘটনা ক্রমে আমি শীঘ্রই শোনওয়ার্থ ছাড়িয়া যাইতেছি—"

এইখানে পড়িয়া হাসির সহিত ব্যারণ বলিলেন, "হতভাগ্য শোনওয়ার্থ!" সিয়েনের ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল। তাহার দিকে চাহিয়া কৌতুক-তীব্র-স্বরে তিনি পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিলেন।

"যখন আমি আবার তোমার নিকট ফিরিব, তখন তুমি দেখিবে—এই সামান্য কয় মাসের জন্য যে ব্যারণেস্ মাইনো নাম লইয়া রুডিস্‌ডর্ক হইতে বাহির হইয়াছিল, বাহিরের কোথাও সে স্থির আশ্রয় পায় নাই,—ব্যারণেস নাম তাহার মিথ্যা। রুডিস্ ডর্কের কন্যা আজ আবার তাহার জন্মের আশ্রয় স্থানে ফিরিতে চায়, ভগবান করুন সেই তাহার এ জীবনের একমাত্র ও শেষ-আশ্রয় হোক্। আমি যত শীঘ্র পারি এখান হইতে যাইব ও তোমার স্নেহের শীতল বক্ষে মাথা রাখিতে পারিব, এই আমার সান্ত্বনা। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিও।

এ বিবাহভঙ্গকে কি তুমি আমাদেরর দাম্পত্যকলহের ফল ভাবিতেছ আলরিক? না না এ ভুল করিয়ো না, স্বামীর সহিত আমার বিবাদ দূরের কথা, একটি কথান্তরও হয় নাই। অসদ্ব্যবহার ত নয়ই বরং সর্ব্বদাই তিনি আমার সুখের জন্য প্রস্তুত আছেন, কোন দিকে কিছুরই অভাব নাই আমার।

তবে কেন এমন ঘটিল? কি উত্তর দিব দিদি, অদৃষ্ট ছাড়া আর কার দোষ দিব বল? শুধু মনে হইতেছে,—আমি আর পারিতেছি না! ক্লান্তি, বিষম ক্লান্তি, পৃথিবীর কোন কিছুতেই যেন আমার আর ক্ষমতার নাম মাত্র নাই। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই আমার।

তবু তুমি বিস্ময়ভরে আমার দিকে চাহিয়া আছ আলরিক? হাঁ তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ আমার পক্ষে সত্যই অসাধ্য। তাহার অপেক্ষা তাঁহার—আমার স্বামীর কথা বলি কিছু যদি বুঝিতে পার।

তুমি ত জান, তিনি যে আমায় ভালবাসেন না—ভালবাসিতে পারিবেন না, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। তাহার বন্ধুর নিকট ও মাতার নিকট তাঁহার মন্তব্য স্মরণ কর, সেকথা শোনার পর আমি কি সে আশা রাখিতে পারি ?"

ব্যারণ আবার থামিলেন. পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির স্তব্ধ লিয়েনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "না তুমি রাগ কর নাই বটে,—কিন্তু লিয়েন আমিও একটা কথা বলিতে পারি,—সে সব কথা জানিয়াও তুমি আমার সহিত আসিয়াছিলে কেন ? আর এত দিন আমায় সে কথা জানিতে দাও নাই কেন ?"

"অতি অস্ফুট স্বরে লিয়েন বলিল "আর একটু পড়।"

ব্যারণ পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার স্বর সম্পূর্ণ পৃথক,—পূর্ব্বে জুলিয়েনকে শোনাইবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিলেন এখন যেন তাহা নিজের মনেই ধীরভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ঐ সমস্ত জানার পরই নীচে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহের অঙ্গুরী ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিম্বা শোনওয়ার্থে আসিয়া যখন বিবাহ ব্যবস্থায় আপত্তি উঠিল তখনও আমি ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই কেন আলরিক ? তাঁহার ভালবাসার আশা করি নাই বলিয়া নয় কি ? মনে ছিল, যে পদ দিয়া তিনি আমায় আনিয়াছেন সেই গবর্ণেসের উপযুক্ত হইবারই চেষ্টা করিব এ জীবনে যা কিছু আছে তাই দিয়া তাঁহার সন্তান—এখন আমার প্রাণাধিক লিয়োকে পালন করিব, কিন্তু তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিল না, লিয়োকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে আমায়। কেন যাইতে হইবে এ প্রশ্নের উত্তর নাই ভগিনি, জিজ্ঞাসাও করিয়ো না।"

এই পর্য্যন্ত পড়া হইতে লিয়েন অগ্রসর হইয়া বলিল "আর না—আর পড়িও না।"

"কেন পড়িব না—নিশ্চয় পড়িব।" বলিয়া রাওয়েল পড়িবার উদ্যোগ করিতেই লিয়েন তাঁহার হাত হইতে পত্রখানা লইতে গেল। ব্যারণও দক্ষিণ হাতখানি পত্র সহিত উর্দ্ধে তুলিয়া বাম হস্তে লিয়েনের হাত ধরিয়া পড়িতে সুরু করিতে—লিয়েন তাহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইল। ব্যারণ স্পষ্টস্বরে পড়িতে লাগিলেন ;—

"এখন আমার স্বামীর কথা শোন, তাঁহাকে তুমি দেখিয়াছ—অসাধারণ সুন্দর পুরুষ নন্ কি? ইঁহার হাসি চাহিয়া দেখিবার সামগ্রী,—বোধ হয় তুমিও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ইহা সহজ চক্ষের—কিন্তু যে তাঁহাকে জানে সে বলিতে বাধ্য হইবে দিদি, তাঁহার অন্তরের বৃত্তিগুলিও তেমনি সুন্দর। উদার ভাব তাঁহার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই প্রকাশ পায়, সরলতাও তেমনি পরিস্ফুট;—শরীরের বলের ন্যায় মানসিক শক্তিও বলিষ্ঠ। শিক্ষা বা উচ্চ ভাব—কোন দিকেই তাঁহার ন্যূনতা দেখিতে পাই না। তবু আমাদের সঙ্গী ম্যাগনস্‌দ্যোদার সহিত তাঁহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সে ধীর, ইনি বীর। যে সকল প্রণয়-প্রসঙ্গ লোকে গোপন করে, ইনি অম্লানবদনে তাহা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়া যান, তবে ইঁহার দোষ কি জান? সংসারে কোন বিষয়েই তাঁহার আস্থা নাই, সকল কাজেই তাচ্ছিল্য,—শুধু আমোদ-প্রমোদ আর লঘু গল্পখেলাতেই জীবন কাটাইয়া দিতে চান। তাঁহার কথা ও গল্প করিবার প্রণালী হৃদয়গ্রাহী। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—অনেক লোকের সহিত মিশিয়াছেন, জ্ঞান কোন দিকেই কম নয়; কিন্তু ঐ যে বিলাসিতা, নিত্য-নূতন আমোদলিপ্সা,—তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে। নানা কারণেই আমার মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই, যেটুকু আশা করিয়া আমায় বিবাহ করেন—আমি বোধ হয় তাও দিতে পারি নাই; অপেক্ষাকৃত যোগ্যা স্ত্রী হইলে তিনি সুখী হইতেন;—তাই আমি এ বিবাহ ছেদে আরও আগ্রহান্বিত হইয়াছি।

এ সর্ব্বাংশে শ্রেয় হইবে আল্‌রিক, আমি তাঁহার উপযুক্তা স্ত্রী নই,—সমাজে যেখানে তিনি যান্—সকলেই তাঁহাকে পরিরাজকুমারের ন্যায় আদরে গ্রহণ করে। আর সেই জন্যই বোধহয় নূতন দেশ নূতন লোক তাঁহার প্রিয়। আবার তিনি শীঘ্রই বিদেশ যাইবেন, কেনই বা যাইবেন না? বাহিরের অত আদর—"

এই খানেই পত্র অর্দ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। পাঠ শেষে রাওয়েল খানিকক্ষণ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া থাকিলেন, লিয়েন তখন অন্য দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু পরে ব্যারণ বলিলেন,—"তুমি সমস্তই ঠিক্ কথা লিখিয়াছ জুলিয়েন, আমার স্বভাব একটুও অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে আমার মনের এত ছোটো ছোটো জিনিষগুলাও এত স্পষ্ট করিয়া

দেখিলে কিসে ? আমি যেন তোমার মাইক্রশকোপটার নিকট ছোটো একটি প্রজাপতি, আমার সবই তোমার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে ? কিন্তু কখন তুমি এমন করিয়া আমায় দেখিলে বল ত ? সর্ব্বদাই ত দেখিতাম তুমি নিবিষ্ট চিত্তে ভেল্‌ভেটের উপর ফুল তুলিতে ব্যস্ত থাকিতে, তাহারই ভিতরে আমার উপর লক্ষ্য করিতে কখন ? সূচির দিকে ছাড়া তোমার চোখ যে অন্য দিকে ফিরিতও না, আমি ভাবিতাম সুতার প্রত্যেক টিপ্‌গুলি গুণিয়া গুণিয়া তোমার এক একটি ফুল সেলাই হয়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তুমি এত দেখিয়াছ কি করিয়া ?"

লিয়েন একটি কথারও উত্তর দিল না। ঘরের বাতাসে ব্যারণের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল; পরক্ষণেই তাঁহার অভ্যস্ত কৌতুকহাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন ;--"ঠিক কথা বলিয়াছ লিয়েন, তোমার স্বভাবের সহিত আমার কোথাও মিল নাই,—তুমি আমার নিকট থাকিয়া এক বিন্দু সুখ পাইবে না। সম্প্রতি এ বিবাহ ভঙ্গের কি সুবিধা হইয়াছে দেখিয়াছ ? এই অছিলায় তুমি অনায়াসে এখনি আমায় ছাড়িয়া রুডিস্‌ডর্ফে যাইতে পার ঐ যে তোমার হাতের ভয়ঙ্কর আঘাত, উহাই দেখাইয়া তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে পার। আমি ত অস্বীকার করিতে পারিব না—সহজেই তোমার এ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে।"

লিয়েন এবার মুখ তুলিয়া তীব্র ব্যাকুল স্বরে বলিল, "রাওয়েল্ ?"

ক্ষীণ হাসির সহিত ব্যারণ বলিলেন, "আমি সত্যকথা বলিতেছি লিয়েন।

"চুপ কর, আর বলিতে হইবে না।"

ব্যারণ আর কিছু বলিলেন না, পার্শ্বের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া থাকিলেন। লিয়েন অবসন্নভাবে একখানি সোফার উপর পড়িয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, তখনও তাঁহারা সেই ভাবেই ছিলেন। বাহিরের আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, ঘর আরও আঁধার। প্রভু ও প্রভুপত্নী আছেন বলিয়া কিম্বা কি জানি কেন ভৃত্যেরা এখনও আলো দিয়া যায় নাই। প্রথমে

ব্যারণেরই চমক ভাঙ্গিল,—মুখ ফিরাইয়া ঘরের দিকে চাহিয়া তিনি জুলিয়েনকে দেখিতে পাইলেন না; আবার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ সে তবে চলিয়া গিয়াছে ?"

আঁধারের মধ্যে মাথা তুলিয়া লিয়েন বলিল, "আমার কথা বলিতেছ কি ? যাই নাই ত।"

"এই যে, হাঁ—" রাওয়েলের মুখ অনেকটা সহজ প্রসন্ন ভাব ধরিল। তিনি নিঃশব্দে লিয়েনের আসনের নিকট আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। লিয়েন তখন উঠিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে কথা ছিল না, আঁধারে মুখের ভাবও দেখা যায় না।

ব্যারণ ডাকিয়া আলো দিতে বলিলে ভৃত্যেরা বাতি জ্বালাইয়া দিল। স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া তিনি তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আর কারু জন্য নয়, কিন্তু রুডিসডর্কে গিয়া লিয়োর জন্য কি তোমার কষ্ট হইবে না ?"

মাথাটি আবার সোফার গায়ে হেলাইয়া লিয়েন বলিল, "তা জানি না।"

"জান না—লিয়েন ?" ব্যগ্রভাবে লিয়েন উত্তর দিল, "না না জানি না, এ কথা ছাড়িয়া দাও—"

একটু থামিয়া ব্যারণ বলিলেন, "লিয়ো কিন্তু বড় কাঁদিবে ?"

এবার ঘাড় তুলিয়া স্পষ্ট স্বরে লিয়েন বলিল, "লিয়োর যাহাই হউক—তোমার তাহাতে কি ? তুমি ত দেখিবে না কিছুই—বিদেশে গিয়া নিশ্চিন্ত হইবে; তোমার ভাবনা কিসের ?"

"না ভাবনা আবার কিসের, কিছুই না। বাড়ীর জন্য ভাবনা কি আমার,—আর বাড়ীর কেহও বোধহয় আমার জন্য ভাবিয়া অস্থির হয় না! বাহিরের লোকে আমায় আদর করে, ভালবাসে—তুমিই তাহা লিখিয়াছ, আর আমার ঘর—সেখানে আমার জন্য কি আছে বল ?"

বলিতে বলিতে ব্যারণ টুপি লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, জুলিয়েন সেই ভাবেই নীরবে বসিয়া ছিল। দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া রাওয়েল মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "আমায় তোমার বলিবার কিছু আছে কি ?"

লিয়েন ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—"না।"

তখন বাহিরে মুখ ফিরাইয়া রাওয়েল বলিলেন, "কোন কথা—কিছু নাই জুলিয়েন? আচ্ছা সেই ভাল। কিন্তু মনে রাখিয়ো, এই আমাদের নির্জ্জন সাক্ষাতের শেষ; যদি কিছু বলিবার থাকে—"

"আচ্ছা—আচ্ছা, একটি কথা বলিবার আছে রাওয়েল, শুনিবে?" লিয়েন দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ব্যারণ মুখ ফিরাইলেন না—দ্বারের হাতলে হাত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "শুনিব বলিয়াই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

বিষণ্নভাবে লিয়েন বলিল, হাঁ শোন, তোমার কয়েকটি কথা বলিতে আছে আমার,—তুমি প্রায়ই বল—সংসারের সকল কর্ত্তব্য তোমার শেষ হইয়া গিয়াছে, হইতে পারে—কিন্তু লিয়োও কি তোমার কেও নয়? যে একদিন তোমার আসনে বসিবে তাহার সম্বন্ধেও কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই?"

রাওয়েল্ এতক্ষণে মুক্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আছে বৈকি, তার কি প্রয়োজন বল?"

"প্রয়োজন যথেষ্ট। তুমি ত বিদেশ চলিয়া যাইতেছ,—কত দিনে ফিরিবে তাহাও স্থির নাই—"

রাওয়েল বলিলেন, "না, তার কোন স্থিরতা নাই।"

"তবে লিয়োকে তুমি কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ? তাহার মাতামহ বৃদ্ধ স্নেহান্ধ; আর ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাদ্রীর শিক্ষা, তাহার ফল কি আজ স্বচক্ষে দেখিলে না?"

ব্যারণ এবার উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ এই কথা? ভয় নাই লিয়েন, লিয়োর জন্য আমি সে ভাবনা করি না, সে যে আমার পুত্র—আমারই মত হইবে সে। বাল্যকালে আমাকেও অনেক ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছে, তাহার ফল দেখিতেছ ত? লিয়োর মুখ শরীর—সব আমারই মত, দুষ্টামি ধূর্ত্তপনা—ঠিক আমার শৈশবের অনুরূপ; ভবিষ্যতে সে আমার নাম রাখিবে দেখিয়ো?"

লিয়েনও হাসিয়া বলিল, "তা জানি, তবু—"

"সে আমি নিশ্চয় বিবেচনা করিব তোমার কোন ভাবনা নাই বলিতেছি। তবে আর একটি কথা ; কোর্ট চ্যাপলিনের সহিত তোমার সে তর্কের সময় আমি কোন কথা বলি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর ক্ষুণ্ণ হইয়াছ বোধহয় ?"

লিয়েন উত্তর দিল না দেখিয়া ব্যারণ বলিলেন, "পাগ্লামি করিও না লিয়েন, ওখানে আমি একটি কথা বলিলেই আজ সর্ব্বনাশ হইত ; এক, ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝি না, দ্বিতীয়তঃ একজন পাদরীর সম্মুখে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি বাঙ্নিষ্পত্তি করিলে কি হয় তাও যে তুমি মনে রাখ নাই ! আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, তোমার সহিত তর্ক করিলেও তোমার উপর তাঁহার আক্রোশ নাই কিন্তু বাহির হইতে যদি আমি একটি মাত্র কথা বলিতাম,—তাহা হইলে চ্যাপ্লিন তখনই কি আমায় জেলে পাঠাইত না ? আর তোমার সেই বন্ধু, যিনি দুই তিনবার তোমার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন—"

"সে সাহায্য আমি চাই না রাওয়েল্ !—তোমার বাড়ীতে অন্য কেহ যে আমার সপক্ষে কথা বলিয়া সাহায্য করিতে আসিবে সে আমার অসহ্য।"

কোমল হাস্যের সহিত তাহার প্রতি চাহিয়া ব্যারণ বলিলেন, "বন্ধু থাকিলে ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি কিছুই না, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই. সে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক আমার মত বিধর্ম্মীর পক্ষে কথা বলেন কেন ! শুধু আজ নয় যে দিন আমি প্রথম এখানে আসি সেই দিনই তিনি আমায় অনেক কথা বলিয়া বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।—"

"সে কি কৈ আমি ত তাহা জানিনা ! কি হইয়াছিল বল দেখি, কখন তাঁহার সহিত দেখা হইল তোমার ?"

"সেই দিন রাত্রিতে।—" বলিয়া লিয়েন সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা একে একে বলিয়া গেল। মনোযোগ দিয়া শুনিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "আমার কথা কিছু বলেন নাই ?"

"না, বলিলেই বা আমি শুনিব কেন ? তিনি কি জানেন না যে তুমি আমার স্বামী ?"

"জানেন কিন্তু জান কি—সাধারণ মানুষ, তার মধ্যে স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে ঐ ধর্ম্মভেকধারী পাদরীদের প্রভাব কি উগ্র ? ধর্ম্মভীরু ভ্যালেরি উহার কথায় উঠিত বসিত !—আমার সহিত মনান্তর হইলে সেকথা পাদরীর নিকট বলিয়া শান্তি পাইত সে।—"

"তোমার কাছেও বোধ হয়—"

"বাধা দিয়া লিয়েন বলিল," কিন্তু আমিত ক্যাথলিক নই, তবে মনে হয় যেন তাঁর উদ্দেশ্য ঐখানেই, তিনি প্রলোভন দেখাইয়া আমায় তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে চান।"

"খুব সম্ভব তাই, তবু তুমি তাঁহার নিকট সাবধানে থাকিও জুলিয়েন!"

"কি রকম? বুঝিতে পারিলাম না!"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তোমার স্বভাবটি একেবারে পুরুষের মত,—সাধারণ স্ত্রীলোক যা সহজেই বুঝিয়া লয় তুমি তাহা অনুমান করিতেও পার না। শুধু এখানে নয়—সব সময় সবারি প্রতি তোমার এই ভাব।"

ব্যস্ত হইয়া লিয়েন বলিল, "কথাটি কি—খুলিয়াই বলনা।"

"কথাটা?—"ব্যারণের অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় বাধা পড়িল দুয়ারে পিয়োর দ্রুত পদধ্বনি ও সেই সঙ্গে,—"মা, মা কোথায় আমার!" বলিয়া তাঁহার চীৎকার। সে সম্মুখে লিয়েনকে দেখিয়া তাঁহার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।—

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে লিয়ো, মাকে মনে ছিল না বুঝি?"

"ইঃ তাই কিনা; আমি ঘোড়ায় চড়িয়াছিলাম. মা দ্যাখ—সহিস্ কিছুতেই আমার বাবার ঘোড়ায় চড়িতে দেয় না! তুমি বলিয়া দিও—আচ্ছা?"

"তুমি যখন তাঁর মত বড় হইবে তখন অমন ঘোড়ায় চড়িবে; ও বড় দুষ্ট ঘোড়া—তোমায় ফেলিয়া দিবে যে।"

"ইঁা ঘোড়ার সাধ্য কি যে আমার ফেলে, আমি চাবুক মারিয়া দুরস্ত করিয়া দিব না! হাঁ মা, তুমি ঘোড়ায় চড়না কেন? ঐ ডচেসের মত।"

হাসিয়া লিয়েন বলিল, "কেন, তোমার কি ঘোড়ায় চড়া ভাল লাগে?"

"খুব ভাল লাগে। তাঁহার কেমন সুন্দর চাবুক দেখিয়াছ? সোণার বাঘ আছে তাহাকে, তোমার থাকিলে আমি সেটা কাড়িয়া লইতাম। দেখিয়াছ কি মা সে চাবুক?"

"না লিয়েন।" "কেন, সেই যে বাবার ঘরে টেবিলের সাম্‌নেই ফটোগ্রাফ, তার হাতেও সেই চাবুক, তুমি দেখ নাই?"

ব্যারণের আজ কি জানি কেন মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। লিয়েন তাহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি লিয়োকে কোলে তুলিয়া বলিল, "ছেলের যত গল্প—তার অর্দ্ধেক চাবুকের কথা! তোমার বাবার কাছে একবার গেলে না যে আজ?"

ঠোঁট ফুলাইয়া শিশু বলিল, "না, বাবা বড় দুষ্ট হইয়াছেন—তোমার হাত কাটিয়া দিয়াছেন।"

অবুঝ বালকের দায়ে লিয়েন নিজেও অপ্রতিভ হইতেছিল। কথাটা ফিরাইবার জন্য সে ত্বরিতকণ্ঠে বলিল, "তোমার বাবা যে শীঘ্রই বিদেশ যাইবেন তা জান লিয়ো?"

"জানি, আর মা তুমিও কি শীঘ্রই রুডিসডর্ফে যাইবে?"

লিয়েন চমকিয়া বলিল, "ওরে পাগল, তোকে একথা কে বলিল?"

"কেন প্রিন্স বার্টি বলিল যে, 'তুমি তার মা আর বাবা নাকি সেই কথা বলিতেছিলে।"

এইবার রাওয়েল্ কথা কহিলেন, বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন;—শুনিলে লিয়েন, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একথা সহরময় ছড়াইয়া পড়িবে তা বুঝিয়াছ ত?"

লিয়েন মুখ হেঁট করিল। লিয়ো বলিল, "আমি তবে কাহার কাছে থাকিব মা?" লিয়েন নীরব, উত্তর না পাইয়া লিয়ো বলিল, "আমায়ও সেখানে লইয়া যাইতে হইবে কিন্তু।"

"লিয়েন্!" স্বামীর রুষ্ট স্বরের উত্তরে অতি ধীরভাবে লিয়েন বলিল, "বল।"

"বল, আমি যাইবার পূর্ব্বে আর যাইবার নাম মুখে আনিবে না।"

"কিন্তু।—"

"আবার কিন্তু কি?" ব্যারণের মুখে রক্তোচ্ছ্বাস যেন ফুটিয়া পড়িতেছে।

বিনীত-সম্ভ্রমে লিয়েন বলিল, "তুমি চলিয়া গেলে আমি এখানে থাকিতে পারিব না রাওয়েল্,—আমায় মার্জ্জনা কর!—বল, তুমিও চলিয়া যাইবার বারো ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার রুডিস্ যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে?"

ব্যারণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লিয়ো তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল,—"আমিও মা আমিও,—আমাকেও লইয়া যাইতে হইবে।"

লিয়েনের চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিয়াছে, চক্ষু মুদিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলিল; "সে তোমার বাবাকে বল।"

লিয়োঁ কি বলিতে উদ্যত হইতেই বাধা দিয়া ব্যারণ বলিলেন, "থাম লিয়ো; সর্ব্বদাই এক কথা আমার ভাল লাগে না! চলিলাম লিয়েন্,—হাঁ এই পত্রখানা আমি লইলাম, কারণ ইহাতে আমার কথা আছে—এ চিঠি আমার।"

লিয়েনকে কথা বলিবার বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়া রাওয়েল তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এ সম্ভাষণ শুধু নিত্য-প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তন মাত্র নয়, রাণী বা রাজকুমারীকে যেমন সসম্মান অভিনন্দনে বিদায় সমাদর দেওয়া হয়, ইহা যেন ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধার, তেমনি গৌরবময়!"

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

আভাষ।

(গান)

—:*:—

ললিত।

তোমার মধুর হাসিতে ভুবনে
সব সঙ্গীত ছুটে
নয়নভঙ্গে নিখিল অঙ্গে—
প্রেম রোমাঞ্চ উঠে!
তোমার যতেক হৃদয়স্পন্দ
আমার জীবন-মরণানন্দ
তোমার প্রেম আমারি মাঝে
আছে শতদলে ফুটে!

রয়েছ তুমি যে আলোকে ছায়ায়
করিয়াছ আজ একি এ মায়ায় !
এত বন্ধন মাঝে হ'তে ওগো
কেমনে যাইবে টুটে ?
তুমি যেন এক চকিত বাসনা,
হঠাৎ সরম-রক্ত-আননা,
ছুটিয়া পলানো চরণ-শব্দ,
কাঁধে ঢুলে-পড়া দেহ—
ওগো কে তুমি তোমার আভাষ, আমার
জীবন-মরণ লুটে' !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বস্ত্রসমস্যা।

—ঃ*ঃ—

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত "অন্নসমস্যা" প্রবন্ধ "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই সেই প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পড়িয়া থাকিবেন। দিন দিন যেরূপ অন্নের মূল্য বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহাতে ভূমিহীন শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবী অল্প বেতনের মধ্যবিত্ত পরিবারের উৎসন্ন যাইতে বড় বেশী বিলম্ব নাই। অচিরে ইহার প্রতীকার হওয়া আবশ্যক।

আমি আমার জীবনেই বাল্যকালে একটাকা চারি আনায় পাকা ১/ এক মণ চাউল খরিদ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এখন টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় এবং পাটের চাষ বৃদ্ধি

হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে একমণ চাউলের দাম ১০৲ দশ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৫৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বস্ত্রের অবস্থাও অতি শোচনীয়। গত পাঁচ বৎসরে বস্ত্রের মূল্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অথচ সাধারণতঃ লোকের আয় সে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। প্রত্যুত বহুলোক কর্ম্মাভাবে অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য আছে। দেশে অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার দেখা দিয়াছে কোন কোন স্থানে লোক লজ্জার ও কষ্টের হাত এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে।

সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে বস্ত্র অভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে সংবাদপত্রে এরূপ কাহিনী আমরা বহুল পাঠ করিয়াছি। শুধু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের কাজ করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের নিজেদের, আমাদের দেশের ভাইভগ্নীদিগের লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে ও ক্ষুধার জ্বালা এড়াইতে হইলে আমাদিগকে বীরের মত কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

গৃহস্থ যাহাতে সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া বস্ত্র বয়ন পূর্ব্বক নিজ নিজ পরিবারস্থ লোকের লজ্জানিবারণ করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। বঙ্গদেশে এমন এক সময় ছিল যে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কার্পাসের বীজ ছাড়াইবার কল, সূতাকাটার কল এবং বস্ত্রবয়নের তাঁত ছিল। পরে বস্ত্রবয়নের ভার তাঁতী ও জোলার হস্তে অর্পিত হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে সূতা-কাটার কল বিদ্যমান ছিল, প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ তৈয়ারী সূতা জোলা ও তাঁতীকে দিয়া নিজ নিজ ব্যবহার্য্য বস্ত্রবয়ন করাইয়া আনিত। বেশীদিনের কথা নহে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল ইউরোপীয় কলের প্রতিযোগীতায় এই সূতাকাটা ব্যবসা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কেবল তসর ও গরদের সূতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ ব্যবসা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে এবং কোচবিহারে এণ্ডিকাপড়ের বহুল প্রচলন ছিল। সেই কাপড় প্রস্তুত করিতে এণ্ডি পোকার চাষ হইত, এখন সে চাষ হয় না। ইহা আমার নিজের জানা। আসাম প্রদেশে এখনও এণ্ডি মুগার ব্যবসায় চলিতেছে। সেখানে অধিকাংশ পরিবার এণ্ডি মুগা দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিতে পারে। গৃহকার্য্যের অবসর সময়ে তাঁহারা এই কার্য্য করেন। কুমারীদিগের বিবাহের পূর্ব্বে বস্ত্রবয়ন শিল্পে অভিজ্ঞতা আছে, কিনা

তদ্বিষয়ে পাত্র পক্ষ হইতে প্রশ্ন ও পরীক্ষা হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে যেমন কুমারীর হস্তাক্ষর পরীক্ষা হয় আসাম দেশে তেমন কুমারীর কৃত রুমাল চাদর সাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বস্ত্র যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে প্রতি পল্লীবাসী গৃহস্থ নিজ নিজ গৃহ প্রাঙ্গণে কার্পাসবৃক্ষ রোপণ করেন এবং সূতা কাটার চড়কা কল ব্যবহার করিবেন এবং সেই সূতা দ্বারা বস্ত্রবয়ন করার জন্য তাঁত রাখেন ও আপাততঃ কিছু কিছু কার্পাস খরিদ করিয়া বস্ত্রবয়নশিল্প অধ্যবসায়ের সহিত আরম্ভ করেন এইরূপে দেশে পুনরায় যাহাতে বস্ত্রবয়ন বিষয়ক প্রাচীন প্রথা প্রচলিত করিয়া বস্ত্রকষ্ট দূরীভূত হয় এবং বস্ত্রের জন্য গৃহস্থের ব্যয় কমিয়া যায় ও যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গল হয় তাহা সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

গত ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দ পরগণার লোকদিগকে এবং নিজ আত্মীয়দিগকে এ সম্বন্ধে বুঝাইয়া আসিতেছি কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহাদের সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। ভিতরবন্দের কোন কোন প্রজা সামান্যমত কিছু কার্পাসবীজ লাগাইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে কার্পাসগাছ জন্মিয়াছে। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্পসবীজ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন, শ্রীরামপুরে বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বয়নশিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণতঃ দেশ-বাসীদের আলস্য ও শিথিলতায় গভর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। উত্তর-পশ্চিম (অধুনা যুক্ত প্রদেশ) প্রদেশের কানপুর নগরে মুদ্রণ ও রঞ্জন (Dyeing & Printing) বিদ্যালয় স্থাপিত আছে কিন্তু তাহাতে প্রচুর শিক্ষার্থী জুটিতেছে না। যুক্ত-প্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থানের শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অতিরিক্ত ফি ধার্য্য হওয়ায় কম ছাত্র হওয়ার অন্য-তম কারণ বটে।

এক সময় দেখিয়াছিলাম চরকা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। কেহ বলেন "চরকা আর পুনর্জ্জীবিত করা যায় না, কলকারখানায় সূতা হওয়ার দরুণ চরকা চলিতে পারে না।" এই ধারণা যাহাদের হইয়াছে তাহারা না হয় দেশের মঙ্গলসাধনের জন্য যৌথ সমবায় সংগঠন করিয়া সূতা কাটার কলকারখানা স্থাপন করুন এ দেশে লক্ষাধিক জোলা ও তাঁতী এখনও রহিয়াছে সহজে সূতা পাইলে তাহারা কাপড় বুনিয়া দিতে পারিবে; আর যাহারা

বিশ্বাস করেন যে চরকার স্থান এদেশে আছে তাঁহারা চরকা প্রচলনে মনোযোগী হউন। ইহা আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। যেমন মোটরকার হওয়ায় গোশকট উঠিয়া যায় নাই এবং ষ্টীম বোট হওয়ায় দেশের ছোট নৌকা একেবারে লোপ পায় নাই এবং নদীমাতৃক স্থানে এখনও বহু নৌকা চলিতেছে সেইরূপ সূতা কাটার কল কারখানা নির্ম্মাণ হওয়ায় চরকা একেবারে উঠিয়া যাইতে পারে না। *

বঙ্গের কয়েকটি প্রধান লোকের সঙ্গে আমি বস্ত্রসমস্যা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাহারা সকলেই সূতা কাটা ও কাপড়ের কল জন্য যৌথকারবার খোলা সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

কারবারি লোক এবং ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিকট হইতে আমি আবশ্যকীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। অন্যূন ১৫০০০০০৲ পনর লক্ষ টাকা মূলধন হইলে যৌথ সমবায় কোম্পানী গঠনে সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন যন্ত্রের একটী কল কলিকাতার অনতিদূরে স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহাতে দেশের কল্যাণ ও প্রচুর লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে উৎসাহী এবং উদ্যোগী হইলে সহজে কল স্থাপিত হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর D. B. Meek সাহেব এ বিষয়ে অনেক আবশ্যকীয় সংবাদ আমাকে দিয়াছেন এবং আবশ্যক মত সাহায্য করিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন। ঢাকা নগরী এক সময়ে তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন্ এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও ঢাকার অনেক তাঁতীবংশ সমুদ্ভূত মহৎ লোক বাস করেন, তাহারা চেষ্টা করিলে ঢাকা নগরের নিকটও এইরূপ একটী যৌথ সমবায় সংগঠন অল্প আয়াসেই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশে ভূম্যধিকারীগণ যদি নিজ নিজ এলাকায় কার্পাস চাষের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। প্রত্যেক জেলাবোর্ড ও মফঃস্বল মিউনিসিপালিটি

---

* রংপুরের টেক্‌নিক্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চরকায় সূতা কাটার প্রথা পুনঃ প্রচলন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। উন্নত প্রণালীতে চরকা প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। চরকা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাহার নিকট জানা যাইতে পারে।

একজন করিয়া ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ কর্ম্মী ছাত্রকে শ্রীরামপুর বয়নবিদ্যালয়ে পাঠাইয়া উন্নতির উন্নতপ্রণালীর বয়ন শিক্ষা করাইয়া আনিয়া বয়নশিল্পের উন্নতি বিধান করিতে পারেন।

বিদ্যা হইবে অর্থকরী,—যেবিদ্যায় তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ সেই ত বিদ্যার মত বিদ্যা, ইহাই আমাদের বিদ্যাসম্বন্ধে ধারণা নহে কি ? ভাল! এত দিন ত আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরদ্বারে মাথা কুটিয়া তাহার চরম দান সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম কিন্তু তার পরিণাম ? না মিলিল বিদ্যা,—না মিলিল অর্থ! বিদ্যার গর্ব্বে, ঘরের ধন—মার আশীর্ব্বাদ পায়ে ঠেলিয়া এখন ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন স্থলে যেথানে দাঁড়াইয়া বাধ্য হইয়া বুঝিতে হইতেছে,—ও-বিদ্যায় আর কুলায় না!—এখনও কি আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইবে না! এদেশে বিদ্যার অর্থ যদি অর্থই হয় তবে "মাকু" ঠেলিতে দোষ কি ? আমার বিশ্বাস ইহাতে "উপাধি" না দেক্ জীবন দিবে! মানের দায়ে জীবন হারাইতে যে চায় চাউক—আমি ত প্রার্থনা করি,—আমার চাষার দেশের চাষা আবার চাষআবাদ করিয়া সোনা ফলান,—লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য মোটা কাপড়ের আয়োজন হউক—তাহা হইলেই শিক্ষা সার্থক।

শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

প্রতারণা।

—:*:—

কি জানি কিসের মোহে ছিনু এতদিন
তোমা মাঝে লীন।
দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া শত বারে বারে
সরল অন্তরে আমি ভুলি আপনারে ;

ভাবিয়া তোমারে শুধু করুণার ছবি
যাহা ছিল পদতলে দিয়াছি যে সবই।
ভাবিয়াছি তুমি শুধু করুণার ছায়া—
রচিয়াছ মায়া।

ভাবিয়াছি—তুমি যেন শরতের ফুল –
নাহি তব তুল।
নব কিসলয় সম তুমি রেখাহীন
আপন সৌন্দর্য্য মাঝে আপনি বিলীন,
অকলঙ্ক কুন্দ তুমি আধ-বিকসিতা
তোমারে জেনেছি আমি চির-অনিন্দিতা।
ভাবিয়াছি তুমি যেন প্রভাতের তারা
নিজ সাথী হারা।

গোলাপে কণ্টক আছে—ভাবিনি এ কথা
তাই বাজে ব্যথা।
কে জানিত শেফালীর পেলব অন্তরে
লুকায়ে র'য়েছে কীট প্রতি স্তরে স্তরে,
কুন্দের পরশ লাগি'—কে জানিত হায়
হৃদয় শুকায়ে যাবে মরণের প্রায়!
কভু ভাবি নাই আমি—জ্যোছনা তরল
ঢালিবে গরল।

ভুলায়ে করিবে তুমি হেন প্রতারণা
ছিল নাকো জানা।
ভরিয়া নয়নে জল, করিয়া মিনতি
ধীরে ধীরে জানাইলে আপন সম্মতি,
আজি একি! বুঝি নাত'—এ কেমন ছল—
ভুলাতে আমারে শুধু ফেল আঁখি জল।
ডাকিয়া বিদায় দিলে—একি প্রতারণা
অয়ি অকরুণা!

শ্রীরেণুকা দাসী।

মায়ের ব্যথা।

—:*:—

(১)

ঘরের ভিতরকার ছায়ায় গা রাখিয়া ও চৌকাঠের বাহিরকার রৌদ্রে এক রাশি ভিজা চুল ছাড়িয়া' দিয়া, প্রতিভা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল। স্তব্ধ দুপুর। চারিদিক জ্যৈষ্ঠের 'কাঠফাটা রৌদ্রে চন্‌চন্‌ করিতেছে। গাছপালার ঝোপের ভিতর হইতে তৃষিত চাতকের ক্ষীণ চীৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দই নাই। হাতের বইখানার পাতা উল্টাইতে প্রতিভা দেখিল যে তার ছোট ননদ চামেলী একমুখ হাসি চাপিতে চাপিতে ঘরে ঢুকিতেছে। সে এই হাসির মর্ম্ম বুঝিবার জন্য উঠিয়া বসিল, বলিল "কি রে ভাই হাসছিস্ কেন?" চামেলী কোনও রকমে হাসিটা চাপিতে গিয়া আরো হাসিয়া ফেলিল। প্রতিভা জানিত যে চামেলীর এই হাসিটা তাহার পক্ষে এখনকার দিনে বড় সুলক্ষণ নয়। কারণ তাহার ছোট নন্দাই

অনিলের আগমনে চামেলী এখন 'দলে ভারী' হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। তাই বিরক্ত হইয়া মুখখানা অন্ধকার করিয়া সে বলিল "বাঃ খালি হেসেই ম'র্‌ছে।" হঠাৎ দোরের দিকে চোখ পড়িতেই দেখিল সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেশ স্ফূর্ত্তি-ভরা মুখে অনিল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি এক হাত ঘোমটা টানিয়া বসিল। অনিল হাসি মুখে ঘার নাড়িতে নাড়িতে বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা আজ অস্ত্র পেইচি, দেখুন, আগে আমার হাতে কি তাই চেয়ে দেখুন, তারপর না হয় ঘোমটা দেবেন যত ইচ্ছা তত।" প্রতিভা আড়্‌চোখে চাহিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ! অনিলের হাতে যে বেশী ভারী একখানি চৌকো খাম! এযে প্রতিভারই চিঠি! প্রতিভা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এখন উপায়! মরিয়া হইয়া একবার মহাশত্রু চামেলীরও খোসামোদ করিল। কিন্তু সে কি অনিলের পক্ষ ছাড়ে? প্রতিভার মুখখানা তো রাঙিয়া উঠিয়াইছিল, চক্ষু ফাটিয়াও বুঝি জল আসিয়া পড়ে! বারান্দার অন্য দিকে তার ভাগিনেয় সুধীন সদ্য আগত টাট্‌কা সংবাদ-পত্রে নিবিষ্টচিত্ত। আর কেউ কোথাও নাই।

বাড়ীর গিন্নি; প্রতিভার বড় জা সাবিত্রী তখন অনেক কষ্টে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া সবে মাত্র পা মেলিয়া কাঁথার জন্য কাপড়ের পাড়ের সুতা তুলিয়া, পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন আর মধ্যে মধ্যে হাত বাড়াইয়া ছেলের গায়ের, যেখানটায় হাত পড়ে সেই খান্‌টাতেই একটু চাপ্‌ড়াইয়া দিতেছিলেন। প্রতিভা অগত্যা ইঁহারই শরণাপন্না হইতে আসিয়াছিল। তিনিও প্রতিভার মুখ দেখিয়াই কিছু কিছু আন্দাজও করিয়াছিলেন, বলিলেন "কি রে আজ ঘুমুস নি?" প্রতিভা কোন রকমে মাথা নাড়িয়া বলিল "নাঃ" "হল কি? চিঠি আসেনি?" মুখখানি ভার করিয়া প্রতিভা খানিকক্ষণ সাবিত্রীর পায়ের গোড়ায় বসিয়া রহিল। সাবিত্রী অনেক প্রশ্নের পর ব্যাপারটি শুনিয়া লইলেন। কিন্তু হায় রে এমন একটা সাংঘাতিক খবরেও তিনি একটু হাসিয়াই ফেলিলেন, বলিলেন "তার আর কি? চেয়ে নিগে যা না।" প্রতিভা বলিল "তুমি চেয়ে দাও দিদি, আমায় ছাই দেবেন।" উত্তরে দিদি বলিলেন "হ্যাঃ,—আমি এখন এই বুড়ো বয়সে যাই ছেলেমানুষী ক'রতে, তুই যা না বাপু, চাইলেই তো পাবি।" সঙ্গে সঙ্গেই অনিলের হাস্যোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠ শোনা গেল। "আচ্ছা বলুন তো, বড় বৌদি, একটি বার একটা কথা মাত্র, না চাইলে, আমিই বা আমার

হাতের জিনিষ কাউকে দোব কেন ? কি বলুন ?" রাগে প্রতিভার গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া, অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "অভদ্র।" অনিল পরম উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল। বলিল "বাঃ আর আড়িপাতা বুঝি পরম ভদ্রতার কাজ! আমার হাতে এখন যন্ত্রপাতি আছে, বৌদি দেখুন।" হাতের চিঠিখানা প্রতিভাকে দেখাইয়া সে পকেটে পুরিল। প্রতিভা লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাই বলিয়া চাহিয়া সে লইবে না। অত সহজে সেই বা হারিবে কেন ? নাকি সুরে সে সাবিত্রীকে খেপাইয়া তুলিল "অ দিদি তুমি বলনা।" তিনি বলিয়া উঠিলেন "না এরা জ্বালাতন ক'রে তুল্‌লে--"

(২)

বছর খানেক আগে যখন প্রতিভা নূতন কনে-বৌ আসিয়াছিল সেই সময়ে সে অনিলকে দেখিয়া ঘোমটা দিয়াছিল। অনিল প্রতিভার স্বামী শিশিরের সতীর্থ বন্ধু, সুতরাং ভগিনী-পতি সম্বন্ধ ছাড়াও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী রকম ছিল কিন্তু শিশিরের শত অনুরোধেও প্রতিভা অনিলের সঙ্গে কথা বলে নাই, কারণ ইতিমধ্যেই সে ছোট ননদ চামেলীর সঙ্গে তর্কস্রোতে দিব্যি করিয়াছিল যে সে চামেলীর স্বামীর সঙ্গে কথা বলিবে না। অনিল শুনিয়া বলিল "এতো ভাল কথা, আমার যদি ক্ষমতা থাকে আমি কথা বলিয়ে নোব" তখন অবশ্য প্রতিভা খুব বড় মুখ করিয়া বলিয়াছে "আচ্ছা! আমি বল্‌লে তো!" কিন্তু এখন দিদি শুদ্ধ অনিলের দিকে ত সে পারে কেমন করিয়া ?

ছাতের এক কোণে, নির্জ্জন নিভৃত স্থানে বসিয়া প্রতিভা শিশিরের সুদীর্ঘ পত্রের উত্তর লিখিয়া শেষ করিয়া আনিয়াছে প্রায়, এমন সময়ে পিছন হইতে সাজা পান, তার মুখে পুরিয়া দিয়া, চামেলী হাসিয়া উঠিল। অপ্রস্তুতে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত প্রতিভা লেখা চিঠি চারটুকরা করিয়া নীচেকার বাগানে ফেলিয়া দিল। এক ঝাড় ধব্‌ধবে সাদা ফুল ভরা যুঁইগাছের উপর টুক্‌রা কখানি ঝরিয়া পড়িল, অনিলই বাগানে বেড়াইতেছিল সে নিঃশব্দ হাস্যে একবার চামেলীর দিকে চাহিয়া টুক্‌রাগুলি পকেটস্থ করিল। সাবিত্রীর বড় খোকা বিকাশ সম্মুখে পাঠ্য পুস্তক রাখিয়া বাঁ হাতের কাছের 'হিন্দুস্থানী উপকথা'র পাতা উল্টাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল "পিসেমশায়, ওখানে কি কুড়িয়ে পেলেন,

মার্ব্বেল ?" অনিল বলিল "হুঁ যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত,—মার্ব্বেল কি আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি রে? না গাছে ফল্‌ছে?" অপ্রতিভ বিকাশ একবার নিজের সার্টের পকেট নাড়িতে নাড়িতে মাটীর উপর চক্ষু রাখিয়া বলিল "আমার একটা মার্ব্বেল এখানে হারিয়ে গেছে যে!" অনিলের চক্ষের নিগূঢ় ইঙ্গিতেও ওদিক্‌টার সিঁড়ির উপর গুরুগম্ভীর জুতার শব্দে পিতার আগমন বুঝিয়া মার্ব্বেলের খোঁজ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বিকাশ ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু উঠিবার সময়কার ব্যস্ততায় হাতের কাছের 'ইংরাজি' বইখানা টেবিলের ও-পাশে গড়াইয়াছে, তাড়াতাড়ি কুড়াইবার অবকাশ নাই অগত্যা গ্রামারটা খুলিয়া বসিল। একটা কিছু পড়া তো চাই।

বৈকাল বেলা। ষ্টোভের উপর চায়ের জল বসাইয়া প্রতিভা ময়দা মাখিয়া লুচি বেলিতে বসিয়াছিলেন; চামেলী গা ধুইয়া ফিট-ফাট হইয়া আসিয়া, কেৎ'ল নামাইয়া কড় চড়াইয়া লুচি ভাজিতে বসিল, এবং ঘন ঘন উঠানের ওদিককার ঘরের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল! দেখাদেখি প্রতিভাও কটাক্ষে ওদিককার ঘরগুলা দেখিয়া লইল। সেখানে সুধীন দাঁড়াইয়া, জামা কাপড় সংগ্রহ করিতেছে, বেড়াইতে যাইবার জন্য, আর অনীল মেজের উপর বসিয়া কি যেন করিতেছে ভাল দেখা যায় না। সুধীন চিরদিনই শান্ত গম্ভীর মানুষ, পরিহাস চপল 'ফাজিল' স্বভাব সে কোনও কালেই নয় সুতরাং তার উপস্থিতিটা প্রতিভা বেশ পছন্দই করে কিন্তু অনিল কি করিতেছে জানিবার জন্য সে চামেলীকে প্রশ্ন করিল চামেলী চারিদিকে চাহিয়া বলিল "দাঁড়াও জিজ্ঞেসা করি" চামেলীর জিজ্ঞাসার উত্তরে অনিল ঘর হইতেই বলিল "গীতা সারছি" চামেলী সবিস্ময়ে বলিল "গীতা! কেন তাতে কি হয়েছে?" "খুকী ছিঁড়ে ফেলেছে" প্রতিভা তামাসা করিয়া বলিল "ওঃ সাত জন্মে যা পড়া হয় না তারি ওপর এত দরদ।" অনিল ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল বলিল "পড়্‌বো তবে, শুন্‌বেন?" জলের টবের কাছে দাঁড়াইয়া সুধীন ঘাড় গুঁজিয়া পায়ের উপর হাত ঘসিতে আরম্ভ করিল। অনিলের অনেক পরিশ্রমে আটা দিয়া জোড়া লাগানো কাগজখানির প্রথম ছত্রটুকু পড়া হইতে না হইতেই চাকী বেলন সমস্ত ছাড়িয়া প্রতিভা চামেলীর দিকে অগ্নি দৃষ্টি হানিতে হানিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং অনিল এ বাড়ীতে থাকিতে আর সে চিঠি লিখিবে না এই প্রতিজ্ঞা মনে মনে করিতে করিতে সে একতালার বারান্দা ছাড়িয়া তেতালায়

গিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিয়া হাস্যরোধ অসাধ্য বুঝিয়া সুধীনও ঘরে গিয়া ঢুকিল। প্রতিভাকে উপরে আসিতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন "তোর আবার কি হলো রে?" প্রতিভা কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল "দেখ দিকিনি দিদি!"

সকাল বেলা। সুধীনের পড়ার ঘরে বসিয়া অনিল চা খাইতেছিল, জল খাবার হাতে করিয়া চামেলী আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "শুনেছ সুধীনের বে'র জন্যে ছোটুটী একটি ক'নে দেখে এসেছেন।" সুধীন সলজ্জ স্মিত হাসিমুখে বলিল "ছোটমাসীর আর ঘুম হচ্চে না, শুনেছেন বৈ কি? অমন খবর কারু অজানা থাকে?" অনিল সাগ্রহে বলিল "না কই, আমি শুনি নি তো! কে বল্‌লে তোমায়?" "চামেলী উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু বড়দাদা মোহিত বাবু ও ছোট দাদা শিশিরকে এক সঙ্গে আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। মোহিত বাবু আসন গ্রহণ করিয়াই আবার বিবাহের কথাই তুলিলেন বলিলেন "কেমন মেয়েটি? সুন্দরী তো! শিশির মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "তা মন্দ হবে না তবে ঠিক সুন্দরীও বলা যায় না—" ঠিক এই সময়ে সাবিত্রী আসিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন তিনি বলিলেন "ওসব কোনও কাজের কথাই তো নয় শিশির, তারা কত খরচ করবে তাই আগে বলো, সে কোন্ নবাবের-টবাবের মেয়ে কি না? রং তো বাজে কথা, উনিই শুনেছি আগে নাকি আরমাণী বিবি হেঁকেছিলেন, তার পর বাবা যেই—" কথাটা আর তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে তিনি পারিলেন না অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁর গলা কাঁপিয়া গেল, দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাবিত্রী বড়লোকের মেয়ে নন, তিনি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মেয়ে। তাঁর বিবাহের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও, তাঁহার পিতা মোহিতের পড়ার খরচ যোগাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারই ফলে আজ মোহিত কৃতবিদ্য, এবং পিতৃসঞ্চিত অর্থে অবস্থাবান। সাবিত্রী সুখী হইয়াছেন কি? পিতার ঘরে যে সম্বল থাকলে আজ মুমূর্ষ পিতার চিকিৎসা, আর ছোট ভাইটার মুখে, অন্নগ্রাসটা উঠিত সেই সম্বলই না তাঁর গায়ে সোণা হইয়া উঠিয়াছে। সেই সোণার ঝক্‌ঝকে পালিসের ওপর সাবিত্রী দেখিতে পান মায়ের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মলিন মুখ আর ক্ষুধার্ত্ত ছোট ভাইএর আকুলতা। কন্যা হইতেই তাহাদের এই শোচনীয় নিঃস্বতা।

আজ সাবিত্রী নিজেই পাঁচটি ছেলের মা. সুমুখেই সুধীনের অম্লান তরুণ মুখে ও সুধীনের মায়ের ছাপ্ আঁকা দেখিয়া তিনি আর জ্বালা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই।

কিন্তু তাঁর কথাগুলা যতই কেন যথার্থ হোক না, মোহিতের কানে ভাল লাগিল না। প্রাণপণে ঘাড় হেঁট করিয়া সুধীন উঠিয়া যাইতেছিল দেখিয়া মোহিত আশ্বস্ত হইতেছিলেন, কারণ সাবিত্রীর ঐ ব্যথা গাঢ় কণ্ঠে যদিই সুধীনের ভিতরকার মনুষ্যত্ব হঠাৎ জাগিয়া যায় তা আশ্চর্য্য কি? ছেলেও তো মাতৃগর্ভেই জন্মায়! সাবিত্রী হঠাৎ বলিলেন "ও কি? কোথা যাচ্চিস্ বাবা, একবার সেই শুক পাখীর মত ব'লে যা দিকি তোর কত দাম? কত টাকার মালা নিয়ে তুই ফুল ফেলে দিবি?" এই বার মোহিত বলিয়া উঠিলেন "তুমি কি পাগল হয়েছ? বোক্‌ছো কি সব?"

পাশের ঘরে প্রতিভা ছিল, তার ইচ্ছা করিতেছিল ছুটিয়া গিয়া দিদির একটু পায়ের ধুলা নেয়! সে চামেলীকে বলিল, "দেখ্‌লি ভাই, দিদি চুপ্ চাপ্ থাকেন বটে কিন্তু উনি ভুলে যান না কিচ্ছুই?" চামেলী বলিল "ভুল্‌তে কি পারেন?" "ভূধরের বক্ষ ক্ষত নদী কভু পারিবে ভুলিতে?" সুধীন আসিয়া ঘরের কোণে বসিয়া পড়িল। চামেলী বলিল "কিরে পালিয়ে এলি?" একটু হাসিয়া সুধীন বলিল "বাপ্‌রে বিপদে পড়ে গেছ্‌লুম" প্রতিভা পরম তৃপ্তি পাইয়া বলিল "হুঁ তুমিও একজন মিটমিটে সয়তান, বেশ হয়েছিল তোমার," সুধীন শান্তশিষ্ট মানুষ, সে প্রতিভার কথা শুনিয়া একটু হাসিল। কিন্তু মুখখানায় কি তার একটুও চিন্তার ছায়া পড়িয়াছিল? চিরদিনকার সহিষ্ণু শান্ত স্বভাবের বড় মামীটাকে হঠাৎ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত এই বুকফাটা আর্ত্তকণ্ঠ কি ছেলের বুকে গিয়া বাজিয়াছিল? মোহিত ভাবিতেছিলেন নাঃ ছেলে তেমন একগুঁয়ে মূর্খ গোঁয়ার ছেলে তো নয়, সে যে বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ইউনিভারসিটির তিন ডিগ্রির হাতুড়ীতেও কি ছেলে লোহা হইয়া যায় নাই?

লাফাইতে লাফাইতে বিকাশ হাসিয়া বলিল "কার রাঙাদা, আড্ডা দিতে বসা হয়েছে, বাইরে যে সেই ধীরেনবাবু, যাদের বাড়ীতে বেশ সুন্দর কুকুরের বাচ্ছা আছে,—তিনি এসেছেন চলো" চামেলী বলিল "তোর বন্ধুটির দেখ্‌ছি আচ্ছা সার্টিফিকেট্ তো! কুকুরের বাচ্ছার

কথা না বল্লে বুঝি তাঁকে চেনা যায় না ?" বিকাশ সুধীনের সঙ্গে বেশী রকম ভাব করিয়া ফেলিয়া বলিল "রাঙাদা, তুমি যে বলেছিলে, ওঁর কাছ থেকে একটা কুকুর আনবে ?"

(৪)

কোন্ এক কুটুম্ববাড়ী হইতে মেয়ে দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে চামেলীও প্রতিভার রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। সুধীন পিতৃহীন, আজীবন মাতুলালয় পালিত, মোহিতবাবুই তাহার অভিভাবক ছিলেন, তাহার বিধবা মা ও ভাইয়ের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেন। প্রতিভার মনটা সেদিন ভারী উৎফুল্ল ছিল কারণ সেদিন সুধীনের জন্য কনে দেখিবার উপযুক্ত বলিয়া ভাশুর তাহার মর্যাদা রাখিয়াছেন ; সাবিত্রীর ছোট খোকার গা গরম হওয়াতে তাঁহার আর যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। মোহিত বারংবার বারণ করিয়াছিলেন যে বিবাহ সংক্রান্ত কোনও কথা যেন সুধীনকে শোনানো না হয়, যখন ঠিক করা হইবে তখন শুনিবে। সাবিত্রীর ঘরে ঢুকিতেই তিনি বলিলেন "হ্যাঁরে প্রতিভা মেয়েটি কেমন দেখ্লি রে ? কত বড় ?" চামেলী বলিল "ও মাগো—বৌদি সে মেয়ে যেন একটা ধাড়ী মাগী, বল্লে যে তেরো বছরের কিন্তু দেখাল যেন তেরো দুগুণে ছাব্বিশ বছরের মত।" প্রতিভা চামেলীর দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দিয়া ব্লাউসের বোতাম খুলিয়া লইতেছিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাঃ,—না দিদি, বেশ মেয়ে, দিব্যি সুন্দরী মেয়ে।" প্রতিভার বলে তখন পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, এই সংবাদটা সুধীনকে শুনাইবার জন্য, তা তার বট্ঠাকুরের যতই নিষেধ থাকুক তা বলিয়া এমন সরসতা মাঠেমারা যাওয়া সে সহিতে পারিবে না নিশ্চয়। উপরকার পশ্চিম দিকের বারান্দায় একখানা বই হাতে করিয়া সুধীন বেড়াইতেছিল, আর ঘরের ভিতর বিকাশ বসিয়া পড়িতেছিল। বারান্দায় রীতিমত ঘোরালো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল সে আলোয় আর বই পড়া চলে না দেখিয়াই সুধীন বই বন্ধ করিয়া বেড়ানো আরম্ভ করিয়াছিল।

শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ অপূর্ণ চাঁদের ফালি পশ্চিম আকাশে সোনার টিপের মত ঝক্ঝক্ করিতেছিল ! অস্ফুট জ্যোৎস্নার ছায়া আসিয়া বারান্দায় পড়িয়াছিল। চামেলী ও প্রতিভা সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল 'সুধীন।' সুধীন বেড়াইতে বেড়াইতে থম্কিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এলেন আপনারা ?" প্রতিভা বলিল "মেয়ে দেখে এলুম যে আমরা।" সুধীন চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল, দুইটি তরুণী সকৌতুকে তাহার মুখের দিকে চাহিল কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসের কোনও চিহ্নই সেখানে ফুটিল না। চামেলী বলিল "কথা বলচিস্‌নে যে!" "কি কথা বল্‌ব আবার" প্রতিভা বলিল "সত্যি সুধীন খাসা সুন্দরী ক'নে, তুমি যদি দেখ্‌তে—" সুধীন বেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল "আমি তো দেখেছি।" প্রতিভা ও চামেলী পরস্পর মুখ চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল তারপরই প্রতিভা চামেলীর গা ঠেলিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "দূর্‌ মিছে কথা।" চামেলী বলিল "দেখেচিস্‌? আচ্ছা কেমন মেয়ে বল দেখি?" সুধীন বলিল "কেন বেশ তো!" "বেশ্‌! তা হ'লে তোর পছন্দ হয়েছে বল্‌, তুই কি গেছ্‌লি নাকি মেয়ে দেখ্‌তে?" সুধীন হাসিতে হাসিতেই বলিল "আহা! যাও যাও ছোট মাসী বোকো না, আমার তো আর কোন কাজ নেই কিনা?"—"নাঃ তুইই তো বললি বাপু যে দেখেছিস্‌" "দেখেনি তো কি? দেখেনি তো ওর অমন ভয়ানক অসুখ হ'ল কেন?" বলিতে বলিতে অনিল ও শিশির একই সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। অনিলের কথায় শঙ্কিত শিশির বলিল "অসুখ? কি অসুখ হ'ল রে তোর?" সুধীন বিরক্ত মুখে এই বাক্যচপল গুরুজনটির পানে একবার চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

অনিল বলিল "কি হয়েছে? দেখ্‌তে পাচ্চনা? এই চাঁদের কিরণ, এই কোকিলের ডাক—" উচ্চ নারিকেল গাছের মাথায়, এক পাল পেঁচা কর্কশ শব্দে ডাকিয়া উঠিল, শিশির কানে হাত দিয়া বলিল "ওকে তোমরা কোকিল বল নাকি? আমরা পেঁচা বলি, আচ্ছা তারপর!" অনিল বলিল "তাইতো তবে যে সুধীন কনে দেখেছে বলছিল?" সুধীন বলিল "সত্যিই মেসমশায় সে মেয়ে আমি অনেক বারই দেখেছি" উত্তরে প্রায় সমবয়স্ক পরম গুরুজন দুটি কিছু বলিবার আগেই সুধীন বলিল "কিন্তু, এ বিয়েটিয়ে হতে পারবে না।" শিশির ঝাঁ করিয়া, মুখের উপর দাদার মত গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল "কারণ?" সুধীন চুপ করিয়া রহিল। শিশির বলিল "কই বল্‌লে না এর কারণ?" "সে তার বাপের ক্রীতদাসকে আজীবন ঘেন্না করবে ছোট মামা।" শিশির, অনিল ঘরের ভিতরকার বিকাশ পর্য্যন্ত এক সঙ্গে চম্‌কাইয়া উঠিল। এ কণ্ঠ যেন সুধীনের নয়, এ সেই সাবিত্রীর বেদনাহত আর্ত্তকণ্ঠ! শিশির একটুখানি ঢোক গিলিয়া বলিল "এ কথা সে এসে তোমার কাছে বলে গেছে নাকি?" সুধীন এবারও উত্তর দিল না দেখিয়া শিশির আবার বলিল "কথাটা তোমারই, তুমিই

ক্রীতদাস হ'তে চাওনা কেমন ? আচ্ছা, দাদার সাম্‌নে এম্‌নি ক'রে বলবার সাহস থাকলে তো ! - তা থাকলে আমরা কেউই ক্রীতদাস হতুম না।" ঘরের মধ্যে বিকাশ সুর, করিয়া কবিতা বহি পড়িতেছিল ; সুধীন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল যে সেটা কোন্ কবিতা ! শুনিল বিকাশ পড়িতেছে—

ওহে দেব ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন।

শিশির একটুখানি ভাবিয়া বলিল "তুমি কি এমনি ক'রে নাম কিন্‌বে, যে গুরুজনদের অবাধ্য হবে ? তোমার মা কি মনে ক'রবেন ভেবেছ কি ?" সুধীনের সমস্তমুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সে বলিল "কি মনে ক'রবেন ? মনে ক'রবেন ছেলে তাঁর মানুষ হয়েছে।" বিকাশ পড়িতেছিল

তুমি জীবনের প্রভু তব ভৃত্য হ'য়ে
বিলাইব বিভব তোমার।
আমার কি লাজ আমি ততটুকু দিব
দেছ মোরে যে টুকুর ভার।

প্রতিভা চাহিয়া দেখিল অনিলের হাস্যচপল মুখের অনর্গল পরিহাস-স্রোত আজ এই শান্ত অবাকপটু ছেলেটির করুণাদীপ্ত মুখের কাছে একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ঝুলন-মিলন।

গান।

(পরজ-বাহার—ঢিমেতেতালা)

শাখী-শাখে বাঁধিয়াছি ঝুলনা।
এসো নাহি হতে সাঁঝ বেণু করে রসরাজ,
শুভ অবসর আজ ভুলো না।
দুলিছে যমুনা ঐ কূলে কূলে পুলকে,
দামিনী দুলিছে হাসি স্বর্লোকে ভূলোকে,
বিধাতার পাদপীঠে বাঁধা রশি গিঁঠে গিঁঠে,
এ ভুবন হলো মিঠে দোলনা;
দোদুল যামিনী আজি ভুল না।
ময়ূর দুলিছে তার মেলি' চারু পাখাটি,
হেলে দুলে মাধবীরে চুমে নীপ শাখাটি;
ঘোরে অলি ফুলে ফুলে বুলে বুলে দুলে দুলে,
এ লীলার কোথা মেলে, তুলনা?
মধুমিলনেরে আজি ভুল না!
পূর্ণশশীরে ঐ নভ'পরি আবরি
শ্যাম জলধর দোলে হাসি হাসি আ'মরি!
দোলো তুমি এরি মত সখী সহ অবিরত,
ঢলি ঢলি করি শত ছলনা,
শুভক্ষণ আজিকার ভুল না।

গৃহে গৃহে প্রাণ দোলে দ্বিধা হৃদে ধরিয়া,
বনে আর গৃহকোণে আনাগোনা করিয়া ;
টলে ঋষি বনপথে,　　দোলে রথী রথে রথে
টলে আজি গৃহ হ'তে ললনা ;
আজিকার নিশি সখা ভুল না ॥

শ্রীকালিদাস রায়

স্বরলিপি।

—:*:—

রচনা—শ্রীকালিদাস রায়।　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

II না র্সা মা দা । পা ক্ষা পা দা I না -দা -না র্সা । র্সা -া -া -া ।
শা খী শা খে　বাঁ ধি য়া ছি　ঝু • • ল　না • • •
•　　১　　২´　　৩

। না সা গা মা । মা মা মা -া I পা দা দা দা । পা দা -া -া ।
এ সো না হি　হ তে সাঁ ঝ্　বে ণু ক রে　র স রা জ্
•　　১　　২´　　৩

। না-র্সা র্সা র্সা । না দা পা -ক্ষা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া II
শু ভ অ ব　স র আ জ্　ভু লো • •　না • • •
•　　১　　২´　　৩

II দা দা না র্সা । ঋা র্সা না -র্সা I না র্সা না দা । না র্সা না -া ।
দু লি ছে য　মু না ঐ •　কূ লে কূ লে　পু ল কে •

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্গা র্গা র্গা । র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা I র্সা র্ঋা না -দা । না র্সা না -া ।
দা মি নী ছু লি ছে হা সি স্ব র্লো কে ॰ ভু লো কে ॰

০ ১ ২´ ৩
। গা মা মা -া । মা -া মা গা I পা দা দা দা । পা না দা পা ।
বি ধা তা র্ পা দ্ পী ঠে কাঁ ধা র শি গীঁ ঠে গীঁ ঠে

০ ১ ২´ ৩
। না র্সা র্সা -া । না র্সনা দা পা I না -দা -না র্সা । র্সা -া -া -া ।
এ ভু বন্ ॰ হ লো॰ মি ঠে লো ॰ ॰ ন না ॰ ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্গা -া র্গা । র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া II
দো ছ ল্ যা মি নী আ জি ভু লো ॰ ॰ না ॰ ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II ন্া সা -মা মা । মা মা মা -া I পা দা দা দা । পা দা পা -া ।
ম য়ূ র্ ছ লি ছে তা র্ মে লি' চা রু পা খা টি ॰

০ ১ ২´ ৩
। পা র্সা না র্সা । দা না পা দা I ঋা পা ঋা ঋা । গা ঋা সা -া ।
হে লে দু লে মা ধ বী রে চু মে নী প শা খা টি ॰

০ ১ ২´ ৩
। ঋা দা না সা । র্ঋা র্সা না র্সা I না না দা দা । না সা না না ।
ঘো রে অ লি ফু লে ফু লে বু লে বু লে দু লে দু লে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্গা র্গা -া । র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া ।
এ লী লা র্ কো থা মে লে, তু ল ॰ ॰ না ॰ ॰ ॰

০　　১　　২´　　৩
। না র্সা র্সা র্সা । না দা পা ক্ষা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া া ।
ম ধু মি ল　নে য়ে আ জি　ভু লো ० ०　না ० ० ०

০　　১　　২´　　৩
II দা -দা না র্সা । ঋা র্সা না -র্সা I না র্সা না দা । না র্সা না -া ।]
পূ র্ ণ শ　শী রে ঐ ०　ন ভ' প রি　আ ব রি ०

০　　১　　২´　　৩
। র্সা র্গা র্গা র্গা । ঋা ঋা র্সা র্সা I র্সা ঋা না -দা । না র্সা না -া ।
শ্যা ম জ ল　ধ র দো লে　হা সি হাসি ०　আ ম রি ०

০　　১　　২´　　৩
। গা মা মা মা । মা মা মা গা I পা দা দা দা । পা না দা পা ।
দো লো তু মি　এ রি ম ত　স খি স হ　অ বি র ত

০　　১　　২　　৩
। না র্সা র্সা র্সা । না র্সনা দা পা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া ।
চ লি চ লি　ক রি० শ ত　ছ ল ० ०　না ० ० ०

০　　১　　২´　　৩
। র্সা র্গা র্গা -া । ঋা ঋা র্সা -া I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া II
শু ভ ক্ষণ্ ०　আ জি কায্ ०　ভু লো ० ०　না ० ० ०

০　　১　　২´　　৩
II ন্া সা মা মা । মা -া মা মা I পা দা দা দা । পা দা পা -া ।
গৃ হে গৃ হে　প্রা ণ্ দো লে　দ্বি ধা দ্ব দে　ধ রি য়া ०

০　　১　　২´　　৩
। পা র্সা না -র্সা । দা না পা দা I ক্ষা পা ক্ষা ক্ষা । গা ঋা সা -া
ব নে আ র্　গৃ হ কো ণে　আ না গো না　ক রি য়া ० ०

·　　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩

। ঋ্ণা দা না র্সা । ঋ্র্সা র্সা না র্সা I না না দা দা । না র্সা ণা না ।
টলে ঋ ষি ব ন প থে দো লে র থী র থে র থে

·　　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩

। র্সা র্গা র্গা র্গা । ঋ্র্সা ঋ্ণা র্সা র্সা I ন, দা -না র্সা । র্সা -া -া -া ।
ট লে আ জি গৃ হ হ' তে ল ল • • না • • •

·　　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩

। না র্সা র্সা -া । না দা পা ঋ্ণা I না দা -না -র্সা । র্সা -া -া -া II II
আ জি কা র্ নি শি স খা ভু লো ০ • না ০ ০ •

'ম'এর মহত্ত্ব

মহামহিমামণ্ডিত মনীষীমণ্ডলকে মতবিহিত সম্ভাষণান্তে আত্ম-মহত্ত্বকীর্ত্তনে দণ্ডায়মান হইলাম। আত্মশ্লাঘা মূঢ়তাব্যঞ্জক হইলেও বর্ত্তমান সমাজে উন্নতি লাভের উহাই শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন! সুতরাং 'বড় বড় মার্কামারা' গ্রাজুয়েট মহোদয়গণের কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট কালে আত্মগরীমা প্রচারের মত, গ্রন্থারম্ভে কবিগণের ভূমিকা-আড়ম্বরের মত, আমার এই অনতি-রঞ্জিত মহত্ত্বপ্রকাশ দোষাবহ হইবে না বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি—ক্ষন্তব্যমেহপরাধঃ।

স্পর্শ বা বর্গীয় বর্ণমালার সর্ব্বনিম্নে আমার অবস্থান দর্শনে অনেকেই আমাকে চব্বিশটি বর্ণের অধম বলিয়া অনুমান করেন,—বিষম অমর্য্যাদার কথা! গুণ, বয়স ও কর্ম্মানুযায়ী শ্রেষ্ঠত্বে ইতর-বিশেষ ঘটিয়া থাকে কিন্তু সেগুলির সম্যক সমালোচনা করিলে সর্ব্বাংশে আমার মহত্ত্ব প্রমাণিত হইবে। প্রথমতঃ বয়ঃক্রম-হিসাবে তাহাদের জন্ম তো পরের কথা, বর্ণ স্বরূপিণী স্বয়ং বাগ্দেবীর জন্মেরও বহুপূর্ব্বে শব্দজগতে যখন কেবলমাত্র মহাপ্রণব ধ্বনির উৎপত্তি সেই মহাস্তব্ধতার মহিমান্বিত সন্ধিমুহূর্ত্তে আমার আবির্ভাব ও প্রাধান্যলাভ দুইই ঘটিয়াছিল।

কালমাহাত্ম্যে অবমাননার নিম্নতম স্তরে নিমজ্জমান হইলেও সাম্যাবতার পরমব্রহ্মের যমজ-ভ্রাতা আমি—আমাতেও সাম্যভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! যেহেতু মানেও আমি—অপমানেও আমি, সম্ভ্রমে আমি—অসম্ভ্রমেও আমি, মর্য্যাদায় আমি—অমর্য্যাদায়ও আমি, সুনামেও আমি—দুর্নামেও আমি. অতএব এতৎসম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র মনোবিকারের কারণ নাই। অধিকন্তু—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণি॥

মর-জগতে যাহা সর্ব্বময়—সেই আজন্ম-মরণে আমিই সর্ব্বাধারে সমভাবে বর্ত্তমান! যে 'আমিত্ব' গৌরবে মানবমাত্রই উন্মত্ত, যে 'কামনা' তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার। 'মায়া'রূপে আমিই দেহীমাত্রকে মোহিত রাখিয়াছি, 'মাৎসর্য্যের' উচ্চাসনে অধিরূঢ় হইয়া অধস্তন নিরীহ প্রাণীর উপর যখন ভ্রূকটি-কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপে তাহাদিগকে কম্পমান করি, তখন—পরোক্ষে 'দুর্ম্মুখ' বলিতেও সম্মুখে আমার 'তেলামাথায়' তৈল মর্দ্দনে তাহারা অমূল্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থকে।

মানবদেহমধ্যগত উত্তমাঙ্গসমূহে আমার সম্যক্ অধিষ্ঠান।—মস্তকে আমি, মস্তিষ্কে আমি, মুখে আমি, চর্ম্মে আমি, লোমে আমি, মেদে আমি, মজ্জায় আমি, প্রত্যেক ধমনীতে তাহাদের আমি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান—মলমূত্রাশয়েও আমার কিছু কিছু আধিপত্য আছে। আমার অভাবে হস্তপদ হইলেও মস্তক হয় না, জিহ্বা হইলেও মুখ হয় না নধর সুন্দর কান্তি আমি অভাবে নিমেষমধ্যে কিম্ভুতকিমাকার ধারণ করিবে!

মহামহীরুহ, মহীধররূপে,—সর্ব্বংসহা বসুমতীরূপে, গম্ভীর মহাসাগররূপে একদিকে আমি যেমন গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করি, অন্য দিকে মন (১) প্রভৃতিরূপে তেমনই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকি। যে 'মহা'শব্দ যোগে সদসৎ সকলের সমধিক মহত্ত্ব বৃদ্ধি করি, সেই 'মহা'শব্দ

(১) মনো মধুকরো মেঘো মানিনী মদনো মরুৎ।
মা মদো মর্কটো মৎস্যো 'ম'কারা দশ চঞ্চলা॥

যোগে শঙ্খ (২) প্রভৃতিকে হেয়তার নিম্নতম স্তরে নিমজ্জিত করিয়া থাকি—সুতরাং মহিমা আমার উত্তর দিকেই অপরিমেয় !

দেহীমাত্রকেই যাহা ধারণ করিয়া রাখিয়াছে সেই ধর্ম্মে আমি, কর্ম্মে আমি, মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানে, স্মৃতি, আগম, নিগম বিহিত ধর্ম্মাচরণে, তান্ত্রিক সাধকের পঞ্চ'ম'কার উপাসনায় একমাত্র আমিই মূলাধার। আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মপথে গতি হইলেও 'মতি' স্থির হয় না, ভক্তি থাকিলেও মুক্তিলাভ ঘটে না, যন্ত্র জানিলেও 'মন্ত্র' মনে আসে না, ঝোলা মিলিলেও 'মালা' মিলে না, ভেকধারী হইয়া অরণ্যে রোদন করিলেও 'ব্রহ্ম' (ইষ্ট) লাভের আশা সুদূর-পরাহত। সংস্কারকর্ম্মে—জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, দারকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে প্রেতকর্ম্মটী সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই মানবের নিত্যসহচর। জাতিগত প্রথায়—ব্রাহ্মণ বল, মোস্‌লেম বল, মিশনারী বল, মেথর মুচির সঙ্গেও আমি সমসমাজভুক্ত! তাহারা মঠে, মন্দিরে, মস্‌জিদে সর্ব্বত্রই আমার উপাসক।

বংশগত সম্বন্ধ-বন্ধনে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা পরমাত্মীয়। পিতৃপক্ষে—পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং মাতৃপক্ষে সমস্ত সম্বন্ধই মৎকর্ত্তৃক সমলঙ্কৃত! বিশেষতঃ সম্বন্ধি (শ্যালক) মাতুল ও জামাতাবাবাজীবেশে কুটুম্বক্ষেত্রে সমধিক সমাদর লাভ করিয়া থাকি। আমার অবর্ত্তমানে পিতা মিলে—মাতা মিলে না, স্বজাতি মিলে—সমাজ মিলে না, কন্যা মিলে—জামাতা মিলে না, শত্রু মিলে—মিত্র মিলে না, সুতরাং আমি অভাবে সম্বন্ধ-জগৎ মুহূর্ত্তমধ্যে—"প্রলয়পয়োধিজলে...... ।"

সম্পদ-মর্য্যাদায় কেহ আমার সমকক্ষ হইতে সমর্থ নহে। সম্রাট বল, মহারাজা বল, জমীদার বল, মহাজন বল,—মুটেমজুরের গৃহেও আমি বর্ত্তমান। মনিবের মনস্তুষ্টিসাধনে মোসাহেবরূপে আমি তোসামোদ করিতেও যেমন,—রামা, শ্যামারূপে 'ধামা ধরা' কর্ম্মটীতেও তেমনি তৎপর, সুতরাং—অহমেকাদ্বিতীয়ম্!

---

(২) শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে ॥

অর্থ-সম্পদে মহামূল্য মাণিক্যটি আমি, মণিমরকত হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য তাম্রমুদ্রাটিও একমাত্র আমারই অধিকারে।

আইন আদালতে--সুপ্রিম কোর্ট হইতে মিউনিসিপ্যালিটি আফিসটীতে পর্য্যন্ত আমিই বিরাজমান! কমিশনার বল, মুন্সেফ বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, ঝারুদার মেথরের চাকুরিতেও আমি আত্মগরীমা অনুমান করিয়া থাকি।

গৃহসামগ্রীর মধ্যে আলমারী হইতে ম্যাচেস্ বাক্সটী পর্য্যন্ত মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত। দ্রুত ভ্রমণে—ব্যোমযান হইতে মোটর, টম্‌টম পর্য্যন্ত, ভোজনে--মৎস্য, মাংস, মাখন হইতে মোচা ডুমুর পর্য্যন্ত, পানে---অমিয় মধুর রস হইতে মাদক পর্য্যন্ত, শয়নে—'সুকোমল শয্যা' হইতে মাদুর পর্য্যন্ত, আভরণে—মুকুট (শিরোভূষণ) হইতে মোজা পর্য্যন্ত, আবাসে সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে মুনির আশ্রমকুটীর পর্য্যন্ত আমারই সম্যক ব্যবহৃত।

মর্ত্ত্যবাসীর দেহমাত্রেই আমি আত্মারূপে বিরাজমান। বিমানে—বিহঙ্গমকুলে, শাখে—মর্কটদলে, ভূতলে--মানবাদিতে, জলে—মৎস্য, মকর, কুম্ভীরে বিদ্যমান ত আছি তথাপি মত্তমাতঙ্গ হইতে মাকড়সারূপে, ময়ূর হইতে চামচিকারূপে, তিমি, মহাসোল হইতে মৌরলারূপে আত্মসামর্থ্যের ইতর-বিশেষ প্রমাণ দিয়া থাকি!

সমর-সম্বলে—মহিষাসুরের বক্ষঃভেদী মহাশক্তি অস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুদ্ধের মারকাস্ত্রসমূহে আমিই বিদ্যমান ছিলাম। এই যে সম্প্রতি জার্ম্মাণ-মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল ইহাতেও আমি সমূহ সমর ও বিমান পোতে, 'ক্রুপের কামানে' বিষাক্ত ধূমে এবং প্রত্যেক মাইন, ডিনামাইট ও বোমায় বর্ত্তমান ছিলাম।

শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে—মনুর স্মৃতি হইতে সমগ্র আগম, নিগম, অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধিকন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রথমভাগখানিতেও পরিত্যক্ত হই নাই। সঙ্গীতসম্প্রদায়ে—মিনার্ভা থিয়েটার হইতে মাণিকপীরের গানে, সভাসামাজিকে—মহামহোপাধ্যায় সমাজপতি হইতে মেম্বরটী পর্য্যন্ত, স্কুলকালেজে—এম্-এ, ক্লাশ হইতে নিম্নপ্রাইমারীর পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত, চিকিৎসাগারে—মেডিক্যাল কালেজ হইতে হকিমী ঔষধালয়ে, ভৌগোলিক পরিচয়ে—মহাদেশ হইতে প্রত্যেক গ্রামটিতে, কুটুম্ব সম্ভাষণে—তাম্বুল তামাকটিতে, সমাজ-উৎসবে—নিমন্ত্রণ পত্রখানিতে আমার বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনেও আমার ক্ষমতা অসীম।—ভূমিকম্পে, জলস্তম্ভে, মেঘাড়ম্বরে, ঝঞ্ঝামরুৎপ্রবাহে মৃত্তিকা অবধি ব্যোমদেশ পর্য্যন্ত নিমেষে বিপর্য্যস্ত করিতে একমাত্র আমিই সক্ষম।

ঘূর্ণায়মান কালপ্রবাহ আমারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সুশৃঙ্খলভাবে নিত্য প্রবাহিত। আমার অভাবে দিন গুণিলেও মাসের সাক্ষাৎ হইত না,—পনরদিনে পক্ষ থাকিত না, যেহেতু তাহাতে পঞ্চমী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী ও পূর্ণিমা (অমাবস্যা) তিথি বাদ পড়িত। সাত দিনে সপ্তাহ হইত না—তাহাতেও সোম, মঙ্গল দুইটি বারের অভাব হইত আবার গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতুর অভাবে ষড়ঋতু অঙ্গহীন হইয়া প্রাকৃতিক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইত।

আর-কত বলিব?—মাসিকের সম্পাদকে, সমালোচনায়, মন্তব্যে আমিই প্রকাশমান! আমার অবর্ত্তমানে কবি মিলে—উপমা মিলে না, কাগজ মিলে—কলম মিলে না, প্রবন্ধ লিখিলেও মনোনীত হয় না, প্রেস থাকিলেও মুদ্রণ হয় না, ভাল 'কম্পোজিটর' অভাবে ভূমিকার প্রারম্ভে ভূষিকা যোজনা দেখিয়া প্রুফএক্‌জামিনারের মস্তক-কণ্ডূয়ন সমুপস্থিত হয়।

কাব্য-জগতেই হউক আর চিত্তরঞ্জিনী বাক্য-বিন্যাসেই হউক, শোভন শব্দমালিকা আমার সম্যক্ মুখাপেক্ষী।—মনোহর, মনোলোভা, মনসমোহন, মধুর মিলনমাত্রই আমাতে সম্ভবে। কামিনী, যামিনী, ভামিনী, দামিনী আমারই আত্ম-সহচরী; কমনীয়, রমণীয় প্রভৃতি আমারই চির-বিহারভূমি! আবার উত্তমে-অধমে, শ্রমে-বিরামে, স্মরণে-ভ্রমে, কামে সংযমে, সমে-বিষমে, আগমে-নির্গমে আমিই মতবৈষম্যের প্রধান কমিশনার!

আড়ম্বর—নিষ্প্রয়োজন। মানবমাত্রই আমার 'মায়ানট'!—শৈশবে—মাতৃরূপে, যৌবনে কামিনীরূপে, প্রৌঢ়ে—সম্পদরূপে, স্থবিরে—মরণরূপে একমাত্র আমিই বরণ করিয়া থাকি। মান, সম্ভ্রম, আত্মীয়-কুটুম্ব 'সম্পদ কালে' আমিই প্রদান করিয়া থাকি,—বিষম নৈরাশ্যে শত শত অপ্সরা-পরিবৃত 'অমরার' নিভৃত উপবনে কামনার মানসপ্রতিমারূপে আমিই 'মোহন ইঙ্গিতে' ডাকিয়া লই। মায়ামরীচিকালুব্ধ বঞ্চিত অধম, বিষম দুর্গমে পতিত হইলে মাতৃরূপে আমিই মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে 'উদ্যম' দান করিয়া থাকি, এতদ্ব্যতীত নবদম্পতির

মধুর মিলনে, বাসন্তি মধুযামিনীতে, সুষম-মাখা কুসুম কাননে কি বিমল আনন্দ,—আমার 'মক্কেল' সাজিয়া উপদেশ না লইলে উপভোগ করা অসম্ভব।

প্রলাপে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। মনস্তত্ত্ববিৎ সাজিতে হইলে সমস্ত ব্যোম, মরুৎ, সৌদামিনী 'খুঁজিয়া' সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া আমার মহিমা অন্বেষণ কর—দেখিবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শুধু একমাত্র আমি! কখন দেখিবে—সুরম্যহর্ম্যে রূপমুগ্ধ নয়নে—প্রেমাস্পদের আমিয় সন্তোষণে আত্ম-ভোলা আমাকে; কখন দেখিবে—মহতের ফটকে—মুক্ত পাণিপুটকে—মুষ্টিভিক্ষা আহরণে দণ্ডায়মান আমি! কখন দেখিবে মহানগরীতে মানস-সরসীতে 'বিকচ-কমলদলে' আমাকে;—কখন দেখিবে—দুর্গম শ্মশানে—নির্ম্মম আসনে আত্মজন দাহনের 'চিতাধূমে' মিশ্রিত আমি! সুতরাং আমার অনধিগম্য স্থল ব্রহ্মাণ্ডে বিরল।

মাতৃহীন! আশ্রয় লও আমার;—মুক্তপ্রাণে মা মা বলিয়া ডাক, জগন্মাতারূপে উন্মুক্ত-বক্ষে আমিই তোমাকে ধারণ করিব। প্রেমিক! বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে চাও—এস আমার নিভৃত মানস-কুঞ্জে, ব্যষ্টি ছাড়িয়া 'সমষ্টি'র মধ্যে আমাকে অনুসন্ধান কর—পাইবে সহস্র হৃদয়মথিত গাঢ় প্রেমামৃত। বিন্দুমাত্র আস্বাদনে যাহার ভুলিয়া যাইবে আপনাকে, ভুলিয়া যাইবে স্বার্থময় জগতের বিরহ-বিকার পূর্ণ তুচ্ছ ভালবাসা! অপূর্ব্ব বিমলানন্দে 'চির মাতোয়ারা' করিয়া তুলিব।

এবম্বিধ প্রেম-আহ্বানেও যদি কোন মহোদয়ের মনস্তুষ্টি না ঘটে বা আমার মহত্বে অনাস্থা প্রকাশ করেন, অবিলম্বে তাঁহাকে 'সমাজ' 'মাতা' ও 'জন্মভূমি' পরিত্যাগ করিতে হইবে। সহধর্ম্মিণী 'রমণী' পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে! অগত্যা তাহাকে লইয়া 'শ্বশুরগৃহনিবাস' অবলম্বন একমাত্র উপায়! অবশ্য সেখানেও ৫।৬ দিন পরে জামাতা বাবাজিদের সচরাচর যাহা ঘটে (১) তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে অথবা দাম্পত্য-প্রেমপ্রবাহিনীতে ভাটা পাড়লে

(১) শ্বশুরগৃহনিবাসঃ স্বর্গবাসো ধরায়াং
যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়্ বাসরাণি।
তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ দুগ্ধলুব্ধো বিড়াল—
স্তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাদুকা পুণ্যঘাতঃ!
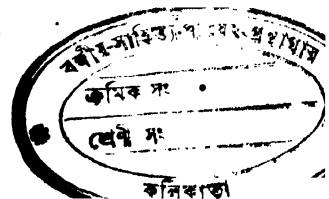
ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আর দণ্ডায়মান হইবার স্থল কোথায় ? যদি থাকে তবে মর্ত্ত্য, মরুৎ ও ব্যোম ইহাদের অন্তরালে উপনীত হইয়া নবযুগের নবীন ত্রিশঙ্কুরূপে এক চিত্তবিভ্রমকর বিকট দৃশ্যের অভিনয় করিতে হইবে।

অথবা মানিতেই হইবে—

'ম'এর মহত্বময় ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল !

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মধু-নাম।

—:*:—

প্রাণের গভীর হতে উঠিতেছে গান।
দিবানিশি শুনি তাহে বাজে তব নাম॥
সবল ঝঙ্কার তার অনাহত ধ্বনি।
গগন ভরিয়া তার উঠে প্রতিধ্বনি॥
তোমা ছাড়া কারো নামে পারিব না প্রভু।
হৃদয়ের পূজা দিতে এ জীবনে কভু॥
আমার প্রাণের কথা তুমি জান একা।
মরমে কেমন সদা চাহি তব দেখা॥
যে গান উঠিছে প্রাণে তাও দে'ছ তুমি।
তাই দিয়ে পূজি তোমা তব পদে নমি॥
বুঝেছি জেনেছি পিতা সঙ্গীত আমার।
পশেছে শ্রবণে তব—আনন্দ অপার॥

দুঃখকষ্ট সবি তাই গিয়াছে ঘুচিয়া।
আনন্দ সাগরে তাই রয়েছি ডুবিয়া।
তোমার নামেতে প্রভু কি যে প্রাণ করে!
দেখ কেবা—কার প্রাণ কাঁদে এত করে!
আশীর্ব্বাদ কর দেব! তব মধুনাম
দেহে মনে মোর যেন করে নিত্যধাম॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চির-রহস্য-সন্ধানে।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবম পরিচ্ছেদ।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-বক্ষ নৈশতিমিরাচ্ছন্ন,—কিন্তু আকাশ স্বচ্ছ, মেঘলেশহীন; স্রষ্টার কোটী কোটী নক্ষত্র-জগত অত্যুজ্জল আলোকমালার মত চন্দ্রহারা গগনমণ্ডলে পূর্ণ গৌরবে ঝলমল করিতেছে। প্রভঞ্জনোৎক্ষিপ্ত গর্জ্জন-মুখর তরঙ্গদল ভীম আস্ফালনে তীরাভিমুখে ছুটিয়া আসিয়া, বীণা-তন্ত্রী-ঝঙ্কৃত সুকোমল স্বর-বিভঙ্গের মত মৃদু সঙ্গীতে ইলফ্র্যাকোম্বের উপকূলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নৃত্যপর বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্রই একটা সজীবতা ও জীবন-লক্ষণ পরিব্যাপ্ত—জগতের গতিলীলা সুস্পষ্ট—শৈল-পরিবেষ্টনী-মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐ তরঙ্গ-চঞ্চল সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, স্পষ্টই অনুমিত হইবে, ভূমণ্ডল তোমার চরণ-নিম্নে নিত্য-ঘূর্ণায়মান, গ্রহ-তারা-খচিত মহাকাশ তোমার শিরোপরি চির-চঞ্চল—অশ্রান্ত-গতি।

সৈকতপ্রান্তে, অন্তরীপবৎ উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর, একটী সাগর-দুয়ারী নির্জ্জন অট্টালিকা— সমচতুর্ভুজাকারে ইহা নির্ম্মিত এবং তাহা অতিক্রম করিয়া আর একটী সুউচ্চ গির্জ্জা উপরিদিকে উঠিয়া গিয়াছে। গির্জ্জার মধ্যে একটী আলোক প্রজ্জ্বলিত; তাহার পাণ্ডুর দীপ্তিটুকু, উড্ডীয়মান-সমুদ্র-বিহঙ্গ-বৎ গর্জ্জন-ক্ষুব্ধ-পবনের পক্ষ-তাড়নায় মুহুর্মুহুঃ ভীতি-কম্পিত। সূর্য্যকিরণেও অট্টালিকাখানি নিরানন্দ দেখাইতেছিল, এক্ষণে রাত্রিতে উহার দৃশ্য আরও শোচনীয় হইয়াছে বাটীখানি পুরাতন; ভূতাশ্রিত বলিয়াও একটা সুনাম আছে; এ অবস্থায় বর্ত্তমান গৃহকর্ত্তা সুবিধাদরেই উহা লাভ করিয়াছিলেন। গির্জ্জাটী তাঁহারই নির্ম্মিত, এবং এই দম্‌কা খরচের জন্যই হউক, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, তিনি নিজেও উক্ত আবাসবাটীর অনুরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, যে লোক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে, বাহ্যজগতের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্কই রাখে না, যাহার সম্বল একটী ভৃত্য মাত্র (জনৈক জার্ম্মাণ যুবক যাহাকে দুষ্ট লোকে উক্ত গৃহকর্ত্তার "রক্ষক"-রূপে অভিহিত করিত), যাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী এতই অনাড়ম্বর যে অষ্টটঙ্কা সাপ্তাহিক আয়ের কোনো আধুনিক 'বাবু'ই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, এবং যে হতভাগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্যা বা জ্যামিতিবিষয়ক যন্ত্রাদি ব্যতীত বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ক্রয়যোগ্য খুঁজিয়া পায় না, সেরূপ সৃষ্টিছাড়া ব্যক্তিকে, হয় উন্মাদ নতুবা কোনো কু-সংঘ-সংশ্লিষ্ট তো হইতেই হইবে—বিশেষ ঐ গির্জ্জা যখন সে নির্ম্মাণ করাইয়াছে এবং (পাড়ার লোকে যতদূর জানে) সে নিজে ছাড়া এ পর্য্যন্ত অপর কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় নাই;—এতগুলি গুরুতর সন্দেহ-কারণ বর্ত্তমান থাকায় জনসাধারণ যে ভদ্রলোককে পরিত্যাগ করিতে চাহিবে, ইহা তো স্বাভাবিক!—এদিকে, ইলফ্র্যাকোম্বের ভদ্রমহোদয়গণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, উচ্চতর প্রতিভার সূচনা দেখিলেই দেশের সম্ভ্রম-গর্ব্বীরা তাহার সংস্পর্শ পরিহার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এ সকল সত্ত্বেও বৃদ্ধ ডাক্তার ক্রেমলীনকে মোটের উপর মন্দ বলা চলে না। অবশ্য জীর্ণ পরিচ্ছদ কিম্বা অশোভন চক্ষুদুটো তাঁহার আকৃতির বিরুদ্ধ সাক্ষী হইতে পারে—কিন্তু তাঁর শীর্ণ আননখানি করুণা ও কমনীয়তায় মাখা এবং মধুর কণ্ঠস্বর যেন প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির জন্য সর্ব্বদাই একটা সকরুণ সহানুভূতিতে আবেগ-কম্পিত; এমন কি, তাঁহার

বিষণ্ণ ম্লান-হাস্যটুকুও যেন করুণা-ব্যঞ্জক। জন্মভূমি রুষিয়ায় অবস্থান-কালে বন্ধুবান্ধবের নিকট তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমগ্র জীবন কোনো এক সুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে উৎসর্গীকৃত—ফলে, ঐ "বন্ধুরা" উন্মাদ ভাবিয়া অনুসন্ধান-ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইলে, তাঁহার খোজখবর রাখা কেহ যে প্রয়োজনীয় ভাবিবেন এমন লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না—পরন্তু সফল হইলে, ঐ সকল বন্ধুর যে নিত্যই দলবৃদ্ধি ও পুনঃবৃদ্ধ ঘটিবে এবং তাঁহাদের ক্রম-বর্দ্ধিত সমাগমে অতিষ্ঠ হইয়া ভদ্রলোকের প্রাণ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে থাকিবে, এ বিষয়ে সন্দেহই নাই। ইতিমধ্যে এক, এল র‍্যামি ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে পত্রাদি লিখেন না বা দেখিতেও আসেন না; আজও রাত্রি প্রায় দশঘটিকার সময় তাঁহার নির্জ্জন আবাস-দ্বারে এল র‍্যামিকে করাঘাত করিতে দেখা গেল—এবং ভৃত্য কার্ল অতিমাত্র আগ্রহ ও আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

"আপনি আসাতে বড় খুসী হলুম"—প্রফুল্লকণ্ঠে ভৃত্য বলিতে লাগিল—"হার্ ডাক্তার আজ সমস্তদিন একেবারেই বেরুন নি, তাঁর আহারও যেন দিন দিন কমে আস্‌ছে; আপনাকে দেখ্‌লে খুবই খুসী হবেন তিনি"।

গায়ের কোট খুলিতে খুলিতে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গির্জ্জেঘরে আজও তিনি এখন কাজে ব্যস্ত বোধ হয়?"

বিষাদভরা দৃষ্টিতে কার্ল স্বীকার করিল এবং ভোজন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া টেবিলের উপর দুইখানি আহার্য্য-পূর্ণ পাত্র দেখাইয়া দিল।

সস্নেহ-হাস্যে এল র‍্যামি বলিলেন—"এটা ঠিক নয়, কার্ল! তোমার পক্ষে প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু এটা ঠিক নয়—এত রাত্রে তোমার প্রভুকে কিম্বা আমাকে কখনও খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি ক'রো না। যাও, ওসব সরিয়ে ফেলে স্বচ্ছন্দে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা দেখগে। কাল সকালে তোমার যত ভাল-খুসী খাবার তৈরি ক'রো—আমরা দুজনেই তা'র সদ্ব্যবহার করবো!...না, না, দুঃখিত হ'য়ো না...গুরু-আহার কাজ করবার শক্তি নষ্ট করে জান তো?"

"আর 'গুরু-উপোস,' কাজ করবার শক্তি তো পরের কথা, কাজ করবার যন্ত্র জীবনটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করে"—অপ্রসন্ন ভাবে কার্ল বলিল—"একথাও আপনার বেশ জানা আছে আশা করি?"

"এক্ষেত্রে তা' আছে বটে"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"তোমার মনিব আমার আগমন আশা করেছিলেন?"

কার্ল ঘাড় নাড়িল—এবং এল র‍্যামি বিদায়-সম্ভাষণের পর দ্রুতপদে সোপান পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। উপর হইতে দ্বার বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল—পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ। কার্ল একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—পরে ঐ নিস্ফল আহার্য্য ধীরে ধীরে সরাইয়া ফেলিয়া, আপন মনে ঘাড় নাড়িতে ও বকিতে আরম্ভ করিল:—

"নাঃ,—কেবল কতকগুলো বোকাকে কিছু শেখাবার জন্যে, এই সব জ্ঞানীরা যে কেমন করে' উপোষ সহ্য করতে পারে, এটা কোনোরকমেই আমার মাথায় ঢুক্‌লো না! এ সব দেখে শুনে, জ্ঞানী হওয়া বেশ সুবিধের কথা বলে' মনে হয় না!—উহুঁ, জ্ঞানী হওয়া চল্‌লো না; যেমন গাধা চিরদিন আছি তেমনিই থাকতে হবে দেখ্‌ছি। এই সব বিজ্ঞান-ফিজ্ঞানের চেয়ে, তোফা এক গ্লাস মদ কি দিব্যি একদফা আহার আমার মতে ঢের বেশী আরামের। হুঁ, আর্ ডাক্তার বলেন কিনা—'মরে গেলে কোথায় যাবে মনে কর, কার্ল?...উত্তরে আমি কি বলি?...কেন! আমি বলি—'তা' জানিনে মশাই,—আর জান্‌বার বড় একটা বাঞ্ছাও নেই; যতদিন বাসকরা যাচ্ছে ততদিন এই পৃথিবীটাই আমার কাছে যথেষ্ট আরামের ঠেক্‌ছে'। 'কিন্তু পরে, কাল, তার পরে?' পাকা-চুলে-ভরা মাথাটী নাড়তে নাড়তে তিনি জিজ্ঞেস্ করেন। আমি কি বলি শুন্‌বে?.. বলি—'বল্‌তে পারিনে, বাবু সাহেব!—তবে, এখানে যে আমাকে পাঠিয়েছে, অন্য কোনোখানেও যে আমার বাসের জন্যে পরিপাটী ব্যবস্থা করে' রাখবার সুবুদ্ধি তা'র ঘটে থাক্‌বে, এটুকু আশা করে থাকি!'...শুনে, প্রভু আমার কেবল হাসেন আর মাথা নাড়েন। না বাবা, চালাক আমাকে কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না—আর একথা ভাব্‌লেও আমি খুসী হ'য়ে উঠি!"

কিছুক্ষণ সে ধীরে ধীরে শিশ দিতে লাগিল; পরে শয়নার্থ পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল কান পাতিয়া দাঁড়াইল। কি আশ্চর্য্য! এই যে নিয়তই বাড়ীময় একটা মৃদুল

গম্ভীর গমগমে আওয়াজ ভাসিয়া বেড়ায় এবং নিস্তব্ধতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই উচ্চ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে, ইহার কারণ কি? কি গুরুগম্ভীর আওয়াজ!--ঠিক যেন অরগ্যানের ভিতরকার অবরুদ্ধ বায়ু, কয়েকটা পর্দ্দাকে একইকালে ঠেলিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিতেছে,—যেন সাগর-কল্লোল আর তটিনীর কলগানের সহিত বাতাসের শন্ শন্ শব্দ একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে! কিসের শব্দ তাহা না জানিলেও কানের ইহা সহিয়া গিয়াছিল;—শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল এবং তন্দ্রাঘোরে মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার জননী সুদূর জার্ম্মাণীতে, জন্মপল্লীর দেবদারুবনে বসিয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছে আর সেই চরকার শব্দই আপাততঃ তাহার কর্ণে বাজিতেছে। মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল।

এদিকে, গির্জ্জার উপর আরোহণ করিয়া এল র‍্যামি দেওয়াল-সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বারটীতে সজোরে করাঘাত করিলেন। ঐ বিচিত্র শব্দ এক্ষণে স্পষ্ট ও উচ্চ হইয়া উঠায়, তিন চারবার আঘাত করিবার পর ভিতর হইতে সাড়া পাওয়া গেল। অল্প পরেই সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া 'হার্ ডক্তার' বহির্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—তাঁহার চিন্তারেখাঙ্কিত বয়োজীর্ণ মুখখানি হস্তাস্থিত বাতির আলোকে ভারতীয়-চিত্র-কলা-পদ্ধতির রেখা-মূর্ত্তিবৎ প্রতিভাত হইল।

"আ—! এল র‍্যামি!" ধীর অথচ প্রীতি-পুলকিত স্বরে তিনি বলিলেন—"আমি ভাব্‌ছিলাম যে তুমিই হবে; 'বার্ণার্ডোর' মতন তুমিও একেবারে নির্দ্দিষ্ট সময়টীতে দেখা দাও।" যোগ্য-উপমা-চয়নে সক্ষম হইয়া সন্তোষ হাস্য-সহ তিনি দ্বারটী আরও মুক্ত করিয়া ধরিলেন; পরে বলিলেন—"এস, এস, শিগ্‌গির চলে এস; আকাশের দিকের বড় জান্‌লাটা খোলা রয়েছে—যে-রকম জোর বাতাস, তা'তে হঠাৎ একটা অনর্থ ঘটতে পারে—চলে এস—চলে এস।"

সহসা তাঁহার স্বর যেন উৎকণ্ঠায় ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া আসিল, এবং এল র‍্যামি বিনা বাক্য ব্যয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া ক্রেমলীন খিল আঁটিয়া দিলেন—পরে, সঙ্গীর সেই মর্য্যাদা সুন্দর অবয়ব ও প্রশান্ত দর্শন কৃষ্ণ আনন-মণ্ডলে, হস্তস্থিত আলোকটীর মুখ ফিরাইয়া ধরিলেন।

"বাঃ, বাঃ, তোমার চেহারা এখনও দিব্যি রয়েছে"—তিনি বলিলেন—"বার্দ্ধক্যের ছায়াটুকুও পড়েনি—সর্ব্বদাই সুস্থ ও সবল! হায়, হায়, আমার কাঠামোটা যদি তোমার মতন হ'ত, তা'হ'লে মনে হয়, আর্কিমিডিসের মত আমিও এই পৃথিবীটা উপ্‌ড়ে তোলবার আশা করতে পারতাম! কিন্তু আমি বড্ড বুড়ো হ'য়ে পড়্‌ছি—শক্তিসামর্থ্যও প্রত্যহ কমে আস্‌ছে,—তবু আমার কর্ত্তব্য আজও শেষ হয়নি......ভগবান্! ভগবান! কিছুই হয়নি, সমস্তই বাকী পড়ে রয়েছে!"

হতাশভাবে তিনি হাত নাড়িলেন—তাঁহার স্বর যেন কাতরোক্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এল র‍্যামির কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু তারকাদ্বয় অনুকম্পাভরে তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইল।

"বাস্তবিকই তোমার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে, বন্ধু"—কোমল-কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কঠোর পরিশ্রমেই ভেঙ্গে গিয়েছে। আজ রাত্রে বিশ্রাম করাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিশ্রুতি-মত আজ আমি এসেছি, তোমাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করবো বলেই এসেছি। বিশ্বাস কর—সময়ের অভাবে তোমার জীবন-ব্যাপী কার্য্যের পুরস্কার থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না। এ পরিশ্রম সম্পূর্ণ করে' তোল্‌বার অবকাশ তুমি তো পাবেই, তা' ছাড়া বিশ্রামের জন্যে অতিরিক্ত সময়েরও তোমার অভাব ঘট্‌বে না—সে সময় আমি দেব তোমাকে!"

বয়োবৃদ্ধের কম্পিতদেহ চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল; ক্লান্তভাবে একটী হস্তের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"পার না, বন্ধু, মৃত্যুর অগ্রসার তুমি রোধ করতে পার না! তুমি শক্তিশালী বটে—তোমার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মবিচার-নৈপুণ্যও অপূর্ব্ব-সাধারণ সন্দেহ নেই—কিন্তু তোমার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত জ্ঞান সেইখানে, সেই সমাধির-সীমারেখায়, থাম্‌তে বাধ্য। এ রহস্য তুমি উদ্ভেদ করতে পার না কিম্বা একপাও একে অতিক্রম করতে পার না,—অশ্রান্তগতি কালের চরণক্ষেপ মন্থর করে' দেওয়া তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়;—না, না! এ আবিষ্ক্রিয়া অর্দ্ধ-অসম্পূর্ণ রেখেই আমাকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।"

এল র‍্যামি হাসিলেন,—কতকটা অবজ্ঞা-ভরা সে হাসি।

"তোমার মত লোক, যে এমন অনেক জিনিষে বিশ্বাস রাখে যা'র প্রমাণ হয় না, সে কি না এই প্রমাণ-সিদ্ধ ব্যাপারটার সম্বন্ধে এতখানি অবিশ্বাসী!—কিন্তু, যা'ই হোক্ আর যা'ই তুমি মনে কর না কেন, আমি এখনই তোমার এই হঠাৎ-আহ্বানের উত্তর দিচ্ছি;—এই—এই নাও তোমার বার্দ্ধক্য-প্রতিষেধক"—টেবিলের উপর একটা সোণার ছিপিযুক্ত বোতল রক্ষা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"এই যে জিনিষটা, একে 'সময়ের পরিস্রুত নির্য্যাস' বা 'কালের আরোক' বলা চল্‌তে পারে—কারণ, ভগবান যা' করতে পারেন না বলে' শোনা যায়, এ নির্য্যাস তা'ই কর্‌বে, অর্থাৎ সময়ের গতিকে বিপরীতমুখী করে' দেবে!"

কৌতূহলী হইয়া ক্রেমলীন বোতলটী হস্তে তুলিয়া লইলেন।

"এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস তোমার?

"হাঁ, এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস। কেবলমাত্র এই সঞ্জীবন-রসের সাহায্যেই একজনকে আমি আজ ছ'বছর ধরে' সম্পূর্ণ সুস্থ ও জীবিত রেখেছি।"

"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!'—বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বোতলটীকে আলোকের নিকট ধারণ করিলেন এবং উহার ভিতরকার হীরক-শুভ্র তরল পদার্থ ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; পরে সন্দিগ্ধ-হাস্যে বলিলেন—"আমি কি নতুন কোনো 'ফষ্ট' আর তুমি 'মেফিষ্টো'?"

"বাঃ!" অবজ্ঞা-হাস্যে এল র‍্যামি বলিলেন—"এ যে ঠাকুরমার গল্প এনে ফেল্‌লে!—তবে, অন্য অন্য ঠাকুরমার গল্প কি রূপকথার মতন এটাও সত্য-লেশ-শূন্য নয়। আমি আগেও তোমায় অনেকবার বলেছি যে, এজন্মে কিম্বা পরজন্মে যা'র বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এমন কোনো কল্পনাই মানব-মস্তিষ্ক প্রকাশ করতে পারে না; যা' হ'তে পারে না সে সম্বন্ধে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব হ'লে বিশ্বনিয়ম মিথ্যা হয়ে পড়ে, গণনা-রীতি ভ্রমাত্মক প্রমাণ হ'য়ে যায়,—সেই জন্যেই আমাদের সূক্ষ্মতম স্বপ্নটুকুও কালে সত্য হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। কিন্তু তা' হ'লেও, এমন কোনো অমানুষিক শক্তি আমার নেই, যা'তে তোমার গাত্র-চর্ম্মটা হঠাৎ সাপের চামড়ায় পরিণত করতে পারি, কিম্বা একেবারে তোমাকে একটা কবি-যুবক ক'রে তুল্‌তে পারি—তবে, যে সব উপাদান তোমার মধ্যে আজ আছে সেইগুলিই শুধু স্নায়ু-সতেজ হ'য়ে উঠ্‌বে, দেহ-শোণিতে একটা নতুন শক্তি ও শুদ্ধতা আস্‌বে—অন্য কিছুই

হবে না; আর আমি যতদূর বুঝ্ছি, তোমার পক্ষে এইটেই আপাততঃ দরকার; সত্যি বল্তে কি, যতদিন স্নায়ুমণ্ডলীতে নূতন তেজ আর রক্তপ্রবাহে বিশুদ্ধি সঞ্চার ঘট্তে থাক্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত, এক বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুতেই তুমি মর্‌বে না।"

"মর্‌বো না!" বিস্ময়-বিহ্বল-ভাবে ক্রেমলীন প্রতিধ্বনি করিলেন—"বল কি মর্‌বো না?"

"বল-প্রয়োগ ছাড়া"—এল র‍্যামি সজোরে পুনরুক্তি করিলেন, "বেশ!—তা'তে কি? বাস্তবিক পক্ষে, এর মধ্যে বিচিত্র কিছুই নেই। প্রাকৃতিক রহস্যের সঙ্গে যারা পরিচিত, বল-প্রয়োগ মৃত্যুই তা'দের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য মৃত্যু—এ বিষয়ে একাধিক দৃষ্টান্ত অনেক পুরোণো গল্পে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মৃত্যু, ঐ রকম কোনো আখ্যায়িকার মতে, বল-প্রয়োগে ঘটেছিল। বল-প্রয়োগ ব্যতীত জীবন অবিনশ্বর, অন্ততঃ আবশ্যক মত নূতন করে' তোলা যেতে পার্ব্বে।"

"অবিনশ্বর!" আপন মনে ক্রেমলীন বলিলেন—"অবিনশ্বর! আবশ্যক মত নূতন করা যাবে!...ভগবান!—তা' হলে সময় আছে এখনও—প্রচুর সময় আছে!"

"আছে, যদি যত্ন কর সে জন্যে"—করুণার্দ্র কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"আর ঐ যত্ন যদি বরাবর রক্ষা কর্‌তে পার! আজকালকার দিনে কেউ বড় একটা তা' করে না।"

ক্রেমলীন এ কথা শুনিতেই পাইলেন না; বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তখনও তিনি বোতলটী পরীক্ষা করিতেছিলেন।

"বলপ্রয়োগে মৃত্যু?" অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন; পরে সহসা এল র‍্যামির দিকে ফিরিয়া, বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা, বন্ধু, ভগবান স্বয়ং কি আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ কর্‌তে পারেন না? এই যে আমরা কত পরিশ্রমে, কত যত্নে, কত বছর ধরে', কত রকম হিসাব নিকাশ কর্‌ছি, এ সমস্তই মুহূর্ত্তে ধ্বংশ করে' দিয়ে, আমাদের অনিচ্ছু-আত্মাকে তিনি কি এই পার্থিব আধারটা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন না?"

"ভগবান?—ভগবান যদি কেউ থাকেন—অনেকে এ রকম অস্তিত্ব বিশ্বাসে অভ্যস্ত বটে—তবে বলপ্রয়োগ তিনি করেন না—" এল র‍্যামি বলিলেন "বলপ্রয়োগে মৃত্যু হচ্ছে

অজ্ঞতার ফল; মানুষের নির্বুদ্ধিতা, নৃশংসতা, বংশপরম্পরাগত গোঁয়ার্তুমিই এর জন্যে দায়ী।"

"জাহাজ-ডুবি, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত—এ সবগুলো কি?" তখনও বোতলটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে, ক্রেমলীন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি কিছু আর সমুদ্র যাত্রা করছো না, করছো কি?" সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়া, এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"তা' ছাড়া, তোমার অন্ততঃ জানা উচিৎ যে, জাহাজ-ডুবিও ঐ জাহাজ-নির্ম্মাণ-কালীন সূক্ষ্ম গণনা-দোষ বা ওজন-জ্ঞানাদির ত্রুটির ফল। একটু নির্ভুল সতর্কতা, যা, দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায়ই ঘটে ওঠে না, কিম্বা সামান্য একটা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন—ব্যস্, প্রচণ্ড ঝড় বাতাসেও হিসাব মত তৈরী জাহাজ বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। বজ্রের কথা ধর; স্বীকার করি, অনেকে এতে মারা পড়ে; কিন্তু কেন?—বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের সুবিধাটা দিব্যি বাড়িয়ে দিয়ে সরল সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বলেই নয় কি? যদি তা'রা সটান শুয়ে পড়ে, তা' হলে তো আর নিয়মিত বিদ্যুৎ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ মুর্খ মানুষগুলোর মধ্যে এই সামান্য সতর্কতাটা অবলম্বন করা ক'জন দরকার মনে করে? ফল কথা, এ সমস্ত দুর্ঘটনায় ভয় করবার কোনো কারণই এ ক্ষেত্রে আমি দেখ্‌ছি নে।"

"না, না,"—অন্যমনস্কভাবে বৃদ্ধ বলিলেন—"আমি ভয় করছি নে—না, না! ভয় করবার আমার কিছুই নেই।"

নিস্তব্ধতায় তাঁহার স্বর ডুবিয়া গেল। গির্জ্জাবাটীর এক ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কক্ষে তিনি ও এল র‍্যামি উপবিষ্ট,—কক্ষটা এত সঙ্কীর্ণ যে একটা টেবিল ও দু'খানা চেয়ারেই উহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া গিয়াছে। কক্ষগাত্রের সর্ব্বত্রই, সরল, বক্র ও বিসর্পিত রেখায় ভরা বিচিত্র ধরণের মানচিত্র; সেগুলোর অর্থ যে কি, তাহা এক ক্রেমলীনই বলিতে পারেন, এর কারণ তাঁহার ভাবস্তিমিত নয়ন একান্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় ঐ সকল রেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বকথিত শব্দের বিরাম নাই—বোধ হইতেছে যেন গির্জ্জা মধ্যে কোথাও কোনো প্রকাণ্ড চক্র ঘূর্ণায়মান এবং তাহার স্বরহিল্লোলে সমগ্র গৃহভিত্তি বিকম্পিত; মধ্যে

মধ্যে পবন-গর্জ্জনের সহিত মিশ্রিত হইয়া সে শব্দ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইয়া উঠিতেছে। এল র‍্যামি শুনতে লাগিলেন।

"এখনও সেটা ঘুর্‌ছে ?" ধীরে ধীরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ক্রেমলীনের পাণ্ডুর গণ্ডদ্বয় সহসা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উভয় চক্ষে উৎসাহ বিকীর্ণ করিতে করিতে তিনি বলিলেন—

"হাঁ!—এখনও ঘুর্‌ছে!" জয়োল্লাসে তাঁহার স্বর নাচিয়া উঠিল—"এখনও ঘুর্‌ছে, এখনও ঝঙ্কার তুল্‌ছে! পৃথিবীর অন্তরতম সঙ্গীত, বন্ধু, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির ঐক্যতান ঝঙ্কার! ঐ শোন!—প্রগাঢ়, পরিপূর্ণ, অতুল, অনিন্দ্য-সুন্দর!—ঐ যে গ্রহসমূহের পর্দ্দা-বিকম্পিত সমোচ্চ সুরটী—ওটী হচ্চে একটী মাত্র গ্রহের—বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমান এই পৃথিবীর গান! এস! এস আমার সঙ্গে"—উত্তেজনার প্রাবল্যে তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন—"আজকের রাত কাজ কর্‌বার পক্ষে বিশেষ উপযোগী—আকাশ একেবারে দর্পণের মতন স্বচ্ছ—এস, আমার অপূর্ব্ব আবিষ্কার নিয়তি-চক্র দেখ্‌বে এস;—জানি, তুমি আগেও দেখে গেছ, তবু এখন তা'তে অনেক নতুন নতুন প্রতিবিম্ব পড়েছে—অনেক অপূর্ব্ব আলোক ও বর্ণরেখা ফুটে উঠেছে;—আহা, এল র‍্যামি, যদি তুমি আমার এই সম্পাদ্য বিষয়টীর মীমাংসা কর্‌তে পার্‌তে, তা' হ'লে তোমার জ্ঞান ভাণ্ডার আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তো! আমার এই সম্পাদ্য, যা'র মূল জীবনে সীমাবদ্ধ নয়—সম্পাদ্যের তুলনায়, তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, তোমার ঐ দীর্ঘ জীবন-দান"—

"অবশ্য—যদি ঐ সম্পাদ্যের মীমাংসা হ'ত—" বাধা দিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন।

"হবেই এর মীমাংসা!" ক্রেমলীন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই হবে! এ রহস্য আবিষ্কার না করে' কোনোমতেই আমি মর্‌বো না! এ গুহানিহিত তত্ত্ব আমি যেমন করে' পারি উপ্‌ড়ে আন্‌বো—এ রহস্য-কুসুম যদি ভগবানের কল্পনার মধ্যেও থাকে তবে সেখান থেকেও তা'কে আমি উৎপাটন কর্‌বো!"

আবেগাতিশয্যে তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন,—পরে আপন ললাটে বারকতক হস্ত মার্জ্জনা করিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, সহসা-পরিবর্ত্তিত-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সহাস্যে বলিলেন—"এস!"

অনুরোধ-পালনার্থ, একেবারেই এল র‍্যামি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৃদ্ধের অনুগমন করিয়া, এক সঙ্কীর্ণ উচ্চদ্বারপার্শ্বে উপনীত হইলেন। অতি সন্তর্পণে ক্রেমলীন দ্বার উন্মোচন করিলেন; একটা দমকা বাতাস কক্ষ-মধ্য হইতে তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিল; ভিতরে প্রবেশ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, সুখদ সমীর স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে তাঁহাদিগকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিল। গির্জ্জা-কেন্দ্রে অবস্থিত সুপ্রশস্ত সুন্দর কক্ষ--ক্রেমলীনের জীবন-ব্যাপী বিরাট গবেষণা ফল, মানব-বিস্ময়বৈচিত্র্যের পূর্ণগৌরবে জন্ম বা সপ্রকাশ,—অপূর্ব্ব অচিন্ত্য অনুষ্ঠান,—এ পর্য্যন্ত মানব চেষ্টা কখনও সে পথে অগ্রসর হয় নাই—পরে কখনও হইবে কিনা, সন্দেহ।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রবেশমাত্র যে-বিশেষ দৃশ্যকেন্দ্রে নিবদ্ধ হইয়া, নয়ন বিমূঢ়-বিস্ময়ে পলকহারা হইয়া গেল, তাহা ছাদ ও মেঝের মধ্যপথে দৃঢ়-নিবদ্ধ তারের [illegible] দোদুল্যমান এক প্রকাণ্ড পাষাণ-থাল! স্ফটিক-প্রস্তর-ধরণের কোনোরূপ মসৃণোজ্জ্বল পদার্থে তাহা নির্ম্মিত, এবং পরিধি ও উচ্চতায় ঐ বিশাল কক্ষের প্রায় সমগ্র পরিসর জুড়িয়া বর্ত্তমান। গির্জ্জাশীর্ষ হইতে একটী সুদীর্ঘ ইস্পাতদণ্ড বা সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বিলম্বিত—তদুপরি থালাখানিকে সমভার করিয়া বসানো হইয়াছে। বিবিধ রেখা-ভঙ্গী-রঞ্জিত আলোক-প্রভায় উহার ঘূর্ণ্যমান পৃষ্ঠদেশ তরঙ্গায়িত এবং অশ্রান্ত চক্রগতি-তালে অপূর্ব্ব-গুঞ্জনবৎ এক [illegible]র স্বরলহরী সমুত্থিত হইতেছে।

এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল, কিসের আওয়াজ বাড়ীময় ভাসিয়া বেড়ায়; এই বিশাল-কায় পাষাণ-চক্রের গতিশব্দ ব্যতীত তাহা অন্য কিছুই নহে। ক্রেমলীন 'স্ফটিক'-থাল বলিয়া অভিহিত করিলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা সাধারণ স্ফটিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধরণের—কারণ স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য ব্যতীতও, বহুমুখী হীরক-কিরণ ঝলকের মত এমনি একটা তীব্র দীপ্তি উহা হইতে বাহির হইতেছিল যে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকার পর এল র‍্যামি চক্ষু আবৃত করিতে বাধ্য হইলেন।

চক্র ক্রমাগতই ঘুরিতেছে; দেওয়ালের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড বাতায়ন নৈশ আকাশের দিকে উন্মুক্ত; অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র সেই বাতায়ন-পথে পরিদৃশ্যমান; এখনও

বাতাস বহিতেছে—কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল নহে, অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবাপন্ন ; তরঙ্গ-ভঙ্গ জনিত সাগর-কল্লোল এবং চক্র-ঘূর্ণন-জনিত শব্দ-লহরী শুনিয়া মনে হইতেছে, উভয়েই যেন সমস্বরে বাঁধা। বাতায়নের একপার্শ্বে সুন্দর একটী দূরবীক্ষণ আকাশের দিকে উর্দ্ধমুখ করিয়া রক্ষিত ; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখা গেল, কিন্তু তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই ; বস্তুতঃ, ঐ চক্র-গতি-সুন্দর ও শব্দ-তরঙ্গায়িত 'স্ফটিক'-থালখানি দেখার পর এ ঘরের অন্য কোনো দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই অসম্ভব।

ভাবে বোধ হইল, ক্রেমলীন যেন এল র‍্যামির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন—বাতায়ন-সমীপে অগ্রসর হইয়া কক্ষ-কোণে রক্ষিত একখানা বেঞ্চের উপর তিনি উপবেশন করিলেন এবং বক্ষ-বন্যস্ত করে আপনার ঐ অপূর্ব্ব রচনাটীর দিকে সানুনয় বিস্ময়-দৃষ্টিতে অপলকে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"কি উপায়ে রহস্যোদ্ভেদ হ'বে—কেমন করে' এ সঙ্কেতের অর্থ সংগ্রহ করবো !...বল্ রাক্ষস, বল্—এ সমস্যা কি পূরণ হ'বে না ? জীবন-ব্যাপী চিন্তাফলেও কি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবো না ? অথবা, এ কি সম্ভব যে, সৃষ্টি তা'র স্রষ্টার চেষ্টাকে পণ্ড করে দিতে সক্ষম হবে ? ঐ !—আবার রেখা-পরিবর্ত্তন ঘটছে—আলোক-স্পন্দন বদলে যাচ্ছে—পরিধি-চক্র সেই একই রকম রয়েছে অথচ জ্যোতির্বিম্ব পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে,—কিন্তু কি উপায়ে এদের পৃথক করি ? কেমন করে' শ্রেণীবিভাগ করি ?"

এই সময়ে এল র‍্যামি তাঁহার পার্শ্বে উপনীত হওয়ায় সহসা আত্মসম্বৃতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ; পরে, শান্ত ও সংযতকণ্ঠে, বক্তৃতানিরত বিজ্ঞানাচার্য্যের মত, উক্ত পাষাণ-চক্রটীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন :—"ঐ যে চুলের মতন সূক্ষ্ম ভারকেন্দ্রটি দেখ্তে পাচ্ছ, ঐটীই হ'চ্ছে আসল জিনিস ; ঐখান থেকেই এ যন্ত্রে চিরন্তন-গতি-সঞ্চার ঘট্ছে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত যন্ত্রটী ভেঙ্গে না ফেলা হ'চ্ছে ততক্ষণ এ গতি কিছুতেই থাম্বে না। এই ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি, ঐ রকম কোনো একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভারকেন্দ্র-সাহায্যে অনন্তকাল ঘুরে চলেছে—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংশ না হওয়া পর্য্যন্ত সে গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। কেমন, যুক্তিটী নিখুঁত মনে হ'চ্ছে না ?"

প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত এল র‍্যামি তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিতেছিলেন—বলিলেন—"সম্পূর্ণ নিখুঁত।"

"বেশ কথা; এখন, এই যে চিরন্তন-গতি-রহস্য-আবিষ্কার—এক এইটাই কি একটা মস্ত আবিষ্ক্রিয়া নয়?" আগ্রহভরে ক্রেমলীন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এল র‍্যামি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

হাঁ, মস্ত আবিষ্ক্রিয়া" —অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন—"স্বীকার কর্‌তে একটু ইতস্ততঃ করেছি ব'লে' কিছু মনে কর' না,—এরূপ কর্‌বার কারণ এই। চিরন্তন গতির যথার্থ আবিষ্ক্রিয়ার দাবী তুমি কর্‌তে পার না, কেন না এ বিশেষ রহস্যটী প্রকৃতির একান্তই নিজস্ব। হয় তো আমার বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার করে' তুল্‌তে পার্‌ছি নে—অর্থাৎ, আমি বল্‌তে চাই এই যে, যে-পৃথিবীর ওপর তোমার ঐ আশ্চর্য্য চক্রখানি দাঁড় করানো রয়েছে, সেই পৃথিবী স্বয়ং যদি গতি-বিশিষ্টা না হ'ত, তা' হ'লে ও চাকাটাও ঘুর্‌তো না। এ রকম মনে করা যদি সম্ভব হয় যে আমাদের এই পৃথিবী তা'র কক্ষ-পথে হঠাৎ থেমে পড়্‌তেও পারে, তা' হলে তোমার ঐ চাকাটাও থেমে পড়্‌তে বাধ্য হবে—কেমন, নয় কি?"

"আহা হা, তা' তো হবেই!" অধীরভাবে ক্রেমলীন উত্তর করিলেন—"এটা তৈরী কর্‌বার উদ্দেশ্যই যে তাই! এমনভাবে কষামাজা করে' হিসেব পত্তর করে' এটাকে গড়া হ'য়েছে যা'তে ঐ পৃথিবীর নিজস্ব গতিটাই এর ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে অথচ অবিকল ছন্দঃসৌন্দর্য্যে প্রকাশ পায়;—এম্‌নি সতর্কতার সঙ্গে এর ভারকেন্দ্র ঠিক করে' নেওয়া হ'য়েছে যে চুল-চেরা তফাৎটুকুও নজর এড়াতে পারেনি।"

"ঠিক,—আর তোমার আবিষ্কারের প্রধান বিস্ময়ও ঐখানে," শান্তস্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—"তোমার ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা-নৈপুণ্যই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিস্ময়কর; ঐ নৈপুণ্য তোমাকে চিরন্তন-গতির পন্থা অনুসরণে সক্ষম করেছে। কিন্তু চিরন্তন-গতির গতিত্ব সম্বন্ধে তোমার কিছুই করবার নেই—এ জিনিসটা যে কি, কোথা থেকে জন্মায়, কেন জন্মায়, তা'র কিছুই তুমি বল্‌তে পার না; কাল যেমন নিরবধি, এও তেম্‌নি নিত্য। বস্তু মাত্রেই গতিশীল—সেই সঙ্গে আমরাও গতি-বিশিষ্ট—তোমার ঐ চাকাটাও তাই।"

"কিন্তু সমস্ত সচল বস্তুই এম্‌নি একটা কেন্দ্রে—একটীমাত্র সূক্ষ্মাগ্র কীলকের ওপর সমর্পিত-ভার!" জয়দৃপ্তভঙ্গীতে আপন রচনাটীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ক্রেমলীন উত্তর করিলেন।

"সে কীলক—?" সন্দিগ্ধ ভাবে এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন।

"কারণ জগত"—উত্তরে ক্রেমলীন বলিলেন—"যেখানে ভগবান বাস করেন।"

বিস্ফারিত উজ্জ্বল-চক্ষে এল র‍্যামি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"ধর," সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ধর, তর্কের খাতিরে মানা গেল যে তোমার ঐ 'কারণ-জগত' আছে—কিন্তু যদি এমন হয় যে, সে কারণ-জগত বা কেন্দ্র-জগত অপর কোনো কেন্দ্র-জগতের বহিরাবরণ মাত্র, আর এই রকম অসংখ্য অসংখ্য কেন্দ্র-জগত যদি ক্রমাগতই আবরণের পর আবরণই হ'তে থাকে, কোনো বিন্দু বা কীলক বা সীমা যদি না পাওয়া যায়!"

ক্রেমলীনের কণ্ঠ হইতে একটা আর্ত্তনাদ-শব্দ বাহির হইয়া আসিল; ভয়ে ও হতাশায় কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বলিলেন—"থামো, থামো, আর ব'লো না! উঃ, এ রকম কল্পনা বড় ভীষণ, বড় ভয়ঙ্কর! পাগল হ'য়ে যাবো—একেবারে পাগল হ'য়ে যাবো। না—না, এ রকম নিষ্ঠুর অনন্তের সম্ভাবনা-চিন্তায় কোনো মানব-মস্তিষ্কই স্থির থাকৃতে পারে না!"

অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া দৈহিক-যন্ত্রণা-কাতর ব্যক্তির ন্যায় ফুলিতে ফুলিতে, এল র‍্যামির চিন্তাশীলতাপূর্ণ মুখমণ্ডল ও সরল দেহভঙ্গীর দিকে এম্‌নি এক রকম করিয়া তিনি চাহিলেন, যেন সহসা স্বপ্নে কোনো দানবের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিয়াছে। অনুকম্পা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন:—

"সঙ্কীর্ণ তোমার ধারণা, বন্ধু,—অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই বাহ্যজ্ঞান বা ভবিষ্যত অনুধাবন-শক্তি যেমন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকে, তেমনই সঙ্কীর্ণ। স্বীকার করি, মানব-মস্তিষ্কের শক্তি সীমাবদ্ধ; কিন্তু মানবাত্মার তো সীমা নেই! আত্মার উচ্চাশার মধ্যে তোমার ঐ 'নিষ্ঠুর

অনন্ত' যে কোনোখানেই নেই—সে যে চির-অতৃপ্ত, চির-তরুণ, চির-অন্বেষু, চির-উচ্চাভিলাষী; কি অসীম উর্দ্ধে, কি অনন্ত অতল, সর্ব্বত্রই যে সে ক্লান্তি-সুপ্তি-বিবর্জ্জিত হ'য়ে ছুটে চল্‌বার জন্যে সর্ব্বক্ষণই সমুৎসুক! হোক্ না কেন অনন্ত কোটী জগৎ—কি যায় আসে? আমি—আমি পর্য্যন্ত, নির্ভয়ে তাদের অনন্তত্ব-সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌তে পারি; হ'তে পারে, সে অগণ্য সংখ্যাধিক্যে আমার মস্তিষ্ক টলমল কর্‌তে থাক্‌বে, হ'তে পারে, আমার মানব-মস্তক সে চিন্তায় বন্ বন্ শব্দে ঘুর্‌তে থাকবে—কিন্তু আত্মা সে সমস্তই নিঃশেষে শোষণ করে' আরও কিছুর জন্যে প্রসারিত থেকে যাবে!"

তাঁহার প্রশান্ত, গভীর, পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর ক্রেমলীনের উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যেন প্রলেপ-স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিল। অধীর অঙ্গসঞ্চালন বন্ধ করিয়া এমন নিস্পন্দবৎ তিনি বসিয়া রহিলেন, যাহাতে বোধ হইল, কোনো সুকণ্ঠ-সমুত্থিত সঙ্গীত-শ্রবণে তিনি আত্মহারা।

"তুমি সাহসী পুরুষ এল র‍্যামি" ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন—"আমি বরাবরই একথা বলে' আস্‌ছি,—এত সাহসী যে তোমাকে গোঁয়ার বল্‌লেও বলা যায়। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি, এতখানি উচ্চ ভাবুকতা-সত্ত্বেও তোমার মধ্যে বিরোধ রয়েছে যথেষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, এখনই তুমি এমনভাবে আত্মার কথা বললে যেন এসম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস আছে—অথচ অনেক সময় তোমাকে এই আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সংশয়াপন্নও দেখা গিয়েছে।"

"তোমার সঙ্গে বিচারে,—দেখ্‌ছি, চুল-চেরা যুক্তির দরকার"—মৃদু হাসিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না যে, আত্মার সম্বন্ধে নিশ্চিত না হ'য়েও তা'তে বিশ্বাস স্থাপন করা কিছুমাত্র শক্ত নয়? আমাদের জীবন এতই ক্ষণস্থায়ী আর এতই ক্রুটী-সঙ্কুল যে অমরত্বের দাবী মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রেরণা দাঁড়িয়ে গিয়েছে,—হ'তে পারে, এ ধারণার জন্যে দায়ী আমাদের বংশানুক্রমিক অপরাধ, কিন্তু তা' হ'লেও ধারণাটা মোটের ওপর যে জন্মেছে এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী—তবে, আমার এই বিশ্বাসটুকু যা'তে অকাট্য সত্য-বিশ্বাসে পরিণত হয়

তারই জন্যে আমি নিশ্চয়তার সন্ধান কর্‌তে চাই। আমার জীবনের ব্রতই হ'চ্চে, প্রমাণ-সিদ্ধভাবে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করা, সন্দেহের কোনোরকম পথ না রাখা ; এখন বল, এর মধ্যে বিরোধ কোথায় ?"

"কোনো বিরোধ নেই, কোনো বিরোধ নেই"—ক্রেমলীন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে না ; দুঃসাহসিক তোমার চেষ্টা,—এত স্পর্দ্ধা, এত অসমসাহস, অজ্ঞাত-শক্তির সম্বন্ধে প্রকাশ করা চলে না।"

"আর এটা কি ?" বিচ্ছুরিত-রশ্মি স্ফটিক-চক্রখানির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"এর মধ্যে স্পর্দ্ধা কি অসমসাহস প্রকাশ পাচ্ছে না আশা করি !"

ক্রেমলীন উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিলেন।

"না, নিশ্চয়ই না !"--প্রাকৃতিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষামাত্রকে কোনোমতেই তুমি স্পর্দ্ধা বল্‌তে পার না—তা' ছাড়া এ বিষয়টা খুবই সোজা। সকলেই জানে যে, আকাশের প্রত্যেক নক্ষত্রটী চিরন্তন-আলোক-প্রভা বিকীরণ করে, আর সেই সব বিকীর্ণ প্রভা একএকটা নির্দ্ধারিত মুহূর্ত্ত বা দিন বা মাস বা বৎসরে আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌছয়। অবশ্য এ পৌছনো নির্ভর করে, ঐ নক্ষত্র আর পৃথিবীর দূরত্ব এবং ঐ সব প্রভা-তরঙ্গের গতি-কালের ওপর। কতক নক্ষত্রের একএকটী রশ্মি হাজার বছরে এখানে আসে—বস্তুতঃ যে-সময়ের মধ্যে সে এই বায়ুমণ্ডল ভেদ ক'রে এতদূরে পৌছবে, তা'র আগেই মূল তারকাটা হয়তো অন্তর্হিতও হ'য়ে যেতে পারে। এ সব কথা শিশুপাঠ্য কেতাবেও পাওয়া যায় ; তা' ছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রে যা'দের হাতেখড়ি হ'চ্ছে তারাও জানে। কিন্তু, সময় আর দূরত্বের কথা বাদ দিলেও, এ সমস্ত আলোক-তরঙ্গের গতির বিরাম আসলেই নেই—মুহূর্ত্তমাত্রও না থেমে তা'রা ক্রমাগতই এগিয়ে আস্‌তে থাকে। এখন, আমার উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সমস্ত প্রভাকে কোনো দর্পণ বা চুম্বুক-থালে ধরে রাখা ; প্রথমে অসম্ভব মনে হইলেও, দেখ্‌তেই পাচ্ছ যে, সে উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হয়েছে। প্রাচীন ঈজিপ্ট-পুরোহিতদের কাছে যেমন ছিল, তোমার কাছে তেম্‌নি চুম্বুক-থাল অবশ্য নতুন জিনিষ নয়—তা' ছাড়া এর বিশেষ গুণটী, (অর্থাৎ, সে-বিন্দুতে আলোক পড়ে তা'র ঠিক সমরেখায় সে-আলো আকর্ষণ করে'

নেওয়া,) অজ্ঞদের কাছে যতই আশ্চর্য্য মনে হোক্ তোমার কাছে মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নয়। ঐ যে থালখানার ওপর সব আঁকাবাঁকা বা বৃত্তাকার রশ্মিরেখা দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, ওর প্রত্যেক রেখাটী কোনো না কোনো নক্ষত্রের প্রভা-তরঙ্গ ; কিন্তু গোলের কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এ সব রেখার মানে কি ! বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে একটা সুস্পষ্ট অর্থ এর মধ্যে রয়েছে—সে অর্থটা যেন ধরা দিয়েও ধরা দিতে চাইছে না,—কি-একটা রহস্য প্রকাশ হ'য়েও যেন প্রকাশ হ'চ্ছে না ! দারুণ উৎকণ্ঠায় রাতের পর রাত, এই বিচিত্র থালের পাহারায় বসে আছি !"

সহসা তিনি যন্ত্রটীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং চক্র-পৃষ্ঠের যে-বিশেষ স্থলটীতে সে সময় একটা উজ্জ্বল প্রভা-তরঙ্গরেখা ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এস, দেখ্‌বে এস, এইখানে এক দল আলোক-তরঙ্গ দেখা দিয়াছে—মিনিট দুয়েকের মধ্যেই এগুলো অদৃশ্য হ'য়ে যাবে—আবার হয়তো বছরখানেক কি তারও বেশী পরে দেখা দেবে। এ প্রভাগুলো যে কোন্ তারাপুঞ্জের, আর অন্যগুলোর চাইতে এর বর্ণই বা এত গাঢ় কেন তা' বল্‌তে পারিনে। ঐ—দেখ !"

বিস্ময়-বিমিশ্রিত ক্ষুব্ধ বিজয়-দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই আলোক-রেখা-গুলি মিলাইয়া গেল এবং ক্রেমলীন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"যাক্, চলে গিয়েছে ! আজ এই বারো বছরের মধ্যে চারবার মাত্র এগুলো আমার চোখে পড়লো,—কত চেষ্টা করেছি এত মূল আবিষ্কার কর্‌তে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠ্‌তে পারলাম না ! হায়, হায়, শুদ্ধ যদি এ সঙ্কেতের অর্থ বুঝ্‌তে পারা যেত !—কারণ, অর্থ যে একটা আছেই তা'তে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।"

এল র‍্যামি নীরব ; ক্রেমলীন পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"বাতাসের কাজ শব্দ বহন করা ; আলোকের কাজ দৃশ্য বহন করা ; বেশ বুঝে যাও কথাগুলো। আলোককে বর্ণ-প্রবর্ত্তক বা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। আলোকের প্রতিক্রিয়া থেকেই চিত্রের সৃষ্টি,—ঐ চকিত-দীপ্তির কথা ধর ; রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্যে, সেকেণ্ডের মধ্যে এর প্রতিচিত্র গৃহীত হ'তে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে,

প্রত্যেকটী আলোক প্রতিবিম্ব এক একটা অত্যাশ্চর্য্য হরফ, আর সেই সব হরফের পাঠোদ্ধার করতে পারলে সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য সমূহ আমাদের করতলগত হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গীতের সাতটী স্বর বর্ত্তমান; —সাধারণ ঝড়ের সময়, বাতাস বৃষ্টি আর পত্রমর্ম্মরের মিলিত-ধ্বনির মধ্যে যদি কান পেতে দাঁড়াও, তা' হলে শুনতে পাবে, এ-যাবৎ রচিত যাবতীয় ধ্বন্যাত্মক সৃষ্টির প্রত্যেকটী অনুকণা যেখানকার প্রেরণা, সেই সম্পূর্ণ সপ্তস্বর পর্দ্দা ঐ ঝড়ের মাঝখানে হিল্লোলিত। অথচ এই পর্দ্দাটাকে একটা দৃশ্যমান সুস্পষ্ট আকার দিতে কত দীর্ঘকালই না লেগেছে,—তবু আজও, পাখীর গানে মধ্যে মধ্যে সে-সব খণ্ড-তান শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি। এখন, সঙ্গীতের সমস্ত উপাদান যেমন ঐ সাতটী স্বাভাবিক শব্দের মধ্যে বর্ত্তমান—তেমনি আলোকের সম্পূর্ণ অধিকারও একটা চিত্রিত ভাষা সঙ্কেত, বর্ণ আর রীতি-বিশেষের মধ্যে সপ্রকাশ; এ ভাষার অর্থ ও অভিপ্রায় আবিষ্কার করাই হ'চ্ছে আমাদের, কিনা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবের কর্ত্তব্য। কিন্তু, এত বড় রহস্যটা শিয়রে করেও আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই পরম নিশ্চিন্ত মনে পানাহার, নিদ্রা, বংশবৃদ্ধি আর মৃত্যুকেই চরম-পরিতোষের বিষয় করে' তুলেছে! আমি তোমাকে বলছি, এল র‍্যামি, যদি একটীমাত্র আলোক-তরঙ্গকে আবিষ্কার ক'রে তাকে যথাস্থানে রক্ষা করতে পারি, তা' হলে বাকীগুলো খুবই সোজা হ'য়ে আসবে।"

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি থামিলেন। প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান শব্দ-কম্পিত প্রকাণ্ড চক্রটা, অদৃষ্টচক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া যদি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার অস্থি চূর্ণ করিয়াও দেয়, তাহা হইলেও আর এখন তিনি উহার গতিরোধ করিতে পারেন না—হায়রে নর-জীব!

সস্নেহ-আগ্রহে এল র‍্যামি ক্ষণকাল তাঁহার নিবিষ্ট ভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন—"এখনও কি বিশ্রাম-সময় আসেনি ক্রেমলীন? উপরি উপরি ক'রাত্রি তুমি একেবারেই ঘুমের মুখ দেখনি—অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছো—চল, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবে চল; ভবিষ্যতে নবশক্তি লাভ করতে পারবে।"

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা তড়িৎ-শিহরণ বহিয়া গেল।

"তোমার উদ্দেশ্য কি?" এল র‍্যামির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"উদ্দেশ্য, তোমার সম্বন্ধে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।" এল র‍্যামি বলিলেন—"তুমিই এজন্যে আমায় অনুরোধ করেছিলে"—এবং পূর্ব্বকক্ষ হইতে আনীত সেই তরলোজ্জ্বল পদার্থে পূর্ণ বোতলটী তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন—"তোমার জন্যেই এ বোতলটা প্রস্তুত করা হয়েছে—পান কর, কাল থেকে আপনাকে নববলদৃপ্ত আর একটা মানুষ বলে' বুঝ্‌তে পার্ব্বে।"

দারুণ সংশয় দৃষ্টিতে ক্রেমলীন তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে উন্মাদের মত হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমার বিশ্বাস"—চেষ্টাকৃত রহস্যাচ্ছলে অস্ফুট ভাষায় তিনি বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে বিষ খাওয়াতে চাও! হ্যাঁ—নিশ্চয়!—বিষ খাইয়ে আমার সমস্ত আবিষ্কার-ফল নিজে গ্রহণ কর্‌তে চাও! এই তারকা ঘটিত মহারহস্যটী নিজে আবিষ্কার করে' সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করতে চাও—হ্যাঁ, ঠিক, আমার এই কষ্টার্জ্জিত যশঃ অপহরণ করাই তোমার অভিপ্রেত!—নিশ্চয়—ওটা বিষ—বিষ!"

একটা ক্ষীণ যন্ত্রণাশব্দ করিয়া উভয় হস্তে তিনি মুখাবৃত করিলেন।

শুনিতে শুনিতে এল র‍্যামির উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় বেদনা ও করুণায় ভরিয়া উঠিল; শান্তস্বরে তিনি বলিলেন:—"হতভাগ্য বন্ধু আমার! তুমি আজ শ্রমক্লান্ত, মৃত্যু-ভীতি-কাতর—অতএব তোমার এই আকস্মিক অবিশ্বাসকে আমি মার্জ্জনার চক্ষেই দেখ্‌বো। আর ঐ বিষের কথা যা' বল্‌ছো,—দেখ!" এবং বোতলের ছিপি খুলিয়া কয়েক বিন্দু তরল পদার্থ স্বয়ং পান করিলেন—"কোনো ভয় নেই! তোমার তারকা-রহস্য তোমারই থাক্‌বে—প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবন লাভ করে' তুমি যেন এই মহারহস্যের পাঠোদ্ধারে নিযুক্ত থাক্‌তে পারো। আমার নিজের কর্ত্তব্য যথেষ্ট রয়েছে, আর সে কর্ত্তব্যের প্রকৃতিও অন্যরকম; তুচ্ছ অতি তুচ্ছ আমার কাছে ঐ তারকাপুঞ্জ, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার বা এই সৌরজগৎ; আমার করবার সেই

'আত্মা' নিয়ে যেখান থেকে বস্তু-ফেনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে —'বস্তু' নিয়ে নয়। যাক্ সে কথা ; এখন বাঁচ্‌তে চাও না মর্‌তে চাও বল ? এ নির্ব্বাচন তোমারই হাতে ক্রেমলীন,— তুমি অসুস্থ, খুবই অসুস্থ—তোমার মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—এ রকম ভাবে আর যে বড় বেশীদিন বাঁচবে তা' বোধ হয় না। যদি আমার ওপর এতই অবিশ্বাস তোমার, কি জন্যে তবে আস্‌তে লিখেছিলে ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে বাতায়ন-সন্নিকটস্থ বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন—পরে এল র‍্যামির দিকে চাহিয়া চেষ্টাকৃত-হাস্যে বলিতে লাগিলেন :—

"নিজেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছ, ভাই, কি রকম ভীরু স্বভাবের হ'য়ে পড়েছি। সত্যি বল্‌তে কি, সবই যেন আজকাল আমার কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে !—তুমি বিভীষিকা—আমি নিজে বিভীষিকা—আর—আর বল্‌তেও লজ্জা করে—সকলের চেয়ে বিভীষিকা ঐ পাষাণ-চক্রখানা ! মনে হয়, ওটা যেন আজকাল আমার চেয়েও প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।" মুহূর্ত্তকাল তিনি কি ভাবিলেন, পরে কষ্টোচ্চারিত ভাষায় বলিতে লাগিলেন—"সেদিন রাত্রে একটা ভারী আশ্চর্য্য ধারণা মাথায় এল—মনে হ'ল কি জান ?—ধর, সৃজন প্রারম্ভে ভগবান আপনাকে বিষয়ান্তরে প্রেরণ করবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন নাকি ঐ পাষাণ থালখানা আমি সৃষ্টি করেছি। এখন ঐ সৃষ্টি, যা'কে ভৃত্য করে' রাখাই তাঁর ইচ্ছা ছিল, যদি প্রকৃতপক্ষে আজ তাঁর প্রভু হয়ে উঠে' তাঁর শক্তির বাইরে চলে গিয়ে থাকে ?... অথবা এমন যদি ঘটে থাকে যে তিনি আজ মৃত ?...নয় কেন ? দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মানুষ মরে যাবার পরও তা'র কীর্ত্তি বেঁচে থাকে—তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেই বা এ নিয়ম অসম্ভব হবে কেন ?...ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর ! মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর ! আমি মর্‌তে চাই নে এল র‍্যামি !"—তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠে অসন্তোষ ও বিলাপে ভরিয়া উঠিল—"না, না, এখন না ! এখন মর্ত্তে পার্‌বো না !—আমার অসমাপ্ত কার্য্য শেষ কর্‌তে হবে—ব্যাপারটা জান্‌তে হবে—আমি বাঁচতে চাই—আমি বাঁচবো"—

"নিশ্চয়ই বাঁচবে," বাধা দিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"বিশ্বাস কর আমাকে, এর মধ্যে মৃত্যু নেই !"

পুনর্ব্বার তিনি বোতলটী তুলিয়া ধরিলেন। ক্রেমলীন সভয়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন—পরে সহসা উত্তেজিতভাবে বোতলটা গ্রহণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমস্তটা খেয়ে ফেল্‌তে হবে?"

এল র‍্যামি সম্মতি জানাইলেন।

মুহূর্ত্তকাল তিনি ইতস্ততঃ করিলেন—পরে, 'যা' থাকে কপালে' ভাবিয়া স্বরচিত যন্ত্রটীর দিকে এম্‌নিভাবে চাহিলেন যেন ইহাই তাঁহার শেষ দেখা—অতঃপর কম্পিত হস্তে বোতলটী মুখে তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে উহার গর্ভস্থ পদার্থটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ কি হইল!—শেষ বিন্দুটী উদরস্থ হইতে না হইতেই তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় চীৎকারশব্দে লাফাইয়া উঠিয়া তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—একেবারে নিস্পন্দ, নিশ্চল, অসাড়!

তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া আপন বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে এল র‍্যামি সহজেই তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন এবং বাতায়ন-সমীপস্থ বেঞ্চখানির উপর ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া মস্তকনিম্নে একটী বালিশ ও সর্ব্বাঙ্গে একখানি আচ্ছাদনী বিছাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের আনন মৃত্যু-বিবর্ণ, দেহ শবের ন্যায় কঠিন - অথচ সহজ ও স্বাভাবিক নিঃশ্বাস বহিতেছে; এল র‍্যামি উক্ত পানীয়ের কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন—সুতরাং উদ্বেগের কোনো কারণ দেখিলেন না; পরম নিশ্চিন্তভাবে জানালার ধারটীতে ঠেসান দিয়া নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। সাগর-তরঙ্গের তটাভিঘাতশব্দ ক্ষণে তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল,--কখনও বা পশ্চাত ফিরিয়া ক্রেমলীনের বিপুলকায় চক্রখানি ও তদুপরিস্থ উজ্জল জ্যোতির্বিম্বগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"একমাত্র লিলিথই ইহার অর্থ-নির্দ্ধারণে সক্ষম" তিনি ভাবিতেছিলেন। "সুবিধামত একদিন একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। কিন্তু, সত্যই কি আমি, তবে, তাহার সকল কথা বিশ্বাস করি? অথবা ক্রেমলীনই কি বিশ্বাস করিবে?…অলৌকিক উপায়ে উদ্বুদ্ধ নারীর আত্মা!—এত লঘু কেন্দ্রের ভিতর দিয়া সংগৃহীত সংবাদ কি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য সন্দেহ হয়। না. কোন্ পথ যে প্রকৃষ্ট তা ঠিক বলা যায় না,—শিশুর মত সরল বিশ্বাসে সমস্ত স্বীকার করিয়া লইব, না তার্কিকের মত তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রয়োগে সমস্তই বিচার করিতে

থাকিব? শিশুই সুখী সন্দেহ নাই; কিন্তু কথা এই যে, সুখী হওয়াই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? কি, তাহা তো মনে হয় না—এখানে তো এমন কিছুই নাই যাহা অধিক দিন আমাদিগকে সুখী রাখিতে পারে।"

তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল,—গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তারকা-পুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুখ! কি মধুর শব্দ—কি সুন্দর পরিকল্পনা! মধুচক্রের চতুর্দ্দিকে মক্ষিকার ঝাঁকের মত তাঁহার সমস্ত চিন্তা ঐ কথাটীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সুখ!—কোথায় তা'র উৎস? অজ্ঞাতসারে তাঁহার মস্তিষ্কে যেন বাজিয়া উঠিল—"প্রেমে?" বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এম্‌নি একভাবে তিনি চাহিলেন যেন কথাটা তাঁহার নিজের নহে, অপর কেহ উচ্চারণ করিয়াছে।

"প্রেম!" অর্দ্ধস্বগতস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"এরূপ কোনো বৃত্তিই নাই— অন্ততঃ পৃথিবীতে নাই। এখানে আছে লালসা—দেহের প্রতি দেহের একটা পাশবিক আকর্ষণ যা'র পরিণাম অবসাদ আর ক্লান্তি। প্রেমের মধ্যে রুক্ষতার লেশমাত্রও থাকিতে পারে না কিন্তু বিবাহ-বন্ধনের মত রুক্ষতর আর কিছু আছে কি? এ বন্ধনে স্ত্রী পুরুষ আহারে শয়নে পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্য-স্বীকারে বাধ্য হয়; ফলে শূকর বিড়ালের মত গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তানের আবির্ভাব ঘটে! ইহারই নাম যদি 'প্রেম' হয়, তবে 'প্রেমের অবমাননা' 'প্রেমের ব্যভিচার' কাহাকে বলে? 'প্রেম' স্বর্গীয় মনোভাব, 'প্রেম' নির্ম্মল, পবিত্র, নিষ্কলুষ—অতএব তাহার অনুভূতিও অবশ্যই সেইরূপ হইবে।"

পুনরায় তিনি ক্রেমলীনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখা গেল, বৃদ্ধ প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন—তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা সজীবতা দেখা দিয়াছে এবং চর্ম্মশৈথিল্য সকল অঙ্গে অঙ্গে ভরাট হইয়া আসিতেছে। এল র‍্যামি তাঁহার হস্ত-পরীক্ষা করিলেন— নাড়ীর গতি বেশ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যলক্ষণব্যঞ্জক। পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সরিয়া আসিলেন এবং চাকা ঘুরাইয়া পূর্ব্বকথিত দূরবীক্ষণটীকে যথাস্থানে আনয়ন করতঃ বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে নৈশবায়ু-প্রবেশ-পথ বন্ধ হইলে গায়ের কোটটাকে বালিশের মত মাথায় দিয়া মেঝের উপর তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘুমাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

রবীন্দ্র-সদনে।

—:*:—

৭ই আষাঢ়, ১৩২৪।

আজ সকালে একটা প্রয়োজনে 'মানসী' অফিসে গিয়াছিলাম। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই দেখি প্রভাতবাবু সাজিয়াগুজিয়া বাহিরে আসিতেছেন! আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'এই যে আপনি এসেছেন, চলুন আমার সঙ্গে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায়?'

প্রভাতবাবু বলিলেন, 'রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। এবার তাঁর আমেরিকা থেকে আসার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করা ঘটে' ওঠে নি। তিনি যে কবে কলকাতায় আসেন, কবে চলে যান কিছুই জানতে পারা যায় না। আজ যাওয়া যাক্‌ চলুন।'

আমি সানন্দে তাঁহার সঙ্গী হইলাম। রবিবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া কবিবরের জন্য তাঁহার বসিবার ঘরে আমাদিগকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল না। কার্ড প্রেরণের ২।৪ মিনিট পরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বোলপুরে সম্বর্দ্ধনার সময় রবীন্দ্রনাথকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম এখন তাঁহাকে সেইরূপই দেখিলাম। চেহারার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে প্রভাতবাবু বলিলেন, 'আপনি কখন আসেন কখন পালান তা জানতে পারি নে বলে এতদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।'

রবিবাবু বলিলেন, 'হাঁ, আমি নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি বটে। জীবজগতে সকল প্রাণীরই আত্মরক্ষার একটা-না-একটা স্বাভাবিক অস্ত্র আছে,—নখ, দন্ত, শৃঙ্গ প্রভৃতি। আবার হরিণের মতন জন্তুরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।'

প্রভাতবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি কি তবে নিজেকে হরিণ শ্রেণীর জীব বলতে চান?'

রবিবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, 'তা বৈকি। এ কথা নিশ্চিত যে আমি নরমাংসভুক্ নহি, আর যারা নরমাংসভুক্ তাদের আমি বড় ভয় করি। তারাই ত আমাকে এখনে তিষ্টিতে দেয় না।"

আমরা হাসিতে লাগিলাম। প্রভাতবাবু সদ্য প্রকাশিত আষাঢ়ের মানসীখানা রবিবাবুর হাতে দিয়া তাঁর একটি প্রতিকৃতির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'এ সব আবার কি করেছ? এ ছবি কার আঁকা?'

প্রভাতবাবু বলিলেন, 'দেখুন না, নীচে নাম আছে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

রবিবাবু। তিনি যে এমন ছবি আঁক্‌তে পারেন তা' ত জান্‌তুম না। তাঁর সঙ্গীত-বিদ্যার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু তাঁর এই চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা আমার কাছে খুব বিচিত্র বলে বোধ হচ্ছে।'

তারপরে পাতা উল্টাইতেই 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক একটি লেখা তাঁর চোখে পড়িল। তিনি তাহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'তোমরা আমাকে নিতান্তই তাড়ালে দেখ্‌ছি।

প্রভাতবাবু বলিলেন, 'এ প্রবন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচকদের উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

রবিবাবু। আমি এ সব সম্বন্ধে ভাল মন্দ আর কিছুই শুন্‌তে চাই নে। আমাকে যাঁরা ভাল বল্‌বেন তাঁদেরও বিপদ বড় কম নয়।

আমি বলিলাম, 'সে কথা যে সত্য তার প্রমাণ আমি নিজেই সম্প্রতি পেয়েছি। * আপনার মত—'

"এত বেশী গালি বাংলার আর কোন সাহিত্যিককে খেতে হয় নি।' এই বলিয়া রবিবাবু প্রভাত বাবুকে বলিলেন, 'তোমাকে কেউ কিছু বলে না?'

প্রভাতবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'এখন পর্য্যন্ত ত আমাকে কেউ আক্রমণ করে নি।'

* ১৩২৩ পৌষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত মল্লিখিত 'কবি ও ঋষি' নামক প্রবন্ধ ও মাঘের ভারতবর্ষে তাহার সমালোচনা (!) দ্রষ্টব্য। লেখক।

রবিবাবু। আমাকেই সবাই আক্রমণ করে কেন বল দেখি ? এ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে আমার আর জুড়ী খুঁজে পাবে না। হেমবাবু, নবীন সেন প্রভৃতি সকলেই বেশ কাটিয়ে গিয়েছেন। আমাকেই সবাই কেমন অসঙ্কোচে গালি দেয়। তোমাদের দু'একজনকে যদি দলে পাওয়া যেত তবু মনটা একটু ভাল থাকত। পরস্পরের দুঃখ ব্যথা জানিয়ে কিছু তৃপ্তি পাওয়া যেত।

প্রভাত বাবু বলিলেন, 'আপনাকে গালি দেওয়াটা যে বেশ paying—এতে বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়।'

রবিবাবু। ঠিক বলেছ। তা' হলে আমি এই বাংলা দেশের অনেক দরিদ্র সাহিত্যিকের উপকার কচ্ছি, বল ; আর এই পরোপকারের পুণ্যটা আমার নিজেরই সম্পূর্ণ প্রাপ্য, যাঁরা টাকা দেন তাঁদের নয়।

আমরা সকলেই হাসিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, 'আপনি কি এ সব সমালোচনা বা আক্রমণ গ্রাহ্য করেন ?'

রবিবাবু। 'আমি এখন আর এ সব পড়িই নে। যে সব বইয়ে বা কাগজে আমার সম্বন্ধে কিছু আছে জান্‌তে পারি সে গুলোর মোড়ক পর্য্যন্ত খুলি নে। কাল একখানা বই আমার কাছে এল। খুলে দেখি তার নাম 'রবিয়ানা'। বুঝলুম আমিই লেখকের লক্ষ্য। কেতাবখানা সরিয়ে রেখে দিলুম। এই সব আক্রমণকারী তাদের গালিগালাজ যদি আমাকে না শোনাতে পারে তা হ'লে তাদের তৃপ্তি হয় না। সে যা' হোক্ আমি নিজে এইরূপে নির্লিপ্ত থাক্‌তে চেষ্টা করি। কিন্তু তা' হলেও প্রাণটা দেশের লোকের sympathy পেতে চায়। নোবেল প্রাইজ্ পাবার আগে পর্য্যন্ত সে sympathy যে একেবারে পাইনি তা' বল্‌তে পারি নে। সে পর্য্যন্ত নিন্দা সুখ্যাতিতে এক রকম কেটে গেছে, দুঃখ করবার বিশেষ কারণ হয় নি। কিন্তু এখন আমি আছি শরশয্যায়, এখনও চারিদিক থেকে শরবর্ষণ চল্‌ছে।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই সব আক্রমণ সত্ত্বেও, দেশ আপনাকে কি ভাবে নিয়েছে তা বোধহয় আপনি বুঝতে পারেন।'

রবিবাবু। আর যান মশাই! আমাকে আর মিথ্যা সান্ত্বনা দেবেন না। দেশ যে আমাকে কি চোখে দেখে তা আর বুঝ্‌তে আমার বাকী নেই।

আমি। আচ্ছা, এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনার কি একটা ভাল দিক নেই?—দেশে একটা প্রাণের সাড়া পড়ে যায় নি কি?

রবিবাবু। সেটা কতক ঠিক বটে। জীবনের লক্ষণই response দেওয়া। আমি জানি এই উদ্দাম চাপল্য কালে শান্ত ভাব ধারণ করবে এবং দেশ তখন তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবে। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি আমাকেই সবাই গালি দেয়। আমেরিকায় একটি মহিলা একদিন আমাকে বলেছিলেন, We take delight in your writings, but your countrymen must feel pride for them, আমি চুপ করে রইলুম।

প্রভাতবাবু বলিলেন, 'ইংরিজিতে আর আপনার গল্পের বই বেরুবে কি? আমি যে পাঁচটি গল্পের অনুবাদ করেছিলাম তার দুইটিমাত্র আপনার এ বইখানিতে আছে।'

রবিবাবু। হাঁ, Renunciation ও The Crowned King,—দুইটি গল্পেরই খুব সুখ্যাতি হয়েছে। আমি মনে করেছিলুম 'The Crowned King' পড়ে ইংরেজেরা খুব চটবে। কিন্তু এটাও সকলের ভাল লেগেছে দেখ্‌ছি। Times of India লিখেছে, Every Civilian ought to read this story. আমার আরও একখানা গল্পের বই ইংরিজিতে বেরুবে। তোমার গল্পও কতক কতক ইংরিজিতে অনুবাদ কর না? যদি বল ত আমি ম্যাক্‌মিলানের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারি। কি জান, এ রকম অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমের লোকেরা আমার আবির্ভাবটাকে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করে। কেউ কেউ অবশ্য জানে যে আমাদের দেশে একটা বড় রকমের literary movement হয়েছে, আমি তারই একটা expression মাত্র। এইটেই যে সত্য সে কথাটা ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই জন্যে তোমাদের লেখারও ওদের ভাষায় তর্জ্জমা হওয়া দরকার। আমি দ্বিজেনবাবু, দেবেনবাবু, সত্যেন প্রভৃতি কবিদের কতকগুলো কবিতা ইংরিজিতে তর্জ্জমা করেছি। এই কবিতাগুলোর একখানা বই শীঘ্র বার করব।'

একটু থামিয়া রবিবাবু প্রভাতবাবুকে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি আর একবার বিলেত চল না,—অবশ্য যুদ্ধটা শেষ হ'লে। তোমার বোধ হয় আর ওদিকে সরবার মৎলব নেই? তুমি প্রভাত—তোমাকে পূর্ব্বেই থাকতে হবে। কিন্তু আমি পূর্ব্বে উঠেছি, আর পশ্চিমে আমাকে অস্ত যেতে হবে। নইলে আমার পিতৃঋণ শোধ হবে না। এ কথা এখন আমি বেশ ভেবে দেখ্‌ছি। পঞ্চাশের আগে আমি একছত্রও ইংরাজি লিখি নি—একখানি চিঠিও না। আমার ভয় হ'ত বুঝিবা কোথায় গ্রামার ভুল করে বসব। তারপরে বিলেত যাবার সময় জাহাজে সময় কাটাবার জন্যে আমার কয়েকটি কবিতার তর্জ্জমা করি। সেগুলো পড়ে এখন ওরা বল্‌ছে আমাকে ওদের দরকার আছে। সে যাই হোক্‌, আমাকে আর একবার বেরিয়ে পড়তে হবে'*

এদিকে বেলা বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিয়া আমরা উঠিলাম। প্রভাতবাবু তাঁহার দুইখানি নব প্রকাশিত পুস্তক রবিবাবুকে উপহার দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি এখন তিনি তাঁহার হাতে দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াও খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

বিলাত যাত্রী

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

(ক)

জাহাজে বড় ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড় নদীতে জোয়ারের জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েছি কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েছে বাম হাতের ভাগে তাদের সংখ্যা বেশী,

* সম্প্রতি তিনি আবার বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

চাপ বেশী, স্থান কম। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে সেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী যুগ। রেলগাড়ি বল, হোটেল বল, আর পাগলা গারদ বল সমস্তই পিণ্ড পাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্ব-জগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশী সংকুচিত হ'তে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয় সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। কিন্তু সমষ্টি দেবতা সর্ব্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ, রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠছে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠবে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়া মাত্র, সে কখনই টিঁকতে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েছি কিন্তু এমন কত বলি রক্ত লোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি করে আজ অন্তর্দ্ধান করেছে।

ইতিহাসে এ নিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না—আমাদের শাস্ত্রে বলে ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে কিন্তু সেই ধর্ম্মনিষ্ঠুর সমষ্টী দেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম।

১৯ মে, ১৯২০।

(খ)

এডেন পার হয়ে লোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেছি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামে নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডা গরমেই মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেচে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক থেকে আর এক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ গঠনের রুদ্র নৃত্য রচনা করে চলেছে, সেও এই

ঠাণ্ডা-গরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডা গরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক একভাবে চিন্তা করবো, কাজ করবো, ওরা ঠাণ্ডাদেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিস ওদের হাটে এবং ওদের জিনিস আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনো দিনও ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেন না জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টি ক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তি—বৈচিত্র্য, সে কথাটা ভারতসমুদ্র থেকে মধ্য-ধরণীসাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার একথা শুনে তোমরা হয়তো বলবে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও বাহ্য-প্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠ্‌তে পারি নে?" এ কথার উত্তর হচ্চে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথা বলা চল্‌বে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই। বাহ্য-প্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েছে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার যো নেই। তাহলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়া গেছে সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকেই নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন ক'রে নিতে পারে কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ বলে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তিহীনের কাজ। উপনিষদে বলেছেন, যিনি এক তিনি "বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থদান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছে সেই জাতিই সার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি

টত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, পরের অর্থ কামনা করে,

কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে পারে না, কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে জাতও যায় পেটও ভরে না। ইতি—

২৪শে মে, ১৯২০। 'শান্তিনিকেতন'।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—অনুবাদক শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ; ১৩৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পকেট সংস্করণ, বাঁধাই, কাগজ, ছাপা মনোরম; পত্রসংখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৲ টাকা,—এবাজারেও অত্যধিক!

'সবুজপত্র'সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্-এ, বার্-এট-ল মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। চৌধুরী মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"হাফিজ ও সাদীর নাম ভদ্রসমাজে কে না জানে? ওমার খৈয়ামের নাম কিন্তু দু'দিন আগে এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি ফার্সিনবিশেরাও নয়। যদি চ এযুগের সমজদারদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরাণ দেশের সব চাইতে বড় কবি। * * কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কবি ওমারকে আবিষ্কার করেন। * * এযুগে ইউরোপের এমন ভাষা নেই, যাতে ওমারের একাধিক অনুবাদ নেই। * * ওমারের কবিতার রস ফুলের আসব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা হতে ঝরে পড়ে।"

'এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর
ভোগ-সাগরে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।'

* * * * * *

'বিজ্ঞ যিনি বিজ্ঞ আছেন—তর্ক নিয়েই থাকুন ঘোর,
সৃষ্টি-বিচার, তত্ত্বকথা—ঘুচিয়ে এস সঙ্গে মোর।
একটি কোণে ব'সব মোরা, হট্টগোলের চের তফাৎ,
ভাগ্য—যাহার খেলনা মোরা—করব তারেই পাত্রসাৎ।'

আনন্দই জীবন—আর সমস্তে "don't care."

"শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতাগুলি বাঙলা করে বাঙালী পাঠক-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহার অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে,

পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমার খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও সলীল অনুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নি।" বর্ণে বর্ণে সত্য।

বুদ্ধ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; ডিমাই ১৬পেজি, ১০৬পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট ছাপা ভাল, মূল্য ।৵ আট আনা।

সিদ্ধার্থের পুণ্য-চরিত; ইহার নূতন করিয়া পরিচয় অনাবশ্যক। এমন করুণ, মধুর, পবিত্র, উদার, বিশ্ব-বান্ধবের চরিত্রকথা যতই পঠিত হয় ততই মঙ্গল! গ্রন্থকারের ভাষা প্রাঞ্জল, বলিবার ভঙ্গী সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, এরূপ সুখপাঠ্য পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা আশা করি।

ঘটনার স্রোত—উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ প্রণীত। মেসার্স কর, মজুমদার এণ্ড কোং-র শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার বি-এ, কর্তৃক প্রকাশিত. ডিমাই ১৬ পেজি ১৬৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ের বাঁধাই, ছাপা কাগজ ভাল, মূল্য ১৲ মাত্র।

ঘটনার স্রোতের ঘটনা সাধারণ। নায়ক বক্তা স্বয়ং। তাঁহার আত্মকাহিনীতেই প্রকাশ "আমি বিবাহিত; বিবাহের পরেই বুঝিয়াছিলাম যে আমার কপালে সুখ নাই—তাই ডাক্তারী বইগুলার মধ্যে একেবারে মনপ্রাণ দিয়া নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলাম। বিবাহের পরের দিনই সেই যে চলিয়া আসিলাম—সেই শেষ! আমার বিবাহ কিম্বা শ্বশুর বাড়ীর কথা আমাদের বাড়ীতে আলোচনা পিতার নিষেধ! শুনিতে পাই দেনাপাওনা লইয়া শ্বশুরের সঙ্গে পিতার কি গোল হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থা তারই নাকি বিষময় ফল! আমার কিছু কহিবার নাই, তবে সহিবার যথেষ্ট আছে। নিঃসন্তান বৌদির অক্ষয়-স্নেহ কবচের মতন আমাকে ঢাকিয়া রাখে নাহলে যে আমার পরিণাম কি হইত!"

পরিণাম কি হইত বলা কঠিন—সেটা অবশ্য বিধাতার হাতে, তবে এটা অতি নিশ্চয় যে নায়কটীর ভাগ্যে যদি তাঁহার বৌদির মত একটী অতি সহিষ্ণু শ্রোতা না জুটিত তাহা হইলে তাহার উচ্ছ্বসিত দার্শনিকী, ফিলসফির বক্তৃতার স্রোত ছুটিত কোথায়! বৌদি বেচারী ভ্রাতৃ-প্রতিম দেবরের অদৃষ্টফলে মর্ম্মাহতা। দেবরেরও কথা ঐখানে কিন্তু শিক্ষিত যুবকের পক্ষে 'পত্নীর জন্য প্রাণ কেমন করা' রূপ দুর্ব্বলতা স্পষ্টাস্পষ্টি প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ, তিনি তাই আসল কথা ফিলসফির বুকনিতে চাপা দিতে চেষ্টিত কিন্তু পাষাণ টুটিয়া স্রোতের প্রকাশ স্বাভাবিক—যত চেষ্টাই হক না কেন—জিহ্বার গতি মুখের ক্ষত যেখানে! দেবরের মনের ভাব জানিবার জন্য বৌদি উৎসুক।—দেবর আত্মভাব সোজাসুজি প্রকাশে অনিচ্ছুক দেখিয়া বলিলেন—"ছি ভাই আমার কাছেও ফাঁকি?" (ইনি মাতৃহীন নায়ককে মানুষ করিয়াছেন!)

দেবর তৎক্ষণাৎ 'গম্ভীর স্বরে' তত্ত্ব কথায় উত্তর দিলেন—"বৌদি, এত বড় সংসারটা এও ত ফাঁকি·! সত্য নিয়ে কারবার করা ঠিক্ চলে না। তাতে দেউলে হবার যথেষ্ট ভয় আছে! যে সত্যিটা ধর না, আমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে পীড়ন কর্‌ছে, সেটা বাস্তবিক যদি কোনো দিন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে এ-বাড়ীতে আমার স্থান অসংকুলান হয়ে পড়বে—সেদিন তুমিও তাকে ঠেকাতে পর্ব্বে না।" স্নেহময়ী নারীর প্রাণ, আসল তত্ত্ব তাঁর নিকট অপ্রকাশ থাকিল না, তিনি কহিলেন—'যা বল্‌ছ ঠিক বটে। আমার বড় দুঃখু রয়ে গেল তোমাকে সংসারী করলুম, সুখটুকু দিতে পারলুম না। বাবার মন যদি ফেরে, ভগবান যদি···' তাঁর কথায় বাধা দিয়া নায়ক বলিয়া উঠিলেন—'রক্ষে কর বৌদি! ওই কথায় কথায় ভগবানের দোহাই আমার পক্ষে কেমন অসহ্য! ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা যা করে থাকি, তাতে ভগবান তাঁর প্রাপ্য থেকে যতখানি বাদ পড়েন এতখানি বোধ হয় আর কেউ নয়। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান বেচারা সত্যিই বিপন্ন হয়েছেন।" • • • মানুষ নিজেকে এত ছোট করে নেবে তা তার অন্তর্যামী প্রথমে হয়ত বুঝতে পারেন নি। ঘরে বাইরে কাড়াকাড়িটা চরম সুখের পরম সোপান বলে মানুষগুলো এমনধারা ছুটোছুটি করছে। • • ক'জন আত্মা কিম্বা অনন্ত জীবনের কথা ভাবেন কিম্বা ভাবতে পারেন—যাঁরা ওসব চিন্তা করেন, সংসারের গণ্ডীর বাইরে তাঁরা মুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন!"

ইত্যাকার বাছা বাছা তত্ত্ব কথায় বৌদি-ঠাকুরপো সম্ভাষণ পূর্ণ! সেগুলির মূল্য অন্যত্র থাকিলেও 'ঘটনা-স্রোতে' তাহা যেমন অপ্রাসঙ্গিক ও উপন্যাসের আকর্ষণী শক্তি গড়িয়া তুলিবার পক্ষেও তেমনি সাংঘাতিক,—বাঙ্গলার বৌদি অবলা, তাঁর নিকট দেবর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যগর্ব্ব কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাণ যেটা চায় তাহার তৃপ্তিসাধন বৌদির সাধ্যের বাহিরে! বিবাহিত হইয়াও স্ত্রী হইতে বঞ্চিত সে দুঃখটা ত আর কম নয়, তার উপর পিতা আদেশ করিলেন—'আবার বিবাহ কর।' শিক্ষিত পুত্র মনে মনে পিতৃ-আদেশের মুণ্ডপাত করিলেও মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রলয়ের অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত আলোক তাঁহার চক্ষের সামনে নিভিয়া গেলেও মুখে কিন্তু বাধ্যছাত্রের মত বলিলেন—"আজ্ঞে, আপনার ইচ্ছা!"

রক্ষা! দ্বিতীয়বার বিবাহ নায়কের হইল না—তিনি পিতৃইচ্ছাতেই কাশীতে বেড়াইতে গেলেন। পত্নীর সহিত মিলন এখানে। তিনি ডাক্তার কিনা,—তাঁর স্ত্রী গৌরীর এক দিন মূর্চ্ছা হওয়ায় ডাক্তাররূপে তিনি আহূত হইলেন। রোগিণীকে দেখিয়াই নূতন পাশ করা ডাক্তার বলিলেন 'উনি ত এখন বেশ ঘুমুচ্ছেন।' রোগিণীর ভগিনী যুবতী উত্তর দিলেন 'না-না উনি মূর্চ্ছা গেছেন!' ডাক্তার বলিলেন 'তাই নাকিঃ।' চিকিৎসায় গৌরীর শিব লাভ হইল, সে চিনিল—ডাক্তার তারই স্বামী। ডাক্তারের নিকট পীড়িতা যুবতীর আচরণ অদ্ভুত ঠেকিল।

মনে হইল সদ্য পাশকরা ডাক্তারের পক্ষে সুন্দরী যুবতী রোগিণী খুব বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি ভি'জিট লইতে ভুলিলেন। রোগিণীর ভগিনী বলিলেন 'ডাক্তার বাবু ক্ষমা করবেন, গোলেমালে আপনার দর্শনীটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেম; আঁচলে আঁচলেই এতক্ষণ ফিরছে—এই নিন্।' ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন—'একেবারে চুকিয়ে দিলে হয় ত ডেকে পাবেন না—ওটাকে এখন না হয় হাতের পাঁচ করে রাখুন।'

যুবতীর উত্তর—'আপত্তি নেই, তবে ঋণের মাত্রা বাড়িয়ে লাভ কি—শেষে যদি আপনি সুদ শুদ্ধ চান।'

'তখন না হয় বল্‌বেন সব তামাদি হয়ে গেছে।'

দার্শনিক ডাক্তারের পক্ষে একজন অপরিচিতা যুবতীর সহিত এরূপ বাক্‌চাতুরী তাঁহার চরিত্রের সহিত একেবারে খাপ খায় নাই (তখনও ডাক্তার জানেন না, ঐ তরুণী—মনোমোহিনী তাঁরই শ্যালিকা!)

দু'দিনেই হইয়া গেল 'সব জানাজানি'। স্বামীস্ত্রীর মিলনচিত্রটা যেরূপ গম্ভীর ও প্রেমাত্মক হওয়া উচিত ছিল তাহার দিক দিয়াও যায় নাই!

তারপর পিতাপুত্রের মিলনের পালা! বুড়া প্রথমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলেও শেষে দেখা গেল;—তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ। চরিত্রে তাঁর একগুঁয়েমী—একটা জোর আদবেই নাই, পিতা-পুত্রে মিলনটা ঘটাইলেন 'বৌদি!' বেহাইয়ে বেহাইয়ে পর্য্যন্ত মিলন হইয়া গেল। 'বেহাইয়ের দুই হাত ধরিয়া পিতা কহিতে লাগিলেন 'আজকে যা দেখলাম ঠিক এরকম দেখাশোনা হবে তা আপনিও ভাবেন নি, আমার কথা ছেড়ে দিন। এ ভগবানেরই খেলা! আহা! বৌ নয়ত দুর্গাপ্রতিমা। আজ ছেলের বাপের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে।" ভাল কথা, উপন্যাসের উপসংহারটা সুখের! আরও সুখের বিষয় হইত—যদি ইহার পাত্রপাত্রীর চরিত্রগুলি পরিপুষ্ট হইত! ইহাতে অনেক ভাল ভাল তত্ত্বকথা, নির্ম্মল রসালাপের উপকরণ, সুন্দর সুন্দর বাক্য-কদম্ব সন্নিবিষ্ট, কিন্তু শিল্পচাতুর্য্যের অভাবে অবিন্যস্ত—বিশৃঙ্খল!

এক হিসাবে উপন্যাসখানির পূর্ণ-সার্থকতা;—একালের শিক্ষিতের অনেকেই যেমন মুখে বড়, কার্য্যে নয়; মুখে উদার হৃদয়ে নয়,—নির্ম্মল রহস্যে, বাক্‌চাতুর্য্যে পটু, অথচ সে রহস্য কেবল রহস্যরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম—উহার মধ্যে আর একটা গূঢ় রহস্যের সন্ধান তাঁরা পাইতে চান—ঘটনাস্রোতের নায়কটীও সেই স্বভাবের, নব্য যুগের মুখসর্ব্বস্বের নিখুঁত ফটো।

জন্ম-অপরাধী,—উপন্যাস,—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। প্রকাশক মেঃ কর, মজুমদার এণ্ড কোং'র শ্রীযুক্ত নলীন্দ্রচন্দ্র বসু, বি-এ, ১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেঃ ২১৯ পৃষ্ঠা কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বলুন ত জন্ম-অপরাধী কাহারা? ক্রীতদাস-সন্তান? না,—আজ এ সভ্যতার যুগে তাহারাও সে দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে! ক্রীতদাস হইতেও শক্তিহীন, আরও অসহায়, আজীবন পরাধীন জন্মে যাহাদের হাহাকার, শিক্ষায় যাহাদের বাক্‌বিতণ্ডা, বিবাহে যাহাদের পিতৃপক্ষের—অনেক স্থলে উভয় পক্ষেরই চিরদারিদ্রা, সংসারে যাহারা পর মুখাপেক্ষী, অন্যের মন যোগাইতে যাহাদের জীবন, অস্তিত্ব যাহাদের পরসেবায়—হৃদয় তাহাদের চাউক না চাউক সেই গর্ব্বেই যাহাদের পতিপুত্র চিরঅন্ধ,—আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ চেষ্টাই যাহাদের জীবনে অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য, মৃত্যুতে যাহার সর্ব্ব শান্তি,—জন্মক্ষণ হইতে শ্মশানের ছাই মুষ্টিতে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাদের কলঙ্কের ভয় সেই জন্ম অপরাধী কে? ওগো সে যে আমাদেরই মাতা, ভগিনী, কন্যা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পুরুষের পার্শ্বে ছায়াময়ী বঙ্গবধূ! বধূত্বেই তাহার অপরাধের পূর্ণ পরিণতি! ছাই পাঁশেরও মূল্য আছে, বাঙ্গলার কন্যা তাহা হইতেও অধম,—অর্থ দিয়া পণ দিয়া তাহাদের বিক্রয়ের প্রথা! বিদ্যা তাহার বিবিয়ানা,—স্বামীর গুণাগুণে তাহাদের গুণাগুণ। স্বামী উপার্জ্জনশীল হইলে, যদি নেক নজরে দেখেন তিনি তবেই তাহার গৌরব নতুবা অশেষ দুঃখ যন্ত্রণায় পশুর অধম জীবন যাপনে সে বাধ্য, সমস্তই তাহার পণ্ড! তখন সেই জন্ম-অপরাধীর দুঃখের আর অন্ত কোথায়? নায়িকা অপেরা স্বামী-নিগৃহীতা এমনি একটী জন্ম-অপরাধী? যে দেশ নাকি নারী-পূজার জন্য প্রসিদ্ধ—সেই দেশে ভদ্রবংশীয়, শিক্ষিতা, সহিষ্ণুতার প্রতিমা, সুশীলা সাধ্বী অপেরা, উচ্চশিক্ষিত, অসংযমী চরিত্রহীন স্বামী বিনোদলালের হৃদয়হীন অতি-উগ্র ব্যবহারে পশু অপেক্ষাও হেয়তম হীনভাবে অকারণে নির্জ্জিতা,—বাক্যে প্রহারে জর্জ্জরিতা—তাহার জীবনপাতের ব্যবস্থা করিয়া তবে সে জন্ম-অপরাধের স্খালন। স্বামী করে যাকে হেলা, বাঁদীও মারে তাকে ঢেলা,—দাস, শাশুড়ীর নিকট অভাগিনী অপেরা যে তুল্য ব্যবহার লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! 'স্বামী আড়ালে যাহা করেন, তাহা অপেরা নিঃশব্দে সহিয়া লইত কিন্তু প্রকাশ্যে অন্যের সাক্ষাতে অভদ্রজনোচিত কদর্য্য বাক্য ও ব্যবহার, অপেরার মর্ম্মান্তিক লজ্জা দিত! কিন্তু নিরুপায় বঙ্গবধূ সে! বিনা অপরাধে সহস্র দণ্ড ভোগ করিতে হইলেও, নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ তাহার মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! বাংলা দেশের অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই একটা সুমহান্ মোটা নীতি শিখিয়াছে,—"হলুদ জব্দ শিলে—আর বউ জব্দ কীলে!" বধূর ভাগ্য ইহাতেও শেষ হইত যদি, সহনশীলা বঙ্গবধূ তাহা সহিতেছে, সহিতই; কিন্তু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে তাহার চরিত্রহীন স্বামী সন্দিহান হইয়া এমন জঘন্য দুর্ব্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিল যাহার তীব্র বিষ সত্যই অসহ্য! মানুষ এই দুঃখে পশু হইয়া যায়, আত্মার এত অগৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু বঙ্গমহিলা (আজন্ম নিপীড়িতা হইয়া আত্মণক্তিতে

শ্রদ্ধাহীনা বলিয়া বা দেবীর অধিক চরিত্রবলে, জানি না) আত্মহত্যায় বিরত! তিলে তিলে তাহাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। তাহাই হইল; শরীর সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেও মন সহ্য করিতে পারিল না; মনের বেগে হৃদয় শতধা হইয়া গেল! স্বামীর দুশ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত অপেরা যে দিন স্বচক্ষে দেখিল; বিনোদও স্ত্রী তাহার কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিল জানিয়া যে মুহূর্ত্তে লজ্জিত না হইয়া ক্ষুব্ধ হিংস্র উন্মত্ত উত্তেজনায় পৈশাচিক উন্মাদনায় দানবদম্ভে লাফাইতে লাফাইতে চাবুক হস্তে স্ত্রীর প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া দিতে উপস্থিত! জন্ম-অপরাধী তখন জন্মের শোধ পিশাচ স্বামীর শাসন-বাধ্যতার আইনের কবল এড়াইয়া ঊর্দ্ধে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দেশে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে! উষ্ণ রক্তস্রোতে শোণিততর্পণে চাবুকের র‍্যাপচারে তার শেষ! কি করুণ! লেখিকা হৃদয়শোণিত উৎসারিত করিয়া পূর্ণ সহানুভূতিতে প্রাণ ঢালিয়া জন্ম অপরাধী চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার করুণ প্রবাহ পাষাণকেও স্পর্শ করিয়া স্নেহযুক্ত করে! কাহিনীটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী কিন্তু বাঙ্গলায় পাষাণে কর্দ্দম কোথা? সমাজ অন্ধ!

সমাজ অন্ধ হইলেও শিক্ষা ত অনর্থক নহে,—লেখিকাই তাহার প্রমাণ। আলোকহীন মহাসাগর গর্ভে বংশের পর বংশ, আজীবন নিমজ্জিত থাকিয়া যে জীব চক্ষুরত্ন চিরদিনের মত হারাইয়াছে, তাহার পক্ষে চক্ষুষ্মান হওয়া অতি কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। মনের প্রবল ইচ্ছা প্রেরণায় সুদীর্ঘ কালের সাধনার ফলে পঙ্গুও এ পৃথিবীতে গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে! নারীর স্বস্থান পুনরুদ্ধার এমন কি অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু সে স্থানটা কোথায়,—সমস্যাটা সেইখানেই। শিক্ষিতা মনস্বিনী মহিলার সে স্থানটা নির্দ্দেশচেষ্টা শুভ,—পুরুষের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। বঙ্গবধূর সুখদুঃখ, শুভাশুভ, মনোবৃত্তি লেখিকা যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা, লেখকের পক্ষে তাহার ধারণা তদ্রূপ সুগম বা নিরাপদ নহে। সুতরাং লেখিকার অঙ্কিত চিত্র অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস আমাদের নাই,—বরং সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি—এরূপ স্বভাবের পুরুষ চক্ষে না পড়িয়াছে এমন নয় কিন্তু তাই বলিয়াই ও-পক্ষের উক্তি,—নারীর মাপকাঠিতে পুরুষের পরিমাণ, সাধারণ ভাবে যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইলে পত্নীপক্ষপাতিত্ব দোষে কেহ দোষী করিলে জবাব নাই! নারী বহুভাবে নিপীড়িতা সত্য, কিন্তু স্বামীর হস্তে আজকাল খুব কমই! 'উচ্চশিক্ষিত' যুবকদের আর যে দোষই থাকুক, স্ত্রীবিদ্বেষী এ অভিযোগ তাহাদের পনর আনা শত্রুও দিতে পারে না। তাহারা ও-পক্ষের প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে মানিয়া লইয়াছে, সেটাতেও যদি কেহ অন্যত্র দোষ আরোপ করিয়া আড়ষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে আব্দার বা অতিরঞ্জিত উক্তি বলিতে বাধ্য হইতে হয়। পুরুষ শক্তি উপাসক; শক্তিকে ভক্তি না করিয়া তাহার উপায় নাই! রমণী যে পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছেন, অধিকারও বিস্তার হইয়াছে ততটুকু! স্বামী একেবারে সহ্য করেন না—একথা বলা চলে কি? সাক্ষী গৃহ-দেবতা! শক্তির

সুপ্রয়োগে শিব ও সুখ উভয়ই লাভ হয়,—অপ্রয়োগে যত বিপদ ! অপেরা সুশীলা, ধৈর্য্যের প্রতিমা, কিন্তু দুর্ব্বলা, আত্মশক্তিতে আস্থাহীনা—সে কি করিয়া দুর্দ্দান্ত বিনোদকে বশে আনিবে ! তাহার দুঃখ এ সমাজে কেন সকল সমাজেই অনিবার্য্য,—তবে অন্য সমাজে হইলে তাহার চরিত্রের পরিণতিও হইত অন্যরূপ,—যেথানেই হউক যেমন ভাবেই হউক শক্তি সঞ্চয় তাহাকে করিতেই হইত, অন্যথায় পরিণাম হইত একই ! অপেরা প্রাণ দিল, ওঃ কি কষ্টে ! পশুর মত ! তাহার 'ভালমানবেষী' তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না ; ও-ভালমানুষেমীতে কাহারও মঙ্গল নাই—আবার চরিত্রহীনা পিশাচী পিয়ারীর স্বামীর উপর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ আরও ভয়ঙ্কর ! কেন ? কারণ প্রকৃত শক্তির স্ফুরণ উভয় ক্ষেত্রের এক স্থলেও ঘটে নাই !

বইখানি পড়িতে পড়িতে কত কথাই না মনে জাগে ! বঙ্গনারীর অবস্থা কি ভয়ঙ্কর,—দুঃখের তাহাদের পরিমাণ হয় না—অথচ তাহার প্রতিকারের পথ এ সমাজে কিরূপ জটিল ! নারীকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজের ও গৃহের সংস্কার আবশ্যক, কর্ত্তাকেও ভক্ত করিতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক, তবে না শক্তির প্রভাবে সংসার শক্ত সহনক্ষম হইবে।

এতদিন পুরুষকে জাগ্রত করাইবার চেষ্টা বিধিমত হইয়াছে, কার্য্যে হইলেও তাহার আশানুযায়ী ফল হয় নাই। এবারে গতি বিভিন্ন পথ হইতে ;—স্বামী শিক্ষা দিবেন স্ত্রীকে—এই ছিল এত দিনের ব্যবস্থা, এখন স্ত্রী শক্তিশালিনী হইয়া সুপথে আকৃষ্ট করিবেন স্বামীকে ! গৃহিণী যিনি, মাতা যিনি, জন্মমাত্র সন্তানের শিক্ষয়িত্রী যিনি, তাঁহার শিক্ষা, স্বভাব কত মহান্ হওয়া উচিত পুরুষ তাহা বুঝিল না,—এবারে আপনার স্থান অধিকার করুন নারী স্বয়ং ! চিন্তাতেও প্রাণ ভরিয়া উঠে ! শক্তির ত চাই এমনি সাহস !

লেখিকাকে তাঁহার সাহসের জন্য ধন্যবাদ ! পোষাপাখীর খাঁচার বাহিরে আসিয়া আপনার অধিকার খুঁজিয়া লইবার চেষ্টা কম সাহসের কথা নহে ! বাহিরে শত্রুও যে অসংখ্য, বন্ধের আত্মবেদনাও কম নয় !

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
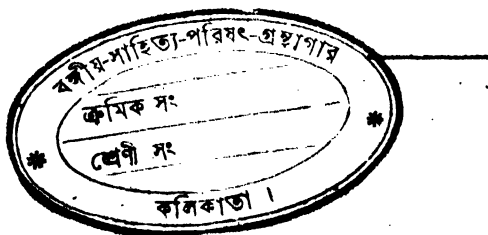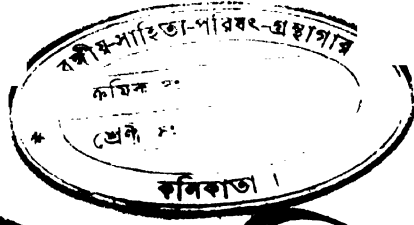
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৪র্থ বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩২৭ সাল। { ২য় খণ্ড, ৮র্থ সংখ্যা।

সহর ও পল্লী।

—:*:—

সহরেতে গেলাম ফিরে পাঁচবছরের পর
দেখতে পাড়ার বন্ধু কজন সেই সে বাসা-ঘর।
চিনতে নারে কেউ যে মোরে বন্ধু দু' একজন
শুষ্কহাসি হেসেই করে তুচ্ছ আলাপন।

(২)

ঢুকতে বাসা সম্মুখে সেই আমার পড়ার ঠাঁই
কাপড় কাচার আফিস সেথা চেনার উপায় নাই
ধারেই বড় অক্ষরেতে প্রবেশ নিষেধ কার?
বিশ বছরের পরিচয়ে এই কি ব্যবহার?

(৩)

ইঁটের মতই শক্ত বুঝি ভবনখানার প্রাণ
সেই সে নিবিড় ভালবাসার এই কি প্রতিদান ?
নিজের ঘরেই চোর যে আমি, ঘরের ধারেই বাঁধ
থমকে আছি দাঁড়িয়ে যেন জাল্ সে 'প্রতাপচাঁদ'।

(৪)

আমার গ্রামে এলাম ফিরে বিশ বছরের পর
লেপে মুছে গ্রামের লোকেই ঠিক করেছে ঘর।
পথ থেকে হায়, নয়ন জলেই সিক্ত হ'ল মন
অফুরন্ত কান্নাহাসি আশীষ আলিঙ্গন।

(৫)

এতই প্রীতি এতই আদর যাহার লাগি রয়
দুঃখী হয়ে রয় সহরে মূর্খ সে কি নয় ?
খেদ মেটে না আমায় দেখে নাইক অবসর
পরাণ পেয়ে ফিরলো যেন আজকে 'লখিন্দর'।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রিয়তমা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাওয়েলের কথা সত্য হইল; ব্যারণেস্ মাইনোর স্থানচ্যুতির সংবাদ অবিলম্বে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। নগরের ঘরে ঘরে ঐ আলোচনা, ধনীরা বলিলেন, ইহা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন। সাধারণ সম্প্রদায় ব্যারণেসের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিল। আর শোন্ওয়ার্থের দাসদাসীরা ভোজন সময়ের সম্মিলনে আপন আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

ব্যারণের নিজের ভৃত্য আরনেষ্ট বলিল, "এত দিনেও যখন ব্যারণ উঁহার কাছে ঘেঁসিলেন না, একদিন তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন না পর্য্যন্ত, তখনি বুঝিয়াছি যে এ ব্যারণেস্ আর বেশী দিন এখানে থাকিতে পারেন না।"

হানা বলিল, "লেডি এদিকে লোক ভাল হইলে কি হয়, তিনি ব্যারণেস্ হইবার যোগ্যা নন্, আসিয়া অবধি তিনি সেই যে মস্‌লিনের পোষাক ধরিয়াছেন, তাহা ছাড়িতে চান্ না। আমার এরকম ভাল লাগে না!"

কোচম্যান্ বলিল, "তাঁর পোষাকের ব্যাপার আমি প্রথম দিনেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আর সেদিনও তাঁহারা যেমন দূর দূর ছিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে সে বিবাহে ভালবাসার সম্পর্ক ছিলনা।"

রান্না ঘরের দাসী মেরি বলিল, উঁহাদের বাড়ীর নাকি সকলেরই লালচুল!"

সে কথায় রাগিয়া উঠিল পাচিকা অ্যান্, বেচারার মাথার চুলগুলি অনেকখানি লাল। দাসীর কথায় ক্রোধ ভরে সে উত্তর দিল, "বিবাহের পূর্ব্বে ব্যারণেস্ যা ছিলেন এখনও তাই আছেন নিশ্চয়; ইহাতে ব্যারণের লাল চুল অপছন্দ বুঝিলে কিসে? আর লেডির মুখশ্রীর মত কয়জনের মুখ দেখিয়াছ? ও কোন কাজের কথা নয়।"

হানা বলিল, "না তিনি যে সুন্দরী তাহাতে ভুল নাই, শুধু ঐ বিশ্রী পোষাকের আর গরীবের মত ধরণে ব্যারণ তাঁহাকে পছন্দ করেন না।"

যাহার যা খুসি বলিতে লাগিল। অর্থাৎ শেষ পর্যান্ত প্রতিপন্ন হইল, নম্র ও দয়ালু হইলেও নূতন ব্যারণেস,—মাইনো গৃহিণী হইবার উপযুক্তা নহেন। বিশেষ বকৃশিষ ইত্যাদি পাওনায় তাহারা লিয়েনের নিকট বড় ফাঁকিতেই পড়িয়াছে, নিজের বা অন্যের জন্য তিনি কখনও একটি পয়সাও ব্যয় করেন না, সুতরাং একজন ধনশালিনী কর্ত্রী তাহাদের প্রার্থনীয় বোধ হইতেছিল।

লিয়নের কর্ণেও এ সকল কথা প্রবেশ করিত কিন্তু এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নীরব ছিল।—

এ দিকে ব্যারণের যাত্রাতে ক্রমশঃই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল।—উস্কার শাসনে কি গোল্-মাল চলিতেছে সে বিষয়ে একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাতেই তাঁহার যাইবার দিন প্রায় একমাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই ভ্রমণ বন্ধ ও বিষয়কার্য্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের মনোযোগে হপ্‌ মার্শেলের যথেষ্ট আনন্দ, রাওয়েলের জীবনে এ সুমতি তিনি কখনও দেখেন নাই। সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি দেখিলেন যে ব্যারণের সঙ্গে যাইবার জন্য যে দুইটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক কয় দিন হইতে পূর্ণ হইতে ছিল, আজ তাহারা শূন্য গর্ভে তোষাখানায় ফেরত গেল, পরিবর্ত্তে একটি ছোট বাক্স ও ব্যাগ, সামান্য ও সাধারণ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিতে সজ্জিত হইয়াছে। আজ বৈকালেই রাওয়েল্ জমিদারীতে যাইবেন।

সানন্দ মনে তিনি আজ লিয়োর ঘরে চলিলেন, সেখান হইতে লিয়ো ও তাঁহার বন্ধু কোর্ট চ্যাপ্‌লিনের কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া পাদ্রী প্রফুল্ল হইলেন, কিন্তু পাঠে অবহেলা করিয়া গল্পের অবকাশ দিলেন না কারণ এ শুধু ধর্ম্মের উপদেশ, তাহাতে বন্ধুত্বের সুযোগ লওয়া অন্যায়! বরং মার্শেলকে শোনাইয়া আরও বিস্তারিতভাবে উচ্চকণ্ঠে পাঠ দিতে লাগিলেন।

লিয়োর সেদিকে আদৌ মনোযোগ নাই, সে টেবিলের উপর রক্ষিত কাচপাত্রের মধ্যের লাল মাছগুলির ওঠানামার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত। পাদ্রী বলিলেন, "লিয়োর স্বভাব একেবারেই তাহার মাতার মত হয় নাই। অন্য দিকে ত বেশ দেখি, শুধু ধর্ম্মের উপদেশেই দারুণ অনাস্থা।"

হপ্ মার্শেল বলিলেন, "নূতন শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার ফল—দেখুন। মেয়েটা যায় যায় করিয়া যায়-ও না ত!"

এমন সময় ব্যারণ সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, লিয়ো তাঁহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিতেই পাদ্রি তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিলেন, কি চঞ্চল বালক,—বস, এখনও তোমার উঠিবার সময় হয় নাই। যাহা বলিলাম তাহা স্মরণ আছে? আচ্ছা শোন আর একবার।" কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি পুনরায় পাঠোদ্যম করিতেই র‍্যাওয়েল বলিয়া উঠিলেন, "একটি কথা স্যার প্রিষ্ট সেই জনাই আমি এখানে আসিলাম।"

দেখিতেছেন ত—এ ঘরটা ব্যারণেসের ঘরে সংলগ্ন, ধর্ম্মচর্চ্চার সম্বন্ধে আমি তাঁহার মতে বা বিশ্বাসে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না। তাই বলিতেছি যে তাঁহার কানের কাছে এ পাঠ বোধহয় তাঁর শান্তি ভঙ্গ করিবে। লিয়োকে লইয়া আপনি তার পড়িবার ঘরেই এ সকল পাঠ দিবেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মার্শেল বলিলেন, "কেন, সে বুঝি তোমার কাছে নালিশ করিয়াছে?"

"না, সে আমার কিছুই বলে নাই, কিন্তু ইহা আমার উচিৎ—কর্ত্তব্য।"

"বটে! তাই ভাল; চলুন চ্যাপ্‌লিন, আমরা এখান হইতে যাই তবে।"

হপ্ মার্শেলের আসন তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল, পাদ্রিও অন্ধকার মুখে তাঁহার অনুসরণ করিলেন পথে আসিতে আসিতে কোর্ট চ্যাপ্‌লিন বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

"মেজাজ্!—ও মর্জ্জির ত কোন হিসাব নাই, চিরদিন ধরিয়া এই খেয়ালেই চলিল।"

লিয়ো আর পড়িতে আসে নাই, পাদ্রীরও বোধহয় আর সে উৎসাহ ছিল না। বৃদ্ধ আপন মনে লিয়েন্ ও ট্রেচেনবার্গ বংশের মুণ্ডপাত করতে ছিলেন আর বিষণ্ণ গম্ভীর বদন কোর্ট চ্যাপ্‌লিন অল্প কথায় তাহাতে যোগ দিতে ছিলেন মাত্র, তাহার ভাব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। বেলা শেষ হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ বাহিরে অশ্ব পদশব্দ শুনিয়া হপ্ মার্শেল বলিলেন, "র‍্যাওয়েল্ চলিল বুঝি?"

দুই জনেই জানালার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, অনুমান যথার্থ। ব্যারণ অশ্বারোহণের উদ্যোগ করিতেছেন, সম্মুখে লিয়োকে লইয়া জুলিয়েন দাঁড়াইয়া।

একসঙ্গে উভয়ের চারিটি চক্ষুই অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু না, ব্যারণের ভাবে তেমন বিরক্তির কোন কারণ নাই; রাওয়েল লিয়োকে টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন, তার পর লিয়েনকে সামান্য কি বলিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তে অশ্ব অদৃশ্য হইল, তখন দর্শক দ্বয়ের মুখ মেঘমুক্ত হইয়াছে।

রাওয়েল্ ঘোড়ায় উঠিবার সময় জুলিয়েনকে এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন। "আমি এখন কয়দিনের মত চলিলাম লিয়েন, কিন্তু আসিয়া যেন তোমায় যেমন দেখিয়া যাইতেছি তেমনই দেখিতে পাই, হঠাৎ কোন মত পরিবর্ত্তন করিও না লেন।"

পরদিবস প্রাতে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র আনিয়া হপ্ মার্শেলের হাতে দিল। তাহাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লিখিয়াছেন;—লিয়ো কেমন আছে? আপনারা কেমন আছেন সংবাদ দিবেন, আমি ভাল আছি।" মাত্র এই দুই লাইন্ পত্র। হপ্ মার্শেল আশ্চর্য্য ও কতকটা বিরক্তির সহিত পাদ্রীকে বলিলেন, "এই যুবকের সবই অদ্ভুত। সময় সময় ছ' মাস ন' মাসেও ঘরের খবর লয় না, আর কাল বৈকালে গিয়া আজই তার সংবাদের প্রয়োজন দেখুন।"

পত্রবাহক উত্তর লইয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে আবার অমনি পত্র আসিল ও গেল। পাঁচদিন এইভাবে গিয়া ছয় দিনের প্রাতে বাহকের হস্তে দুইখানি চিঠি আসিল, তাহার মধ্যে একখানি বৃহৎ ও শিল করা। মার্শেল বলিলেন "ও কাহার চিঠি?"

"আজ্ঞা—ব্যারণেসের নামে।"

"কৈ দেখি-দেখি।" বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু পত্রবাহক তাঁহাকে সম্মান জানাইয়া সরিয়া গিয়া বলিল, "না প্রভু, আর কাহারও হাতে এ পত্র দেওয়া নিষেধ, ব্যারণেসের নিজের হাতেই দিব।"

মার্শেলের মুখ বিকৃত, রুষ্ট স্বরে তিনি বলিলেন, "বটে? তা যাও তাঁরই কাছে যাও, এখানে সঙের মত দাঁড়াইয়া কেন?"

ভীতভাবে লোকটি পলায়ন করিল। পাদ্রী বলিলেন, "ব্যারণ আজকাল বড় পত্র লিখিতে পারেন দেখিতেছি।"

"কতকগুলা আবল্-তাবল্ বকিয়াছে, যাহা উহার অভ্যাস। ভ্যালেরিকেও লিখিত, সে কিন্তু মোটে পছন্দ করিত না।"

কোর্ট চ্যাপ্লিনের ভ্রূকুঞ্চিত ; তিনি কি ভাবিতেছেন,—উত্তর দিলেন না।

পত্রবাহক জুলিয়েনের ঘরে গিয়া তাহাকে চিঠিখানি দিল। সে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার পর শীঘ্র-হস্তে পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ব্যারণ "জুলিয়েন," সম্বোধনেই পত্রারম্ভ করিয়াছেন বটে কিন্তু সমস্ত চিঠিখানির ভাষায় সাধারণের পত্র লেখার মত কোন কথাই নাই, সে যেন কোন ভ্রমণকারীর পথের বর্ণনা, স্থানের চিত্র আর তদনুসঙ্গী দু' চারিটি কথা।

তবু লিয়েন তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পড়িতেছিল, তাহার চোখের উপর যেন একটা সজল আভা, সমস্ত মুখখানি সেই আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাহক অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে বলিল, "আর সময় নাই লেডি, অমনি আমায় ফিরিতে হইবে ; যা হয় শীঘ্র উত্তর দিন।"

চমকিয়া লিয়েন বলিল, "তুমি দাঁড়াইয়া আছ ? কিন্তু এখন যে বড় তাড়াতাড়ি—কাল আমি ইহার উত্তর ডাকে পাঠাইব। তুমি যাইতে পার।"

"না, ব্যারণ আমায় ইহার উত্তর সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, আপনি লিখুন—আমি খানিকক্ষণ বসিতেছি।"

লিয়োর আহারের সময় হইয়াছে, দ্রুতহস্তে লিয়েন লিখিল।—

"রাওয়েল, তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমায় ইহার সমালোচনা করিয়া লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু আজ ত আর তাহার সময় নাই, বড় তাড়াতাড়ি—লিয়োকে খাওয়াইতে চলিলাম। কাল বেলা তিন্টার সময় লিয়োকে লইয়া ফরেষ্টারের ঘরের নিকটের সেই নির্জ্জন স্থানটিতে বেড়াইতে যাইব ও সেইখানে বসিয়া ইহার উত্তর লিখিব। লিয়ো ভাল আছে। তোমার শারীরিক কিছু লেখ নাই কেন ?"

পত্রবাহক ফিরিবার সময় আবার মার্শেলের সাক্ষাৎ পাইল। তিনি বলিলেন, "কি তোমার লেডি কিছু উত্তর দিয়াছেন ?"

"হাঁ প্রভু।" বলিয়া পত্র দেখাইল। লঘুভার ক্ষুদ্র পত্র। বাহক চলিয়া গেলে পাদ্রী বলিলেন "অত বড় পত্রের এই উত্তর ?"

মার্শেল বলিলেন, "পাগলের পাগ্‌লামির উত্তর এমনি হয়!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ণে আপনার সমস্ত সামগ্রী গুছাইয়া লইয়া লিয়েন উদ্যানের দিকে চলিল। লিয়ো তাহার কুকুর লইয়া আগেই ছুটিতেছিল।

ইণ্ডিয়ান হাউসের পশ্চাৎ বাহিয়া খানিক দূর গেলেই সুবিন্যস্ত অরণ্য। উদ্যানরক্ষকের অধীনে এ জঙ্গলও রক্ষিত। উদ্যান ও বনের মধ্যসীমায় রক্ষকের গৃহ, সে সপরিবার সেইখানেই বাস করে। লিয়েন প্রায় এখানে বেড়াইতে আসিত; সুন্দর নির্জ্জন ও বৃক্ষ-লতাদি পূর্ণ এই ক্ষুদ্র বনখণ্ডটি তাহার বড় ভাল লাগিত। আর গর্ব্বহীনা সহৃদয় প্রভুপত্নীর উপর বনরক্ষক-দম্পতির যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, লিয়েন আসিলে তাহারা মন দিয়া সমাদর করিত।

আজও সে আসিতেই রক্ষক একখানি বেঞ্চ আনিয়া তাহাকে আসন দিল, তাহার পর সম্মুখে একটি বাঁশের টেবিলে শুভ্র আবরণ বিছাইয়া পত্নীকে চা আনিতে বলিল।

লিয়েন হাসিমুখে তাহাদের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতেছিল, সে জানিত—ইহাতে আপত্তি করিলে দরিদ্র-দম্পতি অন্তরে-অন্তরে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। ফরেষ্টার-পত্নী ভিতরে গেলে সে নিজের কাগজ-পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল। বেঞ্চে তাহার এক পার্শ্বে লিয়ো ও অপর পার্শ্বে সেই কুকুরটি বসিয়া খেলা করিতেছিল।

হঠাৎ হাত তালি দিয়া লিয়ো চীৎকার করিল, "বাবা!"

লিয়েন সচমকে চোখ তুলিতেই দেখিল, রাওয়েলই বটে। বনের বৃক্ষান্তরাল দিয়া তিনি এই দিকেই আসিতেছেন। তাহার মুখ চক্ষে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়াছিল, স্বামীকে নিকটে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি—তুমি এখানে?"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "হাঁ লিয়েন্, কেন তাহাতে কি কোন আশ্চর্য্য আছে?"

"না, তবে এটা গেটের উল্টা দিক্—তাই বলিতেছি।"

রাওয়েল বলিলেন, "গেটের উল্টা বটে কিন্তু রাস্তার ঠিক্ পাশেই। ঘোড়ার বড় রৌদ্র লাগিতেছিল,—বড় গরম, তাই এটুকু হাঁটিয়া আসিলাম।—"

"তুমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এখানে কেন আসিলে? ইহার অপেক্ষা বাড়ীতে -"

মৃদু হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "বাড়ীতেই বা কে আছে? ভাল জুলিয়েন, তুমিই বল— প্রবাস হইতে ফিরিবার সময় মানুষ যদি জানে যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলে তাহার আপনার...তার পুত্রের সহিত দেখা হইবে, বাড়ী ছাড়িয়া সে আগেই সেইখানেই যাইতে চায় না কি?"

লিয়েন একটু হাসিয়া বলিল, "খবর দিলেই লিয়োকে লইয়া যাইতাম।"

"এই বা মন্দ কি? তোমার পত্রে আমি বুঝিয়াছিলাম যে—"

"বেশ করিয়াছিলে! এখন এইখানে একটু বস দেখি, আমি তোমার জন্য চা আনি!"

ঘরে গিয়া সে ফরেষ্টার-পত্নীকে গরম জলের জন্য তাড়া দিয়া, অন্যান্য যাহা সামান্য আহার্য্য ছিল তাহা আনিয়া টেবিলে সাজাইতে লাগিল।—সেই দীনবেশা রমণী যেমন যত্ন ও মনোযোগের সহিত সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, অপরিচিত কেহ দেখিলে ভাবিত কোন দাসীকন্যা বুঝি পথশ্রান্ত প্রভুর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রাওয়েলের আসনের মধ্যে তিনি বসিয়া ছিলেন, এক পাশে লিয়ো ও অপর পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্রকায় কুকুর; ব্যারণ কুকুরটির শান্তিভঙ্গে অনিচ্ছুক হইয়া লিয়োকেই টানিয়া বলিলেন, "আমার কোলে বস লিয়ো, ওখানে তোমার মা বসিবেন।"

জুলিয়েন শুনিল কিন্তু বসিল না। ফরেষ্টার পত্নী দূর হইতে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটা বেতেরমোড়া দিয়া গেল সে তাহাতেই বসিল। তখন মাথার টুপিটা ঘাসের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কুঞ্চিত ভ্রূ, রুষ্ট মুখ ব্যারণ চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইলেন।

ঘরে আসিয়া ফরেষ্টার-পত্নী দেখিল, তাহাদের দাসীটা চাহিয়া চাহিয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছে।—সে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখিতেছ কি?"

দাসী বলিল, "দেখুন মা, উহাঁরা এক আসনে বসিতে পর্য্যন্ত পারেন না।"

ফরেষ্টার-পত্নী বলিল, "শুধু কি তাই ?—লেডি যখন তাঁহার হাতে চা দিতে গেলেন, তখন ব্যারণের চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল।—দ্যাখ দেখি অন্যায়! সত্য কথায় বলিতে কি চলিয়া গেলে পর উনি ইঁহার মূল্য বুঝিবেন, এমন স্ত্রী সংসারে কয় জন পায় ?"

আকাশে অল্প অল্প মেঘ ছিলঙ, রাওয়েল আসার সময়ে সামান্য বাতাস সুরু হইয়াছিল, এখন ক্রমশঃ তাহা জোরে বহিতে লাগিল।—টেবিলের উপরের কাগজগুলি উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। রাওয়েল তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেগুল তুলিয়াই বলিলেন, "বাঃ এই যে সব আনিয়াছ দেখিতেছি।"

"হাঁ, তুমি ত সুন্দর লিখিতে পার রাওয়েল্, তবে যে বলিয়াছিলে তোমার লেখা মোটে অভ্যাস নাই!"

"ভাল? ও বুঝি ভাল লিয়েন ? ও কি চিঠি হইয়াছে ?"

"চিঠির কথা বলি নাই, কিন্তু যাহা লিখিতে চাহিয়াছ,—তাহা সুন্দর হইয়াছে। বর্ণনাগুলি এমন স্পষ্ট এমন সূক্ষ্ম—যেন তাহা চোখের উপর দেখা যায়।"

মৃদু হাসিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "এ কয়দিন বড় একলা ছিলাম, কিছুই ভাল লাগিত না, তাই বসিয়া বসিয়া লিখিতাম।—আর—" বলিবার সঙ্গেই আলরিককে লিখিত জুলিয়েনের সেই পত্র বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, "আর এই চিঠিখানাও আমার সঙ্গী ছিল, কি জান কেন এখানি পড়িতে আমার বড় ভাল লাগে।"

নতদৃষ্টি উন্নত করিয়া লিয়েন একবার স্বামীর মুখে স্থাপিত করিয়া আবার নামাইয়া বলিল, "বাড়ী চল—ঝড় আসিতেছে।"

ব্যারণ ততক্ষণে কাগজগুলি নাড়িতে নাড়িতে একখানা টানিয়া লইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ আবার কি ? লিয়েন এ কি করিয়াছ ?"

কুণ্ঠিতভাবে লিয়েন বলিল, "তোমার বর্ণনায় আমার মনে হইয়াছিল—স্থানটি যেন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাই—"

"বর্ণনা পড়িয়া এমন সুন্দর ছবি আঁকিলে ? আশ্চর্য্য ক্ষমতা ত! এ যে ঠিক তেমনই হইয়াছে।"

মৃদুভাবে জুলিয়েন বলিল, "তুমি যখন দেশ ভ্রমণে যাইবে সুন্দর স্থান দেখিলে তাহার কথা অমনি করিয়া লিখিও,—আমি ছবি লিখিতে বড় ভালবাসি রাওয়েল।"

"হুঁ, তখন তুমি থাকিবে কোথায় শুনি, ক্লডিস ডর্কে না?

হাসিয়া লিয়েন বলিল, "তা থাকিলামই বা, ক্লডিস্ ডর্কে তোমার পত্র যাইতে দোষ কি বল?"

"দোষ?" যে আর আমার কেউ নয়, তাহাকে পত্র দিব কি বলিয়া?"

"বন্ধু বলিয়া! আমরা যে পরস্পরের বন্ধু রাওয়েল্, ইহা স্থায়ী হইলে কোন দোষ নাই।"

"বন্ধু! আমি তোমার ও বন্ধুত্ব চাহি না লিয়েন, তুমি আমার সম্মুখে আর ওকথা মুখে আনিও না—বলিতেছি।"

ব্যারণের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফরেষ্টার-পত্নী ও দাসী বাহিরে আসিল, প্রভুপত্নীর অবস্থা ভাবিয়া তাহাদের মুখ শুষ্ক উদ্বিগ্ন। জুলিয়েন তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, "ফ্রোবেস্, লিয়োকে ঘরে লইয়া যাও, ঝড় বেশী হইল।"

"লিয়োকে লইয়া গেলে ব্যারণ বলিলেন, "চল না আমরাও ঐ ঘরে যাই!

লিয়েন বলিল, "তুমি যাও, আমি একটু এইখানেই বসি।"

বিস্মিতভাবে ব্যারণ বলিলেন, "এই ঝড়ের মধ্যে বসিয়া থাকিবে? কেন?"

স্নিগ্ধ হাসির সহিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া লিয়েন বলিল,—ঝড় আমার বড় ভাল লাগে রাওয়েল্, ঝড় দেখিলেই আমার ক্লডিস ডর্ককে মনে আসে। ঝড়ের সময় আমি সেখানের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কত দিন ম্যাগ্নসও থাকিত। তাহার পর বৃষ্টি নামিলে ছুটিয়া বাড়ী আসিতে প্রথমেই এক চোট আল্রিকের ধমক্,—তাহার পর সেই আবার তোয়ালে আনিয়া আমাদের মাথা মুছিতে বসিত। গা পরিষ্কার করিয়া কাপড় বদলাইয়া তাহার পর খাইবার পালা। বেচারা আল্রিক্ ত সব দিন সুখাদ্য যোগাইতে পারিত না;—তবু তাহার স্নেহের হাতে দেওয়া সেই গরীবের 'খানা' কত যে মিষ্ট লাগিত! আমার মনে হয় সে দিনের আর তুলনা নাই।"

শুনিতে শুনিতে ব্যারণের মুখ গম্ভীর হইতেছিল; লিয়েনের বাক্য-শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আল্‌রিকের মত অভ্যর্থনা করিতে সকলে জানে না। আর তেমন স্নেহ,—সেও তুমি অন্যত্র পাইবে না; তবে দরিদ্রের সংসার ভিন্ন অন্যস্থানে যে প্রকৃত হৃদয় নাই—সুখ নাই, এটি তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। দেখিয়াছি এ বিশ্বাসটি তোমার প্রাণে একেবারে বদ্ধমূল;—কিন্তু আমি বলিতেছি,—সে তোমার ভুল—সে তোমার অন্যায়! এ ধারণা তুমি ছাড়িয়া দাও লিয়েন্।

লিয়েন মুখ হেঁট করিয়া থাকিল। খানিকক্ষণ দুজনেই নীরব থাকিতে—ব্যারণের যেন তাহা অসহ্য বোধ হইল। একটু ভাবিয়া কথার স্রোত ফিরাইয়া তিনি বলিলেন,—

"যাক্, এ কয় দিনের বাড়ীর খবর কি বল।"

হাসিয়া জুলিয়েন বলিল, "সে বেশ ভাল, তোমার কাকার শরীরও মন্দ ছিল না।"

"আর আর সবাই?—কিছু নূতন ঘটনা ছিল কি?"

"না নূতন আর কি থাকিবে! তবে হাঁ ফ্রোলন আজ কয় দিন বড় কাঁদিতেছে, গেব্রিয়েলের যাওয়া বন্ধ ছিল জান ত? তার মায়ের বড় অসুখ,—কাল হইতে কিন্তু আবার তাহার যাইবার কথা উঠিয়াছে। তাই ফ্রোলন—"

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে ব্যারণ বলিলেন, "কি বল লিয়েন! ফ্রোলন আবার কাঁদিবে কি? তার মত রুক্ষ গম্ভীর কাজের লোক কি কাঁদিতে জানে? তুমি দেখিতেছি কোন দিন মরুভূমিতে জল-কল্পনা করিয়া বসিবে!"

"না রাওয়েল, আমি সত্যই বলিতেছি, গেব্রিয়েলকে সে বড় ভালবাসে যে।"

"বটে, তা হইবে। কিন্তু জান ত—এখানে আমাদের কোন হাত নাই। তার অভিভাবকের আদেশ পালন ভিন্ন আমরা অন্য কিছু করিতেছি না এখানে।"

লিয়েন তাহার হাতের রুমালখানি আঙ্গুলে জড়াইয়া আবার তাহা ঘুরাইয়া খুলিতেছিল। তাহার হঠাৎ সাহস করিয়া বলিয়া বসিল;—আচ্ছা তুমি নিজে সে উইল দেখিয়াছ?"

"কী?" অত্যন্ত বিচলিতভাবে রাওয়েল বলিলেন,—কী বলিতেছ লিয়েন? আমার কাকার সম্মুখে সে উইল লেখা ও স্বাক্ষর হয়, আমি আবার নূতন করিয়া দেখিব কি?"

"না, এই গেব্রিয়েলের মঠে যাওয়া সম্বন্ধে বলিতেছি .

"তাহাও কাকা এবং ছোট চ্যাপলিনের সম্মুখে নিজে তিনিই লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা সেই উইলের ক্রোড়পত্র।"

"তাহা তুমি কখনও পড়িয়া দেখিয়াছ কি ?"

ব্যারণ এবার রাগিয়া উঠিলেন, টেবিলের উপর চাপড় দিয়া বলিলেন, "না পড়ি নাই,—পড়িবার মত সন্দেহও করি না কখনো। জান জুলিয়েন, আমার কাকার যাই দোষ থাক্,—তিনি সম্ভ্রান্ত মানুষ; ট্রেচেনবার্গদের মত মাইনোদেরও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তাঁহাকে আমি অবিশ্বাস করি না। আর তুমি,—যাই ভাব,—তাঁর সম্মানে আঘাত দিয়া কথা বলিয়ো না।"

মৃদুস্বরে লিয়েন বলিল, "না তাঁহাকে অসম্মান নয়—শুধু তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। আমায় ক্ষমা কর রাওয়েল, আমার কৌতুহল বড় বিশ্রী !"

ব্যথা-অসহিষ্ণু ব্যারণের মুখ মুহূর্ত্তে হাস্য রঞ্জিত হইল, নিকটে আসিয়া লিয়েনের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, তুচ্ছ কথা ! কিন্তু ঝড় কত বাড়িল দেখ দেখি, বাড়ী যাওয়া যায় কি করিয়া ?"

ব্যস্তভাবে লিয়েন বলিল, "তাইত ! চল, আর না,—আমি লিয়োকে লইয়া আসি।"

"তাহার অপেক্ষা" চল না আমরাও ঐ ঘরখানতেই বসি গিয়া।"

লিয়েন বলিল, "না, ঝড় বড় বেশি--এখন না থামিতেও পারে। বাড়ী যাইতেই হইবে, কারণ লিয়োর জন্য হপমার্শেল বড় চিন্তিত হইবেন।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি লিয়োকে আনিতে কুটীরের মধ্যে চলিয়া গেল।

দুই জনে যথাসম্ভব দ্রুতপদে চলিয়াছিলেন, গাছের ডালে ডালে ঝড়ের লুটাপুটি দেখিয়া লিয়ো তাহার মাতার ক্রোড়ের মধ্যেই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় দেখা গেল—প্রাসাদ হইতে এক জন ভৃত্য ছুটিয়া আসিতেছে। ব্যারণ প্রশ্ন করায় সে বলিল এই ঝড়ের সময় লিয়ো কোথায় গেল ভাবিয়া হপ্‌মার্শেল অত্যন্ত অশোয়াস্তি বোধ করিতেছেন, তাই সে

তাহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। আরও জানাইল যে, ঝড়ের জন্য ডচেস্ ঘোড়া লইয়া শোনওয়ার্থে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

"বটে, ভাল—তুমি ছুটিয়া গিয়া কাকাকে জানাও যে লিয়ো ভাল আছে ও আমার সহিত যাইতেছে।" লোকটা চলিয়া গেল লিয়েনের দিকে চাহিয়া ব্যারণ আবার বলিলেন,—"আমি তখন ফরেষ্টারের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলাম সে কথা শোনা হইল না,—এখন চলনা শোন্‌ওয়ার্থে গিয়া কি অভ্যর্থনা পাও দেখিবে।"

"কেন ? সে কি কথা ?"

"সে কি কথা—তা বুঝি জান না তুমি ?"

ম্লান হাসিয়া লিয়েন একবার স্বামীর প্রতি চাহিল মাত্র। তখন ঝড়ের সহিত অতি মৃদু জলকণার স্পর্শ মিশিয়াছিল, গতিবেগ আরও বৃদ্ধি করিয়া তখনই তাঁহারা প্রাসাদসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপরের বারান্দায় ডচেস দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্যারণেসের সহিত ব্যারণও আছেন কথাটা শুনিয়া তাঁহার জ্ঞান লোপ হইয়াছিল। নিম্নে হইতেই তাঁহার সে উন্মাদভঙ্গী জলন্ত চক্ষু তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ব্যারণের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু বিদ্যুতের ন্যায় চপল হাস্য খেলা করিয়া গেল।

কিন্তু তাঁহারা যখন ঘরে আসিলেন, বারণের অতি পশ্চাতে—ধীর গতি মলিন মূর্ত্তি শিশু-ধাত্রী রূপিণী লিয়েনের দিকে চাহিতেই ডচেসের সে প্রজ্জ্বলিতভাব শীতল হইয়া গেল; তিনি বুঝিলেন স্বামীর সহিত একা থাকিলেও এ নারী ব্যারণেস মাইনো নয়;—এ সংসারে সে যেমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে, আজও ঠিক সেইভাবেই আছে। তাঁহার সে মুখের ঈর্ষাবিকৃত ভাব দূর হইল; সাদরে তিনি ব্যারণকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

ব্যারণও মুখের কৌতুকতীব্র হাসি চাপিয়া তাহার উত্তর দিলেন।

কিন্তু সম্মুখ হইতে মার্শেলের গর্জ্জন উঠিল;—"তোমার একি অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়াছে আজ বল দেখি ? ঘোড়া ছাড়িয়া এই ঝড় জলে বনের দিকে হাঁটিয়া আসিবার মানে কি রাওয়েল্ ?—"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তখন ত ঝড় আসে নি কাকা, "ঘোড়ার বড় রৌদ্র লাগিতেছিল। এচ বাগান দিয়া ঠাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে আসলাম ; কেন তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে ?"

"ক্ষতি ? ক্ষতি নয়ই বা কি !—তোমার সেই দামী ঘোড়াটা কার কাছে দিয়াছিলে ?—সহিস্ উহাকে আট্‌কাইতে পারে ?"

"নিশ্চয় পারে, সেই জন্যেই তাহাকে রাখা। ঘোড়ার জন্য আপনি অনর্থক ভাবিতেছেন।" বলিয়াই ব্যারণ ডচেস্ ও কোর্ট চ্যাপলিনের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে না পারিয়া লিয়েনের উপর শোধ লইবার জন্য বলিলেন, "আর সব চাইতে বলিহারি যাই তোমাকে প্রিয়তমা লেডি, এ দিনেও তোমার উদ্ভিদ্ ব্যবসাটির আয়োজন করাই চাই—না ?—কোথায়ছিলে এতক্ষণ ?"

"ফরেষ্টারের ঘরের নিকট—"

"ওঃ সেই বনে ! সেইখানে তুমি লিয়োকে লইয়া যাও বুঝি ? হাঁ এদিকের ফুলের বাগান ত তোমার পছন্দ হইতে পারে না ; যেমন প্রবৃত্তি রুচিও ত তেমনি হইবে। তা যা ইচ্ছা করিয়ো কিন্তু আমার লিয়োকে লইয়া আর জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরাইও না, শুনিতেছ ? আমি নিষেধ করিতেছি—লিয়োকে লইয়া আর সে দিকে যাইতে পারিবে না তুমি।"

কুকুর কোলে লিয়ো এতক্ষণ মাতামহের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ছুটিয়া লিয়েনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন ? না—আমি সেইখানেই যাইব, মা তুমি দাদার কথা শুনিয়ো না।"

"বটে রে হতভাগা ছেলে ! মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব না তোর—"

কলহাস্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া লিয়ো বলিল, "মার না, এস না ! আমি দৌড়িয়া পলাইব, তুমি ত হাঁটিতে পারিবে না,—তোমার চেয়ার গুড়গুড় করিয়া চলিবে—আমি এক দৌড়ে গেট পার হইয়া সাঁকোর উপর দিয়া চলিয়া যাইব, তখন ?"

সে হাসিতে ব্যারণ ফিরিয়া হিলেন, পুত্রের কথায় হাসিয়া তাহার কানে হাতদিয়া আদরের সুরে বলিলেন, "তখন কিন্তু আমি পিছন হইতে গিয়া এমনি করিয়া তোমার কান ধরিব ! দাদা মহাশয় তোমার, তাঁহার কথায় কি অমন উত্তর দিতে আছে ? ছিঃ—"

পিতার কথায় তার মুখে ঠোঁট ফুলাইয়া লিয়ো বলিল,—" "হুঁ !"

"হুঁ, সত্য বলিতেছি লিয়ো, অমন করিলে আমি তোমায় একটুও ভালবাসিব না।"

ভৃত্যেরা চায়ের আয়োজন করিয়াছিল ; আহার শেষে যখন সকলে স্থির হইয়া বসিলেন, ব্যারণ বলিলেন, "কয়দিন একলা বসিয়া বসিয়া খালি মনে হইত যে ছোট কাকার বিষয় আমি কিছুই জানি না ! কাকা, আপনার সময় মত তাঁর উইলখানা আমায় দিবেন ত— পড়িয়া দেখিব।"

"সময় মত কেন, এখন পড় না, এই ড্রয়ারের মধ্যেই আছে তাহা।" বলিয়া কপ্ মার্শেল নিকটের আল্‌মারি খুলিয়া উইল বাহির করিয়া ব্যারণের হাতে দিলেন। দেরাজের মধ্যে সম্মুখেই সেই গোলাপী খাম ; সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লিয়েন মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে,—কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধ তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। একটা অদ্ভুত হাসিতে সমস্ত মুখখানা বিকট করিয়া তিনি খামখানি তুলিয়া বলিলেন, "গিসবার্টের উইল কাযের হিসাবে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু এ চিঠিখানি আমার পক্ষে তাহার অপেক্ষাও মূল্যবান ; জানেন ডাচেস্—লক্ষ টাকা দিলেও আমি ইহা হস্তান্তর করিতে পারি না।"

"বটে ! কি ও খানা—চিঠির মত বোধ হইতেছে যেন।"

"হাঁ চিঠিই বটে, আমার প্রিয়তমা প্রণয়িনীর পত্র। বলুন আদরের নয় কি ?"

মার্শেলের এই সগর্ব্ব উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ডাচেস্ ও বোরা হাসিয়া উঠিল।—কোর্ট চ্যাপ্‌লিন প্রশ্নময় দৃষ্টিতে লিয়েনের প্রতি চাহিয়াছিলেন। ব্যারণ ডাকিলেন, "লিয়েন, আমার ছোট কাকার লেখা দ্যাখ।"

জুলিয়েন নিঃশব্দে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে আহ্বানে তৃপ্তির অবসর পাইল না। আর কেহ না জানুক, সে তো বুঝিয়াছে যে ব্যারণ কেন তাহাকে এ উইল দেখাইতে- ছেন। লজ্জা ও ঘৃণার সহিত একটা আঘাতও আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া উইলখানি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ব্যারণ বলিলেন, "তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ ছিল দেখিতেছি ; শুনিয়াছি এই ক্রোড়পত্রখানা তাঁহার মৃত্যুর কয় ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে লেখা হয় ; কিন্তু কি পরিষ্কার অক্ষর ! আর কমা

সেমিকোলন—সেগুলাও কি পূর্ব্বের লেখাটার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে? স্বয়ং কাকা আর মাননীয় কোর্ট চ্যাপলিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাই, নতুবা আমি ইহাকে জাল বলিয়াই সন্দেহ করিতাম।"

তখন ডাচেস বলিয়া উঠিলেন, আপনিও তখন ছিলেন না কি—স্যার প্রিষ্ট?"

"হাঁ মাননীয়া লেডি; গিসবার্ট মাইনোর মৃত্যু আমার সম্মুখেই হয়, তখনও আমি ইঁহাদের পারিবারিক ধর্ম্মযাজক ছিলাম।"

"তবে ত অনেক দিন এখানে আছেন আপনি!"

"অনেক দিন। গিস্‌বার্ট আমার প্রিয়বন্ধু ছিলেন, উইল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই সংবাদ দিতেন। এখানি আমার সম্মুখেই লেখা হয়।"

ডাচেস্ ও ফ্রো মোরা উইলগুলি দেখিয়া হস্তাক্ষরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হপ্ মার্শেল, আবার সযত্নে সমস্ত বাঁধিয়া আলমারীতে তুলিলেন, অন্য প্রসঙ্গ চলিতে থাকিল; লিয়েন অধোমুখে স্বামীর অনুযোগটি স্মরণ করিতেছিল, এখানে আসিয়া এই অভ্যর্থনা; হাঁ উচিৎ হইয়াছে বটে।

লিয়ো ততক্ষণ ডাচেসের স্বর্ণহাতলে হীরক-খচিত ব্যাঘ্রমুখযুক্ত চাবুকটি লইয়া খেলা করিতেছিল। এখন বাতাসের উপর দুইবার ঘা দিয়া সে বলিল বাবা, "তোমার ঘরে টেবিলের সামনেই ছবিখানা ছিল, তারও হাতে এমনি চাবুক ছিল না?"

ব্যারণ মৃদু হাসিলেন। লিয়ো আবার বলিল, "সে ছবি এখন কোথায় রাখিয়াছ বাবা? অন্য ছবিগুলা—সেটা, কোনটাই ত নাই!"

বালকের কথায় চমকিয়া ব্যথিতভাবে ডচেস্ বলিলেন, "সত্য না কি—ব্যারণ? পূর্ব্বস্মৃতির চিহ্নগুলিও কি তুমি মুছিয়া ফেলিয়াছ তবে?"

অপ্রস্তুতভাবে ব্যারণ বলিলেন, "বিদেশে যাইবার সময় সে সকল খুলিয়া রাখাই ভাল মনে হইল, আমি না থাকিলে যত্ন হইবার সম্ভব কোথায়?"

"আর ও-খানা? মার আঁকা সেই চমৎকার ছবিখানা ওটা কেন এখনও খোল নাই? হাঁ বাবা—যাইবার সময় আমায় সেখানা দিয়া যাইও, আমি আমার টেবিলের সামনে তোমার মত করিয়া সাজাইয়া রাখিব,—দিবে?"

"লিয়ো"—"কি বাবা, দিবে বল না? আর সেই লক্ষ্মীছাড়া জুতা জোড়াটা ত ফেলিয়া দিয়াছ, ঐযে—যেখানে এখন আমার ছবি আছে,—সেখানে সেই ছোট জুতা জোড়া ছিল না? ওটা গেব্রিয়েলকে দিও—সে পরিবে, তার পায়ে ঠিক হইবে,—না?"

অতি অস্পষ্ট স্বরে ডচেসের মুখ দিয়া বাহির হইল, "এতদূর!" ব্যারণের মুখও লজ্জায় গভীর রক্তবর্ণ। কিন্তু হপ্ মার্শেল খোঁচা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও, সে ছবিটা তবে তুমিই রাখিয়াছ! কিন্তু দামটা ফেলিয়া দিও, জান ত তার মূল্য ধরা ছিল চল্লিশ পাউণ্ড, সে তুমি দিয়াছ—না দাও নাই?"

বিকৃতকণ্ঠে রাওয়েল্ বলিলেন, "সে আমি যাহা হয় করিয়াছি, তাহার জন্য আপনাকে কিছু চিন্তা করিতে হইবে না।"

"না, সেখানা বিক্রয়ের জন্যই আঁকা হয়, তাই তোমায় বলিয়া দিতেছি।"

"সে আমার যাহা ইচ্ছা করিব, আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কাহাকেও বলিতে হয় না।" ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরক্তি বুঝিয়া মার্শেল আর কিছু বলিলেন না কিন্তু ডচেস বলিলেন, "এত ছবি ভক্ত হইলে কবে হইতে রাওয়েল্?"—

কষ্টে হাসি আনিয়া ব্যারণ বলিলেন, "আপনি ত জানেন, আমি ভাল ছবি দেখিলে পছন্দ করি।"

"হুঁ, তা এতটা জানিতাম না। ছবি আঁকিতে শেখা ভাল দেখিতেছি—কি মোরা?"

বক্র হাসির কুটিল বাণ ফুটাইয়া মোরা বলিল "অগত্যাই।"

এ সকল কথা কিন্তু হপ্ মার্শেলকে ভাল লাগিতেছিল না, মধ্য পথে তিনি এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "হাঁ রাওয়েল, একটু পূর্ব্বে কে একজন তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; তুমি নাকি তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছ?"

"ও! হাঁ, সে একজন মাষ্টার, লিয়োর জন্য তাহাকে রাখিতে হইবে।"

"লিয়োর জন্য? লিয়োর পড়া ত চলিতেছে,—নূতন মাষ্টারের প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পয়সাগুলা অনর্থক নষ্ট করা যেন তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে রাওয়েল। আর এ সম্বন্ধে ত আমায় একটি কথাও জিজ্ঞাসা কর নাই তুমি।"

"হাঁ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, উস্কার শাসনেই সে গিয়াছিল, সেখানে সব কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে।"

"তা হোক, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই—বলিয়া দাও। কোর্ট চ্যাপলিনের শিক্ষাই যথেষ্ট।"

এইবার দৃঢ়স্বরে রাওয়েল বলিলেন, "না তাহা হইবে না, শুধু ধর্ম্মের গোড়ামির ভিতর দিয়া আমি আমার সন্তানের শিক্ষা চালাইতে দিব না, আমি তাহাকে মানুষ করিতে চাই—শুধু ভূত প্রেতে বিশ্বাস জন্মাইয়া একটি ভূত খাড়া করিব না!"

কোর্ট চ্যাপ্লিনের মুখ বিবর্ণ, রুষ্টকণ্ঠে মার্শেল বলিলেন,—"তুমি কি বলিতে চাও যে সে ধর্ম্মকেও তুমি বিশ্বাস কর না?"

"ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিব না কেন?—না কাকা সে কথা নয়, আমি তর্ক করিতে বসিব না এখন, কিন্তু ঐ ইণ্ডিয়ান হাউসের ডাইনী পোড়ার দিন হইতে ও-সকল ব্যাপারে আমার ভয় জন্মিয়া গিয়াছে, তাই লিয়োর শিক্ষা-পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছি।"

হপ্‌মার্শেল আর কিছু বলিলেন না, আজ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রত্যেক কথার মধ্যেই অন্য একটা ভাব—দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে,—তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। রাওয়েলের উদ্ধত প্রকৃতিকে তিনি চিনিতেন ও ভয়ও করিতেন। তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে তর্ক করা বৃথা। বৃদ্ধের চক্ষে হিংসার কৃষ্ণশিখা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ডচেস একদৃষ্টিতে ব্যারণের প্রতি চাহিয়াছিলেন; ফ্রো মোরা বলিল, "কিন্তু সেদিন আপনার অন্য মত ছিল ব্যারণ, ভূত প্রেত বিশ্বাস করে যাহারা—সেই ভীরু কোমল প্রকৃতি স্ত্রীলোকদেরই পক্ষপাতী ছিলেন আপনি।"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "নিশ্চয়, এখনও তাই আছি। ভীরু অবলাদের আশ্রয় দেওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য—একথা কে অস্বীকার করিবে?"

মোরা বলিল, "আর যাহারা তাহা করে না, সেই তুষার পর্ব্বতের মত কঠিন ও উচ্চ যাহারা"—

মাথা দিয়া হাসির সহিত ব্যারণ বলিলেন, "তাঁহাদের ভক্তি করি। ঐ যে তুমিই বলিলে মোরা, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উচ্চ,—উচ্চকে মানুষ মাথার উপরেই দেখে । কি ?"

বাহিরে তখনও ঝড় চলিতেছে, জুলিয়েন দূরে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। ঘরের তর্কবিতর্কের স্বর তাহার কাণে আসিতেছিল কিন্তু মনে তাহার ঐ ঝড় ছুটিতেছে—অন্য শব্দ তাহাতে উড়িয়া যাইতেছিল। সহসা অতি নিকটে পোষাকের খস্ খস্ শব্দ ও এসেন্সের সৌরভে সে ডচেসের আগমন অনুমান করিতে করিতেই তাহার স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ হইল।

মৃদু, অতি মৃদু স্বরে ডচেস্ বলিলেন, "কি ভাবিতেছ এখানে ? আশা—বড় আশায় বড় আনন্দে আছ—না ? এই বল বুকে লইয়াই তুমি এখানে প্রবেশ করিয়াছ। কিন্তু সুন্দরি,—জানিও সে আশা তোমার পূর্ণ হইবে না। হইতে পারে না,—কখনো না—কখনো না—কখনো না !"

জুলিয়েন চমকিতভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ডচেস অপসৃতা হইলেন। তাহার নিকট হইতে লঘু পদে ব্যারণের দিকে চলিয়া গেলেন। এ আবার কি ! কেন তিনি এ কথা বলিলেন ? হতবুদ্ধি লিয়েন কিছুই বুঝিতে পারিল না।

রাওয়েলের নিকট গিয়া ডচেস্ বলিলেন, "ব্যারণ মাইনো, তোমার একখানা গাড়ী আমায় দিতে পার ? আমার ঘোড়া ভিজিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছে, তাদেরও যদি তোমার আস্তাবলে একটু স্থান দাও—"

উচ্চ হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "বড় শক্ত কথাই বলিলেন, দেখিতেছি, আমি কি ইহা পারিব ?"

"তবে তোমার কোচম্যান্‌কে বল শীঘ্র গাড়ী প্রস্তুত করুক।"

তখন গম্ভীরভাবে ব্যারণ বলিলেন, "না এই ঝড়ের সময় আমি কোচ্‌ম্যানের উপর ভরসা করিতে পারি না, আমি নিজেই আপনাকে পৌছাইয়া আসিতেছি।—তবে পাঁচ মিনিট

সময়,—এইটুকু অপেক্ষা করুন, আমি সেই মাষ্টারের সহিত দু'একটা কথা বলিয়া ও আমার ওয়াটার প্রুফ টা লইয়া আসি।"

ডচেস আর লিয়েনের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, অল্পক্ষণ পরেই রাওয়েল আসিলে তিনি, বাহির হইয়া গেলেন। জুলিয়েন্‌ও আর তাঁহার দিকে চাহিতে সাহস পায় নাই।—তাঁহারা চলিয়া গেলে হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "কি ঠাণ্ডা বাতাস আফ্রিকার, আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন খসিয়া যাইতেছে।—স্যার প্রিষ্ট, বন্ধু, চলুন আমার ঘরে—একটু দাবা খেলা যাক্।"

ভৃত্য আসিয়া তাঁহার চেয়ার লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "লিয়ো, চল তুমিও আমার কাছে থাকিবে।"

লিয়ো বলিল, "মা যে এখানে আছেন, তিনি একলা থাকিবেন না কি?"

উগ্রস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ হাঁ উনি একলা বেশ্ থাকিবেন, কল্পনা রাজ্যে উঁহার অবাধ অধিকার। তুমি চল;—মার ভাবনায় ছেলের মমতা দেখিতে দেখিতে গেলাম!"

ধীর স্বরে লিয়েন বলিল, "যাও লিয়ো।"

সে কথাতেও রাগিয়া মার্শেল বলিলেন, "চুপ্ কর, তোমার আর লিয়োর উপর হুকুম চালাইতে হইবে না! লিয়ো, আয় বলিতেছি।"

গৃহ নির্জ্জন হইলে লিয়েন জানালা দিয়া দেখিল ডচেসের পার্শ্বে বসিয়া ব্যারণ গাড়ী হাঁকাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।—স্বামীর উপর তাহার কোন অধিকার নাই, তবু দৃশ্যটি দেখিয়া লিয়েনের মন পীড়িত হইয়া উঠিল।—সে ভাবিতেছিল চিরদিনেই এত পরিচয়,—সর্ব্বজন বিদিত এতখানি প্রেমবৈচিত্রের পরও ইহারা পরস্পর বিবাহিত হন্ নাই কেন? প্রথমবারে যাহাই হউক্, এই দ্বিতীয় সুযোগ ও বিপরীত পথে চলিয়া দুর্ভাগিনী জুলিয়েন্‌কে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিল কেন? ডচেস্ ত এখনও রাওয়েলের জন্য উন্মত্ত,—আর ব্যারণও তাঁহার প্রতি বিরূপ নন—এ চিহ্ন কি ধরা যায় না?—এইখানে আসিয়া স্বামীর অস্বাভাবিক স্বভাবের সংশয়মণ্ডিত জটিলতায় লিয়েনের বুদ্ধিবৃত্তি কূল হারাইল।—সম্প্রতি তিনি তাহার সহিত যে ব্যবহার করিতেছেন, চারি দিকের মিশ্র ঘটনার মধ্যে তাহা যেন কিছুতেই খাপ্ খাইতেছিল না।—তাহার যতটুকু জানাছিল, তাহাতে ডচেসের সহিত

তাঁহার বিবাহ না হওয়ার কোন কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না ও তাহার নিজের প্রতি ব্যারণের সুব্যবহারকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা মনে করিয়া,—সমগ্র চিন্তারাশির মধ্যে সে যেন আপনার একটা দীন আশ্রয় লাভ করিল।—তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, অন্তরের তপ্ত বেদনা তাহার নিঃশ্বাসগুলিকে খর ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।—

অনেকক্ষণ বসিয়া, অবশেষে সে যখন উঠিল, তখন বেলা শেষ হইতেছে। ঝড়ের বেগ মধ্যে একটু থামিয়া আবার ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছে। ব্যারণ আর শীঘ্র ফিরিতেছেন না বুঝিয়া সে আপনার ঘরে যাইবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু ফিরিতেই তাহার চক্ষে পড়িল সেই আল্‌মারির গায়ে চাবিটি তখনো লাগানো রহিয়াছে। নানারূপ ঘটনার উত্তেজনায় ও শীতার্ত্ত হইয়া বৃদ্ধ আজি তাঁহার চিরদিনের সাবধানতা ভুলিয়া গিয়াছেন।

দৃশ্যটি দেখিয়া হঠাৎ তাহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। সে ক্রোড়পত্রটা অনেকখানি অস্বাভাবিক নয় কি?—ব্যারণ যাহা উচ্চারণ করিয়াও সন্দেহ করিতে পারিলেন না, অথচ ফ্রোলনের মুখে বারবার সে ঘটনার ভীষণ ভীষণ বর্ণনা শুনিয়াছে,—এখানেও যদি তেমনি কিছু ঘটিয়া থাকে? কোর্ট চ্যাপ্‌লিনত বৃদ্ধের প্রাণের বন্ধু,—তাঁহার কথার কতখানি প্রত্যয় করা যায়? উইল ও সেই কাগজখানি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য লিয়েনের অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। কেন স্বামী ত তাহাকে দেখিতেই দিয়াছিলেন, তবে এখন দেখিলে দোষ কি?

পরে সে স্থির করিল হতভাগা গেব্রিয়েলের জন্য এ দোষটি সে করিতে পারে; ভগবানের সন্তানের জন্য মানুষের সহিত এ অন্যায়টুকু কখনও পাপ হইতে পারে না। তখন সে আল্‌মারি খুলিয়া ড্রয়ার টানিল। সম্মুখেই সেই গোলাপী খাম; লিয়েনের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তাহার স্পর্শ এড়াইয়া সে কেবল উইলের বাণ্ডিলটা লইয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মানসী।

(গান)

—ঃ*ঃ—

(খাম্বাজ)

বচনে মধুক্ষরে চরণে গীত ঝরে
বরণে তম হরে আমার মানসীর—
সারাটি প্রাণমন এ ভরা যৌবন
বিকাতে উচাটন ও পদে প্রেয়সীর।
মদির মধু নিশি
আকুল দশ দিশি
সকলে আছে মিশি
শোভাতে সুনিবিড়;—
আকাশ আঙিনায়
মেঘেরা নিরালায়
কি কথা কহি যায়—চলনা সুগভীর।
অদূর তটভূমে
নদীরা যেন ঘুমে
আবেশ-ভরে চুমে
তাহারি মঞ্জীর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
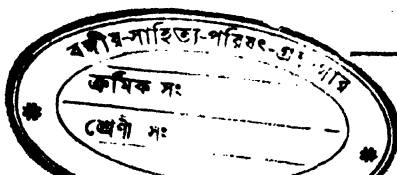
পরলোকগত যদুনাথ চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' নামক পুস্তকে যে সকল স্বনামধন্য প্রবাসী কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণের নাম উল্লেখ হইয়াছে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় তাহার অন্যতম। ইনি চাতরার প্রভূত ধনশালী বহু পরিজনবেষ্টিত জমীদার ৺শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। চাতরার জমীদারেরা যে এক সময় মহা প্রতাপান্বিত এবং পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, পুরাতন শ্রীরামপুর-পত্রিকা পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। এই বিখ্যাত জমীদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় সৌভাগ্যের ক্রোড় হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া দৈন্য ও কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ধর্ম্মবীর,—তিনি দেশের হিতে ও দশের হিতে তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া পার্থিব জমীদারীর সৌভাগ্যকে অন্তর-বলে উপহাস করিয়া গিয়াছেন।

যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পিতা শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ধনে জনে ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু লক্ষ্মী চিরদিন কাহার অঙ্কশায়িনী থাকেন না। চঞ্চলা অধুস্মৃতা জমীদার গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটি দৈব দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন চৌধুরী মহাশয়ের একটি পাঁচ বৎসরের বালিকা কন্যা, খেয়াল-বশে সিংহাসন হইতে গৃহ-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তুলিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই তাহা হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়ে ও দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এই দুর্ঘটনায় পুরজন ভয়াকুল হইল ও চৌধুরী মহাশয় ভবিষ্যত-অমঙ্গলের ভীষণ ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

কলিকাতা হইতে তৎক্ষণাৎ আর একটি তৈয়ারী বিগ্রহ লইয়া আসা হইল কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আর ঘটিল না। যে কন্যাটির হাত হইতে বিগ্রহ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সে তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের বড় অশান্তিতে দিন কাটিতে লাগিল। সবই আছে অথচ যেন কিছুই নাই, এইরূপ একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

তিনি কিছুতেই বাড়ীতে মন বসাইতে পারিলেন না। একমাসের মধ্যেই তীর্থবাসে শান্তির আশায় তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

শিবচন্দ্র সাত কন্যা পাঁচটি পুত্র, ও জামাতাগণকে লইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন ও বড় জামাতা হঠাৎ কলেরা রোগে লোকান্তরিত হইলেন। সকলেই শোকে আচ্ছন্ন।—এই দুর্ব্বহ শোকভার লাঘব হইতে না হইতেই একমাস পরেই আবার মধ্যম জামাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। জমীদার-গৃহিণী এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া একমাস মধ্যেই আট মাসের শিশু পুত্র যদুনাথকে নিয়তির কোলে লালনপালনের ভার দিয়া বিশ্বনাথের চরণে স্থান লাভ করিলেন। ইহার একবৎসর পরে চৌধুরী মহাশয়ের আর দুটি পুত্র সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। বিধির কি বিড়ম্বনা, দেখিতে দেখিতে সকল ধন ঐশ্বর্য্য, প্রবল বাত্যায় তুলার মত কোথায় উড়িয়া গেল এদিকে যাহা সামান্য টাকাকড়ি ছিল তাহাও প্রায় ফুরাইয়া গেল। দুটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাহাদের বিবাহের জন্য যখন সকলে ভাবিত এমন সময় ভগবান অকালে সেই কন্যাদ্বয়কে সংসার হইতে তুলিয়া লইয়া মানীর মান রক্ষা করিলেন। এইরূপে মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিয়া চৌধুরী-পরিবারকে উৎসন্ন করিতে উপক্রম করিল। শিবচন্দ্র এত শোক বাহ্যিক ভাবে সহ্য করিলেও, অন্তর তাঁহার শতধা হইয়া গিয়াছিল, এক কন্যা ও একমাত্র পুত্র অবশিষ্ট থাকিতে শিবচন্দ্র মৃত্যুর হস্তে সকল জ্বালা জুড়াইলেন। মাতৃপিতৃহীন যদুনাথ ভগিনীর স্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের জামাতার নাম চন্দ্রকান্ত। তিনি পত্নীকে ভ্রাতার ভার লইল দেখিয়া তাঁহার সংসার কিরূপে চলিবে ইত্যাদি বাক্যে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে বিবাদের সূত্রপাত হইল; তাহার ফলে চন্দ্রবাবু পুনঃরায় দারপরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

এই সময় যদুনাথ বাবুর বয়স মাত্র তের বৎসর। তাঁহার ভগিনী স্বহস্তে নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লোকের দ্বারা তাহা বিক্রয়ে কায়ক্লেশে ভ্রাতাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কাশীতে চন্দ্রবাবুর বাসায় যাহা কিছু তৈজসপত্রাদি ছিল তাঁহার স্ত্রী সে সব আনিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কতদিন পরে চন্দ্রবাবু কাশীতে প্রত্যাগমন-

করিলেন। বাসায় কোন দ্রব্যাদি না দেখিয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে তাঁহার স্ত্রীই সব তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। তখন তিনি লোকদ্বারা আপন জিনিস চাহিয়া পাঠান। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য প্রত্যার্পণ করিতে একেবারে অস্বীকার করেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া চন্দ্রনাথ বাবু রাজদ্বারের শরণাপন্ন হইলেন।

চন্দ্রবাবু নালিশ করিয়াছেন শুনিয়া যদুনাথ বাবুর হিতাকাঙ্ক্ষীরা সকলে অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখনকার দিনে মামলামকর্দ্দমাকে ভদ্র গৃহস্থ বড়ই ভয় করিত। ক্রমে মকর্দ্দমার দিন স্থির হইয়া শমনজারি হইল। পাছে জমীদার-কন্যাকে প্রকাশ্য আদালতে হাজির হইতে হয় এই ভয়ে সকলে বালক যদুনাথকে এই জিনিষগুলি সব তাহার বলিয়া এজাহার দিতে শিখাতে লাগিলেন। তাঁহারাও সেইভাবে সাক্ষ্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বালক যদুনাথ সকলের পরামর্শ নীরবে শুনিয়া লইলেন কোনও রূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি করিলেন না। তাঁহার এক মেশো কাশীবাস করিতেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক প্রত্যহ নিয়মিত স্নান দান পূজাদি সমাপন করিয়া আহার করিতেন। মকর্দ্দমার দিন হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে চাহিলে যদুবাবু হাত যোড় করিয়া সকলকে নিরস্ত করিলেন, কহিলেন "অদ্য কেবল আমি ও মেশো মহাশয় যাই ত তার পর থেকে আপনাদের সকলকেই কষ্ট করিতে হইবে,...কাছারীর কাজ ত আর একদিনে শেষ হয় না।"

চৌদ্দ বৎসরের বালক কোর্ট কাছারির কিছুই জানেন না, সেখানে গিয়া জনতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অপরাধীদের দেখিয়া তিনি কোন একভাবে অভিভূত হইলেন, তাঁহার ডাক হইলে তিনি স্থিরভাবে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিচারক একজন বৃদ্ধ ধার্ম্মিক মুসলমান; তিনি বালকের নামধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসার পর প্রশ্ন করিলেন "ইনিই কি তোমার ভগ্নীপতি?" যদুনাথ উত্তরে হাঁ বলিলেন। তখন বিচারপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ভগিনীপতি, তোমার ও তোমার ভগিনীর নামে তাঁহার সমস্ত তৈজসপত্রাদি হরণ করার জন্য অভিযোগ করিয়াছেন তোমার এ সম্বন্ধে বক্তব্য কি তাহা বল।" নির্ভীকহৃদয় যদুনাথ স্পষ্টভাবে বলিলেন "হুজুর আমার ভগিনীপতি যাহা অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সকলি সত্য।" বোধহয় সেই মুহূর্ত্তে বজ্র পতন হইলেও বিচারপতি ইহা হইতে অধিক চমকিত হইতেন না। তিনি

নিজের শুনিতে ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রশ্ন পুনরুক্তি করিলেন কিন্তু এবারেও সেই একই উত্তর পাইলেন। তখন তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বালক তুমি কি বলিতেছ? ইহা ছেলেদের খেলিবার স্থান নহে ভবিষ্যত ভাবিয়া উত্তর কর।" বালক তখন করযোড়ে বলিল "হুজুর সত্য বলিব, ইহাতে ভবিষ্যতে যাহাই হউক। পার্থিব শাস্তি বা কষ্টের জন্য ধর্ম্মহানি করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে প্রাণ চায় না তাই যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ করিলাম—আমার পিতা মাতানাই, ভগিনী স্নেহবশে বোধহয় সব দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়াছেন, অবশ্য আমি ইহার কিছুই জানি না। স্বামীর জিনিস গ্রহণ করায় যদি স্ত্রী চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে যে-কোন শাস্তি আপনি বিধান করিবেন, ভগিনীর হইয়া আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।" বৃদ্ধ বিচারপতি চোখ ভরা জল লইয়া বালককে স্নেহ স্বরে বলিলেন, "বালক আজ তোমার মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে গিয়া যেমন আনন্দ পাইলাম এরূপ আমার জীবনে কখনও পাই নাই। ধর্ম্মই লোকের সহায়; তুমি শিশু হইয়া ঐ কথার মর্ম্ম প্রণিধান করিয়াছ। আমি প্রার্থনা করি খোদা তোমার মন আরও উন্নত করুন। আমার সময় হইয়াছে আমি চলিয়া যাইব তোমার এই ন্যায়ের, এই ধর্ম্মের উন্নতি বন্ধুভাবে শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার অবসর পাইব না।" এই কথায় বালক ত কাঁদিলই বিচারকও চক্ষু মুছিলেন আর কাছারীর সকল লোক স্তব্ধ হইয়া এই অপূর্ব্ব বিচার দেখিল। তাহার পর বিচারপতি চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবু বোধহয় আর তোমার কিছু বলিবার নাই, তুমি আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লইবে, এই দৃঢ়চেতা বালককে আর কষ্ট দিবে না।"

চন্দ্রবাবু আশাই করেন নাই যে বিচার এইভাবে শেষ হইবে। তিনিও শ্যালকের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি আপোষ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাহিরে তাঁহার বৃদ্ধ মেশো বসিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিতেছিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বাবা সত্য যে কত বড় তাহা আজকার ঘটনাতে বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ।"

পনেরো বৎসর বয়সে যদুনাথবাবু কাশীতে একটি চাকরী পাইলেন। জাহাজ যাইবার সময় পুল খোলা তাঁহার কার্য্য ছিল। একদিন জাহাজ যাইবার ঠিক সময় হইয়াছে এমন

সময় কোন একটি উচ্চপদশালী ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী যদুনাথবাবুকে অপেক্ষা করিতে বলেন কিন্তু যদুনাথবাবুর তখন পুল খোলা কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এজন্য তিনি জাহাজ না যাওয়া পর্য্যন্ত সাহেবকে এক ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখেন। পরে যখন জাহাজ চলিয়া গেল, পুল জোড়া হইল, তখন ঐ সাহেবের গাড়ী যদুনাথের নিকটবর্ত্তী হইল। সাহেব ক্রোধে যদুবাবুকে অযথা গালি দিতে লাগিল। যদুবাবু অগত্যা ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া গাড়ী আটকা-ইলেন এবং বলিলেন, "সাহেব গাড়ীতে বসিয়া কাপুরুষের মত গাল দিও না। আমরা কালা হইলেও লাল রক্ত ধারণ করিয়া থাকি, একদিন ত মরিতে হইবে, এমন শিক্ষা দিয়া দেব যাহাতে আর কখনও অভদ্র ব্যবহার করিবে না।" সাহেব বালকের গায়ে জোর আছে দেখিয়াই হউক বা অন্য কিছু ভাবিয়াই হউক চলিয়া গেল। যদুবাবু কিন্তু নিরস্ত হইলেন না কোর্টে গিয়া মানহানির নালিশ করিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও একজন ভাল উকিল দিতে বলিলে তিনি বলিলেন আমি নিজেই ওকালতী করিব।

তাহার পর কোর্টে গিয়া যখন জজ বলিলেন "বাবু তুমি সাহেবের অপমান করিয়াছিলে তাই তিনি তোমায় গাল দিয়াছেন।" যদুবাবু বলিলেন "হুজুর আমি পোল খুলিবার কাজ করি, এই কাগজখানিতে কি কি নিয়ম আছে, কোর্টের আগে তাহা দেখিতে আজ্ঞা হউক, আর সেখানে কতলোক ছিল তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হউক যে যখন ঐ সাহেবটি গাড়ী লইয়া যাইতে চাহিয়া ছিলেন তখন পোলখোলার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল কি না। জাহাজ চলিয়া গেলে ঐ সাহেবটি আমাকে অযথা গালি দেন।" জজ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার উকিল আছে?' যদুবাবু বলিলেন 'ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মাসনে বসিয়া পক্ষপাত শূন্য হইয়া এ সময় বিচার করিবেন তাহার জন্য উকিলের আবশ্যক কি? আপনার ধর্ম্মবিচারে যদি আমি দোষী হই অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিব।' স্তব্ধ হইয়া জজ এই যুক্তি শুনিলেন তাহার পর বিচার করিয়া রায় দিলেন। যদুবাবুর জিত হইল, ক্ষতি পূরণের টাকা ঐ সাহেবকে দিতে হইবে। যদুবাবু বলিলেন 'ন্যায্য বিচার লাভ করিয়া আমার মনে যে আনন্দ হইয়াছে তাহা লক্ষ টাকা পাইলেও তাহা হইত না।' তাহার পর যদুবাবু ধন্যবাদ দিয়া কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া সকলের উদ্বিগ্ন দূর করিলেন।

সতের বৎসর বয়সে ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। এই লক্ষ্মী রূপিণী বালিকার নাম তারাসুন্দরী। প্রকৃতই এই বালিকা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। ইহার পর যদুবাবু জাহাজের কাজ ছাড়িয়া গাজিপুরে ওভারসিয়ারী কাজ শিখেন এবং কার্য্যোপলক্ষে নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি ওভারসিয়ারী কর্ম্ম লইয়া যখন মুরারে আসেন তখন তাঁহার দুই পুত্র। তিনি তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র লইয়াই মুরারে অবস্থান করেন। কালে যদু বাবুর নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে, কেননা তিনি ধর্ম্মভীরু. উপরি উপার্জ্জনের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। একদিন তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা সাহস করিয়া তাঁহাকে বলে এই কাজে যথেষ্ট পয়সা আছে, আপনিও লইতে পারেন ও কিছু কিছু আমাদেরও সুবিধা হয়। যদুবাবু একথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা তাহারা যদুবাবুর ভগিনীর নিকট আসিয়া বলে 'আপনি আপনার ভাইকে বুঝান এখন দু'পয়সা করিতে পারিলে ভাল হয়। আর এই ত উপার্জ্জনের সময়।' অবোধ ভগিনী ভাইকে আহারের সময় তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। যদুবাবু বলিলেন 'আমি মাতৃপিতৃ হীন অভাগা, তোমারই যত্নে পালিত তোমার এই ভাগ্যহীন ভ্রাতা আজ গরীব হইলেও ধর্ম্মবলে সে সেই জমীদার পুত্রই আছে। তুমি যেরূপে আমায় পালন করিয়াছ তাহাতে তোমার কাছে আমার জীবন বিক্রীত, তোমার কথার অবাধ্য হইতে আমি পারিব না। তবে এতকষ্ট করিয়া পালন করিয়া যদি আমায় জেলে পাঠাইতে ইচ্ছা থাকে তবে আমি নিশ্চয় তোমার কথা শুনিব।' ভগিনী কাঁদিয়া বলিলেন 'ভাই অত বুঝি নাই তুমি আমার বাপের বংশের দুলাল আমি শাক অন্ন খাইয়া থাকিব তুই আমার ধর্ম্মপথে থাক।'

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে আফিসের বড় সাহেব বদলী হইয়া গেলেন। নূতন সাহেব আসিলে শত্রুরা সুযোগ পাইল। সকলে সাহেবকে বুঝাইল যে এই যদুবাবু সরকারের বিস্তর টাকা খাইয়াছেন। সাহেব সন্দিহান হইয়া যদুবাবুর কাছে সমস্ত হিসাব চাহিলেন। যদুবাবু একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন কেননা তিনি পুরাতন সাহেবকে হিসাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন পুনরায় বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকার হিসাব দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না। যাহা হউক, তিনি সাহেবের নিকট কিছুদিন সময় চাহিয়া হিসাব নিকাশ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে শত্রুরা সুযোগ বুঝিয়া যদুবাবুর নামে, তিনটি নালিশ রুজু করিয়া দিল। এই সংবাদে সকলেই প্রমাদ গণিলেন। যদুবাবু তাঁহার একটি বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি এখন হিসাব লইয়া ব্যস্ত মকর্দ্দমার তদবির করিতে হইবে উপরন্তু আবার বৈজ ছেলেরও বড় অসুখ কি করি।" সেই বন্ধুটি বলিল "তুমি মন দিয়া হিসাব নিকাশ কর আমি মামলার জন্য যাহা করিতে হয় করিব ছেলের ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

ভগবানের কৃপায় মকর্দ্দমায় যদুবাবুর জয় হইল। এদিকে পুরাণ হিসাবপত্র দেখিয়া সাহেবও যদুবাবুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন "বাবু তোমার শত্রুপক্ষেরা দেখিতেছি প্রবল, তুমি সাবধানে থাকিবে।" যদুবাবু বলিলেন, "সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিব ইহাতে যদি দণ্ড পাইতে হয় তবুও আমার শান্তি থাকিবে যে আমি নির্দ্দোষ।"

অতঃপর শত্রুপক্ষেরা ক্রোধের বশে যদুবাবুর প্রাণহানি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। একদা তাঁহার জ্বর হইলে, তিনি ডাক্তার ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, ২।১ দিন পরে ডাক্তার ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কি আজকার ঔষধ বড় তিক্ত তবু ভাল তোমার রোগীর প্রতি দয়া আছে।" ডাক্তার কাতর-স্বরে উত্তর করিল "বাবু তুমি যদি শপথ কর তবে আমি একটি কথা বলি," যদুবাবু ডাক্তারকে অভয় দিলেন। তখন ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কাহারও প্ররোচনায় অর্থের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার জন্য প্রাণনাশক তীব্র বিষ হাতে করিয়া বসিয়াছিলাম। জানিনা কেন আমার বিবেক আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। তুমি দশজনের উপকার কর, তাই ভগবান তোমায় বাঁচাইলেন, আর আমিও এই মহাপাপ হইতে ত্রাণ পাইলাম।" যদুবাবু তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং ডাক্তারকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন, "আমার প্রাণ অপেক্ষা তুমি যে পাপ হইতে বাঁচিয়া গেলে ইহাতেই অধিক আনন্দ লাভ করিলাম।"

কোন এক সময় গোয়ালিয়ার বৃহৎ দুর্গের প্রাকারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, যদুবাবু উহার সংস্কারকার্য্যের ভার পান। একদিন তিনি ভগ্ন প্রাকারের উপর

শুইয়া জরিপ করিতেছিলেন, উহার খাই বাধহয় দু তিনশত গজ গভীর। হঠাৎ যদুবাবুর দৃষ্টি কতকগুলি উগ্র লোকের পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া বলিলেন "ভাই সব, তোমরা আমার মৃত্যু একান্ত কামনা কর। এখানে কেহই নাই তোমরা আমায় অনায়াসে নীচে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পার। একদিন অবশ্য মরিতেই হইবে, তোমাদের ইহাতে যদি সুখ হয় কর। কিন্তু ভাই সব, আমার হৃদয়ে এই অনুতাপ হয় যে তোমরা কি ভীষণ পাপে পড়িয়া নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিতে যাইতেছ। ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা কি করিবেন? যে অর্থের জন্য তোমরা এ অনন্ত পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছ সেই অর্থে যাহাদের ভরণপোষণ করিবে, হায় সেই ধনজন কি তোমাদের এই ভীষণ নরক হইতে উদ্ধার করিবে?" এই বলিয়া তিনি আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের চিরদিনই পরাজয়! সেইদিন হতে তাঁহার শত্রুদের শুভবুদ্ধি হইল ও তাহারা তাঁহার পরমহিতকারী বন্ধুতে পরিণত হইল।

একবার সরকারি টাকা লইয়া যদুবাবু ও তাঁহার সাহেব আসিতেছিলেন পথিমধ্যে কতকগুলি দস্যু আসিয়া তাঁহাদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। কোনরূপে তাঁহারা সে বারে বাঁচিয়া গেলেন। দস্যুদের যে প্রধান তাহাকে যদুবাবু চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়াই তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিলেন "আজ তোমার কেন এমন দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল? আমি যেমন তোমায় চিনিয়াছি তেমনি আরও কেহ চিনিতে পারে। ধরিতে পারিলে শক্তসাজা পাইবে তাহা বোধ হয় জান?" তখন সে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল "তাহা হইলে কি হইবে? আমায় ক্ষমা করুন, বাঁচান।" যদুবাবু বলিলেন "যদি তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ কর যে এরূপ অন্যায় কার্য্য আর কখনও করিবে না তাহা হইলে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে পারি। সে যথাবিহিত প্রতিজ্ঞা করিল; তখন যদুবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া ৫।৭ দিনের মত সে স্থান ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন।"

ইং ১৮৭২ সনে দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। জীবের কষ্ট দেখিয়া মহাপ্রাণ চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত কাতর হন। তিনি, স্ত্রী ও ভগিনীর গহনা ও বাড়ীর তৈজসপত্রাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রায় তিন হাজার দেড় শতটাকা সংগ্রহ করেন এবং তদ্দ্বারা ছোলা ক্রয় করিয়া

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কুটীর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে সাধ্যমতে প্রয়াস পান। কিন্তু তখন, শতসহস্র লোক অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। সেই সামান্য টাকায় আর কয়দিন চলে। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া জেনারেল গেভেন সাহেবের নিকট গমন করেন। গেভেন সাহেব ইহার কথায় প্রথমে তত মনোযোগ করেন না কিন্তু চৌধুরী মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন তিনি সাহেবকে অনেক পিড়াপিড়ী করিয়া দুর্ভিক্ষের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখাইতে লইয়া গেলেন। একজন তখনি বমন করিয়া গিয়াছে আর অপর দুই জন পেটের জ্বালায় উহাই ভক্ষণ করিতেছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য চৌধুরী মহাশয় আর দেখিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সাহেবের হাত ধরিয়া বলিলেন "হায় ভগবান আপনাদের রাজপুরুষ করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে শত প্রকারে এই হতভাগ্য জীবদের সাহায্য করিতে পারেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করিবেন।" সাহেব এদৃশ্য ও চৌধুরী মহাশয়ের চোখের জল দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন "বাবু আমার দ্বারায় যতদূর সম্ভব, আজ হইতে করিব কিন্তু ইহাতে বিস্তর সময়ের আবশ্যক ও পরিশ্রম অবিশ্রান্ত করিতে হইবে।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "আমার ছুটি পাওনা আছে ছুটি লইব।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কি তুমি ছুটী পাইবে? চৌধুরী মহাশয় উত্তর করিলেন যদি ছুটী না পাই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব।" সাহেব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "বাবু, তোমার যাহা কিছু ছিল আগেই উহাদের দিয়াছ এখন কর্ম্ম ছাড়িবে বলিতেছ তাহলে তোমার চলিবে কিরূপে?" যদুবাবু উত্তর করিলেন "সাহেব যাহা ভগবানের ইচ্ছা হয় হইবে।" সেইদিন মহারাজ জিবাজী সিন্ধিয়ার নিকট চৌধুরী মহাশয় গমন করেন এবং অতিকষ্টে দরবারে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পান, দেশের অবস্থার সমস্ত কথা বলিয়া চাঁদা সাহায্য চাহিলে প্রথমে মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত ত করিলেন না উপরন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেদের নিজের রাজত্ব হইতে বাহির করিয়া দিবেন এই উত্তর দিলেন। তখন উক্ত সাহেব মহারাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে এরূপ ব্যবহার করিলে তিনি গভারমেণ্টকে জানাইতে বাধ্য হইবেন যে মহারাজ প্রজার দারুণকষ্টে সাহায্য করিতেছেন না। শক্ত মাটিতে বিড়াল সহজে আঁচড়ায় না, অতঃপর মহারাজ চাঁদার খাতায় সহি করিলেন। খাতায় অপরাপর অনেকেরই সহি লইয়া রীতিমত চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। অনেকটা মাঠ ঘিরিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের

জন্য বাসা প্রস্তুত করা হইল। ১৫।১৬ জন রাঁধুনী নিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ ১০।১৫ মন আটা চাল ডাল প্রভৃতি রন্ধন করা হইতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া রন্ধন কার্য্য চলিত এবং প্রাতঃকালেই উহাদের আহার আরম্ভ হইত; পেটভরিয়া আহার করিতে দেওয়ায় আর এক বিপদ হইল। কলেরায় অনেকে আক্রান্ত হইতে লাগিল। তখন তাহাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এবং উহাদের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ১৫।২০ জন ধোপা নিযুক্ত হইল। ভিস্তি স্নান করাইয়া যাইত। এইরূপে দুই মাসের মধ্যে বেশ সুবৃষ্টি হইল এবং ইহারাও বেশ সবল হইয়া কর্ম্মক্ষম হইল।—

ছয়মাস পরে সেই দুর্ভিক্ষের কার্য্য যে দিন ভঙ্গ করা হইল সেদিন অসংখ্য লোক চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া রোদন করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

দুর্ভিক্ষের টাকা যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, চৌধুরী মহাশয় তাহা হইতে তাহাদিগকে একটি করিয়া ঘটি দুখানি কম্বল পরণের একখানি করিয়া কাপড় ও ৪টি করিয়া টাকা দিয়া অশ্রুজলে সাহানুভূতি দেখাইয়া উহাদের বিদায় করিলেন, বলাবাহুল্য এই উপলক্ষ্যে অনেকে তাঁহাকে অনেক কথা বলিয়াছিল এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে চোর বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

১৮৮২ শালে চৌধুরী মহাশয় একসময় সৈন্যাবাস প্রস্তুত করিবার কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। একদিন তিনি দাঁড়াইয়া এই কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় সৈনিক ইংরাজ কর্ম্মচারী অশ্বারহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাপর সকলেই ইহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল, কেবল চৌধুরী মহাশয় নিজের কাজেই ব্যস্ত রহিলেন; এদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, নিজকার্য্যে তখনও তিনি ব্যস্ত। সাহেব ইহা লক্ষ্য করিয়া রূঢ়ভাবে চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন "তুমি বড় অসভ্য।" চৌধুরী মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সাহেব বাহাদুর আরও চটিয়া গিয়াগালি দিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় মস্তক উত্তোলন করিলেন, সাহেবের ভাব দেখিয়া বলিলেন "কেন, কি হইয়াছে যে তুমি ক্রোধে এত অধীর হইয়াছ! শুভ চাও ত কাজের বাধা হইও না—নিজ কার্য্যে চলিয়া যাও।"

সাহেব আরও আগুন !

তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন "অসভ্য তুমি ভদ্রলোককে অযথা গালি দাও কেন।" সাহেব বলিলেন "যে আমাকে সম্মান প্রদর্শন না করে তাহাকে আমি শিক্ষার সহিত সম্মান করিতে শিখাইয়া থাকি।" চৌধুরী মহাশয় উত্তর করিলেন, "সেই ভাল কে কাহাকে সম্মান করে দেখ। তুমি আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নহ, স্বভাবে অভদ্রকেও হার মানাইয়াছ। ইংরাজ নামের কলঙ্ক তুমি অথচ মনের গরমে ইংরাজ কুলেই জান্মিয়াই সম্মানের অধিকারী হইয়াছ, সে সম্মান যদুনাথের নিকট নাই !" সাহেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল "কালা আদমির এতদূর স্পর্দ্ধা। ঘুঁসি মারিয়া মুখ ভাঙ্গিয়া দিব না।" নির্ভিক হৃদয় চৌধুরী মহাশয় রাগত স্বরে বলিলেন "ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া কাপুরুষের ন্যায় বৃথা বাক্য ব্যয় করিও না। কাপুরুষ না হও যদি ঘোড়া ছাড়িয়া নীচে নাব।" সাহেব ক্রোধে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং জামার আস্তিন গুটাইয়া গালি দিতে দিতে প্রায় দশ গজ দূর হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া চৌধুরী মহাশয়কে ঘুঁসি প্রহার করিল। সাহেব একজন মিলিটারী সার্জ্জেন, লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ, চৌধুরী মহাশয় মাথায় বড় জোর তাঁহার কাঁধ পর্য্যন্ত। প্রায় দুই তিন হাজার লোক তথায় কার্য্য করিতেছিল। সকলে স্তব্ধ হইয়া কালায় গোড়ায় বিবাদ দেখিতে লাগিল ! তিনি নিজের পায়ের নাল দেওয়া জুতা কোনমতে খুলিয়া হাতে লইলেন। সাহেবের ঘুঁসি ও চৌধুরী মহাশয়ের জুতা সমান ভাবে চলিতে লাগিল, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়ে রক্তাক্ত কলেবরে নিরস্ত হইলেন। সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলে, চৌধুরী মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গলাতে গেলেন এবং তাহাকে সমস্ত অবস্থা দেখাইয়া নালিশ রুজু করিলেন, মোকদ্দমায় তাঁহার জিত হইল। তিনি পুনরায় দশ হাজার টাকার মানহানির দাবী দিয়া নালিশ করিলেন এবারও কোর্টে তাঁহার জিত হইল। জজ সাহেব বলিলেন "বাবু গোরা টাকা কোথায় পাইবে যে তোমায় দিবে তবে সে এই প্রকাশ্য আদালতে তোমায় টুপি খুলিয়া সেলাম করিবে।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "যথেষ্ট উহাই, সাহেব স্মরণ রাখিবে আর কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। কালাও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব।"

ইহার পর চৌধুরী মহাশয়ের ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি দক্ষিণ দেশে বদলি হন। তিনি মুরারে ষোল বৎসর ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল সর্ব্বদাই লোকহিতকর কার্য্যেই কাটাইয়াছেন, দক্ষিণে নানা স্থান ঘুরিয়া অতঃপর চৌধুরী মহাশয় লাহোরে আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ তখন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়েন। তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ এখানে অবস্থান করিয়া নানা সৎকার্য্য করেন, এবং পরে সংসারে টাকার অনাটন হওয়ায় পুণরায় কোয়েটার কর্ম্ম লইয়া চাকরী করিতে যান। সেখানে কিছুদিন চাকরী করিবার পর সাহেবের সহিত তাঁহার মনান্তর হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাড়ী আসেন।

লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া চৌধুরী মহাশয় জেনারেল অনিবর সাহেবের একখানি পত্র লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। নীলাম্বর বাবু বিরক্ত ভাবে বলিয়া পাঠান চাকরী ত সকলেই চায়, চাকরী কি পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! তাহাতে চৌধুরী মহাশয় নীলাম্বর বাবুকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, "ভগবান যাহাকে দিবার উপযুক্ত করেন সেই দিতে পারে; কিন্তু অধম মানুষ পদ গৌরবে ও অর্থে অন্ধ হইয়া আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া আপনাকে কর্ত্তা ভাবে।" নীলাম্বর বাবু এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ও সাহেবের পত্রে ইনি উপযুক্ত লোক জানিতে পারিয়া চৌধুরী মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু ইনি আর যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। নীলাম্বর বাবু তিন শত টাকা বেতনের চাকরী দিতে চাহিলেন, চৌধুরী মহাশয় অম্লান বদনে তাহা প্রত্যাখান করিয়া পত্রে জানাইলেন যে তিনি অর্থের দাস নহেন; অর্থকে দাস করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের জন্যই তাঁহার অর্থের আবশ্যক, যেখানে সে আশা নাই,—সেখানে কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তিও নাই। কেবল সাহেবের অনুরোধে ও স্বদেশী রাজার রাজত্বে কর্ম্ম করিয়া সাধ্যমত উন্নতি করিবার আশায় তিনি আসিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কথায় দেওয়ান বাহাদুরের তিলমাত্র কর্ত্তব্যের উদ্রেক হইয়া থাকে তবে দাতা হইয়া দানের পাত্র একজনকেও যদি দান করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ধন্য বিবেচনা করিবেন। ইহার অধিক আর কোন প্রার্থনা নাই, এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কাশ্মীর ত্যাগ করেন। ইহার পরই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ লাহোর মেডিকেল কলেজ

হইতে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়া ডাক্তারী পদ লইয়া ঝাঁসিতে আসেন। পুত্রের সহিত চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে ঝাঁসিতে আসেন এবং রাণী হাবিলী নামক একখানি বৃহৎ বাড়ী ও পানি নামক একখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া সেইখানে বাস করেন।

চৌধুরী মহাশয় যেমন ন্যায়বান তেমনি পরের দুঃখে কাতর ছিলেন। ঝাঁসির সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি সকলকে সন্তানের তুল্য স্নেহ করিতেন। এক সময় বেহারী বাবু নামক জনৈক মাতাল কোন সমাজ বিগর্হিত কার্য্য করা অপরাধে সমাজচ্যুত হয়েন; বিহারী বাবু চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তখন তিনি সমাজের সকলকে ডাকিয়া বলেন যে বিহারী যখন অন্যায় কাজ করিয়াছে, তখন তাহার জ্ঞান ছিল না। এখন সে সমাজের নিয়মানুসারে দণ্ড গ্রহণে সম্মত আছে অতএব তোমরা আদেশ কর। তাহাতে ঝাঁসির সকলে বলেন যে আমরা উহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিব না ও সমাজচ্যুতই থাকিবে। একথায় চৌধুরী মহাশয় বিরক্ত হন ও বলেন যে "বেহারীর অপরাধ সে অখাদ্য আহার করিয়াছে, কিন্তু তখন উহার জ্ঞান ছিল না, এখন সে দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত। তবুও তোমরা তাহাকে সমাজ ভুক্ত করিবে না, আর এখানে যাহারা যাহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে এই যুগে কখন কোন অখাদ্য খান নাই বা তদ্রূপ কোন পাপের সংশ্রবে আসেন নাই। যদি সমাজ তাহাদের ত্যাগ করে বেহারীও দণ্ড লইতে বাধ্য।" চৌধুরী মহাশয়ের কথায় কেহই কর্ণপাত করিলে না। তখন তিনি রাগিয়া বলেন যে "তোমারা যদি গরীবের উপর অযথা অত্যাচার কর তাহা হইলে আমি তোমাদের কোন সংশ্রবে থাকিব না এই বলিয়া তিনি চলিয়া আসেন। বহুকাল যাবৎ তিনি কাহারও সংশ্রবে থাকেন নাই, এমন কি তাঁহার পরিবারবর্গের কাহাকেও কোথাও যাইতে পর্য্যন্ত দিতেন না। পরে অনেক সাধ্য সাধনার পর সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।

ঝাঁসিতে স্কুল ছিল না বলিলেই হয় চৌধুরী মহাশয় ছোটলাটকে ধরিয়া স্কুলের জন্য গভরমেণ্ট হইতে ১০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়া দেন এবং বাকি টাকা তিনি জমিদারবর্গের নিকট বহু চেষ্টায় বহু কষ্টে সংগ্রহ করেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োজিত করিয়া কাজ করিতে

গেলে অনেক টাকার লোকসান হয় কাজেই চৌধুরী মহাশয় বৃদ্ধ হইলেও অমিত বলে স্বয়ং স্কুল নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন।

স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় লাটসাহেবকে বিশেষ সমারোহে স্কুল ভবনে আনা হয়, তিনি স্কুল দেখিয়া যারপর নাই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিশেষে ঝাঁসিবাসীর আর কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। স্থানীয় উকীলদের দেশের অবস্থার বিষয় জানাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই নীরব। তখন তিনি চৌধুরী মহাশয় অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমার কিছু বলিবার আছে। আপনি দয়া পরবশ হইয়া স্কুলটি নির্ম্মাণ কল্পে সাহায্য করিয়া ও সাহানুভূতি দেখাইয়া ঝাঁসিবাসীর অশেষ উপকার করিয়াছেন, আপনার নিকট সে জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। আর একটু দয়া আপনাকে করিতে হইবে। এখানে স্ত্রীলোকদের জন্য কোনও হাঁসপাতাল নাই তাহাতে সহরবাসীদের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এখানে সন্তান প্রসবে বিভ্রাট ঘটিলে বা কোনরূপ স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হইলে হয় প্রাণ না হয় মান হারাইতে হয়।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। পরিশেষে লাট-সাহেব যদুনাথ বাবু কাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে ইনি যদুনাথ বাবু। তখন তিনি সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার চৌকির পার্শে বসাইয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহেন এবং স্কুল ভবনের একদিকে তাঁহার নিজের নাম ও অপরদিকে যদুনাথ বাবুর নাম খোদিত করিবার ব্যবস্থা করেন। লাটসাহেব চৌধুরী মহাশয়কে রায়বাহাদুর খেতাপ দিতে চাহেন কিন্তু চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন "আমার দেবার মত আমি যদি কিছু করিয়া থাকি তাহার জন্য নামে উপাধীর কোন আবশ্যক দেখি না; আপনার দয়াতে আমি কৃতার্থ; উপাধির উপসর্গে আর অহঙ্কার বৃদ্ধি করিবেন না। ধন্যবাদের পাত্র আপনি, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।" সেই অবধি পর পর চারজন ছোট লাট যদু-বাবুকে বন্ধু মধ্যে গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। গভরমেণ্টের কোন সভাসমিতী হইলে লাট দরবার হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। লাটের পারিবারিক কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলেও বন্ধু-ভাবে চৌধুরী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইতেন। লাটের যত্নে ও চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে ও পরিশ্রমে ঝাঁসিতে অনতিবিলম্বে একটি মেয়ে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবল ইহাই নহে চৌধুরী

মহাশয় যে যে স্থানে কর্ম্ম উপলক্ষে গিয়াছেন সেইখানেই সমাজের উন্নতি করিয়াছেন, স্কুল কালিবাড়ী প্রভৃতি যেখানে যাহা অভাব বুঝিয়াছেন—করিয়াছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে সংসারের শত দুঃখ দৈন্য কষ্ট শত ঝঞ্ঝাবাতে তিনি অচল অটল হইয়া নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন, কেহ তাঁহাকে কোন বিষয় অধীর হইতে দেখে নাই। তাঁহার ২৫ বৎসরের একটি উপযুক্ত পুত্র যখন মারা যায়, সংসারের অপরাপর সকলে শোকে মুহ্যমান হইলেন কিন্তু চৌধুরী মহাশয় স্থির, ধীর, যেন এমন কিছুই ঘটে নাই এই ভাবে সংসারের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলি করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে চৌধুরী মহাশয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কোনকালে আইন পড়েন নাই, কিন্তু তাঁহার সৎ বিচার দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও আইন মোটামুটি পড়িয়া লইয়াছিলেন। এক দিন একটি গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনা হয়; পুলিসে এইরূপ অভিযোগ যে এই ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করিয়া গাড়ীখানি রাজপথের উপর রাখিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের সহকারী নবাব সাহেব গাড়োয়ানের কুড়ি টাকা জরীমানা করেন। যদুবাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে পুলিসের কথার উপর নির্ভর না করিয়া ভালরূপে তদারক কর। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। তাহার পর চৌধুরী মহাশয় নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে গাড়ীখানি সমস্তই উহার বাড়ীতে আছে কেবলমাত্র চাকাখানি সামান্য দুই আঙ্গুল পরিমাণ স্থান রাজপথ অধিকার করিয়াছে। তিনি কোর্টে আসিয়া গাড়োয়ানের চারি আনা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন। নবাব সাহেব ইহাতে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া ঝাঁসির কালেক্টর সাহেবের নিকট অভিযোগ করেন। সাহেব, চৌধুরী মহাশয়কে বলেন "আপনার নামে যে অভিযোগ করিয়াছেন ইহা কি সত্য?" চৌধুরী মহাশয় উত্তর দেন "হাঁ, ইহা সত্য।—তবে নবাবসাহেব নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া ধর্ম্মাসনে ন্যায়বিচার করিতে বসিয়াছেন, প্রজাদের প্রতি যাহাতে অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দূরে থাকুক উনি কেবল জরিমানার অর্থে রাজকোষ পূর্ণ করিয়া আপনাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত হইয়াছেন, আর আমি সেই অন্যায়ের পোষকতা না করিয়া আজ অভিযুক্ত হইয়াছি, আমি বৃদ্ধ, দয়া করিয়া আমায় কর্ম্ম হইতে অবসর দিন।"

অতঃপর সাহেব অনেক করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। একটি মামলার নিদর্শন দিলাম মাত্র। এইরূপ ভূরি ভূরি মামলায় তাঁহার উন্নতচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময় তাঁহার একটি ১৮ বৎসরের কন্যা মৃত্যু হয় সে দিন তাঁহার তৃতীয় কন্যা তাঁহাকে কোর্টে যাইতে নিষেধ করে। তিনি স্নেগার্দ্রস্বরে বলেন "মা যদি ইহার যাইবার সময় হইয়া থাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আর যদি আমি কোর্টে আজ নাই যাই তবে দুটি গরীব লোকের বড়ই ক্ষতি হইবে।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী মহাশয় ক্রমে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে কাজ-কর্ম্ম করিতে কত নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কে কি বিপদে পড়িয়াছে কাহার কি সাহায্য আবশ্যক ইত্যাদি দেখিয়া পূর্ব্ববৎ তৃতীয় প্রহরে নিজের স্নান আহার সমাপন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ, লক্ষ্ণৌতে গিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকেন, সম্প্রতি ইনি কার্য্যদক্ষতার জন্য রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। ১৯১৭ সালের জুন মাসে চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্ণৌয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এইখানে আসিয়া উদরী রোগে চৌধুরী মহাশয় আক্রান্ত হইলেন। তিনি প্রায় পাঁচ মাস শয্যাগত ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র পিতার সেবার ও ঔষধের ক্রটি করেন নাই, সংসারের কার্য যিনি শেষ করিয়া মাত্র হরিনাম পাথেয় লইয়া জীবনের পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার আর ঔষধে কি করিবে? একে একে পুত্র কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী পৌত্র পৌত্রী আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহার শেষ চরণ ধূলি লইতে আসিলেন। এই পরপারযাত্রী মহাপুরুষ সকলকে তখন বলিলেন "আমার পৃথিবীর কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। আমার আক্ষেপ করিবার আর কিছু নাই, আমার বংশে আমি একা ছিলাম আর আজ ভগবানের কৃপায় এই সোণার হাটবাজার বসাইয়া তাঁরই আদেশে চলিলাম। এ সময় প্রাণ উন্মাদকারী হরিনাম সংকীর্ত্তন কর। চিরকাল কেহ এখানে থাকে না, তবে যতদিন ঈশ্বর ইচ্ছায় পৃথিবীতে থাকিতে হয় মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা হইতে বিচ্যুত হইও না। আমার দ্বারা যদি কেহ কষ্ট পাইয়া থাক ক্ষমা করিও।" তাহার পর তিনি ভগবানের ধ্যানে রত হইলেন।
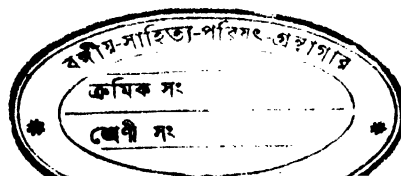
১৭ নবেম্বর ইংরাজী ১৯.৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ বেলা দশ ঘটিকার সময় এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। এই শোক সংবাদ লইয়া তাঁহার পরিজনবর্গ ঝাঁসিতে ফিরিয়া আসিলেন। ঝাঁসি শোক সাগরে মগ্ন হইল, স্থানীয় স্কুল বন্ধ হইল। সহরবাসী সকলে শোক-সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতে ও ইহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি দরিদ্রের প্রাণ ছিলেন, সেই প্রাণ হারাইয়া দরিদ্রেরা কিরূপ হাহাকার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। সে দৃশ্য না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। চৌধুরী মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পুত্রদেরই এই রোদনপরায়ণ জন-সমাজকে বহু কষ্টে সান্ত্বনা করিতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য তাঁহার শ্রাদ্ধে যথাসাধ্য কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া সেই পরলোকগত আত্মার তুষ্টি সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

শ্রীবিমলা দেবী।

মহা-জাগরণ।

—:*:—

একবার জাগ্ তুই, জ্বালা আগুনের মহাশিখা
হৃদয়ে হৃদয়ে দে রে প্রাণময় জ্যোতির্ম্ময় টীকা
গানের আগুন দিয়ে, একবার ভাঙ্গা ঘুম ঘোর,
ছিঁড়ে ফেল্ শত-শতাব্দীর এই স্বপ্ন মায়া ডোর !
আবার বুনিয়া তোল্ সেই মহাপ্রলয়ের গান
সহস্র ফণায় যেন তালে তালে নেচে ওঠে প্রাণ
মেতে ওঠে একবার, তুচ্ছ করে সর্ব্ব সুখরাশি,
তুচ্ছ করে এ জীবন শুনি সেই মরণের বাঁশী !

যে বীর্য্য ঘুমায়ে আছে অন্তরের আঁধার গুহায়,
যে তেজ লুকায়ে আছে হৃদয়ের শিরায় শিরায়,
সবারে জাগায়ে তোল্, একবার সুপ্তি হতে উঠি
সহস্রধারার মত ভাঙ্গিয়া পড়ুক্ টুটি টুটি
এই ধরণীর বুকে, করুক্ শ্যামলতর এরে,
মহাতীর্থে জাগাইয়া তুলুক্ এ মহা মানবেরে
মহা মঙ্গলের পানে, পুনঃ ধর্ম্ম এনে দিক্ তার
বীর্য্য দিয়ে, দীপ্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে আর !
আবার বুঝুক্ প্রাণ সত্য যেথা ধর্ম্ম যেথা আছে
চিরবন্দী আত্মা কেন চিরদিন চিরমুক্তি যাচে
সেই মহা মুক্তিলোকে, কেন এই মিথ্যা যাহা কিছু
এক নিমেষের তরে আত্মা সেথা হয় নাই নীচু
কেন সে স্বাধীন চির, নিয়ে এত ধন যশ মান
কিছুতে ভরে নি কেন তার চির অতৃপ্ত পরাণ !
কেন সে কাঙাল তবু, জীবনেতে এত মিথ্যা পূঁজি,
কিছুতে পায়নি তার হারান রতনটিরে খুঁজি ?
পায় নি সে দেখা তার, যারে দেখি ছুটে যায় বীর
মরণের মহানন্দে সর্ব্ব প্রাণ চঞ্চল অধীর,—
দৃপ্ত তেজে ক্ষিপ্ত প্রায়, যারে দেখে মেতে ওঠে জ্ঞানী,
যারে দেখি যোগানন্দে ডুবে যায় আত্মভোলা ধ্যানী,
যারে দেখি চিত্রকর টানে তূলি, যন্ত্রী ধরে সুর,
যারে দেখি প্রেমিক পাগল হয় প্রেমেতে বিধুর,

শিল্পী গড়ে নব মূর্ত্তি, কবি বাঁধে নবতর গান
ভাবে রসে কল্পনায় ভাষাহারা বিমুগ্ধ পরাণ !
সে কিরে হারায়ে গেছে ? জীবনেতে নাই সে কি আর ?
প্রাণে প্রাণে সেই চিরসুন্দরের দেখা পাওয়া ভার ?
তবে তুই জেগে ওঠ্—ওরে মোর সত্য লোভাতুর
শেষ বার বেঁধে তোল্ প্রাণপণে প্রাণময় সুর
জাগাইয়া তোল্ মূঢ় ! শেষ সাড়া শেষ ডাকে ডাক্
এই মহা-মৃত্যু হতে লক্ষ প্রাণ বাঁচাইয়া রাখ্ !

চির-রহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের কোলে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র বক্ষ হ্রদখানির মত পড়িয়া আছে ; সুখস্পর্শ-বিজড়িত ঈসদুষ্ণ বাতাস নিষ্কম্প।

ক্রেমলীনের ভৃত্য কার্লে'র মেজাজ আজ ভারী প্রফুল্ল—সারারাত্রি সুনিদ্রার পর, খেয়ালী প্রভুটীকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ চিত্ত দেখিতে পাইবার সম্ভবনা-আশায় পরম সন্তোষে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছে ; কারণ, এল র‍্যামি যখনই আসিয়াছেন তখনই তাহার প্রভুর যে ভাব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহা কার্লে'র অজ্ঞাত নহে। যদিও সে শিক্ষা ব্যাপারটাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিত না, এবং প্রায়ই বলিত যে, ও বস্তুর সহিত উপবাসের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ট—তথাপি, এল র‍্যামির ভিতর যে এমন কিছু আছে যাহা অন্য কাহারও অনুরূপ নহে ইহা সে প্রাণে

প্রাণে অনুভব করিত; এজন্য এল র‍্যামির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সে তো অনুভব করিতই, অধিকন্তু তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত।

"হার্ ডাক্তারকে যদি কেউ আরাম কর্‌তে পারে, তবে সে ঐ উনিই"—প্রাতরাশের আয়োজন করিতে করিতে আপন মনে সে বকিতেছিল—"অবিশ্যি বার্দ্ধক্য কেউই আরাম কর্‌তে পারে না, কেননা ও রোগ একেবারেই দুরারোগ্য; কিন্তু যতই বুড়ো হই না কেন, 'ফুর্ত্তির কম্‌তি' কি 'খাওয়া দাওয়ার অরুচি' যে কি দুঃখে ঘট্‌বে, সেটা বাপু ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। দূর হোক্ গে ছাই—এখন কি কি তৈরি কর্‌তে হবে দেখি"—অঙ্গুলি-পর্ব্বে সে গণনা আরম্ভ করিল—"কফি, টোষ্ট্, শাকভাজা, মাখন, ডিম-সিদ্ধ, মাছ,—হ্যাঁ, এই হলেই হবে;—তা' ছাড়া এই গোলাপ-ফুলগুলি যদি টেবিলের ঐ মাঝখানটীতে রেখে দেওয়া যায় তা' হ'লে দেখাবে ভাল"—অতঃপর কথামত কার্য্য করিয়া, বলিল—"বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে! আহা, তবু যদি হার ডাক্তার একটু খুসী হয়"—

"খাবার নিয়ে এস, কার্ল, খাবার নিয়ে এস!" পরিষ্কার প্রফুল্ল কণ্ঠস্বরে চকিত কার্লের উচ্ছ্বাস-ধারা অর্দ্ধপথে ছিন্ন হইয়া গেল। "শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—হাত চালিয়ে নাও; এল-র‍্যামিকে গাড়ী ধর্‌তে হবে।"

কার্ল ফিরিয়া দাঁড়াইল—পরক্ষণেই দারুণ বিস্ময়ে অবাক হইয়া নিশ্চল ও নিস্পন্দবৎ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল! একি সম্ভব যে সেই বৃদ্ধ ডাক্তারই এমন ভাবে কথা কহিতেছে? এই যে সরল, সবল, পরিপুষ্ট আনন ব্যক্তিটী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান—মুখে প্রফুল্ল হাস্য এবং কণ্ঠস্বরে প্রভুত্ব-ভাব—এ কি সত্যই তাহার সেই মনিব? কতক ভয়ে কতক বিস্ময়ে, কক্ষ-প্রবিষ্ট এল র‍্যামির দিকে সে একটা হতাশা-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এল র‍্যামি তাহার ঐ বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন, পরে বলিলেন—

"হ্যাঁ—চট্‌পট্ সেরে নাও কার্ল, গতরাত্রে তোমার প্রভুর বেশ সুনিদ্রা হ'য়েছে—দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ, উনি এখন অনেকটা সুস্থ। যাও, নিয়ে এস তোমার খাবার এইবার; কাল রাত্রেই তো তোমাকে বলে রেখেছি; নাও, নাও, আর দেরী ক'র' না!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে না!" পুনরায় ক্রেমলীনের দিকে চাহিয়া, লুপ্তপ্রায় সংজ্ঞাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে করিতে সে উচ্চারণ করিল; পরে, 'পড়ি-কি-মরি' করিয়া

ছুটিতে ছুটিতে কক্ষের বাহিরে আসিয়া, রান্নাঘরের সাম্‌নের গলিটাতে মিনিট খানেক যেন অসাড় ও বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইল।

"নিশ্চয়ই কোনে রকম ভুতুড়ে কাণ্ড!—এ্যাঁ, রাত্তিরের ভেতর একটা মানুষকে একেবারে বছর কুড়িকের ছোট করে' তোলা, একি ভুতুড়ে কীর্ত্তি না হয়ে য'য় ? উঃ, একদম যেন কুড়ি বছর আগেকার জোয়ানটা! বুক কাঁপ্‌ছে অ'মার!······কি হবে গো, কোথায় যাব? একি অলক্ষুণে চাকরীতে ঢুকেছি বাপু! ভগবান রক্ষে কর—ভগবান রক্ষে কর!······আহা, বেচারী মা আমার!"

শেষ কথাকয়টী কালে'র চরম ধর্ম্মভীরুতার অভিব্যক্তি; যখন সে বিশেষ কোনও বক্তব্য খুঁজিয়া পাইত না তখন দাম্ভিক সৈনিকের মুখে 'কুছ্ পরোয়া নেই' এর মত, স্বভাবতঃই তাহার ওষ্ঠাগ্রে ঐ 'বেচারী মা আমার' কথা কয়টী আসিয়া পড়িত। ইহার যে বিশেষ কোনো অর্থ ছিল তাহা নয়, তবে নিরীহ শৈশবে যখন সে জীবন-সংগ্রাম-পূর্ণ পৃথিবীটার কুটীলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং নবজাত 'ষষ্ঠীর দাসের' ভবিষ্যতের সহিত ঐ 'বেচারী মায়ের' অনেক সাধ অনেক আশা বিজড়িতছিল, সেই সময়টার উপর একটা অস্পষ্ট অর্থা-রোপই বোধ হয় উক্ত উক্তিটীর উদ্দেশ্য।

রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সভীতি-বিস্ময়ে আত্মতর্ক করিতে করিতে সে যখন মৎস্য ও ডিম্ব লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, ডাক্তার ক্রেমলীন সে সময় অতিথি-সহ পাদচারণা করিতে আবাস-সংলগ্ন উদ্যানটীতে প্রবেশ করিয়া শষ্পাচ্ছন্ন একখণ্ড ভূমির উপর দাঁড়াইলেন এবং প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত বারিধি-বিস্তারের প্রতি অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনো কথা নাই———পরে, ক্রেমলীন সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এল র‍্যামির উভয় হস্ত সাগ্রহে আপনার যুগল-করতলে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার চক্ষে অশ্রুবিন্দু।

"তোমাকে আর কি বল্‌বো ভাই?" আবেগ-কম্পিত ভগ্ন-স্বরে তিনি বলিলেন—"কেমন করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো? আমার কাছে আজ দেবতার মত তুমি—আবার আমি জীবন পেয়েছি—আবার সহজে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছি—পৃথিবী আজ আমার চক্ষে নূতন হ'য়ে উঠেছে—এত নূতন যে মনে হচ্চে, এইমাত্র বুঝি একে প্রথম দেখ্‌ছি।"

"বড়ই আনন্দের কথা !" সস্নেহে তাঁহার করযুগল চাপিয়া, নম্রকণ্ঠে এল্ র‍্যামি বলিলেন—"এইরকমই হওয়া উচিত। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার জীবনীশক্তি পুনরুজ্জীবিত দেখ্‌তে পাওয়াই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

"কিন্তু বাস্তবিকই কি আমাকে অল্পবয়স্ক দেখাচ্ছে ?" সত্যিসত্যিই কি আমার চেহারায় পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে ?" সাগ্রহে ক্রেমলীন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সহাস্যে এল র‍্যামি বলিলেন—"কালে'র বিস্ময়ভাব তো নিজেই তুমি লক্ষ্য করেছো; আমার ধারণা, সে তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে আর সে ভয় আমার সম্বন্ধেও বটে। হাঁ; পরিবর্ত্তন ঘটেছে তোমার চেহারায়—যদিও অত্যাশ্চর্য্যরকমের কিছু নয়। কেশ তোমার যেমন শুক্ল ছিল, তেমনিই আছে—মুখমণ্ডলের চিন্তারেখাগুলিরও কোনো বিকৃতি ঘটে নি; যা' ঘটেছে তা' শুধু তোমার স্নায়ুমণ্ডলীতে সজীবতা আর রক্তে বিশুদ্ধতার সঞ্চার—এইজন্যই তোমার চেহারায় একটা উদ্যম, একটা প্রফুল্লতা বা কান্তি ফুটে উঠেছে।"

"কিন্তু এটা কি স্থায়ী হবে— স্থায়ী হবে কি ?" আগ্রহ ভরে ক্রেমলীন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার উপদেশ মত চল যদি, অবশ্যই হবে"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন--"সে আমি দেখবো। আপাততঃ তোমার কাছে কতকটা 'সঞ্জীবন রস' রেখে যাচ্ছি—প্রত্যেক তৃতীয় রাত্রে দশফোঁটা করে' পান করবে অথবা ইচ্ছে করলে, শিরার মধ্যে অন্য উপায়েও সঞ্চারিত করতে পার; এরকম যদি কর, তা'হলে—পূর্ব্বেই বলেছি—বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্যকোনো উপায়েই তোমার মৃত্যু সম্ভব হবে না।"

"বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা এখানে নেই"—আলেখ্যবৎ প্রতিভাত সমুদ্র-সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া ক্রেমলীন সহাস্যে উত্তর করিলেন—"পর্ব্বত-শীর্ষের নিঃসঙ্গ ঈগল পক্ষীটীর মত আমি এখানে একা, আর এই বিজন-বাসেই আমি সুখী। স্বীকার করি, পরিদৃশ্যমান পৃথিবীটা খুবই সুন্দর—কিন্তু এর অধিবাসীরা এ সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করে' তুলছে—অবশ্য আমিও তা'দের একজন। কিন্তু সে যাই হোক্, বলপ্রয়োগ ছাড়া আমার মৃত্যু তা' হ'লে সম্ভব নয় ? প্রায় অমরতার কাছাকাছি এসেছি ! চমৎকার এল র‍্যামি ! তুমি নিশ্চয়ই একটা জাতির অধীশ্বর হবে !"

"বিশেষ ভাগ্যের কথা নয় সেটা!" এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"বরং বল যে, গ্রহ-নক্ষত্রের নিয়ামক হ'ব।"

"ঐ আশাই তোমার পতনের কারণ হবে!" সহসা গম্ভীর হইয়া ক্রেমলীন উত্তর করিলেন—"বড়ই উচ্চাভিলাষী তুমি, কিছুতেই সন্তুষ্ট নও।"

"আত্মার পক্ষে সন্তোষ অসম্ভব, কারণ সন্তোষ সীমা নির্দ্দেশক"—এল র‍্যামি বলিলেন—"তা'র অসীম অধিকার-পরিসরের মধ্যে আকাশও নেই পাতালও নেই। যা' কিছু সম্পাদ্য, এখানে তা' সম্পাদিত হবেই, যা'তে নাকি জীবমাত্রেই জীবনের সম্পূর্ণ স্বরগ্রাম উচিত মত বুঝ্‌তে পারে।"

"কিন্তু তুমি কি তা' বুঝেছো?"

"অংশতঃ বটে, তবে সম্পূর্ণ নয়। বায়ুমণ্ডল মধ্যপথে চিন্তাপ্রবাহের হিল্লোল অন্বেষণ কিম্বা নিখুঁত ভাবে তা'র কার্য্য-কারণ অনুসরণই যথেষ্ট নয়—অথবা, কারণ না জানা পর্য্যন্ত, দেহ মনের আকর্ষণ কি ঐ দৈহিক আর মানসিক চুম্বক ধর্ম্মের সমস্ত রহস্য সরল করে' তুলতে পারাও সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক নয়। তোমার ঐ থালার ওপরকার আলোক তরঙ্গ যেমন, এও তেমনি,—আসে, আবার চলে যায়; কিন্তু জান্‌তে হবে, কি জন্যে কোথা থেকে তা'রা আসছে যাচ্ছে। আমি অনেকটা জানি—কিন্তু আরও জান্‌তে চাই।"

"কিন্তু জ্ঞানানুসরণ কি অন্তহীন নয়?"

"হ'তে পারে—যদি অন্তহীনতা থাকে। অন্তহীনতা সম্ভব—আমিও বিশ্বাস করি,—কিন্তু সে যাই হোক্, প্রমাণ আবশ্যক।"

"এ চেষ্টা সফল ক'রে তুল্‌তে হ'লে তোমাকে হাজার হাজার জীবনকাল যাপন কর্‌তে হবে"—উত্তেজিত স্বরে ক্রেমলীন বলিলেন।

"হোক্, সে সমস্তই আমি যাপন কর্‌বো"—সংযত কণ্ঠে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"কিছুতেই হট্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা, আর হটাতেও কিছু পারবে না!"

একটা অস্পষ্ট ভয়ে ক্রেমলীন তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—সেই উদ্ধত. শ্যাম, সুন্দর মুখমণ্ডলে, নিঃসৃত বাক্যগুলি অপেক্ষাও একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট।

"মার্জ্জনা কোরো এল র্যামি"—ঈষৎ দ্বিধা-জড়িত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"প্রশ্নটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, হয়তো বা বিরক্তও হ'তে পার, তবু জিজ্ঞেস্ না করে' আমি থাক্‌তে পার্‌ছিনে। তুমি অতি সুপুরুষ, অতি মনোহর দর্শন—যদি এই আত্মসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিজে তুমি অজ্ঞই থাক তবে সেটা তোমার বোকামি—এখন, ঠিক করে বল দেখি—তুমি কি কখনও কাউকে ভালবাস নি? কোনো—কোনো স্ত্রীলোককে?"

এল র্যামির ভাবস্তিমিত নয়ন-প্রভা সহসা হাস্য-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"স্ত্রীলোককে ভালবেসেছি?—আমি?" সবেগে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কাজ নেই সে সৌভাগ্যে! ঐ সব বিড়ালাক্ষী কি মৃগনয়না-রূপিণী জীবনের 'খেলনা'দের নিয়ে কি করবো বল্‌তে পার? পৃথিবীতে যত রকম জানোয়ার আছে তাদের সকলের চেয়ে ও জন্তুগুলো আমার কাছে অল্প চিত্তাকর্ষক। বরং একটা পাখীর ডানা স্পর্শ কর্‌তে পারি তবু স্ত্রীলোকের কেশ নয়,—গোলাপের কোমলতা, গোলাপের সুবাস আমার কাছে স্ত্রীলোকের চুম্বনের চেয়ে অনেক বেশী মিষ্ট, অনেক বেশী সত্য। জাতির জন্মিত্রী হিসেবে স্ত্রীলোকগুলোর উপযোগীতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক তা'রা কোনোকালেই নয়—অন্ততঃ, আমার কাছে তো নয়।"

"প্রেমে তোমার তা' হ'লে বিশ্বাস নেই?"

"না; তোমার আছে?"

"আছে,"—ফ্রেমলীনের স্বরে একটা করুণা ও কমনীয়তা ভরিয়া উঠিল—"আমার বিশ্বাস, প্রেমই এই নিরীশ্বর-প্রায় জগতের একমাত্র ঐশ্বরিক বিভূতি।"

এল র্যামির যুগল-ভ্রূর মাঝখানে একটা আধ-ব্যঙ্গ আধ-অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"কবির ভাষায় কথা কইছ তুমি। আমার অবস্থা অতটা কবিত্বময় হয় নি, কাজেই স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত দৈহিক আসঙ্গ-লিপ্সাটাকে অতখানি 'আধ্যাত্মিক' বলে' ধরে নিতে পারিনে। একটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া অন্য কিছুই নয়—পশুপক্ষীদের সঙ্গে সম-পর্য্যায়ভুক্ত হয়েই এ জিনিষটা আমরা ভোগ করে চলেছি।"

"আমার ধারণা, তোমার জ্ঞান এই জায়গাটীতে ভুল করেছে"—মৃদুকণ্ঠে ফ্রেমলীন বলিলেন—"দৈহিক আকর্ষণ এখানে আছে সন্দেহ নেই—তা' ছাড়াও এমন কিছু আছে—

এমন কিছু অতীন্দ্রিয়, এমন কিছু সূক্ষ্ম—যা', কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কারুর বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে নি। অধিকন্তু, এ একটী অলঙ্ঘনীয় আধ্যাত্ম-চেতনা, আর সেই সঙ্গে বস্তু বাসনাত্মক বটে,—দেহের মত আত্মাও, ঐ প্রেমের আশ্রয় ব্যতিরেকে কোনোমতেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না।"

"হ'তে পারে, তোমার মত তাই"—এল র‍্যামি পুনর্ব্বার হাস্য করিলেন—"কিন্তু আমার মধ্যেই এ মতের খণ্ডন দেখতে পারে। প্রেম-হীন জীবন নিয়েই আমি পরিতৃপ্ত—তা' ছাড়া, কামুকতা আর ব্যাভিচারের জীবন্ত উপাদান মনে করেই আজকালকার সাধারণ নারী-জাতির দিকে আমি চাই, আর সে দৃষ্টিতে কেবল একটা বিদ্বেষ-ভাবই ভরে আসে।"

"বড় তীব্র, বড় তীব্র"—সবিস্ময়ে ক্রেমলীন বলিলেন—"সাধারণ স্ত্রীজাতি অবশ্যই তোমার চিত্ত অধিকার করতে পারে না—কিন্তু পৃথিবীতে খ্যাতনামা নারীও আছেন—নারী, যাঁরা শক্তি ও প্রতিভায় অলঙ্কৃত—যাঁদের উচ্চ-লক্ষ্য গগন চুম্বি।"

"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—হাঁ, হাঁ, জানি বৈ কি!" এল র‍্যামি হাসিয়া উঠিলেন—"দুর্ব্বিসহ জীব তা'রা, আপনিও জ্বলে অপরকেও জ্বালায়। কিন্তু এ-সব কথা কেন ক্রেমলীন?—একি তোমার ঐ পুনর্যৌবন-প্রাপ্তির সদ্য-ফল নাকি? আলোচনার যোগ্য যথেষ্ট ব্যাপার তো ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে!······ভাল আমি কখনই বাস্‌বো না—এ গ্রহে তো নয়; আমিত্বের অন্য কোনো অবস্থায় হয়তো ঐ "ঐশ্বরিক বিভূতির" পরিচয় লাভ কর্‌তে পারি। কিন্তু যে সমস্ত নারীজাতিতে আমাদের এই পৃথিবীটা পরিপূর্ণ, তা'দের অন্ধগর্ব্বে, ঈর্ষায়, নীচাশয়তায়, কুপ্রবৃত্তিতে আমার মনে যা' জাগে, তা' শুধুই ঘৃণা আর বিদ্বেষভাব; তা' ছাড়া, ও জাতটাই বিশ্বাস-ঘাতক—আর বিশ্বাস-ঘাতকতা আমার চক্ষে জঘন্য।"

এই সময় কার্ল্‌ জানালার নিকট হইতে জানাইল যে আহার্য্য প্রস্তুত, এবং তাঁহারা দ্বার পথে অগ্রসর হইল।

"ফলকথা, এল র‍্যামি"—বন্ধুর বাহুপরি হস্তার্পণ করিয়া ক্রেমলীন বলিলেন—"যে নিয়তি-মূলে মানব-মাত্রেই অবনত হতে বাধ্য তা'কে অতিক্রম করে' যাবার আশা একান্তই দুরাশা"—

"কি সে নিয়তি-মূল? মৃত্যু?" বাধা দিয়া এল র‍্যামি ধীরকণ্ঠে কহিলেন—"তা'কে প্রায় বশ করে' এনেছি!"

"হোক্, তবু 'প্রেম'কে বশ করতে পার না!" দৃঢ়স্বরে ক্রেমলীন জানাইলেন—"'প্রেম' মৃত্যু অপেক্ষাও বলবতী!"

এল র‍্যামি কোনো উত্তর দিলেন না,—এবং উভয়েই প্রাতরাশে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। আহার্য্যের যথোচিত সদ্ব্যবহার দেখিয়া কার্ল খুবই প্রসন্ন হইতেছিল, যদিও মধ্যে মধ্যে প্রভুর পরিবর্ত্তিত মুখ-লাবণ্যের প্রতি চোরা চাহনি নিক্ষেপ না করিয়া সে থাকিতেই পারিতেছিল না। কি হিসাবে কতখানি পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে তাহা ঠিক ধরিতে না পারিলেও, মোটের উপর একটা উন্নতি যে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে সন্তুষ্ট হইবার চেষ্টা করিল।

"যদি ভুতুড়ে কীর্ত্তিই হয় এটা"—সে মনে তর্ক করিতেছিল—"তা' হ'লে ভূত যে খুবই সহৃদয় লোক তা' আমাকে স্বীকার করতেই হবে; না—এ বিষয়ে আর সন্দেহই থাকতে পারে না। হয়তো আমি একটা পরিত্যক্ত পাপী, কেবল দগ্ধ হবারই উপযুক্ত—কিন্তু ভগবান যদি কেবল দুঃখ জরা আর বার্দ্ধক্য দেবার জন্যেই ব্যস্ত হন, আর ভূত তা' থেকে উদ্ধার করে' আমাদের সুখ স্বাস্থ্য আর যৌবন দিতে পারে, তা' হ'লে ভগবানকে ছেড়ে ভূতের সঙ্গেই আমরা বন্ধু পাতাব না কেন বাপু! আহা, বেচারী মা আমার!"

ঐ সকল বিচিত্র চিন্তা মনের মধ্যে তরঙ্গিত হইতে থাকায় মুখভাবে সংযম রক্ষা করা এবং গম্ভীর আনন ভদ্র দ্বয়ের সম্মুখে ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল--তথাপি সে মানাইয়া লইল মন্দ নয়; এমন কি, প্রভুর হস্তে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া দিবার শক্তিতে তাহার অভ্যস্ত হইয়া আসিল, এবং ব্যাকুলতায় তাহার চক্ষুদ্বয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিকরাইয়া যাইবার উপক্রম না করিল ততক্ষণ সে ওদিকে চাহিয়াও দেখিল না।

আহারের অব্যবহিত পরেই এল র‍্যামি বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং যাহাতে ঐ রশ্মি-রহস্য নির্ণয়কল্পে অত্যধিক পরিশ্রম না করা হয় তজ্জন্য বন্ধুকে অনুরোধ করিলেন।

"কিন্তু আমি একটা নতুন সূত্র পেয়েছি"—জয়দৃপ্তভাবে ক্রেমলীন বলিলেন—"নিদ্রিতাবস্থায় এটা আমার মাথায় এসেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেটা কষে ফেল্‌তে পারবো আশা করি—যদি কৃতকার্য্য হই, তা' হ'লে তোমাকে জানাবো। ধন্যবাদ তোমাকে বন্ধু, এখন আমার অবসর যথেষ্ট—বিশেষ উৎকণ্ঠিত কি ব্যস্তভাবে পরিশ্রম করার আর দরকারও দেখি নে—যে মৃত্যু প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল আজ তাকে অনেকখানি পথ পেছিয়ে দেওয়া গিয়েছে—"

"সত্যই তাই!" এক প্রকার আশ্চর্য্য হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"অনেকখানি পথ—বহুযোজন দূর—পরাস্ত এবং সাগর-গর্ভে-নিমজ্জিত। বিশ্বাস হয় না, কিন্তু কেউ কেউ এমনও বলে যে সৃষ্টিতে মৃত্যু নেই—"

"কিন্তু আছে—নিশ্চয়ই আছে!—" তাড়াতাড়ি ক্রেমলীন উত্তর করিলেন।

এল র‍্যামি অনুজ্ঞাভরে হস্ত উত্তোলন করিলেন—তাহার অর্থ "খবর্দ্দার!"—পরে বলিলেন—"সেটা অনিশ্চিত; তা' এই হিসেবে যে নিশ্চয়তা কিছুরই নেই। 'নিশ্চয়ই' বলে কিছু নেই—যা' আছে তা' আত্মার 'সম্ভাবনা!'

ঐ প্রহেলিকা-বৎ কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লণ্ডনে উপনীত হইয়া তিনি বরাবর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং যথারীতি চাবী ঘুরাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতঃ কিয়ৎকাল উৎকর্ণ হইয়া দালান-কক্ষে দাঁড়াইলেন; ভাবিয়াছিলেন, হয়তো বা ফেরাজ এতক্ষণ নূতন কোনো স্বপ্ন-সঙ্গীতে বিভোর হইয়া আছে—কিন্তু কৈ, কোনো শব্দই তো শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না! গৃহব্যাপী নিস্তব্ধতা তাঁহার প্রাণে কেমন যেন একটা হতাশা, একটা অস্পষ্ট বিষাদভাব বহন করিয়া আনিল। পাঠ কক্ষের দ্বার ঈষদুন্মুক্ত ছিল,—নিঃশব্দে উহা অধিকতর মুক্ত করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, কনিষ্ঠ-ভ্রাতা বাতায়নপার্শ্বে একখানি চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া

নিবিষ্টচিত্তে কি পাঠ করিতেছে। সন্দিগ্ধচিত্তে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, এল র‍্যামির মনে হইল, যেন তাহার আকৃতিতে কোথায় কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—কিন্তু কি বিষয়ে যে সে পরিবর্ত্তন, তাহা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরক্ষণেই বুঝিলেন, ফেরাজের মনোমধ্যে নিশ্চয়ই কোনো প্রকার দৈহিক সৌন্দর্য্যগর্ব্ব জাগিয়া উঠিয়াছে; নতুবা সে সহসা এমন সুবেশ-সজ্জিত কি জন্য?

সাদাসিদা শুভ্র পরিচ্ছদটীর পরিবর্ত্তে আজ তাহার অঙ্গে এক মূল্যবান পোষাক চড়িয়াছে—কটিদেশে স্বর্ণোজ্জ্বল কটিবেষ্টনী—সোনার খাপে আবদ্ধ একখানি ছোরা তাহার সহিত সংলগ্ন—কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কারও তাহার অঙ্গরাখার রেশমী ঝালরগুলির মধ্যে মধ্যে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

বস্তুতঃ, অদ্যকার এই অভিনব সজ্জার ভিতর দিয়া তাহার, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জানুর উপর সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রক্ষা করিয়া একমনে সে পাঠ করিতেছে—এল র‍্যামি দ্বার পার্শ্ব হইতে দেখিলেন—দারুণ বিরক্তিতে তাঁহার ললাট আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল!

ঝনাৎ করিয়া কক্ষকবাটদ্বয় পশ্চাদ্দিকে ঠেলিয়া দিয়া তিনি গৃহ-প্রবেশ করিলেন এবং একেবারেই ডাকিলেন—"ফেরাজ!"

ফেরাজ মুখ তুলিয়া চাহিল এবং এমন একভাবে হাসিল যাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

"কে, এল র‍্যামি! এত শীগ্‌গির? রাত্রির আগে আমি তো তোমাকে প্রত্যাশাই করিনি।"

"করনি নাকি?" অগ্রসর হইয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"কারণ জান্‌তে পারি কি? একরাত্রি অনুপস্থিত থাকবার পর যখনই আমি আসি তখন সকাল সকালই তো এসে থাকি। তোমার সে অভ্যাস্ত স্বাগত সম্ভাষণ কোথায়? হয়েছে কি তোমার? তোমার মেজাজ যেন খারাপ বলে বোধ হ'চ্ছে!"

"হ'চ্ছে নাকি?" 'আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া' ফেরাজ বেশ দীর্ঘরকম একটী হাই তুলিল; পরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অতঃপর হস্তস্থিত পুস্তকখানা টেবিলের উপর রক্ষা

কহিঃ বলিল—"আমি কিন্তু তা'র কিছুই জানিনে। যাক্‌, তারপর সে পাগল বুড়োটাকে কি রকম দেখলে? আশা করি তাকে বলেছ যে তুমিও তারি মতন একটী বদ্ধ পাগল?"

এল র‍্যামি অবাক! অপমানে, বিস্ময়ে ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল।

"ফেরাজ! এর অর্থ কি?"

কষাহত 'তাজা' অশ্বের ন্যায় ফেরাজ অকস্মাৎ এল র‍্যামির পূর্ণ-সম্মুখীন-ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—এতক্ষণের চেষ্টাকৃত ধৈর্য্যের ভাণ ফুৎকারে উড়িয়া গিয়া, যে মূর্ত্তি তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল তাহা যৌবনের তেজ ও সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ-দীপ্তিতে অপূর্ব্ব!

"অর্থ কি?" উত্তেজিত কণ্ঠে সে আরম্ভ করিল—"অর্থ এই যে তোমার দাসাবৃত্তি করে,' তোমার সম্মোহন-বিদ্যায় সমাচ্ছন্ন থেকে আমার প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠেছে;—অর্থ এই যে আজ থেকে তোমার শক্তি আমি প্রতিরোধ করবো, তোমার দাস্যবৃত্তি আর করবো না, মানবো না আর তোমাকে—তোমার প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করবো;—অর্থ এই যে আমার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও আর লুপ্ত হ'তে দেব না,—স্বাধীন, আজ থেকে তোমারই মতন স্বাধীন আমি—আমার মনুষ্যত্ব, আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ অধিকার এখন থেকে আমি রক্ষা করে চলবো। না, আমাকে নিয়ে আর তোমার এ-খেলা চলবে না—আমাদের মধ্যে আর কোনপ্রকার প্রতারণা বা মিথ্যাবাদ থাকবে না; মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি,—তবে শোনো একেবারেই প্রকৃত কথাটা বলি;—তোমার গোপন রহস্য আমি জেনেছি—তা'কে দেখেছি!"

এল র‍্যামি নির্ব্বাক, নিশ্চল, স্তম্ভিত! তাঁহার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে—শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ!

"হ্যাঁ, দেখেছি তা'কে!" উত্তেজনা-প্রমত্ত অভিনেতার ন্যায় হস্তদ্বয় সঞ্চালিত করিয়া ফেরাজ পুনরায় বলিতে লাগিল—"স্বপ্ন-দুর্লভ তা'র রূপ-জ্যোতিঃ!—আর তুমি,—তুমি কিনা পৈশাচিক নির্ম্মমতায় সেই অলোক-সামান্যা সুন্দরীকে শূন্য অন্ধকারে আবদ্ধ করে' রেখেছ! পার্থিব সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে তুমি তা'র দৃষ্টি-শক্তি রুদ্ধ করে' দিয়েছ—আর—মনে করলেও ঘৃণা হয়—তোমার ঐ ভয়ঙ্কর যাদু-নৈপুণ্য-প্রভাবে তা'কে এক প্রেমহীন জ্ঞানহীন দৃষ্টিহীন, অনুভূতিহীন জীবিত শবে পরিণত করেছো! আমি বলছি এল র‍্যামি,—জঘন্য,

অতি জঘন্য তোমার কীর্ত্তি—এর চেয়ে হত্যা করা ভাল—আশা করি নি, যে এ রকম কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব! আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার পরীক্ষা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত,—কখনও ভাবিনি যে, একজন অসহায়া রমণীকে তুমি এমন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে পার! কিন্তু না, আর তা, পারবে না—আমি তা'কে তোমার কবল থেকে মুক্ত করবো,—এত সৌন্দর্য্য জীবন্ত-সমাধির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়নি,—জ্যারোবা যথার্থই বলেছে—তা'র প্রয়োজন জীবন, আনন্দ, প্রেম! এ সমস্তই সে পাবে—আমার ভেতর দিয়েই পাবে!"

উত্তেজনার প্রাবল্যে দম ফুরাইয়া আসায় ফেরাজ থামিল; এল র‍্যামি তখনও তাহার দিকে চাহিয়া আছেন—নির্ব্বাক!

"তোমার যত খুসী, রাগ কর না কেন"—অবজ্ঞাভরে ফেরাজ বলিতে লাগিল—"আমি আর গ্রাহ্যও করিনে। জ্যারোবাই আমাকে সে-ঘরে যেতে বলেছিল, সে-ই তা'র শয়ন-সৌন্দর্য্য আমাকে দেখিয়েছিল...জ্যারোবাই"—

"লুব্ধ করেছিলা নারী, তাই খেয়েছিনু"—শ্লেষভরে এল র‍্যামি আবৃত্তি করিলেন;—"নিশ্চয়ই সে জ্যারোবা; এ রকম বিশ্বাস-ঘাতকতা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ কর্ত্তেই পারে না। স্বভাবতঃই সে জ্যারোবা—যে আমার মাইনে খায়, আমার অধীনে দাসীবৃত্তি করে, যা'র বর্ত্তমান অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত আমার দান—সে নইলে আর আমার ভাইকে এই অমর্য্যাদা-সূচক কার্য্যে কে ব্রতী করবে।"

"অমর্য্যাদা!"—চক্ষের নিমেষে ফেরাজ তাহার কটিবন্ধ-দোদুল ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিল। এল র‍্যামির কৃষ্ণ-তার নয়নদ্বয় ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিল।

"সে কি! এত শীঘ্র ছোরা আস্ফালন?"—তিনি বলিতে লাগিলেন—"কি রকম নাটুকে কাণ্ড এ সব? তুমি—সেদিনকার সেই শান্ত-শিষ্ট বালকটী, যা'র জীবন অতি নিরীহ অতি শান্তিময়, কবিতা আর সঙ্গীত আর স্বপ্ন নিয়েই যে চিরকাল বিভোর—সেই তুমি কিনা অকস্মাৎ যৌবনের মদগর্ব্বে ফেঁপে উঠে, জাঁকালো পোষাকে আপনাকে সং সাজিয়ে, নিতান্তই ইতরের মত অশিষ্ট ব্যবহারে তোমার চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভয় দেখাতে চাও? পরিতাপের বিষয় বটে!...শোন ফেরাজ!—আমি বলেছি "অমর্য্যাদা সূচক"—এ কথার অর্থ

ভাল করে' বুঝতে চেষ্টা কর ; অপরের গোপন রহস্য চুরি করে' জানবার চেষ্টার মধ্যে যা' প্রকাশ পায় তা'র উপযুক্ত বিশেষণই ঐ। কিন্তু সে যাই হোক্, আমি ক্রুদ্ধ হই নি,—এমন কোনো ক্ষতি ঘটে নি যার সংশোধন চলে না, আর যদিই বা তা' ঘট্‌তো তা' হ'লেও গতানুশোচনা নিষ্ফল—এবার যা ঘটেছে 'তা'কে দেখেছি'। কা'কে দেখেছো তুমি ?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে ফেরাজ তাঁহার দিকে চাহিল।

"কা'কে দেখেছি ?" উচ্চকণ্ঠে সে বলিল—"দ্বিতল কক্ষে যে কিশোরীকে তুমি আবদ্ধ করে' রেখেছো,—যে পরমাসুন্দরী, নির্ম্মম অন্ধকারে, সজ্জা ও সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রকার অবলম্বন তা'র জীবনখানি নিদ্রার কোলে ঢেলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, তা'কে ছাড়া আর কা'কে দেখ্‌তে পারি !"

"ঠিক যেন মন্ত্রমুগ্ধা রাজকুমারী, না ?" ব্যঙ্গভরে এল র‍্যামি বলিলেন। "বেশ কথা, তাই যদি তোমার মনে হ'য়েছিল—যদি সে কেবল নিদ্রিতা বলেই বুঝেছিলে, তবে তা'কে জাগিয়ে তুল্‌লে না কেন ?"

"জাগিয়ে তুলবো ?" আবেগোচ্ছ্বল স্বরে ফেরাজ বলিল—"সেই মুদ্রিত নয়ন-পল্লব দু'খানি উন্মীলিত দেখ্‌তে, সেই পল্লব-তল-সুপ্ত দৃষ্টি-বিস্ময় সর্ব্বপ্রকাশ দেখ্‌বার জন্যে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে আমার আপত্তি ছিল না! কতরকম প্রিয় নামে তা'কে সম্বোধন করেছি—আপন করতলে তা'র সেই সুকোমল করপুট আকুলভাবে চেপে ধরেছি—হয়তো তা'কে চুম্বনও কর্‌তে পার্ত্তাম"—

"কিন্তু অতখানি সাহস তোমার হয়নি !" আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া এল র‍্যামি সক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং উত্তেজিত পদক্ষেপে হঠাৎ তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন—"আমার পঙ্কিল স্পর্শে তা'কে কলুষিত কর্‌তে একেবারেই সাহস হয় নি !"

ফেরাজ হটিয়া আসিল,—তাহার ধমণীরক্তে কেমন-যেন একটা শৈত্য অনুভূত হইল। ভ্রাতার এই ক্রোধ-রক্তিম রূপান্তরিত মূর্ত্তি তাহাকে অকস্মাৎ ভীত করিয়া তুলিল,—অগ্নিবর্ষী [illegible]—বিকম্পিত তাঁহার ওষ্ঠযুগল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে !

চকিত বজ্র নির্ঘোষের বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র-প্রবাহ-সম্পন্ন এই শক্তিধর পুরুষটীঃ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-প্রভাব-স্পর্শে, ফেরাজের নব-জাত প্রতিরোধ স্পৃহা ও আস্ফালন যেন মুহূর্ত্তেই উবিয়া গেল ; ভীতি-রুদ্ধ ভগ্নস্বরে সে তাড়াতাড়ি বলিল—"এল র‍্যামি ! আমি—আমি—অন্যায় কিছু করি নি-- জ্যারোবা তখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল' —

"জ্যারোবা !"--এল র‍্যামি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"জ্যারোবা যদি চোখের ওপর কোনো অপ্সরাকে অবমানিতা দেখ্‌তো তা' হলেও বোধ হয় মনে করতো যে ঐ অপমানই তা'র পবিত্রতার পক্ষে চরম সৌভাগ্য ! পারিবারিক সুখদুঃখের মধ্যে সাধারণের মত কাল কাটিয়ে চলাই জ্যারোবার মতে মহৎ-জীবন-যাপনের আদর্শ। হায় হতভাগ্য দুঃসাহসী ফেরাজ ! তুমি বল্‌ছো যে, আমার গোপনীয়তা তুমি জানো—কিন্তু না, কিছুই জান না—জান্‌তে তুমি পার না ! নির্ব্বোধ অজ্ঞান যুবক ! তুমি কি নিজেকে নতুন কোনো যীশুখৃষ্ট মনে কর ?—মনে কর কি, যে, মৃতকে সঞ্জীবিত করার শক্তি তোমার আছে ?"

"মৃতকে ?" বিবর্ণ মুখে ফেরাজ বলিল—"মৃতকে ? যে কিশোরীকে আমি দেখেছি, সে—সে তো সজীব—তা'র তো শ্বাস প্রশ্বাস বইছে..."

"সে শুধু আমারই ইচ্ছাবলে !" এল র‍্যামি বলিলেন—"আমারই শক্তিতে—আমারই জ্ঞানে—আমারই সযত্ন তত্ত্বাবধানে ; যে সূক্ষ্মতম সূত্রে পঞ্চভূতের সঙ্গে জীবাত্মা সংশ্লিষ্ট, সেই সূত্রটীর ওপর আমার অধিকারের প্রভাবে। নতুবা, বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারে, সে কিশোরী মৃত—আজ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সীরিয়ার মরুপ্রান্তরে তা'র মৃত্যু হ'য়েছে !"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আচার্য্য গুরুদাস।

পঙ্কিল পল্বল জলে পঙ্কজের প্রায়,
উঠেছিলে ফুটে তুমি বঙ্গ দীঘিকায় ;
শতদলে শতদিকে বিকশি সৌরভ,
মাতায়েছ মর্ত্ত্য তুমি বাঙ্গালী গৌরব।

চরিত্রে উন্নত বীর! সর্ব্ব-অধিকারী,
শুধু তুমি ছিলে দেব শাশ্বত ভিখারী ;
অঙ্গের রুধিরে করি বঙ্গ সেবা সার,
মুছালে মলিন মুখ দেশ মাতৃকার।

ভারতের মহামন্ত্র বুঝেছিলে সার,
"ফলে স্পৃহা ভ্রান্তি মাত্র, কর্ম্মে অধিকার' ;
ঐহিকতা ফেলি তাই পরত্রের লাগি,
ছিলে তুমি হে ব্রাহ্মণ দিবা নিশা জাগি।"

জনকের মত যোগী গার্হস্থ্য-জীবনে,
জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অশনে বসনে ;
শুদ্ধ, শুভ্র, সৌম্য, শান্ত, ভাস্বর, মোহন,
মিষ্টভাষী, নিষ্ঠাবান, বশিষ্ট ব্রাহ্মণ।

কর্ত্তব্যে কঠোর ছিলে দুর্ব্বাসার সম,
সংযমে চিত্তের জয়ে তুমি ভীষ্মোপম ;
সিদ্ধার্থ পুরুষ প্রায় ভোগে বীতস্পৃহ
ত্যাগীর আদর্শ তুমি প্রাতঃস্মরণীয় !

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

তিব্বতের কথা।

—:*:—

সম্পাদিকা মহাশয়া —

"তিব্বতের ইতিহাস" "তিব্বত-ভ্রমণ" "তিব্বত দর্শন" বোধ করি বঙ্গনারীর পক্ষে দুর্ব্বোধ এবং এখনও জ্ঞানের অতীত। সম্প্রতি এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষের সঙ্গে কথোপকথনে তিব্বতের দেশাচার ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া প্রাণে উল্লাস-উথলিত হইল, ভাবিলাম এমন রহস্যময় ও গভীরতাপূর্ণ দেশের কথা আমার দেশীয় ভগিনীরা শুনিবে না ? জানিবে না ? বিলম্ব করা অন্যায় ভাবিয়া লিখিতে বসিলাম, মনে হইল দেশের সেবায় ব্যস্ত "পরিচারিকা" ; সম্পাদিকাকে কয় লাইন লিখিয়া এই কয়েকটি কথা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিব। তিব্বত-সম্বন্ধে শৈশবে শুনিয়াছিলাম স্থানটি অগম্য এবং সে স্থানে এক "মানস-সরোবর" আছে ; তাহার জল অমৃত এবং পান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করে না, এবং Lasha (লাসা) নামক স্থানে লোকেরা অনন্তকাল বাস করে, ঐ নগর পৃথিবীতে স্বর্গধাম।

শৈশবের কল্পনা আজ সত্যে পরিণত জানিয়া কত যে আনন্দ হইতেছে বলিতে পারি না।

'তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আজিও বিশেষরূপে বিদ্যমান। লাসা মহানগরে গৃহাদির ছাদ স্বর্ণে মণ্ডিত। (?) ধনী দেশ, ধনী নগর, ধনী গৃহীর বাসস্থান হইলেও সে দেশে

কত যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন তাহার সংখ্যা নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিনটি বৃহৎ আশ্রম আছে, Drepung, Sera এবং Ganden ; ড্রিপাঙ্গে প্রায় দশ হাজার ভিক্ষু, সেরাতে সাত হাজার এবং গণ্ডানে তিন হাজার ভিক্ষু বাস করেন। উক্ত ভিক্ষুদল পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া অনবরত ও অবিশ্রান্ত ভাবে প্রার্থনা পড়িতেছেন, দেখিলে মনে হয় তাঁহারা সে সকল কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। প্রার্থনা করিলে পাপ অধর্ম্ম দূর হইয়া যাইবে ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লামাগণের বিশ্বাস তাঁহাদের মৃত্যু নাই ; জীবনান্তকে ইঁহারা দেহত্যাগ বলেন, অর্থাৎ আত্মা এক জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবরে প্রবিষ্ট হন ও বালকরূপে পুনরায় পৃথিবীতে প্রকাশ পান। যে মুহূর্ত্তে কোন এক লামার মৃত্যু হয় সেই মুহূর্ত্তেই কোনও শিশু জন্মাইলে তাঁহাদের বিশ্বাস সেই লামাই আবার বালকদেহে পুনঃ জন্ম লইয়াছেন।

একটি লামার মৃত্যুর পর কোন শিশুর জন্ম সেই ক্ষণে হইয়াছে জানিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হয় এবং সংবাদ পাইলেই শিশুর পিতা-মাতাকে শিশুকে লইয়া আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হয় এবং যদি একাধিক শিশু আনীত হয়—তাহা হইলে মৃত লামার ব্যবহৃত কোনও কোনও দ্রব্য শিশুগণের সম্মুখে রক্ষিত হয় এবং যে শিশু সেই সকল দ্রব্য দৃষ্টি বা স্পর্শ করে সেই শিশুই মৃত লামা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

তিব্বতে "আনি" বলে ভিক্ষুণীদের। আনিগণ এক নির্জ্জন পর্ব্বতের উপরে বাস করেন। তাঁহারা সমস্ত জীবন ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করেন। মাথায় একপ্রকার টুপির মত আবরণ সর্ব্বদা ধারণ করেন এবং হাতে ভিক্ষাপাত্র থাকে। বর্ত্তমান টিস্থ লামার গর্ভধারিণী বধির এবং মূক। যখন পুত্র বুঝিলেন মাতা এই রকম তখন মাতাকে জানাইলেন যখন তুমি মূক এবং বধির তখন বিশ্বাস করি তুমি আনি হইবার জনাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। পরে মাতার কেশ কর্ত্তন করাইয়া ভিক্ষুণী করিয়াছেন। কখনও কখনও আনিগণ দাসীর কাজ করেন, ভদ্রলোকের গৃহে দাসী হইয়া তাহাদের সেবা করেন।

গৃহস্থ বাড়ীর অমঙ্গল দূর করিবার জন্য একজন লামাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখেন সেই লামা দিনরাত্রি প্রার্থনা করেন এবং যাবতীয় বিপদ ও অমঙ্গল দূর করেন।

তিব্বতে আজও সেই পূর্ব্বপ্রথা প্রচলিত আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর বিষয় নানাভাবে নরনারী বিচার করে কিন্তু তিব্বতে বর্ত্তমান শতাব্দীতেও এক পরিবারে যত সহোদর ভ্রাতা আছে সকলের এক স্ত্রীরই সঙ্গে বিবাহ হয়। কোন এক নারী ছয় ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিল কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিল, বাৎসল্যভাবে সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রতিপালন করিত।

তিব্বতের ধর্ম্মপুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় অনেক প্রার্থনা লিখিত আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধিক পুস্তক তিব্বতে আছে। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে এখন সেরূপ প্রচারিত দেখা যায় না কিন্তু তিব্বতে এখনও সহস্র সহস্র লামা সর্ব্বত্যাগী সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী হইয়া জীবনে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম 'জীবন্ত' রাখিতেছেন।'

স্নঃ দেঃ।

বেদনাময়।

—:*:—

ওগো—অসীম ব্যথার পারাবার,
জনমে মরণে　　দুখ নেয়ে সনে
তোমাতে মোদের পারাপার ॥
তুমি দুখময়, সৃজন তোমার
দুখেরি বিকাশ দুখেরি বিকার
আকাশে বাতাসে　　হাসে শ্বাসে ভাষে
চারিদিকে তাই হাহাকার ॥

অরুণ হইয়া উষার গগনে
কাননে কাননে পরকাশে,
করুণ হইয়া নয়নে নয়নে
ছল ছল আঁখি জলে ভাসে।
গরল হইয়া বুকে বুকে জ্বলে
তরল হইয়া মেঘে মেঘে গলে
কঠোর সে যে গো পাষাণে পাষাণে
মশানে শানিত তরবার ॥

কণ্ঠে কণ্ঠে কূজনে গুঞ্জে
প্রেমের স্বপনে মধুময়
বিয়োগে বিরহে বিষজ্বালা রূপে
দেয় নিতি তার পরিচয়।
হেম পিঞ্জরে রুঢ় হয়ে জাগে
একতারা হয়ে পথে পথে মাগে
বাহুর নিগড়ে রচে সংসার
লোহার নিগড়ে কারাগার ॥

জ্যোতি হয়ে জাগে গ্রহ তারকায়
প্রীতি হয়ে মনে মনে রাজে
শ্যাম হয়ে জাগে তরু লতিকায়
ধূসর হইয়া মরুমাঝে।

রস হয়ে জাগে জীবনে জীবনে
রাখে জীবধারা ভুবনে ভুবনে
সম্বেদনায় আহিত চেতনা
দুখ বিনা সবি জড় ভার ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রতিধ্বনি।

—:*:—

নদীর ধারে নির্জ্জন সোপানের উপর ব'সে আমি আপন মনে মালা গাঁথছি। কখন যে অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া হ'তে বিলীন হ'য়ে গেছে তা' আমি জানতে পারি নি। কখন যে সন্ধ্যা নবোঢ়ার মত ধীর পাদক্ষেপে মলিন আঁচল দিয়ে পারের গ্রামকে "নিদ্রালস আঁখির পরে ভুরুর মত কালো" ক'রে দিয়ে গেছে তা' আমি আদৌ বুঝতে পারি নি। আনত-নেত্রে আপন মনে মালাই গাঁথছি। কি জানি কি ভেবে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি—সুমুখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

রাগে ও লজ্জায় আঁচল থেকে সব ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসংলগ্ন আঁচলকে ভাল করে সংযত করে রোষদীপ্ত কণ্ঠে বললাম—"এমন ভাবে চুরি ক'রে দেখতে একটু লজ্জা করে না!"

ক্ষণিক নীরব থেকে সজল-কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন—"আমি চুরি ক'রে দেখতে আসি নি। আমি এসেছি ক্ষমা চাইতে। তোমার ক্ষমা ব্যতীত আমার তৃষিত আত্মা সেই আঁধার দেশে শান্তি পাবে না। শুধু একটু ক্ষমার প্রার্থী। ক্ষমার চেয়ে আর বড় ধর্ম্ম নেই গো বন্ধু নেই।"

আমি রোষদীপ্ত কণ্ঠে বললাম—"ক্ষমা করতে পারবো না; জ্বালিও না আর এখান থেকে সরে যাও। শত্রু যে তা'কে আবার ক্ষমা!"

ধরণী তখন আঁধার হ'য়ে এসেছে। সরযূ নদীর অঙ্গ হ'তে গোধূলির কনক আভরণ খসে পড়েছে। ওপারের মন্দির হতে আরতির ঘণ্টা থেমে গেল। এমনভাবে থাকা উচিৎ নয় ভেবে আমি যখন যাবার জন্য ফিরেছি তখন তিনি করুণ স্বরে বলে উঠলেন—"ওগো বন্ধু! ক্ষমা ত করতে হয় শত্রুকেই; ঘৃণা—না না—এমন ভাবে আমায় ঘৃণা করে যেয়ো না। ক্ষমার্থী অতিথিকে নিরাশ ক'রো না। ক্ষমা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। যা' দিবে তাতে দেবতার নির্ম্মাল্যের চেয়েও নির্ম্মল থাকবে তুমি! দেবার মত জিনিষ দিয়ে কে কবে কাঙ্গাল হয়েছে—যা দেবে তা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়ে পূর্ণ করবে তোমার ঐ পবিত্রতা; কলঙ্ক তাতে তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। পবিত্রতায় আরও উজ্জ্বল হবে। অতিথিকে এমন ক'রে ফিরিয়ে দিয়ো না বন্ধু।" গর্ব্ব-দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"জ্বালিও না।"

রাগে তখন আমার সর্ব্বদেহ বায়ুসঞ্চালিত লতার মত কাঁপছিল। তাঁর সকল দুঃখ তখন যে অশ্রু হ'য়ে চোখ দিয়ে গলে পড়ছে, তা' আমি দেখতে পাই নি। রুদ্ধ বুকে মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহ্য করে তিনি শুধু এই কথা বললেন—"ক্ষমা করতে হবে না বন্ধু—হবে না! ক্ষমা করলেই ত তুমি আমায় ভুলে যাবে। ঘৃণ্য হয়ে তোমার অন্তরের অন্তরতম কোণে যদি আমার একটু স্থান হয়—আমার সেই ভালো ওগো—সেই ভাল। ঘৃণার জিনিষ হ'য়েও যদি আমি মাঝে মাঝে তোমার মনে একটু স্থান পাই, তা' হলে আমার তৃষিত আত্মা পরপারে গিয়েও শান্তি পাবে। ওগো বন্ধু! চিরদিনই যেন তোমার ঘৃণ্য হয়ে থাকতে পারি।"

কখন যে তিনি আমার সুমুখ হ'তে চলে গিয়েছেন, তা' আমি জানতে পারি নি। এক মনে কত কি ভাবছিলাম। জ্যোৎস্না যে নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, তা' দেখবার আমার অবসর হয় নি। হঠাৎ চমকে উঠে নদীর 'পরে চেয়ে দেখি—নদীর বুকে তিনি ভাসছেন। ছুটে গিয়ে যখন ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছি, তখন শুধু শুনতে পেলাম—"তবে যাইগো বন্ধু—যাই!"

মাথা রিমঝিম করে উঠ্‌ল—ঘাটের উপর বসে পড়ে গেলাম। সংজ্ঞালোপ হল বুঝি!

*　*　*　*　*　*

জ্ঞান যখন ফিরে এল—তখন প্রভাতের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উঠে বস্‌লেম; গায়ে বড় ব্যথা—প্রাণে তার চেয়েও অধিক—তুচ্ছ বলে যাকে পায়ে ঠেলেছি, সেই বড় হয়ে বুকে বড় বাধ্‌ছিল। এত অহঙ্কার আমার, এত গর্ব্ব! জীবনে যার প্রতি পদে ক্ষমার আবশ্যক সে বুঝল না ক্ষমার মহিমা! অন্ধ-আবেগে মনপ্রাণ হাহা করে উঠ্‌ল! কম্পিত-কণ্ঠে আপনার অজ্ঞাতে যেন অধীর হয়ে ডাকলেম—"ফিরে এস বন্ধু!—ফিরে এস! ক্ষমা কর আমি ক্ষমাপ্রার্থী তোমারি!"

দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে, কে উত্তর দিল,—"ক্ষমাপ্রার্থী তোমারি।"

সুযোগ তখন চলে গিয়েছে—আর আসবে কি কভু এ জীবনে!

শ্রীরেণুকা দাসী।

স্বাস্থ্যের কথা।

—:*:—

শিশু-শাসন।
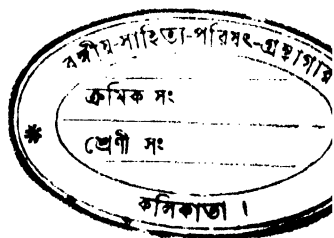
সকল দেশেই শিশুদিগকে শাসন করিবার প্রথা আছে, এবং এক এক দেশের প্রথার এক এক রকম বৈশিষ্ট্য আছে। শিশুরা স্বভাবতঃই দুষ্টামি করিতে ভালবাসে। কোন কোন শিশুর দুষ্টবুদ্ধির মাত্রা আবার অন্যান্য শিশুগণ অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক। দুষ্ট শিশুকে শাসন করিয়া সংযত রাখা অনেক পিতামাতা বা অভিভাবক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। শিশুদিগকে শাসন করিবার অনেক প্রণালী আছে। তন্মধ্যে শারীরিক দণ্ড (Corporal punishment) তিরস্কার, নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শারীরিক শাসন আবার নানাপ্রকার। প্রহার, বেত্রাঘাত, কর্ণমর্দ্দন, চড়, চাপড়,

কীল, ঘুসি প্রভৃতি শারীরিক দণ্ডের অন্তর্গত। পিতামাতা বা অভিভাবক খুব গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি লোক হইলে শুধু তিরস্কার করিয়াই তিনি শিশুদিগকে শাসন করিতে পারেন। আবার এমন শিশুও আছে, কোন প্রকার শাসনেই যাহাদিগকে সংযত করিতে পারা যায় না। লর্ড ক্লাইব শৈশবে এইরূপ শাসনের-অতীত বালক ছিলেন। অনেকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, spare the rod, spoil the child ; অর্থাৎ ছেলে দুষ্টামি করিলে তাহাকে শাসন করা চাই—বেত্রাঘাত করা চাই ; নচেৎ তাহার স্বভাব একেবারে এমন খারাপ হইয়া যাইবে, যে, তাহাকে আর মানুষ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে দুষ্ট বালকদের শাসন করিবার প্রধান উপায় কীল, চড়, চাপড় প্রভৃতি। নিতান্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালক হইলে আরও গুরুতর শাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, শুনিতে পাই, পড়াশুনা যতদূর হউক আর নাই হউক, শাসনের খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত ছিল। গুরুমহাশয় বলিলেই, বেত্রদণ্ডধারী বিরাটাকৃত. রক্তচক্ষু যমদূত সদৃশ এক অতিমানবমূর্ত্তি মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইত। বেত্রহীন গুরুমহাশয়ের কল্পনা করাও বোধ করি অসম্ভব ছিল। তা' ছাড়া, অতি দুষ্ট প্রকৃতির বালকগণকে শাসন করিবার জন্য গুরুমহাশয়ের ভাণ্ডারে 'নাড়ুগোপাল' প্রভৃতি এত রকমের শাসনের উপকরণ থাকিত যে, একালের অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালককেও শাসন করিবার জন্য স্কুলে কিম্বা পাঠশালে এত রকমারি বন্দোবস্ত নাই।

কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল সভ্য সমাজ হইতে এরূপ শিশু-শাসন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। শিশুদিগকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাহাদের যতটুকু উপকার হয় বলিয়া শাসনকর্ত্তারা মনে করেন, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অনিষ্টই হইয়া থাকে। মোটামুটি, আজকাল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিতেছেন যে, শিশুকে কঠোর শাসনাধীন করিয়া রাখিলে, কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি জাতীয় হিসাবে—ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। কেবল বোঝা নহে, অনেকে ইহা স্বীকারও করিতেছেন, এবং শিশু-শাসন প্রথা রহিত করিবার জন্য আন্দোলনও চলিতেছে। তাহার ফলও ফলিতেছে। বিদ্যায় শিশুদিগকে শাসন করিবার প্রথা বর্ব্বর আচরণ বলিয়া ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, শিশুদিগকে খুব কড়া শাসন করিলে, তাহাদের স্বাভাবিক

বৃত্তির বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কেবল শিশু নয়, সমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

শিশু-চিত্ত স্বাভাবতঃই চঞ্চল; তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। তাহারা যখন দুষ্টামি করে তখন কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্যই যে তাহা করে তাহা নয়—সেটা তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলিয়াই করে। সেই কার্য্যে তাহাদিগকে বাধা দিলে, তাহাদের নিজ স্বাভাবের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য করা হয়। ইহাতে যে তাহাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। সেই জন্য সভ্য দেশের সুবিবেচক লোকেরা মনে করেন, সমাজ-হিতার্থ, ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপে বাধা দেওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিশু-পালন-পদ্ধতির কথা আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি, ঐ সকল দেশে শিশুদিগকে বিলক্ষণ রূপে তাহাদের স্বভাবের অনুসরণ করিয়া চলিতে দেওয়া হয়। তাহাতে ঐ সকল দেশের শিশুদের দেহ ও মন সম্যক পুষ্টি লাভ করে। এবং পরিণামে তাহারা জগতের মহা উপকার সাধন করিতে পারে।

আমাদের দেশে এখনও এ সকল গুরুতর তত্ত্ব সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না,—শিশু চরিত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা এখনও এদেশে অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গদেশে কেবল মাত্র স্বাস্থ্য-সমাচারে মধ্যেমধ্যে এ সম্বন্ধে যা একটুআধটু আলোচনা হইয়া থাকে। সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনায় বাঙ্গলা দেশে শিশু-পালন-পদ্ধতির অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। শিশু-পালন প্রথার অনেক বিভাগ রহিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবেই হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে শাসন করিব কি করিব না—ইহা শিশু-পালন পদ্ধতির অন্যতম একটী বিভাগ। আজ আমরা কেবল এই বিভাগটিরই আলোচনা করিতে বসিয়াছি।

সুখের বিষয় সেকালের পাঠশালাও এখন নাই, সেকালের গুরুমহাশয়ও এখন নাই, সে কালের শিশু-শাসন প্রথাও এখন নাই। আমরা শৈশবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে যেরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতাম, আজকাল আর তাহা দেখিতে পাই না। ইহা মন্দের ভাল

বলিতে হইবে। স্কুলে এত কঠোর শাসনের ব্যবস্থা নাই; তবে ইয়োরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের স্কুলসমূহে শিশু-চরিত্র-গঠন ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি রহিয়াছে; সে সকল সংশোধন করিতে হইবে।

কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেরূপই হউক, বাড়ীর ব্যবস্থা আদৌ ভাল নয়। বাড়ীতে দেখিতে পাই, ছেলে মানুষ করিবার দুইটি মাত্র প্রথা আছে। এক, খুব কড়া শাসন; আর এক, শাসনের একান্তই অভাব নিরবচ্ছিন্ন আদর। এই দুইটার একটাও আমরা ভাল মনে করি না। যেখানে বাপ-মা ছেলেকে খুব সভ্যভব্য শান্তশিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় খুব কড়া শাসনের প্রবর্ত্তন করেন,—কথায় কথায় ছেলেকে উত্তম মধ্যম দিয়া থাকেন, সেখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়, ছেলে কতখানি সভ্য এবং শান্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না;—কিন্তু তাহার শরীর মন স্বভাবতঃ যেরূপভাবে পরিণতি লাভ করিতে পারিত, তাহা যে হয় না, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা যে তাহার দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর, তাহা তাহার পিতামাতা বুঝিতে না পারুন,—সমাজ-হিতৈষী, দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা অত্যধিক আদর পাওয়ায়, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ কোন হানি না হইলেও, তাহারা যে ঠিক মত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না, ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

সে যাহা হউক, শিশুকে শাসন করিবার জন্য, অথবা ঠিক শাসন না হইলেও, তাহাকে অভিভাবকের বশীভূত করিয়া রাখিবার জন্য, আর একটা উপায় অবলম্বন করা হয়। সেটা তাহার মনে ভয়ের ভাবের সৃষ্টি করা। জুজুর ভয়, ভূতের ভয়, হুতুমথুমোর ভয়, 'কন্ধ কাটা'র ভয়—প্রভৃতি নানারূপ কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া শিশুর চিত্তকে এমন মুষড়াইয়া দেওয়া হয় যে, সে তো মানুষ হইতেই পারে না,—অধিকন্তু তাহার নিকট হইতে কোন বড় কাজেরই আশা করা যায় না। এই কাল্পনিক ভয়ের ভাব তাহার মনে মরণ কাল পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এক কথায়, অতি শৈশবেই তাহার মনের growth একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মনের এই দুরবস্থা শরীরের উপরও কম কাজ করে না। মনের

সহিত তাহার শরীরও, যে ভাবে তাহার পুষ্টিলাভ করা উচিত ও সম্ভব ছিল, সে ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, খুড়া, জ্যেঠা, অন্যান্য বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ অভিভাবক বা আত্মীয়—ইচ্ছা পূর্ব্বক না হউক, কার্য্যক্ষেত্রে ত বটেই,—এজন্য দায়ী। বিশেষতঃ, দাসদাসীরা এ বিষয়ে আরও বেশী পরিমাণে দায়ী। শিক্ষার অভাব, বিবেচনার অভাব—এইরূপ ঘটনার কারণ। দাস-দাসীদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কারণ, প্রভুর ছেলেমেয়েদের জুজুর ভয় বা ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহারা শিশুর যে কতটা অনিষ্ট করে, তাহা তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু অনেক পিতামাতাও তাহা বুঝিতে পারে না। অথবা চিন্তা করিলে হয় ত বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা আদৌ চিন্তা করেন না। এমন কি, উচ্চ শিক্ষিত অনেক পিতামাতার এরূপ দৌর্ব্বল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কতদূর দুঃখের কথা, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? ইহাতে কেবল যে শিশুর অনিষ্ট হয় তাহা নহে,—ইহাতে সমাজেরও কতটা অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? আমাদের কাপুরুষতা ঐতিহাসিক ব্যাপার, এবং Proverbial; এই কাপুরুষতার জন্য শৈশবে ভূতের ও জুজুর বিভীষিকা যে কতখানি দায়ী, কে তাহা বলিবে? Physically fit হইলেও mentally আমরা যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে কথা ত আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যে সকল শিশু সৌভাগ্য ক্রমে এরূপ জুজুর ভয়ে, ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হইতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদের চিত্তবৃত্তি যতখানি সবল হইতে পারে, জুজুর ভয়ে ভীত শিশুর চিত্তবৃত্তি যে ঠিক সেই পরিমাণে সবল হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। আমাদের জাতীয় চরিত্র যতটুকু অধ্যয়ন করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশের লোকেরা যে সহসা কোন বড় কাজে, কিম্বা যে সব কাজে risk আছে সে সব কাজে হাত দিতে ভরসা করে না, তাহার একমাত্র না হউক প্রধান কারণ যে শৈশবের জুজুর ভয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈশবেই জুজুর ভয়ে বা ভূতের ভয়ে মনটা এমন ভয়প্রবণ হইয়া পড়ে যে, পরিণত বয়সে শত সহস্র অনুকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা কোন risky কাজে হাত দিতে ভয় পাই। শিক্ষা,

বয়স, প্রভৃতি কারণে পরিণত বয়সে ভূতের ভয় যদি নাও থাকে, তবু যে একটা ভয়ের ভাব থাকিয়া যায়, তাহা ঐ শৈশবের ভূতের ভয়েরই আকারান্তর বা প্রকারান্তর মাত্র। মাথার উপর কেহ থাকিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করিলে আমরা পারি না এমন কাজই নাই। কিন্তু পরিচালকতা করিতে, lead লইতে গেলে, আমরা এক হাত এগুই তো দশ হাত পিছাইয়া যাই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—শৈশবের সেই জুজুর ভয়।

এই মিথ্যা ভয় হইতে আমাদের শিশুদের, আমাদের জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। পিতামাতার অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। দাসদাসীদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহারা মিথ্যা জুজুর ভয় দেখাইয়া ছেলেপুলেদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে না পারে। তবে আমাদের কলঙ্ক দূর হইবে। আমরা শরীর ও মনের বলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইতে পারিব। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিব না। মনের এই গতি-প্রকৃতি, ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও, সাধারণের ইষ্টানিষ্টের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। সেই জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, দেশনেতৃগণ এ বিষয়ে অবিলম্বে লোকশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করুন।

শিশুর খাদ্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান জন্মিবার পূর্ব্বেই আমাদের সমস্ত আবশ্যকীয় পদার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাদর-সম্ভাষণে নবজাত শিশু আপ্যায়িত হয়। জন্মিবার পরই শিশু ক্ষুধা অনুভব করে ; কিন্তু দয়ালু ভগবান কিছুই অপূর্ণ রাখেন না। তাহার জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মাতৃস্তন্য পীযুষধারা সঞ্চারিত করেন। এখন উহাই শিশুর জীবন ধারণের উপায়। বাস্তবিক পক্ষেও মাতৃস্তন্য ব্যতীত শিশু আর কিছু পরিপাকও করিতে পারে না। কিন্তু আমরা নিজের বুদ্ধির প্রাথর্য্য হেতু এই ভগবান দত্ত আহার্য্যে অবহেলা করিয়া নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা করি। তাহার বিষময় ফল হতভাগ্য শিশু স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগ করিয়া থাকে।

জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ ও স্বাস্থ্য শৈশবের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলে, এবং নির্ম্মল বায়ু সেবন ও স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানে বাস করিলে, শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে নীরোগ ও সবল হইয়া সুখে জীবন যাপন করে। আর যদি এই সকল অবস্থা প্রতিকূল হয়, তবে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। মানসিক বৃত্তির স্ফুরণও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। দুর্ব্বল শরীরে উর্ব্বর মস্তিষ্ক কখনও কার্য্যকরী হয় না। শিশুর আহার, নিদ্রা, শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নির্ব্বাচন পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর ভবিষৎজীবনের সুখ ও শান্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। শিশুর ভবিষ্যৎজীবনে উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার আহারের উপরই সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি পতিত হয়। বাস্তবিক তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য কি?

শিশুর খাদ্য নির্ব্বাচন বাস্তবিকই জটিল বিষয় নহে। আমরা যদি ভগবান-দত্ত খাদ্যের উপর নির্ভর করি, তবে এই জটিল প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা হয়। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বিধিব্যবস্থার উপর আর আস্থা রাখি না। প্রকৃতির ব্যবস্থার পদে পদে আমরা বিদ্রোহী হই। দুঃখ ও দৈন্য তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রায় সমস্ত চিকিৎসক এই বিষয়ে একমত যে, মাতৃস্তন্যই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত খাদ্য, এই খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইলেই তাহার অকাল-মৃত্যু বা অকাল-বার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী। শিশুকালে যাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তাহারা দরিদ্রতা ও নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সুস্থ ও সবল দেহে সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিশু-মৃত্যুর হ্রাস ও আধিক্যের ইহাই একটি কারণ। সহর অপেক্ষা গ্রামে শিশু মৃত্যুর পরিমাণ কম হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই যে, গ্রামে এখনও অনেক শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়

এদেশে চিরকালই শিশুকে স্তন্য পান করাইতে জননী গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বরং তাহাদিগকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সহরে ক্রমশঃ কৃত্রিম দুগ্ধের প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জননী, দাইয়ের উপর শিশুর পরিচর্য্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার গ্রামেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অনেক মাতার স্তনে দুগ্ধ থাকে না।

তাঁহারাও বাজারের টিনের কৃত্রিম দুগ্ধ শিশুদিগের আহারের জন্য ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক মহিলা সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে শিশুগণকে স্তন্য প্রদান করেন না। এদেশেও কোনও কোনও স্থলে এই বিষময় রীতির প্রচলন দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য অনেক সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাতে দুই, তিন, চার ও পাঁচ বৎসরের শিশুর মৃত্যু সংখ্যা কিছু হ্রাস হইলেও এক বৎসর বয়সে শিশু মৃত্যুর কোনও হ্রাস দেখা যায় না। আজকাল স্ত্রীলোকগণের মধ্যে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দানে ঔদাসীন্যের বিষয়ে ডাক্তার হেরল্ড স্কারফিল্ড্ (Dr Harold Scarfield) লিখিয়াছেন—

"মাতার অক্ষমতাই শিশুর মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহা উচ্চ সভ্যতার ফল। বাস্তবিকই ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না যে, আধুনিক কালের মহিলাগণ দৈহিক উন্নতির বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়াও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলোক অপেক্ষা এই বিষয়ে অক্ষম হইতে পারে। আবার এই বিষয়ে সভ্যতার অর্থ কি? মাতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াও কি স্ত্রীলোকগণ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে পারেন না? এই বিষয়ে অক্ষমতা বা অনিচ্ছার মধ্যে কোনটি প্রধান কারণ তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই বিষয়ে ফ্যাসানের অনুবর্ত্তী হইয়া লোক কতটা কার্য্য করে তাহাও বিবেচনা করা উচিত। অনেকে স্তনদুগ্ধের উপকারিতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না। চিকিৎসকগণও এই অজ্ঞতার উৎসাহদাতা ছিলেন। পিতার অজ্ঞতাও ইহার একটি কারণ। ইহা শুনা যায় যে অনেক সময় পিতা ইচ্ছা করেন না যে, মাতা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁহারা সন্তানকে দুধের বোতল ও দাইয়ের নিকট রাখিয়া আমোদ প্রমোদে বাহির হইয়া যান। সাধারণ স্ত্রীলোক বোধ হয় মনে করেন যে কয়েক ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্য পান করান একটা বিশ্রী কার্য্য। তাঁহারা বুঝেন না যে সুস্থ মাতার শিশুকে স্তন্য দানে বাস্তবিকই আনন্দ অনুভূত হয়। কোনও কোনও স্ত্রীলোক শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে শিশুকে স্তন পান করাইতে রাজী নহেন।"

বাস্তবিকই ইহাপেক্ষা বর্ত্তমান সভ্যতার কলঙ্ক আর কিছু হইতে পারে না। ফ্যাসানের জন্য মাতৃত্বের পবিত্র গৌরব বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আমরা আজকাল স্ত্রীলোকের অর্দ্ধাংশ

মাত্র বিবাহ করি। অপরার্দ্ধ কোনও ঔষধের দোকানে দুধ খাওয়ার বোতল (Feeding bottle) রূপে রাখিতে হয়।

অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ অবস্থা, গুণ ও দোষ পরিজ্ঞাত না হইয়া, শিশুগণের জন্য কৃত্রিম দুগ্ধের ব্যবস্থা করেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, চিকিৎসকগণ কিরূপে মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার কোনওরূপ ব্যবস্থা করেন না। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, বিশেষ প্রকার খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

দেখা যাউক আমরা মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে কি কি ব্যবহার করিয়া থাকি। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গরু বা ছাগলের দুগ্ধ অথবা বাজারের টিনের জমাট দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এই সকল দুগ্ধের প্রভেদ অনুমিত হইবে।

	মাতৃদুগ্ধ শতকরা	গো দুগ্ধ শতকরা	ছাগ দুগ্ধ শতকরা	জমাট দুগ্ধ শতকরা
চর্ব্বি	৩·৫৪	৪·০	৪·৫	১·১
চিনি	৬·৭	৪·৫	৪·০	৫·২
আমিষ জাতীয় পদার্থ (Protein)	১·৫২০	৩·৫	৪·৫	·৮৭
লবণ	২·১০	·৭৫	·৬	·১৫
জল	৮৬·০৮৮	৮৭·০	৮৬·৪	৯২·১৬

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃদুগ্ধের সদৃশ নহে।

কোনও দুগ্ধই পরিবর্ত্তিত না করিয়া মাতৃদুগ্ধের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। অন্য দুগ্ধকে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট করিতে অনেক প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। কাহারও মতে গোদুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া পরে কিছু সর ও চিনি মিশাইলে উহা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হইবে।

বাজারের কৃত্রিম জমাট দুধ শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে চিনির মাত্রা অধিক। কিন্তু আমিষ জাতীয় উপাদান ও চর্ব্বির পরিমাণ কম। ইহাতে ভাইটামাইনও (Vitamine) কম আছে। জমাট দুধ খাইলে শিশু দেখতে নাদুস্ নুদুস্ হয় বটে কিন্তু জীবনী শক্তি অনেক কমিয়া যায়। ফলে শিশু ডাইরিয়া (Diarrhoea) ও রিকেট (Ricket) রোগে* সহজে আক্রান্ত হয়।

প্রায় সমস্ত চিকিৎসক জমাট দুগ্ধের বিরোধী। ডাক্তার লুই ষ্টার (Dr. Louis Star) বলেন—

যে সকল শিশু মিষ্ট জমাট দুগ্ধ পান করে তাহারা স্থূল-দেহ হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে অলস ও ম্লান হয়। তাহাদের শরীর আকারে বড় হইলেও তাহারা দৃঢ়কায় হয় না। তাহাদের রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাহাদের দাঁত গৌণে উঠে। এক বৎসর বয়স না হইতেই তাহাদের রিকেট রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বোতলে করিয়া শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইবার প্রথা এদেশে ক্রমশঃ প্রচার লাভ করিতেছে। ইহার ফলও শিশুগণের পক্ষে অনিষ্টজনক। তাহাতে শিশুর বদহজম হয়। এবং শিশু-বয়সের এই বদহজম প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সেও থাকিয়া যায়। যে সকল শিশু বোতলে করিয়া দুধ খায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ডাইরিয়া (Diarrhoea) রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুগণের জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত তাহাদের ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে প্রকৃত উপকারী ভগবান শিশুর জীবনের উপযোগী করিয়াই মাতৃ স্তনে পীযুষধারা সঞ্চিত রাখিয়া দেন। সেই অমৃতধারাতেই আমাদের জীবন বিকাশের সমস্ত উপাদান থাকে। অতএব স্তনদুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে সকল জননী সন্তানকে মাতৃ দুগ্ধ

* রিকেট রোগকে আমাদের দেশে পেঁচো পাওয়া বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে এই পীড়া হইয়া থাকে। এই রোগে এক বৎসরের শিশু ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় কখন বা স্বয়ং বসিয়া থাকে।

হইতে বঞ্চিত করেন, তাঁহারা শিশুগণের ভবিষ্য জীবনের অশুভের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। যাঁহারা বিলাসিতা বা অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য পবিত্র মাতৃত্বের গৌরব নষ্ট করেন তাঁহাদের কথা কি বলিব!! শিশুর ভাবী শুভাশুভ জনকজননীর উপর নির্ভর করে। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে নিজের দোষ ক্ষালন করা যায় না।

স্বাস্থ্যসমাচার।

অন্তঃপুর ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য।

(সংক্ষিপ্ত)

"পুরুষ, আচার সংযম প্রভৃতি জাতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া গা-ভাসান দিয়াছেন,—পাশ্চাত্য বিলাস-প্রবৃত্তি তাঁহাদের অস্থি-মজ্জায় অণুতে-অণুতে প্রবিষ্ট; তবুও যে সমাজ এখনও টেঁকিয়া আছে, হিন্দু এখনও হিন্দু, তাহার একমাত্র কারণ মায়েরা। আহা, ধৈর্য্যবতী বসুমতী-সদৃশা মায়েরা,—কত সহিষ্ণুতা, কত সংযম, কত ত্যাগ তাঁহাদের। কি অসীম গৌরবে স্বামীভক্তি, গুরুজন-সেবা, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতি সমাজ-প্রতিষ্ঠানের মূল স্তম্ভগুলি আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন; আজ তাঁহাদের পুণ্যেই ত সকলি এখনও রহিয়াছে। রসাতলে যায় নাই।"—এমনি ভাবের কথা বহুবার বহুস্থলে শুনিয়া আসিলাম। দুঃখ এই জন্য যে, বহু বিজ্ঞজনেও এ কথা বলেন, অথচ তেমন বিজ্ঞতা-প্রকাশক পদ্ধতি অবলম্বন করেন না। যে ভাবে আন্তরিকতার সহিত সকলদিকে সচেতন হইয়া কথা কহিলে তাহা অন্তর স্পর্শ করে, সে ভাবের অভাব দেখিতে পাই।

দেশের বুদ্ধি-সম্পদে একটা নিরেট স্তর দেখিতে পাই,—এখনও না কি তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ, ক্ষমতাও বেশী। তাঁহারা যে দলে মোটা, সেটা চক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের হৃদয়োচ্ছ্বাস-উচ্ছ্বসিত, কল্পনা-প্রবণ, একরোখা ও চোখ-রাঙানীর ভাব-প্রকাশক যুক্তি-তর্কগুলি স্বতঃই এমনি অনুমান জন্মায়, তাঁহারা বুদ্ধিতেও মোটা।

গতানুগতিক-পন্থাবলম্বী এই নিয়েট স্তরান্তর্গত বিজ্ঞেরা একরোখা বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হয়। তাঁহাদের সমস্ত অনুরাগ ও বিরাগ আপনাদের মতের অনুকূল ও প্রতিকূল দিকেই ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীকৃত। মিল-মিশের দিকে তাঁহারা আদৌ সম্মত নহেন।

উঁহারা যদি সমাজই হন, সে রাজপদ যথার্থই যদি তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত হয়,—আমার আলোচনাকে রাজদ্রোহ বলা চলিবে না। এ তো রাজার বিরুদ্ধে বৈধ আলোচনা।

হে সমাজ-রাজ! তোমার প্রভাব আছে, ক্ষমতা আছে,—সে ত স্বীকার করিলামই; অধিকন্তু, তোমার অধিকারও অস্বীকার করিতেছি না। তুমি সামান্য কে বলে? কিন্তু তোমার এইটুকু সমর্থন কেমন করিয়া করিব? তুমি আপন গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া ধর্ম্মের এলাকায় পদার্পণ কর কেন? তুমি জাতিবিশেষের, বর্ণবিশেষের অথবা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তোমার সাধ্যে যতটা কুলায়, বিশ্ব-বিধান হইতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচার অবলম্বন কর। তুমি তুমি হইয়া যাহা খুসি কর। যাহা তুমি নও, তাহার প্রভাব তোমার মধ্যে দাবী করিয়ো না। আজ দেখিতেছি যে জাতির শিরে তুমি অধিষ্ঠিত, তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে ক্ষুদ্রতা, ভীরুতা, নিশ্চেষ্টতা, অজ্ঞতা; সুতরাং তুমি যেখানে দাঁড়াইতে পাইয়াছ, সেখানে তোমার স্থান সঙ্কুলান অস্বাভাবিক নহে।—কিন্তু ধর্ম্ম কি, যে জানে, সে ত জানে, ধর্ম্ম তোমারই কালিমা-কলুষ লিপ্ত মনোদেহকে স্নান করাইবার শুদ্ধ করাইবার মত পাবন পুণ্য তীর্থ।—তুমি সে পথে ঘাঁটি বসাইবার কে? ধর্ম্ম ও তোমাতে বিস্তর প্রভেদ। যেটা তুমি, সেটা কখনই ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের পথ ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়া তুমি আপন অধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। জান না কি মনুষ্য-জীবন-বিকাশের জন্য ধর্ম্মের কতখানি প্রয়োজন! তোমার আওতায় সে যদি নষ্ট হয়, তুমি থাকিতে পার—জীবনটা কিন্তু বিকলাঙ্গ হইবে না কি?

যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেটাকে পাশ-কাটাইয়া গোঁজামিল দিয়া হিন্দুত্ব বলিয়া তোমাদের মর্জ্জি-মাফিক্ একটা অপরূপ কিছুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে কাল-সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাকে টানিয়া আনা, এ বালকের কল্পনায় শোভা পায়, মানুষের সঙ্কল্প এ ইচ্ছার উপর দাঁড়াইতে পারে না। কাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে? একটা ছবি, একটা স্মৃতি, না তোমার আপনার স্বার্থ? কোনটাই ত প্রতিষ্ঠা পাইবার নহে। বরং ধর্ম্মকে অবলম্বন কর, তুমি নিজেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে! হিন্দুত্ব গিয়াছে, খৃষ্টানী

ঢুকিয়াছে,—মুসলমানীর সংস্পর্শ তাড়াও—এ-সব প্রলাপ। বিকারের ঘোর কবে কাটিবে? এ সকল কবে দূর হইবে? কবে সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে, যেদিন বুঝিবে—চাই ধর্ম্ম। তাহার প্রাপ্তির পরিণাম নিজের প্রতিষ্ঠা!

স্বামীভক্তি, গুরুজন-সেবা, সন্তান-বাৎসল্য—এগুলি কোনও সমাজ-প্রতিষ্ঠানেরই মূল স্তম্ভ নহে—নারীর নারীত্বের বৈশিষ্ট্য। কোন দেশ, কোন জাতি দেখিয়াছ, যে দেশে নারীর কাছে স্বামী স্বামী নহে, গুরুজন গুরুজন নহে, সন্তান সন্তান নহে? এইগুলি ঘরের মেয়েতে থাকিলেই যদি হিন্দু হওয়া হয়, তবে তোমার চোখে রুষ, জার্ম্মাণ, কাবুলীওয়ালা প্রভেদ কেন? তবেত সকলেই হিন্দু। এস না সকলকে ডাকিয়া এক পংক্তিতে মিলন-মহোৎসবের ভোজে বসিয়া যাই।

তাহা তুমি পার না, অথচ ও-কথাও বলিয়া থাক। ইহার কারণ কি? মনের অগোচর পাপ নাই,—এ উচ্চারণের অভিসন্ধি জানি না তাহা নহে। বলিতে লজ্জা করে, এটা তোমাদের চাতুরী মাত্র। মেয়েদের কাণের কাছে ওই যে ধর্ম্মের নামে ঢাক বাজাইতেছ, উদ্দেশ্য তাহারা বাদ্যভাণ্ডে মুগ্ধ হউক। তুমি ফেরিওয়ালা, তোমার কাছেই বেসাতি করুক, জগতের হাট অজ্ঞাতই থাকিয়া যাক্। (?) সত্য মিথ্যা না বুঝিয়াই তাহাদের দিন কাটিয়া যাক্। ছলনায় প্রতারিত মেয়েরা তোমাদের কথায় আপন-আপন প্রকৃতি মধ্যেই পরিতুষ্ট হইয়া দিন কাটাক্। তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়া অন্ধকারে থাকুক। অথণ্ড আলস্যে আপন ধর্ম্মহীনতায় তোমরাও অটুট থাকিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহাদের দিকটা হইতে ত কখনও কোনও প্রকারে ব্যাঘাত পাইবে না।

হায় রে! ধর্ম্মও গিয়াছে, হিন্দুত্বও গিয়াছে। আছে কতটুকু? বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্ম-বৈশিষ্ট্য চৈতন্যের একটুখানি। তাহাও বিবিধ জড়ত্বের মধ্য-স্তরে নিহিত হইয়া আছে।—এটুকু আমাদের জাতিত্বের ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন; শাখা-পল্লব-রহিত গাছের প্রাণহীন দারুময় কাণ্ডটুকু মাত্র পড়িয়া আছে। যাহা নষ্ট হইবার নহে, সেইটুকুই আছে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর আমাদের জাতিত্বের কণ্ঠাবশেষ প্রাণটুকু সত্যই টেঁকিয়া নাই। এ ধর্ম্মহীন দেশে ধর্ম্মদ্রোহ অপরাধ স্ত্রী পুরুষ সমান ভাবেই অপরাধী। মুখ কাহারও নাই।

এতক্ষণে আমি খৃষ্টান মুসলমান বিবিধ আখ্যায় নিশ্চয়ই অভিহিত হইতেছি। ক্ষতি নাই। মানুষের মানুষ পরিচয়ই যথেষ্ট। তাহাতেই আমি গৌরব বোধ করি। জানি যে, পরের সহিত সেইটাই আমার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই নামটুকুর যতটা সার্থকতা সম্ভব, ততটা আমাতে পরিস্ফুট করিয়া যদি জগতের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারি, তবেই আমার দেহ-ধারণ উদ্দেশ্যের অনুকূল বুঝিব। সন্দেহের মরিচাশূন্য খাঁটি হিন্দুত্বের তকমা স্থানবিশেষে যে সম্মোহনই আনয়ন করুক, তাহার প্রভাব সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমান নহে। কালের কষ্টিপাথরের যাচাই হইলে, মানাইবার জায়গায় মানাইয়াছে বলিয়াই বিকাইবার জায়গায় বিকাইবে না। বাতিল হইবে।

কথাটা এই,—ধর্ম্মের ভিতর দিয়া আবার যতদিন না আমরা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পুরুষের তকমা-পাগ্‌ড়ি লোক-লোচনের অন্তরালেই রাখা ভাল। ও-গুলি পরিলে আমাদের শাস্ত্রীদের সঙের মতই দেখাইবে,—কেহই সেপাই বলিয়া মানিয়া লইবে না। পৃথিবীর মানুষ,—শুধু তাহারা কেন, যিনি মহাকালরূপে তাহাদের নাচাইতেছেন, তিনিও বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও কখনও আপনার মধ্যে স্থান দেন নাই, দিবেন না। তোমার আচার ব্যবহার বৈশিষ্ট্য কতদূর বৈজ্ঞানিক, সে বিচারে কাহারও কৌতূহল হইবে না, যতক্ষণ না এ সত্যটা সকলের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে যে, তুমি জীবনে শক্তিতে অটুট।

অতএব দোহাই তোমাদের, আর হিন্দুত্বের দোহাই পড়িয়া নিছক গলাবাজির জোরে আপনার ওজন ভারী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়ো না। ওজনের পরিমাণ-মাপক সূক্ষ্ম মানদণ্ড সবারই চোখের উপর রহিয়াছে;—সে অদৃশ্য অগোচর অথবা কল্পনার প্রাসাদের মত বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে। যদি সত্যই হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, প্রাণের ধর্ম্মে হিন্দুত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তোল। ফাঁকি দিয়া রাজা হওয়াও সম্ভবে,—মানুষ হওয়া চলে না।

দেশে ধর্ম্ম কি ভাবে আত্ম-বিকাশ করিতে চাহিতেছে, সে ভাবটাকে আয়ত্ত কর। সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর। ধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হউক। আজ অন্তরের ভিতরটা অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, তোমাদের ভিতর সত্যকার ধর্ম্ম আছে কি না?

ধর্ম্ম বিনা আমাদের জাতিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। পণ্ডিতগণ স্পষ্টই বলিতেছেন, যদি আমাদের স্নেহময়ী মাতাগণ, আমাদের গৃহ-দেবীগণ ঘরে-ঘরে পূজা-পাঠ ও ধর্ম্ম-আচরণ জাগাইয়া না রাখিতেন, আজ আর সংসারে আমাদের জাতিত্ব-মনুষ্যত্ব কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে আমরা এখনও পদদলিত হইয়াও বাঁচিয়া আছি। কিন্তু এইরূপ জীবন্মৃত হইয়া বাঁচা কি সুখের বিষয়! এর চেয়ে মৃত্যুই ত ভাল ছিল।

আমরা যথার্থই মাতার শক্তি-বলেই বাঁচিয়া ছিলাম ও আজও তাঁহাদের পুণ্য-আশীর্ব্বাদে বাঁচিয়া আছি,—অস্তিত্বটুকু হারাইয়া বসি নাই, এ কথা সত্য! কিন্তু সে কোন্ মাতা? তাঁহারা কি আমাদেরই মত ক্ষুদ্রপ্রাণা ও অশিক্ষিতা ছিলেন? সে মাতা দেবীমাতা ছিলেন। সেই মা—সে মায়ের স্নেহ-কোড়ে, স্তন্যরসে মানুষ হইয়া গিয়াছেন—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি! সে আজ স্বপ্ন! যে রক্ত-মাংস-পুষ্ট হইয়া সেই দেবময় জ্যোতির্ম্ময় ঋষিগণ বেদাদি দুর্ল্লভ গ্রন্থ-সকল রচনা দ্বারা পৃথিবীতে অমর মনের চির-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, সে রক্ত-মাংস কি আজিকার মাতার অঙ্গে আছে? থাকিলে, এই পরদাস জাত তাহাদিগকে কাম-কলুষিত নেত্রে দেখিতে পারে? আর লজ্জা অধিক কি পাইবে? বিবেকানন্দের মত আজন্ম-ব্রহ্মচারী মাতৃত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—Manufacturing mechine! যে স্বর্গচ্যুত স্নেহামৃতকণা অনাহারশীর্ণ, অজ্ঞানান্ধ কৃষক শ্রমজীবীতেও নারায়ণের অস্তিত্ব জাগ্রত দেখিয়া গিয়াছে, সেখানে সে পদপ্রান্তেও বর্ত্তমান অবস্থার হিন্দুনারী স্থান পায় নাই।—এতেও যদি না পায়, আরো কিসে লজ্জা পাইবে? এতেও যদি মাতৃত্ব আপন বিকৃত রূপ পরিহার করিবার আহ্বানের কষাঘাত স্পর্শ অনুভব করিতে না পারে, কিসে পারিবে?

আর গৃহদেবী? নারী-মহিমার সে আসনে অধিষ্ঠিতা এই মহর্ষিগণের অর্দ্ধাঙ্গিনীরাও অতুল শক্তি ধারণ করিতেন। আজন্ম সতীধর্ম্ম পালন করিয়া স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি নিজেরা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের স্বামী-সহবাস কেবল কুলরক্ষা করিবার জন্যই নহে;—তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে স্বামীর বল বুদ্ধি জ্ঞান দৃঢ়তর করিতেন;—তাহার ফল-স্বরূপ নিজেদের নারীত্ব সার্থক করিয়া মোক্ষের অধিকারিণী হইতেন। এই সত্য সনাতন অখণ্ড অটুট বেদ-ধর্ম্ম,—যাহা সব ধর্ম্মের শিরোমণি, যাহা সব ধর্ম্মের মূল,—যে ধর্ম্ম হইতে মহম্মদ, যীশু, বুদ্ধ আদি মহাপুরুষগণ জগতে সত্যের আলো জ্বালিয়া গিয়াছেন, সেই বেদের রচনাকর্ত্তা আমাদের আদি ঋষিগণ ভারত-জননীর কোলেই খেলা করিয়াছেন। মাতা তোমরা ধন্য,—তোমাদের শক্তি ধন্য—তোমাদের আত্মবল ও আত্মোৎসর্গে আজও ভারত নিজের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ।

এই ধর্ম্মবল, আত্মশক্তি ও সহৃদয়তা গুণেই তোমরা জগন্মাতা নাম পাইয়াছ। এই আত্ম-নির্ভর, আত্মদান-বলেই তোমরা বীর-জননী, বীর-বধূ নাম জগতে লাভ করিয়াছ। এই শক্তি-বলেই আজ তোমরা প্রাতঃস্মরণীয়া—আজ তোমরা আমাদের মহামান্যা হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই দেবীগণ—সুশিক্ষিতা সদাচারিণী ও সদ্‌গুণসম্পন্না জননীগণ—তাঁহারা সন্তানদিগকে ধর্ম্ম, নীতি ও বিদ্যাশিক্ষা নিজেরাই দিতেন; তাঁহারা স্বামী-পুত্রদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন। ঘরে-ঘরে গিয়া দুঃখী, আর্ত্ত, পীড়িতের দুঃখ নিবারণ করিতেন। সমাজের কল্যাণ দ্বারা দেশের শ্রী-বৃদ্ধি-সাধনে তৎপর থাকিতেন। দীন-দুঃখীর সন্তানগণ তাঁহাদের ক্রোড়ে আদরে লালিত-পালিত হইত, শিক্ষালাভ করিত। তাঁহারা ভিতর হইতেই স্বাধীনা ছিলেন। মুক্ত জল-বায়ুর সহিত মুক্ত মন লইয়া বহির্জগতের সকল প্রভাব মধ্যেই অগ্রসর হইতেন। সদ্‌গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মনের বিকাশ করিতেন। ঘরের ব্যবস্থাও সমস্তই তাঁহাদের নিজেদের হাতে থাকিত; সমস্ত কর্ম্ম নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতেন। এ সমস্তের জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হইত না।—পুরুষদের তাঁহাদিগকে লইয়া এমন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ার পরিবর্ত্তে, বরং তাঁহারাই অনেক সময় পুরুষের ভার লাঘব করিয়া দিতেন।

দ্বাপরেও সুভদ্রার মত মেয়েতে রথের ঘোড়া হাঁকাইয়াছেন।

তার পর কবে কোন্ সংক্ষণে রাশিচক্রে দুষ্ট গ্রহের সঞ্চার হইল,—গৃহলক্ষ্মীগণ ঘরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইলেন,—আপন প্রকৃতির বাহিরে দৃষ্টিপাতের ক্ষমতা তাঁহাদের অন্তর্হিত হইল,—বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল!—নারী-ধর্ম্ম সেই দিন হইতে আমাদের ঘর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, মাতৃত্ব পঙ্গু হইয়াছে। মর্ত্ত্যেই স্বর্গ ছিল,—আজ তাহাকে কল্পনা-রাজ্যে আকাঙ্ক্ষার খোরাক দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে। আমাদের সকলেরই এমন দুর্দ্দশার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

পতনের আশ্চর্য্য প্রভাব যে, সিংহের ন্যায় বলশালী পণ্ডিতগণও আজ আত্মগ্লানি সহ্য করিয়া বলিতেছেন, ঘরে দেবীগণ না থাকিলে আমরা মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইতাম।

কি ভয়ানক কথা! একস্থানে কৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন—"যে আপনাকে চিনিতে না পারে এবং আপনাকে স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে দেখিতে না পায়, সে কখনও ভগবানকে পাইতে পারে না।"—এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা কেবল অধঃপতন নয়, আত্মহত্যা! আপনাকে ভুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে পরকেও দেখিতে পাইবার শক্তি কি ভয়ঙ্কর সঙ্কুচিত! তাঁহারা এত বড় পণ্ডিত হইয়া এই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য তথ্য দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমাদের নারী-জাতির জাতিত্বের কোন্ উপযোগী অংশটা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ আছে? আজকাল আমাদের মাতাগণ আমাদের কোলে বসাইয়া কি শিক্ষা দিতেছেন? আজ কি তাঁহারা পুত্রকে

কোলে বসাইয়া প্রহ্লাদের ন্যায় ধার্ম্মিক পুত্র গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন, না অভিমন্যুর মত বীর গড়িতে চাহিতেছেন ? আজ কি আমাদের দেশে দশজনও বিদ্যাসাগর সমতুল্য সহৃদয় দেশহিতৈষী মহাত্মা ঘরে-ঘরে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছেন ?

কোথা হইতে মাতাগণ আজ সে নির্ম্মাণের উপযোগী শক্তি, উদারতা, মহাপ্রাণতা পাইবেন ? তাঁহারা এই কঠিনতর যুগে সঙ্কীর্ণ নব জীব-গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া, কিশোর বয়সেই বিবাহিতা হইয়া, বধূরূপে দাসীরূপে গৃহকার্য্য সমাধান করেন মাত্র। কুসংস্কারাচ্ছন্না অভিভাবিকারা মনোবৃত্তি হিসাবে নিজেরাই এখনও অগঠিতা—আমাদের মনোবৃত্তি বিকশিত করিয়া তুলিবার শিক্ষা কোথায় পাইবেন ? যন্ত্রের ন্যায় কেবল তাহাদের চালাইতেই চেষ্টা করেন। কুশিক্ষা যখন দিতে থাকেন, তখন কিছুই বুঝিতে পারেন না। কুশিক্ষার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিলে তখন তাঁহাদের হাহাকারের আর সীমা থাকে না। বালিকা বধূ,—প্রকৃতি তখনও তাহার অঙ্গে-অঙ্গে ধাবন, উল্লম্ফন প্রভৃতির লীলা-চাঞ্চল্য সমানে অপ্রতিহত বেগে স্ফুরিত করিতে চাহিতেছে ; আর সে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুক্ত বায়ু, উন্মুক্ত আকাশতল, সূর্য্য-চন্দ্রালোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবদ্ধ হইল সেখানে, যেখানে চলিতে ভয়, ফিরিতে ভয় ! চোখ মেলিয়া চাওয়া, হাসা, কথা কওয়া—সকলি ভয়ের শাসনে অষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা !

মানুষের যেমন চলন ধরণ স্বাভাবিক, তাহার বিপরীত প্রথায় অভ্যস্ত হইয়া সারা জীবনটাই আমাদের গঠিত হইতেছে ফল হইয়াছে এই যে, রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, জ্বালা, মলিনতা আমাদের আধুনিক নারী-হৃদয়কে মেঘের ন্যায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে ! ঘর আমরা নরকে পরিণত করিয়াছি। শিক্ষা, সম্মান, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন,—ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তির সকল উপায় কয়টা হইতেই বঞ্চিতা নারীর শান্তি, সন্তোষ, বুদ্ধি, শক্তি, সব লোপ পাইয়াছে। বাহিরের কার্য্যে স্বামীকে, পিতাকে সাহায্য করা দূরে থাক্, তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ঘরে আসিলেই শান্তিময়ী দেবীগণ উল্কামুখী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া, একবার ঘরের অনাটনের কথা, একবার ঝগড়ার কথা, একবার গহনার কথা—যত প্রকার গণ্ডগোল আসিতে পারে, উপস্থিত করিয়া, তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়া বসেন। আজকাল এ নিত্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর দিনে মানুষের অভাব একেই শতগুণ বাড়িয়াছে ; তার উপর পুরাকালের দেবীগণের মত মেয়েদের মধ্যে নিপুণা গৃহিণীপণার অভাবে হিন্দুর সেই প্রবাদ-বিখ্যাত গৃহসুখ কি সুখে দাঁড়াইয়াছে, সে ত চক্ষুর সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়াও সত্যকে যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বলা কঠিন।

দেশে এখন নিশ্চেষ্টতার যুগের অবসান হইয়াছে। অভিনব কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের স্রোত না ছুটাইলে উদ্ধার নাই। এই স্রোতে নারীকেও পুরুষের সহিত সমভাবে গা ভাসাইতে হইবে !

আর পরদার আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবকাশ তাঁহাদেরও নাই। ঘরের নিভৃত-কোণবাসিনী গৃহদেবীদিগকে ওই পদতল-শায়িনী অতুল ধৈর্য্যধারিণী মাতা বসুমতীর কথা মনে করিতে হইবে। তাঁহারা মায়ের কন্যা ;—কন্যা মাকে যত প্রাণের সহিত সেবা করিতে পারে, পুত্রে পারে না। মায়ের এই দুরবস্থার দুঃখাশ্রু মোচনের ভার মেয়েদের। যত প্রকারের দুঃখে জাতি অবসন্ন, সে সকলগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন হইয়া উঠিতে হইবে। প্রতিকারের উপায় তাঁহাদের ভাবিতে হইবে। সেই উপায় অবলম্বনে ফল-লাভে সচেষ্ট হইতে হইবে। চেষ্টা যাহাতে ফল-প্রসূ হয় তাহার জন্য শক্তি-সঞ্চয় করিতে হইবে।

একবার ঠাকুর-ঘরে গিয়া জপটুকু সারা, আর কায়ক্লেশে আত্মীয়-পরিজনকে দেখা—এইটুকুতেই তাহাদের নারীত্ব সমগ্র ;—জীবনের আর বিস্তৃত লক্ষ্য নাই,—এই মারাত্মক সংস্কারই নারী-জাতির দুর্গতির কারণ। এইজন্যই তাঁহারা সঙ্কীর্ণা—লোক-চরিত্রে, বিশ্ব রীতি নীতিতে অনভিজ্ঞা, দুর্ব্বল-প্রাণা হইয়া উঠিতেছেন। এইজন্যই তাঁহারা শক্তিহীনা, পরনির্ভরশীলা। এইজন্যই তাঁহাদের ঘাড়ের উপর অশ্রদ্ধার ভার যুগে-যুগে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি সেই জাতিকে, যাঁহারা "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"—শাস্ত্রের পাতায় জলজ্বলে অক্ষরে এ কথা লিখিয়া রাখিয়া, স্ফীতবক্ষ গৌরবে বসিয়া আছেন যে,—রাস্তার যেখানে একান্ত প্রয়োজন সেখানে No thoroughfare দেখিয়া মানুষে কতকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে? আর যাতায়াত সত্যই কি আটকায়? বাধ্যতার বোঝা চাপাইয়া ইউরোপের শাসন-তন্ত্রের অনুকরণে একটা জাতিকে অধীন রাখিবার চেষ্টার কুফল নিজেদের রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ত? তাঁহাদেরও অধীন জাতি যখন একটা রহিয়াছে, নিজেদের বহির্জীবনের অদৃষ্ট ভাবিয়া উষ্ণ হইবার সময় সে জাতিটার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি যেন পড়ে।

একরোখা কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ দৃষ্টি তাঁহাদেরও পড়িয়াছে। তাঁহারা সুবিধা পাইবার দিক হইতে মেয়েদের মানুষ করিতে খুবই উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন। তবে না কি মেয়েরা অমানুষ হইয়া এত দিন ছিল, সেও এতদিনকার তাঁহাদের এই সুবিধা পাইবার প্রবৃত্তির দিকের চেষ্টাতেই ;—তাই এ চেষ্টা তেমন জমিতেছে না। যে বিষ ঢালিয়াছ, তাহা আগে তুলিয়া লইতে হইবে ত! কথাটা অস্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; কারণ এ-কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আর ঝগড়া করা একই কথা। সেইটুকু আমি এড়াইয়া চলিতে চাই। *

'ভারতবর্ষ' শ্রীসত্যবালা দেবী।

---

* সেই ভাল! পঃ।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"
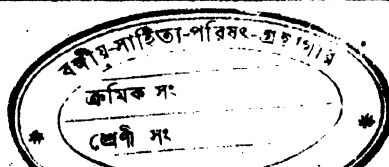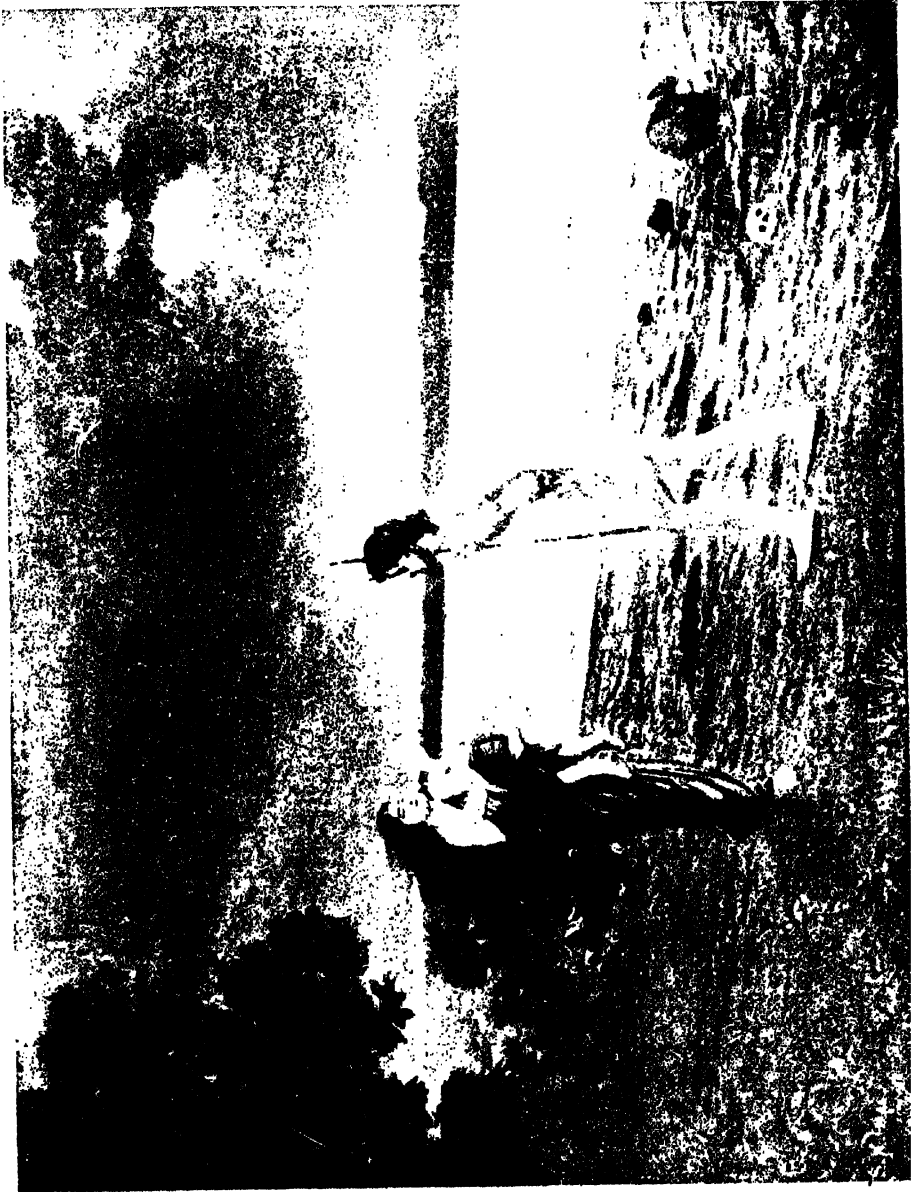
৪র্থ বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩২৭ সাল। { ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

কালোর আলো।

এত দিন কালো বলে ভাবিয়াছি যারে মনে মনে,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমায়েছি অতি সঙ্গোপনে
যাহার পূজার লাগি,
জ্বালি নি আলোক-শিখা জীবন-রজনী দীর্ঘ জাগি,
অদৃশ্য নিস্তব্ধ রুদ্ধ শ্বাসে
বাতাস বহিয়াছিল লুপ্তজ্যোতি অমার আকাশে,
হৃদয়ের বনকুঞ্জ-শাখা
কাঁপে নাই ক্ষণতরে, পক্ষ নাড়ি' একটি বলাকা
উড়ে নাই দিগন্তের পারে
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার চাপিয়া আছিল চারি ধারে!

যার লাগি জীবনের ব্যথা
—আজন্ম প্রকাশ-লুব্ধ নিভৃত গোপন ব্যাকুলতা
সাজাইল যৌতুকের ভার,
অশ্রুহার
মাণিকের মালা হ'ল চুপে
জীবন জ্বলিতেছিল এ দেউলে পূজারতি ধূপে
ধ্যান করি যার কালো রূপে !
যার লাগি কালো আঁখি-তারা
বার বার
সুনিবিড় ব্যাকুল আঁধার
গলাইয়া ঢেলেছিল এত অশ্রুধারা ;
এ কুন্তল
চূর্ণ আঁধারের মত নিবিড় অতল
বাড়াইয়াছিল অন্ধকার
কালো সাথে কালী হয়ে ধ্যান করি কালো দেবতার

সে আজ এসেছে আলো বেশে
জ্যোতির্ম্ময় হেসে,
—আলোকের বর্ণডালা ভরি
আনন্দের পুলকমঞ্জরী !
বর্ণে বর্ণে ইন্দ্রধনু ভাঙ্গি
সর্ব্ব অঙ্গ সর্ব্ব অণু সর্ব্ব রংএ দিল তার রাঙ্গি !

মরি মরি মরি
আলোকের স্বর্ণ রথ ভরি'
উচ্ছ্বসিত হল একি আনন্দের বান
রোমাঞ্চিত এ জগৎ, এ জীবন, এই দেহ প্রাণ !
আজ মনে হয়
আমার সঞ্চয়—
একান্ত আমার সেই নিশীথের আয়োজন-ভার
কোন মূল্য নাহি কিরে তার ?
সে কি তবে ব্যর্থ হয়ে গেছে অন্ধকারে
অথবা এ স্বর্ণালোক-দীপ্তশিখা চরিতার্থ করেছে তাহারে !

প্রিয়তমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র দুখানি বাহির করিয়া জুলিয়েন তাহা মিলাইয়া দেখিতেছিল। দুই হস্তাক্ষরে অসাধারণ ঐক্য; কোথাও বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, বিকৃত-মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত রোগী, মৃত্যুর কয় ঘণ্টা পূর্ব্বে—তাহার এমন নির্ভুল লেখা সম্ভব কি? কিন্তু ইহার বিপক্ষে প্রমাণই বা কি?—তাহার নিজের ধারণা কাহারও কাছে ত সে অসংশয় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে না !

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় এক নূতন চিন্তা উদয় হইল ; সে উঠিয়া অপনার মূল্যবান মাইক্রশ্‌কোপটী আনিয়া ক্রোড়পত্রখানি দেখিতে লাগিল।—ওকি—ওকি !—লিয়েনের মুখ দিয়া চীৎকারধ্বনি বাহির হইতেছিল—সে তাহা সম্বরণ করিয়া লইল।

এ পত্রখানি জাল, প্রথমে সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিলের দ্বারায় অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর কালী বুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অণুবীক্ষণে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। এ নিশ্চয় জাল !

লিয়েনের চোখে জল আসিতেছিল ; একটী অসহায় নারী ও শিশুকে নির্যাতন করিবার জন্য এত আয়োজন ? এত ষড়যন্ত্র—এত জুয়াচুরি ? ফ্রোলনের ধারণা ত ভুল নয়,—তাহার সকল কথাই তবে সত্য। রাক্ষস—পিশাচ, ইহাদের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। জুলিয়েনের চিন্তাশক্তি লোপ হইবার উপক্রম করিয়াছে, সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া কাগজগুলার দিকে চাহিয়া থাকিল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই স্মরণ হইল যে পত্র দুটি যথাস্থানে রাখিতে বিলম্ব হইলে অনর্থের সম্ভাবনা। সে কাগজ কয়খানি সাবধানে লইয়া আবার সেই ঘরে আসিল। সান্ধ্য আহারের টেবিল সাজাইয়া আলো দিয়া চাকরেরা চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া লিয়েন দেখিল—কেহ নাই, তখন ক্ষিপ্র হস্তে আলমারী খুলিয়া উইলখানি রাখিয়া দিল।

চাবি বন্ধ করিতেই—তখনো লিয়েন হাত সরায় নাই, পশ্চাৎ হইতে কে তাহার সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিল। "কে ?"—লিয়েন বিহ্বলভাবে ফিরিয়া দেখিল পাদরী হিউগো।

তিনি বলিলেন—"আমি—আমি অত ভয় পাইতে হইবে না।" জুলিয়েন কিন্তু এ কথায় আশ্বাস পাইল না, কোর্ট চ্যাপলিনকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা স্থির হইয়া গিয়াছিল। হপ মার্শেলের প্রিয় বন্ধু, এই জালের ব্যাপারে অগ্রণী,—এই পাদরী আজই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে যে। সে উদ্ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কোর্ট চ্যাপলিন—"আঃ কি করেন ?" বলিয়া তাহাকে নিকটস্থ সোফায় বসাইয়া নিজেও নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলেন। অজ্ঞাত বেদনায় লিয়েনের স্বর রুদ্ধ, উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও দারুণ অবসন্নতার জন্য সে অবশভাবে পড়িয়া থাকিল। পাদরী তাহার শীতল ও

শিথিল হস্তখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"হাঁ সবই দেখিয়াছি লেডি, কিন্তু তাহার জন্য আপনাকে এত কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। ও-চিঠি আমিও চিনি, হপ মার্শেলের হাতের অস্ত্র,—যাহা লইয়া যখন তখন তিনি আপনাকে যন্ত্রণা দেন ; সেটা নষ্ট করিবার ইচ্ছা,—এ যে আপনার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।"

এতক্ষণে আপনাকে কিছু সম্বরণ করিয়া লিয়েন বলিল,—"না না— তা নয়, তার জন্য কিছু নয়—আমায় অত ইতর ভাববেন না সার ফিষ্ট !"

"ও কি কথা, কে আপনাকে ইতর ভাবিয়াছে ? বসুন আপনি—আমিই ও-পত্রখানা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।"

"না তার দরকার নাই,—আমি তা চাই না, আপনি—" জুলিয়েন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পাদরীর মুখপানে চাহিয়াছিল, এ অদ্ভুত দয়ার মানে কি ?

তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে পাদরী বলিলেন, "আমায় বিশ্বাস হয় না বুঝি ? কেন আপনার স্মরণ নাই কি, যেদিন আপনি প্রথম এখানে আসেন—সেই দিনই বলিয়াছিলাম যে আমি আপনার বন্ধু।"

সে কথার উত্তর না দিয়া লিয়েন বলিল, "ব্যারণ কখন ফিরিবেন ?"

মৃদু হাসিয়া পাদরী বলিলেন, "ব্যারণ ? কি জানি, তিনি কখন ফিরিবেন সে কথা বলা দুঃসাধ্য। তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা জানেন না কি ? আপনি ত নির্ব্বোধ নন্, এত দিনেও নিজের অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই ?"

লিয়েন উত্তর দিল না ; পাদরী বলিলেন,—"আপনি জানেন না লেডি, ব্যারণ মাইনোর স্বভাব চিরদিনই এমনি, ভ্যালেরিকেও তিনি ভালবাসিতেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ও আপনার অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রভেদ। এ বাড়ীর যিনি প্রধান তিনি তাঁহার স্বপক্ষে ছিলেন আপনার অদৃষ্টে তিনি যে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন !"

ক্ষীণ স্বরে লিয়েন বলিল, "কেন এত কথা বলিতেছেন আমায় ?"

"তাহাও বুঝিলেন না ? আপনার অবস্থা যে কেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য। আমি যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে আপনি আর বেশী দিন শোনওয়ার্থে বাস করিতে পারিবেন না, বাধ্য হইয়াই রুডিস ডর্কে ফিরিতে হইবে আপনাকে !"

অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে লিয়েন বলিল,—"আমি তাহার জন্যও প্রস্তুত আছি মহাত্মা! এ দিনের কথা আমি ভাবি—"

অৰ্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া লিয়েন তাহার আসনের গায়ে মাথা রাখিল। এই অনাত্মীয় লোকটির সহানুভূতি তাহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতেছিল। কোর্ট চ্যাপলিনও খানিকক্ষণ নির্ব্বাক থাকিলেন। সম্মুখে ঘড়ি বাজিতেছিল; সহসা পাদরী বলিয়া উঠিলেন, "একটি কথা, প্রিয় লেডি, একটি কথা আমার,—শুনিবেন কি?"

লিয়েন উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার কথায় বাধ্য হইয়া বসিয়া বলিল "আমার না শুনিবার কি কারণ থাকিবে বলুন, কিন্তু ব্যারণ—"

"ইহার মধ্যে ব্যারণের কোন যোগ নাই, আপনার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি তাহাই বলিতেছিলাম, আপনি রুডিস ডর্কে গিয়া আমায় স্মরণ রাখিবেন লেডি!"

"রুডিস ডর্কে গিয়া স্মরণ?" এ আর নূতন কথা কি স্যার প্রিষ্ট! জীবনে অনেক জিনিষই শেষ হয় কিন্তু স্মৃতির শেষ হয় কি? জানি না—জানি না, ইহা সুখের কি দুঃখের তাহা জানি না।"

লিয়েনের বক্তব্য শেষের নিঃশ্বাসটি লক্ষ্য করিয়া চ্যাপলিন বলিলেন, "যাহা দুঃখের, যে স্মৃতির সহিত শুধু বিষাদেরই সম্বন্ধ, তাহা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিবেন। হিংসা কুটিলতা ঘৃণা অশ্রদ্ধা—এ সকল ভুলিয়া মনে রাখিবেন শুধু স্নেহ—শুধু ভালবাসা—"

বাধা দিয়া ম্লান হাসির সহিত লিয়েন বলিল, "কোথায় স্নেহ, কোথায় ভালবাসা? পৃথিবীতে যে ও-জিনিসগুলা বড় দুর্ল্লভ মহাত্মা!"

পাদ্রি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সর্ব্বত্র নয়—আপনি যদি লক্ষ্য করিতেন—"

"কোন প্রয়োজন নাই। যাক্, আপনার আর কিছু বলিবার আছে?"

বিনীত কণ্ঠে চাপলিন্ বলিলেন, "একটু বসুন না লেডি, এখন ত আপনার কোন কাজ নাই; একটু রুডিস্ ডর্কের গল্প করুন না। আমার সেখানে যাইবার ইচ্ছা আছে—আমি যাইব, শোন্ওয়ার্থ আর আমার ভাল লাগিতেছে না।"

লিয়েন বিস্মিত হইল ; পাদরীর মুখ দেখিয়া তাহাতে ত কোন ছলনার আভাষ পাওয়া যায় না। কি এ? হঠাৎ রুডিস্ ডর্কের উপর তাঁহার অনুগ্রহ কেন? সে বলিল, "কিন্তু সেখানে গিয়া বোধহয় আপনি সুখী হইবেন না ; ম্যাগ্‌নস্ একটি প্রচণ্ড প্রোটেষ্টাণ্ট, আন্তরিক ও একগুঁয়ে জেদী মানুষ,—"

"তা হউক ; লেডি জুলিয়েন, শুধু আপনি যদি একটু কৃপা করেন—একটু মিষ্ট কথা,—একটু"—

পাদরীর স্বর কাঁপিতেছিল, লিয়েন চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিতেছে, মুখ গভীর আবেগে রক্তবর্ণ। "কি বলিতেছেন আপনি?"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন হিউগো তাহার হাত দুটি ধরিয়া ত্বরিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দাঁড়াও, আমি কি বলিতে চাই সেটুকু শুনিয়া যাও,—আমার দিকে তুমি কখনও চোখ তুলিয়া চাহ না আমি যে একটি মানুষ—তোমার সম্মুখেই থাকি, তা পর্য্যন্ত তোমার লক্ষ্য হয় নাই। কিন্তু আমি যে তাহার বিপরীত পক্ষেই চলিতেছি লেডি! যে দিন তোমায় দেখিয়াছি—সেই মিনিটে, উঃ জুলিয়েন, এমনি তুমি, জাননা, তোমার ধারণাতেও নাই যে আমার সে ভালবাসা কি। দিনে দিনে তাহা কোন পথে অগ্রসর—প্রতি দিন প্রতি কথায়—তোমায় যত দেখিয়াছি যত বুঝিয়াছি—"

"থামুন আর না।" জুলিয়েন সবেগে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনার সাহসে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আপনি একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোককে এ কদর্য্য কথা শোনাইলেন কিরূপে?"

"কদর্য্য! কদর্য্য তুমি কাহাকে বল? পৃথিবীতে কদর্য্য বলিয়া কোন বিশেষ সামগ্রী নাই, মানুষের উদ্দেশ্যেই সৎ বা অসৎ প্রকৃতির ছায়ায় বিষয় কিম্বা ঘটনার আকৃতির যত পরিবর্ত্তন, আমি বলিতে পারি—আমার জীবনে যদি কিছু সত্য ও নির্ম্মলতা থাকে—"

"থাক্ থাক্, আর আমি শুনিতে চাই না। আমার স্বামী —"

উত্তেজিত স্বরে কোর্ট চ্যাপ্‌লিন বলিলেন, "তোমার স্বামী কাহাকে বলিতেছ,—ব্যারণ মাইনো? সেই চঞ্চল মতি—স্বার্থপর যুবক, যে নিজের সামান্য হিংসাবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্য

তোমার মত এমন দুর্ল্লভ প্রাণকে অকাতরে বলি দিয়াছে, তুমি যে কি—সেটুকু বুঝিবার পর্য্যন্ত যাহার ক্ষমতা নাই—"

এইখানে লিয়েনের কৌতূহল প্রবৃত্তি মাথা তুলিল, খানিকক্ষণ পূর্ব্বে যে সন্দেহটা তাহাকে নির্দ্দেশ-শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়াছিল, এ যে সেই প্রসঙ্গ! সে মুখ তুলিয়া বলিল, "সে আবার কি? প্রতিহিংসার জন্য—একথার অর্থ?"

"কেন সে কথা কি তুমি শোন নাই এখনো? তোমায় তিনি কেন বিবাহ করেন জান না?"

"আমি জানি যে তাহার সংসারে গৃহিণী ছিল না—তাই।"

"হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া পাদরী বলিলেন, "পাগল্—পাগল্! এ কথা তোমায় কে বলিল? এ সংসারে কর্ত্তা বল গৃহিণী বল—সব সেই বৃদ্ধ হপ্‌মার্শেল, তার জন্য—"

শুষ্ক স্বরে লিয়েন বলিল,—"আর লিয়ো, তার জন্যও—"

"মাতৃ বিয়োগের দুই বৎসর পরে? এ সব মিথ্যা ধারণা তুমি পাইলে কোথায় বল দেখি? ও সব ভুল কথা, তোমায় ফাঁকি দেওয়া মাত্র। ডচেস্ অফ্ মন্টিথের কথা তুমি জান ত?"

অতি মৃদুস্বরে লিয়েন বলিল, "ঠিক্ জানিনা, কথাটা কি?"

"কথা অনেক, তুমি একটু বসিবে না কি?" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া পাদরী সেই আসনে বসাইয়া বলিলেন, "সে একটি প্রকাণ্ড উপন্যাস, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলে বুঝিবে যে তোমার সেই স্বামিটির স্বভাব ও অভ্যাস কেমন?" ইহার পর ব্যারণের কৈশোর কাল হইতে সমস্ত জীবনের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন তরল মতি যুবকের যত উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহার পর কুমারী অফেলিয়ার সহিত প্রেমের ইতিহাস সে প্রেমে ব্যারণের তন্ময়তা, বিবাহ-সম্বন্ধ ও পরে ডিউক অফ্ মন্টিথের আবির্ভাবে ব্যারণের প্রত্যাখ্যান; এ সমস্ত সালঙ্কারে বিবৃত করিয়া চ্যাপ্‌লিন রাওয়েলের নিদারুণ মনস্তাপের বর্ণনা দিতেও ভুলিলেন না। সেই অবস্থাতেই হপ্‌মার্শেলের চেষ্টায় ভ্যালেরির সহিত বিবাহ ও ক্রমশঃ তাঁহার সেই হতাশ প্রণয়ের বিকৃত পরিণাম—নিদারুণ ক্রোধও ডচেসের প্রতি

জিঘাংসার বিবরণে নানারূপ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে সে প্রেম এখনও ব্যারণের চিত্তে তেমনি বদ্ধমূল, শুধু তাহার অব্যবস্থিত মতির সহসা উচ্ছ্বসিত প্রতিহিংসা বৃত্তির উগ্রতার জনাই তিনি লিয়েনের জননীকে প্রলোভন দিয়া তাহাকে লইয়া বিবাহের অভিনয়ে এই খেয়ালের খেলা করিয়াছেন। এদিকে কিন্তু ডচেসের অবস্থাও সংঘাতিক, আহত হইয়া তিনি যেন আরও উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন, যে কোনও প্রকারে হোক রাওয়েলকে তিনি আবার আকর্ষণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এমন ব্যাপারে কি হওয়া সম্ভব, চিরদিনের বাঞ্ছিতা সুন্দরীর প্রেমের প্রলোভন, মদিরার ন্যায় ব্যারণকে মোহাকৃষ্ট করিতেছে,—ইহাও তিনি জানাইয়া দিলেন।

চক্ষু মুদিয়া অবসন্নভাবে জুলিয়েন সেই সব কথা শুনিতেছিল। স্বামীর সম্বন্ধে যতটুকু সে অশ্রদ্ধা করিবার মত কোন সামগ্রী দেখিতে পায় নাই। আজ তাঁহার এই নূতন ইতিহাসে সে স্তম্ভিত হইল। তাহাকে ত তিনি ভালবাসিয়া বিবাহ করেন নাই, সে জনা তাঁহাকে সে বিশ্বাসঘাতক বা হৃদয়হীন ভাবিত না, বরং সরলভাবে সকল কথা স্বীকারের জনা তাঁহাকে সে বড় বেশী শ্রদ্ধা করিত। আজ এই নির্ম্মম খেয়ালের অদ্ভুত কথায় তাহার অন্তরের নিভৃত শান্তি-আশ্রয়খানি বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। রাওয়েলের সেই পরম সুন্দর হাস্যোদ্ভাসিত মূর্ত্তি, সহসা যেন মসী-কৃষ্ণ আঁধার ছায়ায় ঢাকিয়া মলিন হইয়া উঠিল। 'স্বামী—প্রিয়তম! আমি কি দোষ করিয়াছিলাম যে এত লাঞ্ছনা দিলে আমায়?' লিয়েন আজ আপনার জ্ঞান বা অন্তরের নিকট কিছু জানিতে চাহিল না, শুধু সেই কলঙ্কম্লান স্বামীর উদ্দেশেই তাহার বুকের সমস্ত রোদন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এত গ্লানি এত মনস্তাপের পরও যে সে তাঁহাকে প্রিয়তম ভিন্ন আর কোন নাম দিতে পারিতেছে না যে!

তাহার মস্তিষ্কের চৈতন্য যেন লুপ্ত প্রায়, অবসন্ন দেহ যেন ধীরে ধীরে আসনে লুটাইয়া পড়িল। কথা শেষ করিয়া কোর্ট চ্যাপলিন তাহার দিকেই চাহিয়াছিলেন, এই পরম নিশ্চেষ্ট নীরবতাকে অন্য ভাবে দেখিয়া তিনি তাহার আসনে আসিয়া বসিলেন, "লিয়েন—লিয়েন,—অমন করিও না।" সাদরে তাহার কপালে হাত দিয়া পাদরী আবার বলিলেন, "এই দুর্ব্বল প্রাণ, আর কত সহিবে? শুধু আঘাত—শুধু অপমান,—মাথাটির ভিতর বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!"

লিয়েন চমকিত হইল, শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল "কি ?"

"কিছু না, তুমি এইখানে স্থির হইয়া থাকে, আমি তোমায় একটু বাতাস দিই।" বলিতে বলিতে মুগ্ধ ধর্ম্মযাজক তাহাকে ক্রোড়ের উপর শোয়াইয়া মাথার নিকট মুখ নীচু করিয়া বলিলেন "এইখানে—এইখানে প্রাণাধিকে, তুমি যে এইখানের ধন !"

"উঃ—উঃ, রাওয়েল !—" লিয়েন সভয়ে উঠিতে উদ্যত হইতে, চ্যাপলিন আবার তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "কি হইল কেন—লিয়েন !"

উত্তেজনার বিকট স্পর্শে উন্মাদপ্রায় লিয়েন প্রচণ্ড বলে পাদরীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল "রাওয়েল—রাওয়েল !"

"কোথায় রাওয়েল ? লেডি জুলিয়েন, তুমি কাহাকে ডাকিতেছ ? তিনি যে এতক্ষণ মণ্টিথ প্রাসাদে বসিয়া তাঁহার পুরাতন প্রণয়িনীর সহিত প্রেমের নূতন অধ্যায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ! এখনও তুমি সেই পশুটাকে স্বামী বলিয়া ভাব ?"

মোহান্ধ পাদরীর দুঃসাহসে লিয়েনের শিথিল অন্তঃকরণে আবার তাহার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়াছিল ; সে তাঁহার ঈর্ষ্যাবিকৃত স্বরের উপর স্বর তুলিয়া সক্রোধে বলিল, "নিশ্চয় ভাবি, তিনি আমার স্বামী, তাঁর দোষগুণ যাই থাক্—তিনি আমার স্বামীই ! আর আপনি—আপনি কোন্ মুখে তাঁর নিন্দা করেন ? তিনি আর যাই হোন্—ভণ্ড নন্, কুটিল, খল, মিথ্যাবাদী নন্। জালিয়াৎ পাদরি ! আমার স্বামী জুয়াচুরিকে প্রাণপণে ঘৃণা করেন, তিনি দয়ালু, তাঁহার—"

কোর্ট চ্যাপলিন উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া জুলিয়েনের নিকট আসিয়া বিহ্বল চঞ্চল কণ্ঠে বলিলেন, "কী ! কি বলিলে—আমি জালিয়াৎ ?"

"হাঁ নিশ্চয়, আপনি গিলবার্ট মাইনোর শেষ পত্রখানির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট, আর সে পত্র যে জাল তাহা আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।"

"তুমি—তুমি তাহা প্রমাণ করিবে জুলিয়েন, সে উইলের তুমি কি জান ?"

"সব জানি।"

পাদরীর মুখে রক্তচিহ্ন ছিল না, কথা কহিতে জিহ্বা জড়াইয়া যাইতেছিল, তবু তিনি জোর করিয়া বলিলেন "মিথ্যা কথা, ভুল তোমার,— সে উইল জাল নয়।"

"নিশ্চয় জাল ! আমার মাইক্রশ কোপ মিথ্যা কথা বলে না—ভুলও বোঝে না।"

"মাইক্রশ কোপ ?" পাদরীর মুখ দিয়া একটী উচ্চস্বর বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন ঝড়ের প্রবল শব্দ তাই তাহা বাহিরের কাহারও কানে যায় নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

লিয়েন অবসর বুঝিয়া সেখান হইতে পলায়নের উপক্রম করিল। একবার সেই আলমারীর দিকে চাহিয়া বলিল "ঐ আপনাদের চাবী, আমি উহা হইতে কিছু লই নাই—শুধু উইলটা দেখিয়াছি মাত্র।" তাহার পর পাদরীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থির পদে দ্বারের দিকে চলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার কণ্ঠের আর্ত্তস্বর উঠিল, "দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটি কথা।" মুহূর্ত্তে লিয়েন দেখিল, তাহার পথরোধ করিয়া কোর্ট চ্যাপলিন তাহার সম্মুখে পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন।

"কি ভয়ানক !" লিয়েনের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উর্দ্ধোত্থিত করে চ্যাপলিন বলিলেন "ভয়ানক নয়—কিছুই ভয়ানক নয়। সুন্দরি,—নারীকুলোত্তমে,—তোমার ভীষণত্বই তোমার সৌন্দর্য্য। বুদ্ধিমতি, আমি তোমার নিকট পরাস্ত,—"

লিয়েন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে করিতে উদ্যত হইতে চ্যাপলিন তাহার হাতখানি নিজের ললাটে চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রথম হইতেই রোটাস লিপির প্রতি তুমি প্রসন্না, গেব্রিয়েলের মস্ক হওয়ায় তোমার আপত্তি, এ সকল আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি জানিতাম না,—ওঃ জুলিয়েন, আমার লিয়েন, ! আমি তোমায় সব বলিতেছি শোন !"

লিয়েন তাঁহার হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর সরোষে বলিল "উঃ হাত ছাড়ুন।"

হাতে আরও চাপ দিয়া চ্যাপলিন বলিলেন "ছাড়িতেছি ভয় নাই ;—কিন্তু আরও কয়টি কথা তুমি যে আমায় শুধু জালিয়াৎ—শুধু মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানিবে, এ তো আমি সহ্য করিতে পারিব না লিয়েন। স্বীকার করি—ও-চিঠির সব কথাই আমি জানি, এমন কি

গিলবার্টের প্রত্যেক অক্ষরের সহিত তাঁহার লেখার ছাঁদের সমস্ত খুঁটি-নাটি মিলাইয়া, আমি ও পত্র রচনা করি। কাচের ওপারে গিল্‌বার্টের লেখা রাখিয়া এপার হইতে এক একটি অক্ষর তোলা, সে যে কত দিনে কত পরিশ্রমে করি—"

"তাহাতে অবশ্য আপনার স্বার্থ ছিল।"

"ছিল—ছিল, সেই কথাই তো তোমায় বলিতে চাই,—শুধু নীচতা নয় তাহা। তোমারও অজ্ঞাত নাই জুলিয়েন, ক্যাথলিক পাদরি বা ধর্ম্মলিপ্সু জীবন যাদের, তারা সর্ব্বাগ্রে কেবল স্বার্থ খোঁজে তা ত তুমি জান। গিল্‌বার্ট মাইনোর দ্বারা অধঃপতিত ঐ দুটি জীবন, ঐ নিরপরাধ শিশু আর সেই অপবিত্রা নারী; ইহাদের মুক্তির আশাতেই আমি ও চিঠির ব্যাপারে লিপ্ত হই। মঠের পবিত্র ভবনে লইয়া যাইতে পারিলে যে ঐ দুটি আত্মার স্বর্গদ্বার মুক্ত হইত,—এ বিশ্বাস আমি করি। বল তুমি আমার ধর্ম্ম বিশ্বাসে এ কি আমি অন্যায় করিয়াছি?"

তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধৈর্য্যভাবে লিয়েন বলিল, "আপনার ন্যায়-অন্যায় আমি জানিনা, আপনি আমার পথ ছাড়িয়া দিন।"

"তাহার পূর্ব্বে তুমি আমার পথ দেখাইয়া দাও, বল আমি কোথায় যাই—স্বর্গে না নরকে? ব্যারণের সহিত বিচ্ছেদের পর;—লিয়েন, এতদিন শুধু ধর্ম্ম লইয়া দিন কাটাইয়াছি —আজি সে ধর্ম্ম—সে স্বর্গ,—সব সব—আমার সমস্ত আজ তুমি! তোমায় যদি না পাই, তুমি যদি দয়া না কর, তবে কোন্ নরকে যে পড়িব, —"

লিয়েন স্তম্ভিত, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, সে চারি দিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া আরও ভীত হইল। কাতর স্বরে বলিল,—"হাত ছাড়ুন স্যার প্রিষ্ট!"

পাদরী তবু হাত ছাড়িলেন না, দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "বল তবে তুমি আমার হইবে? আমি প্রোটেষ্টাণ্ট হইব, কাউণ্ট ম্যাগ্‌নসের পায়ে ধরিব,—আর গেব্রিয়েলের জন্য যা বলিবে তাহাই করিব,—বল আমায় বিবাহ করিবে? জানি, আমি তোমার পদস্পর্শের যোগ্য নই,—তবু—তবু প্রিয়তম!—"

লিয়েন অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, পাদরী তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। জুলিয়েন সবলে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না। তখন মুক্ত-কণ্ঠে ডাকিল, "বাঁচাও—আমায় বাঁচাও! লিয়ো—কোথায়—"

এবার চাপ্‌লিন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, বাহিরে ঝড়ের উপরেও ব্যারণের তেজস্বী অশ্বের পদধ্বনি উঠিয়াছে। লিয়েন বলিয়া উঠিল, "রাওয়েল্, ঐ রাওয়েল আসিয়াছেন!"

"এখনও রাওয়েল? এতর পরও রাওয়েল তোমার এত আপন? আমার কিছুই তোমার কানে গেল না তবে? লেডি জুলিয়েন, জান তুমি—হিউগো তোমার শত্রুতাও করিতে পারে?"

"আপনার যা খুসি করুন।" বলিয়া লিয়েন দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিল, ইত্যবসরে কোর্টচ্যাপ্‌লিন আল্‌মারি খুলিয়া সেই উইল্ ও কাউণ্টেসের লিখিত পত্রখানি লইয়া বলিলেন, "যাইবার পূর্ব্বে এই রঙ্গটি দেখিয়া যাও তবে, এ দিকে দ্যাখ একবার!"

পাদরী তখন কাগজগুলি চিম্‌নির আগুনে ফেলিয়া দিয়া দানবের ন্যায় পৈশাচিক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া ছিলেন, মুখে নীরব ভীষণ হাসি। লিয়েন সেইখানেই থামিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও কি করিলেন? না না—তাহা হইবে না! বলিতে বলিতে সে চিম্‌নির নিকট আসিতেই পাদরী আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। লিয়েন বলিল, "কেন আপনি উহা নষ্ট করিলেন? কে বলিল আপনাকে,—আমি চাহি না"

"কিন্তু আমি চাহি। ঐ পত্র ও উইল নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে আমার কতখানি মুঠার ভিতর আসিয়াছ তাহা বুঝিতেছ না? গেব্রিয়েলের দিকে যে তোমার কতখানি টান্, এ উইল নষ্টে তোমার যথেষ্ট আবশ্যক,—এ কথা ডচেস্ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমার মার চিঠি,—তাহা তুমি ভিন্ন আর কে চুরি করিতে পারে?"

"উঃ কি নষ্ট বুদ্ধি আপনার!"

জুতার দ্বারায় কাগজ পোড়া ছাইগুলা আগুনের উপর ঠেলিয়া দিয়া পাদরী বলিলেন "বোঝ এখনও বোঝ, ইহার পরও আমি একা তোমায় এ অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারি। তোমার স্বামী আসিয়া এ সব দেখিলে কি বলিবেন অনুমান করিতেছ কি? আর হপ্‌মার্শেল"—

বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "দূর হও পাপিষ্ঠ. ভগবান আমায় রক্ষা করিবেন।" ব্যারণের গাড়ীর শব্দ নিকটতর হইতেছিল। সহসা সামনে দ্বার মুক্তির শব্দে উভয়েই চমকিতভাবে ফিরিয়া দেখিলেন হপ্‌মার্শেল প্রবেশ করিতেছেন। দুয়ার হইতে তিনি বলিলেন, "আপনি এখানে? প্রিয়বন্ধু, আমি আপনাকে আল্‌মারির চাবি আনিতে পাঠাইয়া—আগুনের মিষ্ঠ উত্তাপে একটু ঘুমাইয়া লইয়াছি। কিন্তু তাহা ত দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বের কথা, আপনি এতক্ষণ এখানে কি করিতেছেন?"

কোর্ট চ্যাপ্‌লিন তখন অগ্নিকুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া অগ্নি সতেজ করিবার ভানে অবশিষ্ট ভস্মগুলি সরাইয়া দিতেছিলেন, মার্শেলের কথার উত্তর দিলেন না। যেন শীতল হস্ত উষ্ণ করিতেছেন—এমনি ভাবে তিনি নীরবে আপনার উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন।

"এ কি, প্রিয় ব্যারণেস্, তুমিও এখানে যে! কি হইয়াছে বল দেখি,—তুমি পাগলের মত চাহিয়া আছ কেন?" বলিতে বলিতে মুক্ত দ্বার আল্‌মারির দিকে তাহার চক্ষু পড়িতেই তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে ঘরে আসিয়া বলিলেন "ইহার মানে আমার এ ড্রয়ার খুলিল কে?"

কেহ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া তিনি নত হইয়া দেরাজটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই, সেই কাউণ্টেসের পত্রখানি দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জুলিয়েনের প্রতি ঘৃণা দৃষ্টি পাত করিয়া পরিহাস হাস্যে বলিলেন, "তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম, তুমি যে কোন উপায়ে ঐ আমার মূল্যবান চিঠিখানি সরাইবে, ইহা সর্ব্বদাই আমার চিন্তার বিষয় ছিল।—স্যার প্রিষ্ট, আপনি এই স্ত্রীলোকটাকে কি চুরি করিতে দেখিয়াছেন?"

পাদ্রী তখনও নিরুত্তর, বিরক্ত হইয়া হপ্‌মার্শেল জুলিয়েনের নিকট আসিয়া বলিলেন, "চিঠিখানা পকেটে পূরিয়া ভারি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—না? ভাল চাও ত পত্র বাহির করিয়া দাও,—হাঁ দিতে হইবে তোমার,—শুনিতেছ?"

কাতর ভাবে লিয়েন বলিল, "কোথায় পাইব, আমার কাছে ত তাহা নাই।"

চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "নিশ্চয় আছে, তোমার কাছে না থাকিলে গেল কোথায়?"

লিয়েন কথা না কহিয়া অগ্নির দিকে অঙ্গুলি দেখাইল। হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "আগুনে পোড়াইয়াছ না কি? কিম্বা—না না তোমার নিকটেই আছে?"

"আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন, সমস্তই জানেন তিনি।"

"হাঁ তাই ত? স্যার প্রিষ্ট, আপনার কি হইয়াছে—কথা কহিতেছেন না কেন? ব্যাপারটা কি, আমায় পরিষ্কার করিয়া বলুন ত।"

এমন সময় বাহিরে ব্যারণের পদশব্দ নিকট হইয়া আসিতেছে—শোনা গেল। পাদ্রী হপ্‌মার্শেলের নিকটে আসিয়া দ্রুত স্বরে বলিলেন, "পরে সমস্তই জানিবেন, কিন্তু এখন না,—এখন এ সব কথা ছাড়িয়া দিন,—ব্যারণ আসিয়া পড়িলেন।"

রাওয়েল্ সম্মুখের বারান্দা বহিয়া আপনার গৃহের দিকেই চলিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্ত দ্বার পথে লিয়েনের সেই হতজ্ঞান শুষ্কমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "লিয়েন্, এখনও তুমি এ ঘরে আছ?" বলিয়াই পিতৃব্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে কাকা? কোর্ট চ্যাপ্লিন্ কোন্ কথা আমায় জানাইতে নিষেধ করিতেছিলেন?"

পাদ্রী তখন বিনীত সানুনয় দৃষ্টিতে মার্শেলের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "বারণ করিলে কি হইবে, সে কথা যে তোমার জানা চাই, ঘটনাটা শোন। তুমি যাইবার পরই আমি ও চ্যাপ্লিন এ গৃহ হইতে চলিয়া যাই, তোমার স্ত্রী তখন বসিয়াই ছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমার স্মরণ হইল যে আল্‌মারী বন্ধ করিয়া চাবিটা আমি সেইখানেই ফেলিয়া আসিয়াছি, তখন উঁহাকে সেই চাবির খোঁজে পাঠাই। সেও বহুক্ষণের কথা, চ্যাপ্লিনের অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া আমি নিজে এখানে আসিয়া দেখি, আল্‌মারি ড্রয়ার সমস্তই খোলা একখানি প্রয়োজনীয় চিঠি—সেখান হইতে হারাইয়াছে। তোমার স্ত্রীকে এখন যেমন দেখিতেছ,—তেমনি মুখ হেঁট করিয়া থাকিতে আমিও দেখি, শুনিলাম চিঠিখানা নাকি পোড়ান হইয়া গিয়াছে। সম্ভব কথাটা সত্য, কারণ আমার বন্ধু তখন যেমন হতাশভাবে আগুনের দিকে চাহিয়াছিলেন তাহাতে বোধহয় ঘটনাটা তাঁহার সম্মুখেই হইয়াছে। কাগজ উদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারও মন ভাল নাই, উঁহার মুখ দিয়া এখনও যেন কথা বাহির হইতেছে না।"

কম্পিত স্বরে পাদ্‌রী বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, ঠিক্‌ তাই।"

জুলিয়েন এতক্ষণে নিজের বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। হাত নাড়িয়া ডাকিল "রাওয়েল্‌, শোন।"

নিকটে আসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছি জুলিয়েন, তুমি এতক্ষণ এ ঘরে কি করিতেছিলে? তোমার শিল্পের কোন জিনিষ বা বই, কিছুই এখানে নাই, এতটা সময় তুমি কি করিতেছিলে? আর স্যার প্রিষ্ট, আপনিই বা কি দেখিয়াছেন? এত অভিভূত হইলেন কেন বলুন দেখি?"

"সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর উঁহাকে?—আর ব্যারণ, আমার সম্বন্ধে যা তোমার জ্ঞাতব্য, আল্‌রিকের পত্রে কালই তুমি তাহা সমস্ত জানিতে পারিবে।" কথাগুলি বলিতে বলিতে লিয়েনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সেই সজল উজ্জ্বল নয়ন দুটি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বেদনার ভৎর্সনায় বলিল, "আমি ত যাইবার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম, তুমি যদি বাধা না দিয়া রাখিতে তাহা হইলে আজ আমার এ অপমান সহিতে হইত না!"

রাওয়েল ও মার্শেল একসঙ্গে কি বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু লিয়েন আর কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে দ্বার পার হইয়া চলিয়া গেল। মার্শেল বলিলেন, "উহার তেজ দেখিলে রাওয়েল? সম্পূর্ণ দোষী, তবু যেন রাণীর মত অহঙ্কার?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যারণ বলিলেন, "আজ একথা থাক্‌ কাকা, উহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে চাই না।" বাক্য শেষের সহিত গৃহ ত্যাগ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে আসিয়া লিয়েন একখানি আরাম চেয়ারে বসিয়া পড়িল। শরীর যেন বাতাসের মত হাল্কা, দু পা চলিলেও বুঝি পড়িয়া যাইবার ভয় হয়। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবীটা যেন তাহার সমস্ত গাছপালা লইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কতক্ষণ সেইভাবেই পড়িয়াই থাকিল, রাওয়েল বা কাহারও সাড়া শব্দ নাই; লিয়োও আজ তাহার ঘরে আসিল না। না, আর সে ভাবনাই বা কেন? ব্যারণের সম্বন্ধে যা কিছু,

সে সবের সহিত আর তাহার সম্বন্ধ কি ? অ[illegible]পর হপ্‌মার্শেলের কক্ষে—এতক্ষণ তাঁহারা তিন জনে কি করিতেছেন, কোন্ কোন্ কথায় কি কি আন্দোলন হইতেছে, দুশ্চরিত্র ভণ্ড পাদ্রী কেমন করিয়া আপনার দোষ চাপা দিয়া তাহার উপর কতখানি কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া দিতেছে,—সেই সকল ভাবনায় লিয়েন যেন পাগল হইয়া উঠিল। রোদনের উচ্ছ্বসিত স্বরে সে আপন মনেই বলিল, "আমিও তোমার ভালবাসা চাই নাই রাওয়েল্,—শুধু একটু আশ্রয়—একটু বিশ্বাসের নির্ভর,—তাও পাইলাম না ? পাদ্রির কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল, কেবল একটা খেয়ালের বশে, প্রণয়িনীর তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ দিবার জন্যই তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন ! এ লজ্জা নারীজীবনে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?—তাও যদি হইল, তবু যাহাকে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিলেন, তাহার প্রতি কর্ত্তব্যও কি নাই ? পরিবারের মধ্যে স্ত্রীকে তিনি এমন অবস্থায় রাখিয়াছিলেন—যাহাতে একটি ভৃত্য পর্য্যন্ত অবহেলা করে, তাঁহার ঘরে বসিয়া অন্য পুরুষে তাহার অপমানে সাহস রাখে !—

এমন সময় হানা আসিয়া, তাহার কোন প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল, লিয়েন তাহার গায়ের গরম কাপড় আনিতে বলিল। শীতে সে আরও অবসন্ন হইয়াছে। জুতা বদলাইতে চাহিলে সে বলিল, "না হানা এই জুতাই থাক্ এখন, তুমি যাইতে পার প্রয়োজন হইলে ডাকিব।"

হানা চলিয়া গেলে লিয়েন জানালার নিকট দাঁড়াইল। বাহিরে তখনও সেই ঝড়ের আস্ফালন চলিতেছেই, বাগানের গাছে গাছে মাতামাতি বাধিয়া গিয়াছে। পথে রেখা বহিয়া কর্দ্দমাক্ত জল নামিয়া যাইতেছে, আর সমস্ত আকাশ ভরিয়া মেঘের রাশি যেন পৃথিবীর গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত।

শরীর নড়িতে চায় না, সম্মুখে ঐ প্রকৃতির বিষম বাধা, তবু লিয়েন ভাবিতেছিল,—"যা হোক্ যেমন করিয়া হোক্—আজই রুডিলডর্ফে ফিরিবে। এমন কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। সে চলিয়া গেলেই সকলের পক্ষে শুভ, ধরণী শীতল হইবে তাহাতে।

এই চিন্তাটি মনে আসিতে লিয়েনের কল্পনায় ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্কিত ব্যারণের সেই সজ্জিত সুন্দর শকট, দুইটি তেজস্বী অশ্ব রাজপথ কাঁপাইয়া ছুটিয়াছে ; তাহার

উপরে পরস্পরে ঘনিষ্টভাবে আসীন—ব্যারণ আইনো ও সালঙ্কৃতা উজ্জ্বলবসনা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অফেলিয়া! তাঁহাদের বদনে প্রেমের আনন্দ ঝলমল করিতেছে। চারিদিকের দর্শকেরা তৃপ্ত নয়নে সে দৃশ্য দেখিতেছে। দ্বারে আসিতে, ভৃত্যেরা উল্লাস ধ্বনি করিল, বৃদ্ধ হপ্‌মার্শেল সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

হাঁ ইহাই ত প্রার্থনীয়, এই ত সুখের বিবাহ, কণ্টকরূপিণী লিয়েন আজও তাহার বাধা হইয়া এখানে কি করিতেছে? তাহার চোখের জল অ্যাকেলিন গাছগুলার উপর পড়িতে-ছিল, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই লিয়েন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"লিয়ো—আমার লিয়ো?"

সহসা দ্বারে করাঘাত ও তাহার সহিত আহ্বান উঠিল, "লিয়েন্‌?—"

ব্যারণের কণ্ঠস্বর; লিয়েন চমকিয়া তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইল। কিন্তু তখনি দ্বারে আবার আঘাত এবং "লিয়েন দ্বার খোল।" ডাক পড়িতে লাগিল। লিয়েন্‌ নিঃশব্দে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ আহ্বানের সঙ্গে দুয়ারের করাঘাত শব্দ জোরে বাজিতে লাগিল, কিন্তু দ্বার খুলিল না, অবশেষে "তোমার যা খুসি কর।" বলিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া ব্যারণ চলিয়া গেলেন। লিয়েন কান পাতিয়া শুনিতেছিল, পদধ্বনি মিলাইলে—সে ছুটিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শোন্‌ ওয়ার্থ—শোন্‌ ওয়ার্থ! এ যে আমার সব কাড়িয়া লইল, আমি কোন্‌ মুখে রুডিস্‌ডর্কে গিয়া দাঁড়াইব? হায় আল্‌রিক্‌, তোমার স্নেহে কি এ দুর্ভাগিনী লিয়েনের হৃদয়ের সব দাহ জুড়াইবে? রুডিস্‌ডর্কের কন্যা যে আজ তাহার কত দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আজন্মের শান্তিনিকেতন ফিরিবার শেষ মুহূর্ত্তকে সে দূরত্বের সম্পূর্ণ দৃশ্য তাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠিল। অল্প কয়দিনের আশ্রয় এই ঘরখানির ভূমি চুম্বন করিতে করিতে লিয়েন ডাকিল, "ফিরিয়া এস, আর একবার তুমি লিয়েন্‌ বলিয়া ডাক!"

কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে উঠিল। উপস্থিত কতকগুলি কার্য্য শেষ হইলে তবে সে এ স্থান ছাড়িতে পারিবে। সে সকল এখনি সারা চাই। লিয়েন উঠিয়া আয়রণ-চেষ্ট খুলিয়া অলঙ্কারগুলি আবার ফর্দ্দ দেখিয়া মিলাইয়া চাবি বন্ধ করিল। ড্রয়ারের গিনির রাশিও অস্পৃশ্যভাবেই ছিল, তাহাও গুণিয়া যথাযথভাবে বন্ধ করিল। পরে ব্যারণের নামে সামান্য একটু পত্র লিখিয়া—চাবি দুটির সহিত তাহা একটা বড় খামের ভিতর রাখিয়া শিল করিয়া

শিরোনাম লিখিল। রাওয়েলের নামটি লিখিতে গিয়া তাহার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইতেছিল,—আর লেখা শেষ হইতেই অক্ষর ক'টির উপর চুম্বনবৃষ্টির বর্ষা নামিয়া সে নাম আর্দ্র অস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

রাত্রি বাড়িতেছিল, ভৃত্য আসিয়া ডাকিল, আহারের সময় হইয়াছে, লিয়েন উত্তর দিল, তাহার শরীর অসুস্থ, আজ আহার করিবে না।

তাহার পর সে রুডিস্ ডর্ক হইতে যাহা আনিয়াছিল তাহা বাছিয়া একটি তোরঙ্গে গুছাইল। হাতের সব কাজ মিটিলে যখন সে লিয়োর ঘরটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন যেন তাহার বাহ্যজ্ঞান শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে যেন আজ নিশ্চয় এখান হইতে বিদায় লইতেছে এই উন্মাদকর চিন্তা তাহার দেহে যতখানি বল আনিয়াছিল, মনের ভিতরটা ঠিক সেই অনুপাতেই শক্তিহীন করিয়া দিয়াছে। লিয়োর শূন্য শয্যার উপর সে আচ্ছন্নের মত লুটাইয়া পড়িল। কি ভাবনা আসিতেছে তাহারও স্থিরতা নাই; অশ্রুজল ঝরিতে গিয়া যেন চোখের কোণেই বরফ হইয়া যাইতেছিল।

লিয়েন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। লিয়ো শুইয়া আছে, নিকটে বসিয়া সে তাহাকে গল্প শুনাইতেছে। বালকের কোমল বাহুদুটি তাহার কণ্ঠে বেষ্টিত, ক্রমে ঘুমের ঘোরে তাহা ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া আসিল। লিয়ো ঘুমাইতেছে, নিঃশ্বাসের সহিত সর্ব্বাঙ্গে মধুর আন্দোলন উঠিতেছে পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে লিয়েন সাদরে তাহার পুষ্পদল তুল্য ক্ষুদ্র ওষ্ঠে চুম্বনের মৃদু স্পর্শ ছোঁয়াইয়া দিল। সে যেন তাহার প্রাণের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষার একটি বুদ্বুদ,—আদর ভরে ভাঙ্গিয়া গেল!

কিন্তু কোথায় কি? মুহূর্ত্তে স্বপ্নের মায়া মিলাইয়া সত্যের শক্তিমান বাহু সবলে তাহাকে অন্তহীন শূন্যের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কোথায় তাহার লিয়ো? তাহাকে হারাইবার শেষ সময়টিতে সে যে একবার তাহাকে দেখিতেও পাইল না! এতক্ষণে আবার তাহার চক্ষের জল আসিয়া লিয়োর ক্ষুদ্র উপাধানটি ভিজাইতে লাগিল।

ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে, আর ত তবে সময় নাই! লাফাইয়া উঠিয়া লিয়েন তাহার নিজের ঘরে আসিয়া মোটা ক্লোকটি জড়াইয়া ছাতা লইয়া বাহির হইল।

"উঃ এ কি!" লিয়েনের কণ্ঠ হইতে বিস্ময়ের অস্ফুট চীৎকার উঠিল; বাহিরের বারান্দায় সমস্ত আলো জ্বলিতেছে, নিজের স্বল্পালোক ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার দৃষ্টি ধাঁধিয়া উঠিল ও অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়া বিস্ময়ধ্বনি বাহির হইয়া গেল।

একটু গিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল সেখানেও উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, আর বাহিরে যাইবার দ্বার সম্মুখে—যেন পথরোধ করিয়াই রাওয়েল্ দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি অসুখ—খাইতে আসিলে না যে? আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া—একি লিয়েন এ কাপড় ছাতা—কোথায় বেড়াইতে যাইবে না কি?"

স্বামীর হাসিতে ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে লিয়েনের সুপ্ত অভিমান মাথা তুলিল। হাসির কি কারণ আছে, এ তাহাকে পরিহাস নয়? সে উত্তর দিল না।

ব্যারণ বলিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি, এমন চমৎকার সাধও কখনও দেখি নাই! সর্দ্দী জ্বর, এ সবের কথা ভুলিয়া যাইতেছ তুমি?"

"বাহিরে যাইবার প্রয়োজন আছে—সুতরাং"

"প্রয়োজন! এই রাত্রিতে এই দুর্য্যোগে,—তুমি কি আমায় পরিহাস করিতেছ লিয়েন?"

"না পরিহাস নয়, আমি তোমায় বলিতে আসিয়াছি,—মনে কর আমি রুডিস্‌ডর্কে যাইতেছি।"

"রুডিস্‌ডর্কে! ভগবান রক্ষা কর। এই অন্ধকারে জল-ঝড়ের মাঝে এই পোষাকে তুমি পায়ে চলিয়া রুডিস্ ডর্কে যাইতে চাও?"

"পায়ে চলিয়া নয়, সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে—তাহাতেই যাইব; তবে সহরের ভিতরটা অবশ্যই হাঁটিতে হইবে।"

"না হাঁটিয়াই বা উপায় কি! শোন্‌ওয়ার্থের আস্তাবলে কি ঘোড়া আছে না সহিস্ কোচম্যান্‌রা তাহাদের কর্ত্রীর আদেশ শোনে,—ব্যারণেস্ মাইনোর পথ চলা ছাড়া উপায়?"

মুখ নীচু করিয়া লিয়েন উত্তর দিল, "শোনওয়ার্থের ঘোড়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি বল ? তোমায় যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহার পর এখানে কোন কিছুতে ত আমার অধিকার নাই আর। বিশেষতঃ প্রয়োজনও বোধ করিতেছি না।" বলিয়াই সে ব্যারণের পাশ কাটাইয়া লঘু পদে চলিয়া গিয়া দ্বারের হাতল ধরিল। এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রাওয়েলও সেই হাত চাপিয়া ধরিলেন।

"হাত ছাড় ব্যারণ!"

"না ছাড়িব না ; জোর করিও না লিয়েন, তোমার আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া যাইবে !"

দুটি উদ্যত তীরের ফলার ন্যায় সজল উজ্জ্বল চোখ দুটি স্বামির মুখের উপর তুলিয়া লিয়েন বলিল, "ছাড়, কেন তুমি আমায় ধরিয়া রাখিতেছ ?"

"বেশ করিতেছি! আমি তোমায় যাইতে দিব না, তোমার সাধ্য থাকে ত চেষ্টা কর।" এবার লিয়েনের চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া গেল। কাঁদিয়া বলিল,—"কেন যাইতে দিবে না; আমি তোমার কি করিয়াছি ? আর যা দোষ পাইয়াছ আমার—তার জন্য যা শাস্তি দিতে হয়—"

তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র স্বরে রাওয়েল বলিয়া উঠিলেন, "আমিও ত সেই কথাই বলিতেছি গো! পরের কথায় তর্ক করিবার সময় তোমার জিভেও করাতের মত ধার দেখিয়াছি ; আর আজ যে নিজের মাথায় এতখানি দোষের বোঝা চাপিল, তাহার প্রতিবাদ কি একটা শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইবে না ?"

"না তাহার কোন প্রয়োজন নাই, যাহার ইচ্ছা সে আমায় দোষীই ভাবুক ?"

"যাহার ইচ্ছা সে তো যা খুসি করিবে, কিন্তু পৃথিবীর ইতর-ভদ্র সমস্ত লোকের চক্ষে দোষী সাজিয়া থাকিতে তোমার কোন বাধা নাই ত ?"

"না এক পরমেশ্বর ভিন্ন—" লিয়েনের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে আবার বলিল, "তোমার পায়ে ধরি রাওয়েল, আমায় ছাড়িয়া দাও।"

ব্যারণের মুখখানিতেও ক্রমশঃ বেদনার বিবর্ণতা ফুটিতেছিল, নাসারন্ধ্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছিল। তিনি থামিয়া থামিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ঐ জঙ্গলের

পাশ দিয়া পথ, জলে তাহা ভাসিয়া যাইতেছে,—হয় ত কোথাও বরফ—পিছল, সুন্দর ঝড়—চমৎকার ঠাণ্ডা ;—তারপর কাল সকালে কাহারও চোখে পড়িবে ব্যারণেস্ মাইনোর সুন্দর দেহখানি রক্তে কাদায় মাখা-মাখি হইয়া হিম-কঠিন হইয়া পড়িয়া আছে—"

"হউক, তাহাতে তাহাদের কোন অনিষ্টেরও সম্ভাবনা নাই।"

"দুইটি স্থানে অনিষ্ট হইবে বৈ কি, তাহারা বলিবে, অত্যাচারী মাইনোরা এই বালিকাকে হত্যা করিয়াছে—নয় ত, এই নারীই বিশ্বাসঘাতিনী—"

"আঃ থাম রাওয়েল্, এ সকল কিছুই হইবে না, এ আমি তোমায় বলিয়া যাইতেছি। আর লোকে আমায় দোষী বলিবে—কি ভাবিবে,—এ চিন্তার কি মূল্য আছে ? তুচ্ছ আমি, কে আমায় চেনে-জানে ? আমার কথা লইয়া আন্দোলন কেউ করিবে না দেখিও ; আর যদি করেই—আমার রুডিস্ডর্কে তাহার বাষ্পও পৌঁছাইবে না, আমি আর ভয় করি না—কিছুতেই আশঙ্কা নাই আমার ! পথ ছাড়—হাত ছাড় এবার।"

"তবে যাও, তোমার দুয়ার খোলা।" ব্যারণ হাত টানিয়া লইলেন, জুলিয়েন বাহির হইবার সময় একবার স্বামীর প্রতি চাহিল ; সেই সরল সাহস সুন্দর মুখ, দৃষ্টিতে তেমনি অমৃতের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার মোহ আসিতেছিল, কিন্তু সবলে তাহা দূর করিয়া জুলিয়েন ভাবিল, "এখনও ঐ হাসি ?" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আসিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।

ব্যারণ বলিলেন, "দাঁড়াইয়া কেন, চল না ?"

নিঃশ্বাসটা এবার জোরে বাহির হইয়া গেল, লিয়েন বলিল, "এই যাই।"

দ্বার খুলিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তাহাদের গায়ে লাগিল, ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন "উঃ কি শীত !" কিন্তু লিয়েনের পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটে আসিয়া লিয়েন বলিল, "হাঁ ভয়ানক শীত, তুমি ঘরে যাও রাওয়েল।"

সহসা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে আনিয়া ব্যারণ বলিলেন, "একটু দাঁড়াও, আমি আমার ক্লোকটা লই,—"

"তোমার ক্লোক ! তুমি কেন—"

"আমিও যে তোমার সঙ্গে যাইতে চাই লিয়েন !"

"কোথায়—ষ্টেশন ?"

"না, একেবারে সেই রুডিস্‌ডর্কেই,—গাড়ি সাজাইতে বলি দাঁড়াও।" রাওয়েল ঘণ্টার দড়িতে হাত দিতেই জুলিয়েন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "পাগল হইয়াছ নাকি ! তুমি কেন সেখানে যাইবে ? এ তোমার কি ঝোঁক হইল বল দেখি ?"

"ঝোঁক ? আচ্ছা তবে তাই। আমার ঝোঁক হইয়াছে যে তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেইখানেই থাকিব। ইহাতে তোমার কোন আপত্তি শুনিব না।"

লিয়েনের মুখ রক্তবর্ণ হইল, সবেগে বলিয়া উঠিল, "কেন ?—"

"আমার ইচ্ছা। ঠাট্টা নয় আমি সত্যই যাইতেছি—দ্যাখ।"

লিয়েন একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছার মানে আমি সব সময় বুঝিতে পারি না। কিন্তু এ যাওয়ায় তোমার আমার দুজনেরই শান্তি নষ্ট হইবে—তাহা নিশ্চয়।"

"কেন ?" স্বামীর কথার উত্তরে লিয়েন বলিল, "বুঝিতেছ না তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমার মা তখনই আমায় ফিরাইয়া দিবেন।"

রাওয়েল বলিলেন, "সে ত ভাল কথা।"

"না ভাল নয়, সে আরও লজ্জার কথা। আর তোমার পক্ষে লজ্জা,—না রাওয়েল, সে আমি পারিব না, আল্‌রিকের সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারের সম্মুখে আমি তোমায় দাঁড়াইতে দিব না !"

"কেন দিবে না ? আল্‌রিক নিশ্চয় সুবিচারক, তাঁহার নিকট আমি অন্যায়ের আশা রাখি না। ভয় কি ? চল, গাড়ী সাজাইতে বলি।" বলিয়া রাওয়েল ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হইতেই জুলিয়েন দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিঃশ্বাসের বেগে তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অত্যন্ত আবেগের সহিত সে বলিল, "ভুল করিও না, রাওয়েল, ভুল করিও না ? আলরিকের নিকট উত্তর দিবার মত একটি উত্তরও তোমার নাই।"

"আছে—লিয়েন—"

"না নাই—কিছু নাই!" সে যখন তোমায় প্রশ্ন করিবে যে এই নিরপরাধিনী বিশ্বস্তা বালিকাকে তুমি কেন বিবাহ করিয়াছিলে, আবার ত্যাগই বা করিলে কেন, তখন তুমি কি তাহাকে স্পষ্ট বাক্যে জানাইতে পারিবে যে,—তোমার প্রতিহিংসার অস্ত্র স্বরূপ,—যাহাকে চিরদিন ভালবাসিয়াছ এবং এখনও বাস, সেই স্ত্রীলোকটির উপর দুদিনের বিদ্বেষে প্রেমের চটুল খেয়ালে, তাহাকে দণ্ড দানের সাধে—একটা নিরীহ নারীর হৃদয়কে লইয়া এই খেলা করিয়াছ? যাহাকে কখনও ভালবাসিতে পারিবেনা—দূর হউক সে কথা! দারিদ্র্যের শান্তিধাম হইতে টানিয়া আনিয়া একটা দুর্ব্বল মানব প্রাণকে লইয়া তোমার এ প্রেমের প্রতিশোধ লইবার হেতু তুমি কী দেখাইবে রাওয়েন?"

ব্যারণের সমস্ত মুখ মর্ম্মরের ন্যায় শুভ্র হইয়া উঠিল; লিয়েন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল।—"যাহাকে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিয়াছ, তাহার প্রতি একটিবার ফিরিয়া চাও নাই, দিনান্তে বোধ হয় ভাবও নাই যে তাহার অবস্থা আজ কেমন, চারিদিক দিয়া লজ্জা অপমান দুঃখ—বনের আগুনের মত ঘিরিয়া আসিলেও তুমি সে দিকে অঙ্গুলটি পর্যন্ত বাড়াও নাই, কেন কর নাই,—প্রশ্ন উপস্থিত হইলে সে কথার কি তোমার উত্তর আছে?"

শুষ্ক স্বরে ব্যারণ বলিলেন, "তোমার কথা শেষ হইল কি? আমারও বলিবার আছে।"

লিয়েনের চিররুদ্ধ হৃদয়দ্বার আজ যেন ঝড়ের বেগে খুলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার মুখে কথার বাঁধন ছিল না বেগের সহিত বাধা দিয়া সে বলিল, "না না আমার কথা শেষ হয় নাই। তুমি আলরিককে কি বলিবে বল; একটা হতভাগ্য প্রাণকে লইয়া এই খেলা, ব্যারণ! যাহাকে তুমি শুধু জীবনহীন যন্ত্র বা অস্ত্র স্বরূপেই ব্যবহার করিয়াছ, সে যে একটি রক্ত পূর্ণ জীবন্ত হৃৎপিণ্ড তোমার এ ফুটবল খেলায় সে প্রতিক্ষণে শূন্যের দোলায় ঘুরিয়া দুলিয়া অস্থির হইতে পারে, মাটিতে পড়িয়া আঘাতের পর আঘাত পাইতে পারে,—এ ভাবনা কর নাই কেন, একথার উত্তর কি?"

লিয়েনের চোখের জল শুকাইয়া আগুন হইয়া গিয়াছে। কথার মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া সে পাশের দেরাজটা চাপিয়া ধরিল। বিনীত কণ্ঠে ব্যারণ বলিলেন, "তোমার কষ্ট হইতেছে লিয়েন, আজ তুমি চা খাইবার সময়ও খাবারে হাত দাও নাই,—এইখানে একটু বস

এবার।"

দেয়ালে মাথা রাখিয়া লিয়েন বলিল, "দরকার নাই।"

"আছে-আছে;—লিয়েন, আমায় যতখানি ঘৃণা করিতে হয় কর, কিন্তু এখনও আমি তোমার স্বামী, তোমায় স্পর্শ করিবার অধিকার আমার যায় নাই"— বলিতে বলিতে রাওয়েল পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন।

"না না—তুমি আমায় ছাড় ; আমি যাই"—

"আমার দুটি কথা শুনিয়া লিয়েন্;—"

র্যারণের স্বর বিকৃত, চমকিয়া লিয়েন মুখ তুলিয়া দেখিল,—স্বামীর মুখ বেদনায় নীল হইয়া গিয়াছে; চক্ষুর উপর আলোকের উজ্জ্বল চাকচিক্য, সে ব্যথিত হইয়া বলিল, "আমার ত কিছু হয় নাই রাওয়েল।"

"একটু বসিবে তবে? একটু—লিয়েন!"

দুই জনে আসিয়া জানালার পাশের দুইটি চেয়ারে বসিলেন। রাওয়েল দন্তে অধর দংশন করিয়া যেন আপনাকে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। লিয়েন তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া নিজেকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিল। তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া সে-ই প্রশ্ন করিল "কি কথা বলিতে চাহিলে যে!"

রাওয়েলের মুখে মৃদুহাসির রেখা ফুটিল, কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "হাঁ বলিব বৈ কি আলরিককে যাহা বলিবার আছে আমার, তুমিও তা শোন।"

লিয়েনও একটু হাসিয়া বলিল, "আমায় বলিবার প্রয়োজন মোটেই নাই।"

"আছে অন্ততঃ আমার বলিবার প্রয়োজন আছে। আমি তোমার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না, তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য—"

"থাক্ রাওয়েল্!"

"না থাকিবে না, আজ আর কিছু বাকি রাখিব না, শোন। এখনি তুমি যাহা উল্লেখ করিলে,—সেই স্ত্রীলোককে একদিন আমি সত্যই ভালবাসিতাম। শুধু দুই

মোহ নয়, রূপের তৃষ্ণা নয়, প্রথম যৌবনের পবিত্র প্রেম আমি তাহাকেই উপহার দেই। আর বিশ্বাস ছিল, সেও আমায় তেমনি ভালবাসে।”

এইখানে ব্যারণ একবার স্ত্রীর প্রতি চাহিলেন, কিন্তু কোন ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তখন কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আবার বলিলেন, “আমাদের বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল লিয়েন, কিন্তু ঠিক সেই দিনেই ডিউকের সহিত তাহার বিবাহ হইল! সম্পদ, সম্ভ্রম,—এ লোভ সে ছাড়িতে পারিল না, আমায় ত্যাগ করিয়া সে অন্যের স্ত্রী হইল। স্বচ্ছন্দে, অনয়াসে—হাঁ যে যাই বলুক, আমি জানি সে তখন আমার কথা ভুলিয়া প্রেমের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ঐশ্বর্য্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সে সুখী হইয়াছিল নিশ্চয় কিন্তু আমি বুঝি মরিয়া গিয়াছিলাম জুলিয়েন? পাগল হইয়াছিলাম! দিনকতক যে আমার কি ভাবে গিয়াছে তাহা এখন যেন অনুভব করিতেও পারি না। বৎসরখানেক পর—মন যেন একটু বল পাইল; বৃথা কাজ মিথ্যা অসার আমোদে ডুবিয়া সে চিন্তা হইতে পরিত্রাণের উপায় বাহির করিলাম। দেশে দেশে ঘুরিয়া নিত্য নূতন দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যে আপনাকে যেন ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম। সংসার আমার পক্ষে তুচ্ছ—হাসির সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভ্যালেরির প্রবেশ ও প্রস্থান, সেও যেন একটা বিকট পরিহাস,—ইহার মধ্যে যদি আমার লিয়োর মুখখানি আঁকা না থাকিত—”

সহসা বেগের সহিত লিয়েন বলিয়া উঠিল “তাহাকে লইয়াও তুমি সুখী হও নাই?”

“হইয়াছিলাম, বেশ ছিলাম।—কিন্তু আবার বিপদ ঘটিল যে, সে ডাকিনী যে আবার আমার দিকে হাত বাড়াইতে লাগিল। বিধবা হইয়া সে ডিউকে ও তাঁহার সন্তানদের মায়া কাটাইয়া পূর্ব্বরাগকে নূতন করিতে চাহিল।—ওঃ সে কি কুৎসিৎ ব্যাপার! ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত তাতিয়া আগুন হইয়াছিল। তাহার সেই উৎকট লালসার সম্মুখে, অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমারি পত্নী বলিয়া খাড়া করিয়া দিবার জন্য—হাঁ এ তাহাকে দণ্ড দিবার জন্যই বৈ কি,—যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই ঘরে আনিবার জন্যও বুঝি আমার মাথায় উন্মত্ততা আসিয়াছিল।—দৈবক্রমে সেই সময় তোমাদের নাম ও কাউন্টেসের প্রস্তাব আমার কানে আসে। বংশের আভিজাত্যে ডচেস্ অপেক্ষা ন্যূন নহে ভাবিয়া সেইখানেই বিবাহ

করিবার জন্য আমার অনেকখানি আগ্রহও ছিল।—যতশীঘ্র হয় ব্যাপারটা শেষ হইয়া যাক—এই উদ্দেশ্যে, যাহাকে বিবাহ করিতেছি তাহার রূপগুণের প্রতি কোন লক্ষ্য করিতে চাহি নাই, তাহার মুখখানি যে কেমন—তাহাও বুঝি আমার চোখে পড়ে নাই তখন।"

লিয়েন মৃদু হাসিল। ব্যথিতভাবে রাওয়েল বলিলেন, "হাসিও না, আমি আল্‌রিকের নিকট কোন কথা গোপন করিব না, সবই বলিব।"

"বেশ করিবে, কিন্তু তাহা আজ নয়।—আজ আমায় যাইতে দাও পরে একদিন—"

রাওয়েলের মুখ রক্তবর্ণ হইতেছিল, উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—"পরে কেন আজই সব শেষ হোক! চল আল্‌রিকের নিকট, তাঁহার নিকটও আমার অনেক কথা জানিতে আছে।

"সে আবার কি কথা? কি জানিতে চাও বল দেখি শুনি।"

"তুমি শুনিয়া কি করিবে,—জান না কি? আমি আল্‌রিককেও তাহাই জিজ্ঞাসা করিব, যে বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না, ওঃ—সে ত সাধারণ স্ত্রীলোক নয়,—ছায়া দেখিয়া মানুষের মনের ভাব যে অনুভব করে, পত্রে বর্ণনা শুনিয়া কল্পনায় যে তাহার ছবি আঁকে, বুদ্ধিতে যাহার মাথাটি পরিপূর্ণ; সে কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারে না? পারে;—কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চায় না! সে আমায় ঘৃণা করে—সে আমার হীন মনে করে—"

"রাওয়েল্—রাওয়েল্!"

"কেন? বল,—আমি মিথ্যা বলিতেছি? স্বীকার করি—আমি যখন তোমার বিবাহ করি তখন পর্য্যন্ত ভাবি নাই যে জীবনে আমি আবার কোন রমণীর রূপগুণের পক্ষপাতী হইব। কিন্তু তোমায় ঘরে আনিয়াই বুঝিলাম যে আমার সে ধারণা ভুল।—তুমি ঘরে আসিতেই আমাকে বেশ বুঝিতে হইল ট্রেচেনবার্গ বংশের মহিমাময় গর্ব্ব, তাহার প্রতিভার সর্ব্বব্যাপী আলোক জ্বালাইয়া শোনওয়ার্থের উপর সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছে; তাহাতে আমার মত আঁধারের প্রাণীর মনের কালো কোণগুলাও আলোকে রাঙ্গাইয়া উঠিল। তুমি কি তাহা বোঝ নাই লিয়েন, সেকি আমি বিশ্বাস করিতে পারি? বোঝ, কিন্তু স্বীকার করিতে চাও না; আমায় তুমি হীন ভাবিয়া নীচে রাখিতে চাও।—কথায় কথায় রুডিসডর্ফ চলিয়া যাইবার কথা বলিয়া—সাধ করিয়া কষ্ট দাও আমায়—"

লিয়েন ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল "আর না তোমার পায়ে পড়ি রাওয়েল, ও মিথ্যা কথাগুলা ভাবিও না—আমি তোমায় হীন ভাবি ? সাধ করিয়া রুডিস-ডর্ক যাইতে চাই ?"

মুহূর্ত্তে তাহার আসনের নিকট জানু পাতিয়া লিয়েনের হাত দুখানি দুই হাতে ধরিয়া রাওয়েল বলিলেন "তবে বল আর ও-কথা মুখে আনিবে না, আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না,—বল ? লিয়েন—লিয়েন আমায় ক্ষমা কর, আর যে আমি সহ্য করিতে পারি না। তুমি যদি যাও—বাঁচিতে পারিব না,—কিছুতেই পারিব না যে ! তাহার অপেক্ষা—"

বেগের সহিত কথাগুলি বলিতে বলিতে রাওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। লিয়েনের হাত দুটিতে একটু টান দিয়া তিনি কি বলিতে উদ্যত হইয়াই তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেলেন, এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত "নাঃ" শব্দটি উচ্চারণ করিয়া স্খলিত চরণে সরিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে ঝড়ের বেগ তখন কমিয়া আসিতেছে। মৃদু বায়ুর সহিত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে। আর পূর্ব্বাকাশের এক প্রান্তে ছিন্ন মেঘের মাঝ দিয়া পূর্ণপ্রায় চন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ফুটিবার জন্য ক্রমশঃ জ্যোতি বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল।

লিয়েন হতজ্ঞানপ্রায় তখনও চেয়ারখানার উপর বসিয়া। সে চোখে যাহা দেখিতেছিল বা তাহার কানে যে কথা বাজিতেছিল, মনের ভিতর যেন তাহা প্রবেশ করিতেছিল না ! অনেকক্ষণ অভিভূতের ন্যায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"এ কি সত্য ?"

স্বর অস্ফুট, কিন্তু ব্যারণ তাহার শব্দটুকু শুনিতে পাইলেন। ধীরগতিতে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "কি বলিলে ?"

লিয়েন উত্তর দিল না। তখন অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকভাবে মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বল যাইবে না ?" লিয়েন তখনও নিরুত্তর ; ব্যারণ খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কথা বলিলেন তাঁহার স্বর এবার করুণ, "আমায় একটু দয়া করিতে পারিবে না লিয়েন ? তুমি ত সকলের প্রতিই স্নেহশীলা, আমায় একটু দয়া !—"

এবার বাধা দিয়া ব্যাকুল স্বরে লিয়েন বলিয়া উঠিল "দয়া—দয়া! রাওয়েল তাহার নাম কি দয়া?—না তাহার নাম ত দয়া নয়—"

"তবে বল তাহা কি? তুমিই তাহার নাম দাও!—না না লিয়েন, এখনি আমি তাহা চাহি নাই,—যত দিনে হোক্—যত কালে হোক্, একটু—"

"অনেক আগে,—অনেক বেশী, তার চেয়েও অনেক বেশী—"

স্ত্রীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবলে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া রাওয়েল বলিলেন "কত বেশী বল সে কতখানি, এই শূন্য বুকটা ভরিয়া যায় এতখানি কি?"

ধীরভাবে লিয়েন বলিল "স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে যতখানি দিতে পারে—"

"স্ত্রী, হাঁ আমার স্ত্রী! আমার সর্ব্বস্ব—আমার লিয়েন আমার স্ত্রী!"

তাহার চিরদিনের লোভের—তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, স্বামীর আদরের চুম্বনরাশি লিয়েনের উপর অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

উদাসী।

—:*:—

বাইরে যাবার সময় হল,

এবার আমায় যেতে দে রে!

আঁখির জলের বাঁধন দিয়ে

আর পেছনে টানিস্‌নে রে!
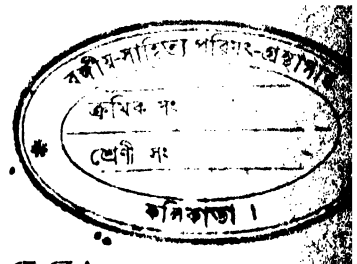
এমন ধারা মায়ের মত
আগ্‌লে তোরা রাখ্‌বি কত ?
আঁচল দিয়ে ধর্‌বি কেবা
ঢেউ-দোলানো বুদ্বুদেরে ?
না জানি আজ কিসের টানে
মন ছুটেছে বাহির পানে !—
শিকল-ছেঁড়া বনের পাখা
স্নেহের ডোরে বাঁধ্‌বি কে রে !
ডাকে রে ওই আকাশ ডাকে,
পাগল হাওয়া বনের ফাঁকে,
উথ্‌লে-ওঠা সাগর ছেপে
নিখিল আমায় ডাক্‌ছে যে রে !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বর্ত্তমান ভারতের নারীজাতি।

ভারতবর্ষীয় নারীসমিতির (Women's Indian Association) সম্পাদিকা—'Asian Review' নামক পত্রিকায় ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

ভারতে যেরূপ বহুসংখ্যক মনস্বিনী নারীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় অন্য কোথাও সেরূপ পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্ত্র নারীগণ লিখিয়া গিয়াছেন।

পৌরাণিক যুগে আমরা পুরুষদিগের ন্যায়ই স্বাধীন ও মহতী নারীর সাক্ষাৎ লাভ করি। সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি সীতা, বিদুষী গার্গী, ব্রহ্মচারিণী মৈত্রেয়ী ও পতিপরায়ণা সাবিত্রীর ন্যায় কতশত নারী এই যুগে আত্মোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক যুগে রাজপুত নারীগণের মহত্ত্ব ও বীরত্ব সর্ব্ব প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যবনের হাতে আপনাদের দেশ ও মান কলঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জানিয়া পদ্মিনী সঙ্গিনীদের সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিলেন। ভক্তিমতী রাণী মীরাবাইএর প্রাণস্পর্শী ভক্তিগাথা সকল আজও চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। প্রতিভাশালিনী নুরজাহান দশ বৎসরের অধিককাল বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের শাসন-কার্য্যের নেতৃ স্বরূপা ছিলেন।

সাজাহানের অক্ষয় কীর্ত্তি তাজমহল আজও মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

তারপর দুই বীররমণীর চিত্র আমাদের চোখে পড়ে ধর্ম্মশীলা প্রজাবৎসলা যোদ্ধৃ রাণী অহল্যাবাই ও ফরাসী বালিকা জোয়ান অব্ আর্কের ন্যায় বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী।

বর্ত্তমান যুগে একটী রমণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইনি ভীষণ বরপণ প্রথার নিকট আপনাকে বলিদান করিয়াছেন। স্নেহলতা এই বীভৎস দেশাচারের নিকট আপনাকে বলি দিয়া দেশের লোকের চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে কত শত ভারতীয় নারীর মহৎ দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে যে নারীগণ জ্ঞানে, বীর্য্যে কর্ম্মে অনেকাংশে পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই নারীগণ স্বাধীনতা হারাইয়া অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের সুগঠিত দেহের শক্তি, উচ্চতর শিক্ষা—কর্ম্মের ক্ষমতা, দেশের কার্য্যে তাঁহাদের প্রভাব সব লুপ্ত হইল।

ইংরাজ রাজত্বের একশত বৎসর কাল চলিয়া যাওয়ার পর এখন আমরা নারীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার ও স্বাধীনতার অনেক

তারতম্য থাকিলেও সাধারণতঃ সর্ব্বত্র উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত অবস্থার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগিয়াছে।

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষ এখনও শিক্ষা বিষয়ে অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ত কথাই নাই।

শিক্ষিতদিগের সংখ্যা সম্বন্ধে যে তালিকা (statistics) সর্ব্বশেষ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে হাজার পুরুষের মধ্যে ১০৬ জন এবং স্ত্রীলোকদিগের হাজারের মধ্যে মাত্র ৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে।

সাধারণভাবে প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে যে লোকপরম্পরায় একটা শিক্ষার ধারা বহিয়া আসিয়াছে তাহার জন্যই আজ পর্য্যন্তই ভারতবাসীকে একেবারে বর্ব্বর, অসভ্যজাতি-দিগের সহিত এক করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

ভারতের রমণীদিগের মধ্যে স্বভাবগত এমন বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সুষমা রহিয়াছে যে অতি অল্প কালের মধ্যে তাহারা শিক্ষাকে আয়ত্ত করিয়া লয়। যে অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যালয় রহিয়াছে তাহাদের দ্বারাই এইরূপে ভারতবাসিনী বালিকাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ যৎসামান্য শিক্ষার বিস্তার হইতেছে।

বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক-শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্ম্মের বিঘ্ন না ঘটে এইরূপ সময় ও সুবিধানুসারে শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইলে ভারত-রমণীদিগের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব নয়। আজকাল ছ'টি গ্রামের মধ্যে মাত্র একটা করিয়া বিদ্যালয় এবং তাহাদের অধিকাংশই বালকদিগের জন্য। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য, শিক্ষকদিগের বেতন এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য এবং ইহাদিগকে বৃত্তিদান করিয়া উৎসাহিত করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার হইতেই হউক অথবা বেসরকারী সমিতি বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতেই হউক এই সকল অর্থ সংগৃহীত হওয়া দরকার।

এখনকার সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন নারী-শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত। প্রাথমিক শিক্ষা যত সত্বর ও বিস্তৃতভাবে ভারতীয় বালিকাদিগের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে ততই মঙ্গল। ইহা ভিন্ন নারী-দিগের পক্ষে দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা করা অথবা কার্য্য করা অসম্ভব; শিক্ষা

ভিন্ন তাঁহাদের মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে না। নারীর উচ্চতর শিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন খুবই আছে স্বীকার করি কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রথমে বিস্তৃত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করা বিশেষ ভাবে দরকার।

যদিও ভারতবর্ষের ন্যায় অপর কোনও দেশে নারীগণকে সম্মান করা হয় না, তাহারা দেশের মাতা, দেবতার ন্যায় পূজার্হা। তথাপি নারীর স্থান ও সম্মান এখানে স্থির করা এদিক দিয়া একটু কঠিন। নারী যখন পুরুষের স্ত্রী তখন সকল দিক দিয়া সে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সকল কার্য্যে তাহাকে স্বামীর মত লইয়া চলিতে হয়। অপর দিকে মাতৃরূপিণী নারী সন্তান দিগের শিক্ষাদাত্রী ও পথপ্রদর্শয়িত্রী। বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানগণও মাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন।

তিনি পরোক্ষে সম্মানে মন্ত্রীস্বরূপা; এক্ষেত্রে মাতৃগণ যদি প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে সন্তানদিগের জীবনের উপর তাঁহাদের প্রভাব কত কার্য্যকরী হইবে তাহা বুঝা যায়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য নারীগণের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় নারীগণের দায়িত্ব অধিক, কারণ পাশ্চাত্যে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের উপর মাতার সাক্ষাত প্রভাব এত অধিক পরিমাণে নাই।

অপর একটী বিষয়ে ভারত-রমনীর পাশ্চাত্য নারীর অপেক্ষা অধিক সুবিধা আছে। পশ্চিমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের অধিকাংশকে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য নানারূপ প্রলোভন ও সংগ্রামপূর্ণ পথ দিয়া যাইতে হয়; পুরুষের সহিত সমানভাবে নানা প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। ভারতবর্ষে এখনও ঠিক ঐরূপ অবস্থা আসে নাই। এখানে নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক না হওয়ায় স্বামী অথবা পিতার গৃহে প্রায় সকল নারীরই ভরণপোষণের সংস্থান আছে। এখনও বেশীর ভাগ রমণীকেই জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ভাবিতে না হওয়ায় শান্তিতে তাঁহারা আত্মোৎকর্ষের দিকে ও সন্তানদিগের শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন। ক্রমশঃ এখানকার নারীগণও জীবিকা উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করিতেছেন কিন্তু পশ্চিমের ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এখন নারীগণ প্রধানতঃ শিক্ষা বিভাগেই কার্য্য করিতেছেন; ইহাতে তাঁহাদের আত্মোৎকর্ষের সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা নাই।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষেও পুরুষদিগের ন্যায় সমানভাবে পরিশ্রম করে কিন্তু অন্য সকল স্থানের ন্যায় এখানেও পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে বেতন না দিয়া স্ত্রীপুরুষভেদে বেতনের তারতম্য করা হয়।

যাহা হউক অনেক বিষয়ে নারীর অধিকার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সুবিধা আছে। সম্পত্তির উপর ভারতীয় নারীর অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক অধিকার আছে এবং হিন্দু আইন অনুসারে নারীকে দেশের ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে বাধা দিবার উপায় নাই। পুরুষের ন্যায়ই নারীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উপাধি ধারণ করিতে পারেন। এই সুবিধা অনেক স্থানে-বিশেষতঃ অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই।

ভারতের নারীর ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ কারণ চারিদিকে সকলেই বুঝিতে পারিতেছে যে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দেশ কত পিছাইয়া পড়িয়া আছে। নারীদিগের অন্তঃকরণেও স্বাধীনতার বাণী আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বোম্বে প্রেসিডেন্সি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ১৯ লক্ষ। এখানকার নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, বাল্যবিবাহ এখানে নাই বলিলেই হয় এবং কয়েক বছর হইতে তাঁহাদিগকে মিউনিসি-পাল ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পুনা সহরে প্রোফেসার কার্ভে ও তাঁহার পত্নী যে 'Women's University' নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন নারী এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। অবরোধ প্রথা না থাকায় এখানে নারীগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া আপনাদিগকে ইচ্ছামত দেশের কাজে লাগাইতে পারেন। বস্তুতঃ বোম্বাইএর নারীগণ যেরূপ দেশের কার্য্যে লাগিয়াছেন এরূপ অন্য কোথাও নহে। এখানে অবরোধ প্রথা নাই। কিন্তু উচ্চ জাতির মধ্যে এখনও বর-প্রথা থাকায় নারীদিগের প্রতি এখনও এ দেশ যথেষ্ট সম্মান দেখাইতে পারিতেছে না। কন্যাবহুল পরিবারে পিতামাতা কন্যাকে অভিশাপ বলিয়াই মনে করেন।

উক্ত দুই প্রেসিডেন্সিতে নারীগণ সভাসমিতি, বক্তৃতাদিতে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন, সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং দেশের যাবতীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে খবর রাখেন। উত্তর

ভারতে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা যেমন জাতিভেদ মানেন না তেমনি স্ত্রীপুরুষভেদে অধিকারের তারতম্য তুলিয়া দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের বহুসংখ্যক নারী নিজেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের সকল বিষয় জানিবার ও সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মহীশূর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আজকাল নারীসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল সভায় তাঁহারা মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রয়াস পান। গৃহকে, পরিবারকে পূর্ণ সুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে গৃহিণীদিগের কিরূপ হওয়া প্রয়োজন এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন।

এই সকল সমিতির মধ্যে বম্বে এবং পুনায় 'সেবাসদন' কলিকাতা ও উত্তর ভারতে 'ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডল' এবং মান্দ্রাজে Women's Indian Association বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই Association এর বিভিন্নস্থানে ৪৬টী শাখা আছে। এই সকল সমিতি যত প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়।

যে 'Women's University'র উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার ন্যায় ইংরাজী ভাষা পৃথকভাবে শিখান হয়।

প্রতি বৎসর নেশন্যাল কংগ্রেসের সহিত নারীদিগের মহাসমিতিরও অধিবেশন হইতেছে।

১৯১৬ সালে যে সমাজ সংস্কার সমিতির (Social Conference) অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে নারীদিগের স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে এই একটী প্রস্তাব রহিয়াছে, যে কোনও কার্য্যে নারী তাঁহার ক্ষমতা দেখাইতে সমর্থা হইবেন সেই কার্য্য হইতে কেবল নারী বলিয়া তাঁহাকে বিরত করা হইবে না।

যখন ফিজিদ্বীপে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতিপয় ভারত রমণী বড়লাটের নিকট আবেদন পাঠাইলেন এবং তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কতক পরিমাণে সফলকাম হইলেন তখনই প্রথম ভারত নারীর হৃদয়ে যে জনহিতের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। ১৯১৬ সালে Mrs Besant যখন অন্তরীন হইলেন তখন মান্দ্রাজের রমণীগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বহু সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং দলবদ্ধ ভাবে পূজার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে ১৯১৭ সালে ভারতীয় নারী মহাসমিতির সভাগণ ভারত-সচিবের নিকট এদেশীয় নারীগণের অধিকার ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দাবী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সর্ব্বত্রই সকলের প্রায় একই মত যে স্বায়ত্ত-শাসনের (Self Government) এর মধ্যে নারীগণেরও অধিকার থাকিবে।

স্বাধীনভাবে অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন ভারত রমণী এখনও কল্পনা করিতে পারেন না এবং কখনও পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পারিবারিক জীবন ব্যতীত বিশ্বের মধ্যে যে আপনার কার্য্যক্ষেত্রে আছে তাহা ধীরে ধীরে ভারতললনা বুঝিতেছে। এই নব জীবনের স্পন্দন সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে। পুরুষগণও উন্মুখ হইয়া আছেন কবে নারীগণ তাঁহাদের সহিত সমভাবে দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হইবেন; সেইজন্য নারীগণের সভাসমিতি সকল তাঁহারা খুব উৎসাহান্বিত ও আশান্বিত হইয়া অনুমোদন করিতেছেন।

আজকাল দেশহিতে রত রমণীগণের উল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কবি রাজনীতিজ্ঞা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম মনে পড়ে। তাঁহার কবিতা সকল স্বদেশ-প্রেমের গভীরতায় ও সৌন্দর্য্যে ভারতবাসী সকলের প্রাণস্পর্শ করে। সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার পর শ্রীমতী গান্ধির নামে সকলেরই মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে। স্বামীর সহিত আফ্রিকায় স্বদেশবাসীর জন্য সংগ্রাম করিতে যাইয়া সেখানকার কারাগারে কতই না কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। এখনও মহাত্মা গান্ধীর সকল প্রকার কার্য্যে পত্নীর সহানুভূতি লাভ করিতেছেন।

শ্রীমতী রমাবাই রাণাডে সেবাসদনের প্রাণস্বরূপা। স্ত্রীলোকের সুশৃঙ্খলা কার্য্যের কতখানি ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা তাঁহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কলিকাতা ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা ও প্রধান উদ্যোগী স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস অক্লান্ত পরহিতৈষণার জন্য চিরদিন ভারতরমণীর আদর্শস্থানীয়া হইয়া থাকিবেন।

মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির তেজস্বিনী মাতা যখন অবগুণ্ঠিতা হইয়া কংগ্রেসের মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইলেন তখন দেশবাসীর প্রশংসাপূর্ণ অভিবাদনে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ইঁহারা বর্ত্তমান ভারতে নারীত্বের প্রথম বিকাশ বলা যায়। ক্রমশঃ ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে এই আলো হৃদয়ে লইয়া আপনাদের পথ যেন দেখিয়া লইতে পারি।

কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার বাক্যের ভিতর দিয়া নারীত্বের যে আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা একবার দেখিয়া লই।

আমি চিত্রাঙ্গদা

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

শ্রীসুধাময়ী দেবী।
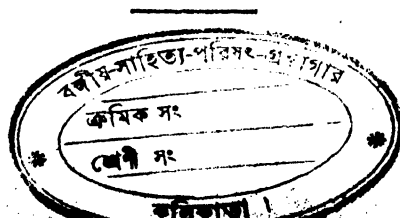
কোথা তুমি।

—:*:—

(১)

আমি যখন খুঁজে সারা, কোথায় তুমি থাক ?
তাহার পরে শ্রান্ত দেহে
লুকাই যবে আঁধার গেহে,
কোথা হতে ডাক।

(২)

তোমার ধ্যানে যখন আমি বিভোর হয়ে পড়ি,
মনের ভ্রান্তি চোখের ধাঁধায়
নিরবধি আমায় কাঁদায় ;
তোমার পুতুল গড়ি।

(৩)

কবে পাব তোমার দেখা, ভ্রান্তি যাবে ঘুচে ?
কবে আমার শ্রান্ত আঁখি
সত্য হেরে ভুল্‌বে ফাঁকি ?
আঁধার যাবে মুছে ?

অনঙ্গমোহিনী দেবী।

———

লভ।

—*—

"লভে" পড়া ছিল অসিতের "ম্যানিয়া" আর রঙিয়ে ফলিয়ে গল্প ক'রে সে কথা জমিয়ে তোলা ছিল তার—বাঁধা নিত্যি বিকেলটীতে। সুরেশ, মলিন আর চারু টারু তার সব কলেজ ফ্রেণ্ডস্ ও মেসের সঙ্গীরা শুন্‌তোও যেমন মনোযোগ দিয়ে—পানীয়ের সঙ্গে চাটের মত চায়ের সঙ্গে সে চুট্‌কী তেমনি উপভোগও ক'র্ত্তো দিব্যি মোলায়েম। প্রশান্তটা কেবল ছিল কিছু বেয়াড়া ধরণের মাঝে মাঝেই রসভঙ্গ ক'রে এমন এক একটা টিপ্পনী কাট্‌তো যে অসিত তো রেগে ফেঁদেই অস্থির—পারে তো প্রশান্তকে লাগিয়ে দেয়—দু—ঘা।

সেদিন বিকেলে প্রথম অনুপের বিলিতি ডাক—Her young majestyর বুকের রঙে রঙিন্ লেখাখানার উপর মল্লীনাথী "কমেণ্টারী" চালিয়ে এই বার সব বসেছিল অসিতের গল্প শুন্‌তে।

অসিত তখন আট বছরের—গোঁসাই বাড়ীর খেঁদী রোজ দুপুরটীতে আস্‌তো কালোজাম কুড়ুতে ও চুপি চুপি উঠে গিয়ে পেছন থেকে তার চোখ দুটো হাত চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস কর্‌তো—"বল্ ত কে?" ইত্যাদি এক প্রস্থ হ'য়ে যাবার পর দুই এর নম্বর সুরু হল :—

তারপর মেঝ বৌদি'র বাপের বাড়ী তার ছোট বোন টুনী,—সে যা সুন্দর তা আর কি ব'ল্‌বো! ফরসা ঠিক "আইসবার্গের ওপর আরোরা বোরিয়ালিসের" রশ্মি রেখার মত ঝিক্-মিকে রং কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল কালো চোখ দুটোর দুটো পাশ একটু একটু ঢেকে দিয়ে নেবে এসে গালের ওপর ঝুম্‌কো ঝুলে উঠেছিল বয়েস "কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল" রকমের—

সবে এইটুকু হয়েছে এমন সময় সিঁড়িতে প্রশান্ত মোহনের পায়ের হেলথের বাড়ীর হাঁস মার্কা জুতোর মোলায়েম শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল সবাই এক সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো "ঐ রে' প্রশান্ত দা আস্‌ছে"—

অসিত ব'ল্‌লো "আসুকগে যা—তারপর শোন্"—

"হ্যাঁ বল্"—অনুপ এই উত্তর করতে করতেই সপুস্তক সচশমা প্রশান্ত ইয়া টেরী আর বাগানো গোঁপ নিয়ে এসে হাজির তাকে দেখেও অনুপ ব'লতেই লাগ্‌লো "হ্যাঁ আইস বার্গের ওপর—অরোরা বোরিয়ালিসের রশ্মি রেখার মত"

প্রশান্ত অমনি ব'লে উঠ্‌লো—"এ যে উপমা কালিদাসস্য"—ইনি বুঝি অসিতের "হা হতোস্মি"—ওরে শোন্‌শোন্ ঐ গল্পটা আমি শেষ ক'রে দিচ্ছি—"তারপর অসিত একটা হর্স্‌ছক্ প্যাটার্ণের আংটী কিনে দিব্যি মখমল মোড়া একটী বেগুনে কেসের ভেতর সেটিকে পুরে তার ওপর তাজা পেস্তার চেয়েও সবুজ রঙে ফুটিয়ে তোলা একটী মৃণাল লতার ডগায় আধ ফোট একটী পদ্মের পাপড়ী সাজিয়ে গুছিয়ে তার নামের মনোগ্রামটী কারু ক'রে তার পর—শ্রীমতী......টুনীকে উপহার প্রণয়ী অসিত" এই একটী কথা লিখে টুনীর কাছে পাঠিয়ে দিলে, টুনীতো পেয়ে চ'টে একদম টং—"

"তোমার মাথা" ব'লে অসিত উঠে দাঁড়াতেই প্রশান্ত তাকে ধ'রে বসিয়ে ব'ল্‌লে—"আচ্ছা আর ব'ল্‌বো না ব'স শোন! এই চারু, আজ ডবল খবর জান্ গুলজার।" বলে প্রশান্ত ধপাস্ ক'রে বইএর রাশ টেবিলের উপর ফেলে সার্ট খুলতে লাগলো। মলিন বল্‌লো :—

"কি খবর কি খবর প্রশান্ত দা?—জার্ম্মান সাবমেরিন সব ইংরেজেরা দখল করেছে?"

"তার চেয়েও বেশী—বিজুতে ৫০০০ ফিট ফিলম্ মন্টেক্রিষ্টো—চমৎকার আর মীনার্ভায় "রাজার ঘরণী" নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক—যাবিতো এইবেলা শীগ্‌গির।"

"সত্যি নাকি? তুমি যাবে প্রশান্ত দা?"

"না আমি আর অসিত লভে পড়ার গল্প ক'র্‌বো—না কিরে অসিত?" ব'লে প্রশান্ত অসিতকে চট্ ক'রে চ'খের ইসারা ক'ল্লে।

ইতিমধ্যে সবাই ছুট-ছাট উঠে বিজুতে আর মীনার্ভায় যাবে ব'লে তৈরি হ'তে গেল—অসিত ব'ল্লে—তার নাকি মন ভাল নেই তাই রাত্তির জাগা বরদাস্ত হবে না। ওরা তখন দল বেঁধে বেরিয়ে গেল। কেউ গেল বিজুতে কেউ বা মীনার্ভায় এদিকে প্রশান্ত ফাঁক পেয়ে অসিতকে নিয়ে প'ল—"ওমর খইয়ম ক্লাবের" আজগুবি খবর শোনাতে।

ওমর খইয়াম ক্লাব জিমখানার মত বিলিয়ার্ড ও ব্রিচ খেলার একটা পোষাকী আড্ডা নয়—ভারী ভারী দেহ বা বড় বড় মোটরও সেখানে যাতায়াত করে না। এ একটা রেস্তোরাঁ—নুতন খুলেছে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের মোড়ে। বাঙ্গালীদেরই এস্টাব্লিসমেণ্ট—কিন্তু সাহেবী ধরণে একজন সুন্দরী কর্ত্রী রেখেছে Land ladyর মত। সৌখীন চা—খেয়ালীরা সেখানে সন্ধ্যায় পান-ভোজন শেষ ক'রে চার পাশের অস্পষ্ট গুঞ্জন-গন্ধের স্মৃতি নিয়ে বাসায় ফেরেন। ক্লাবের এই রকম সাজ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে প্রশান্ত ব'ল্লে—"যাবি অসিত আজ চা খেতে—ওমর খইয়ামে?"

অসিতের Lover গল্পটা অমন হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে যাওয়ায় মনটাও তীর হয়ে উঠেছিল, বেজায় রকমের ভারী-ভারী আর পড়াশুনার বালাইও সেদিন সন্ধ্যাবেলা বরদাস্ত হ'তে চাইছিল না। যাওয়া নিতান্ত মন্দ মনে হলো না। ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীর ওপর জরীর পাড়টানা চাদর উড়িয়ে দুজনেই বেরিয়ে প'ল। "বুকে"র শিশিটা কাত করে রুমালখানা ভিজিয়ে নিতেও অবিশ্যি ভুল্‌লো না—কারণ নতুন হোটেলে—তরুণী-গিন্নি—চিত্তের ভেতর একটু গুঞ্জরণ গুমরে ওঠা তো আর আশ্চর্য্য নয়।

বেণ্টিক ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম ছেড়ে লেড্‌লর বাড়ীর নীচেকার ফুটপাথ ধ'রে দুজনে হেঁটেই চ'ল্‌লো ঠিকানার সন্ধানে। অন্যদিন কি আর কোনো হোটেলের কথা হলে হয় ত চা, চোকোলেট, চপ কাটলেট ইত্যাদি টিফিনের টিপ্পনীগুলোই বারে বারে মনে পড়তো এবং জিহ্বাও অসিতের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত রকম সরস হ'য়ে উঠতো নিশ্চয়। কিন্তু এ ওমর খইয়াম ক্লাবের সুন্দরী সাকীর কথায় কল্পনা অসিতের মন ও চিন্তা জুড়ে রামধনু রঙের রেশমী সুতোয় জলদ হাতে জাল বুন্‌তে সুরু কল্লে। সে ভাবলে কচি, কাঁচা, কোমল একখানা মুখ, কালো একযোড়া চোখ, টুকটুকে গায়ের রঙ, ফিক্ করে একটুখানি হাসি—তার ওপর আবার হাল-ফ্যাসানের সাড়ী-পরা ব্লাউজের হাতের বাহিরে মোলায়েম, সুগোল হাত, সাদা ক্রোম লেদারের ঘুন্টিবাঁধা জুতো যোড়া—ইত্যাদি অনেক কথা। প্রশান্তর মনের ওপর এরকম কোনো চিন্তা বন্যার মত ঢেউ তুলিয়ে ছুটেছিল কিনা—তা সেই জানে তবে একটীও কথা না ব'লে আপন মনে সিগারেটটা টানতে টানতে সে চ'লেছিল—সটান।

খানিকটা এগিয়েই দেখে—সামনের বাড়ীখানা আগাগোড়া জরদা রঙের জৌলুস দেওয়া—দরজাটার ওপরে—একটা বিজলী বাতি জ্বলছে।

দুইবন্ধু বরাবর ভেতরে ঢুকেগিয়ে দুখানা Cane Seated টিফিন চেয়ারের ওপর ব'সে প'ল। সামনে দেয়ালের গায় সুতোর কারিকরিতে ফুটিয়ে তোলা অক্ষর সাজিয়ে একখানা সাইন বোর্ডের ওপর লেখা আছে "ওমর খইয়াম ক্লাব—" তার নীচে নকল মিনার কুচিকুচি জমিয়ে ঝিকি মিকি চমকে চিক্‌মিকানো এটী ইংরিজী কথা :—

"Eat, drink and be merry"

ঘরের মেজেয়, দে'য়ালে চারদিকে আলোর স্রোত এলিয়ে গিয়ে ঝক্ ঝক্ কচ্ছিল। তিনখানা বৈদ্যুতিক পাখা অনবরত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। তরুণী হোটেল-কর্ত্রীর একরাশ কালোচুলের দুএক গাছা উড়ে উড়ে এসে তার গোলাপী মুখের ওপর সিরসির ক'রে উঠ্‌ছিল আর সে সুগন্ধি রুমালশুদ্ধ হাতখানা তুলে ফিরিয়ে উচ্ছৃঙ্খল সেগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। তখন সোনার চুড়িগাছার ওপর আলো আছাড় খেয়ে প'ড়ে হাত সরাবার ফাঁকে ফাঁকে রূপের যে ঝাঁজ জেগে উঠ্‌ছিল তাতে আত্মহারা হ'য়ে যাওয়া কারো পক্ষেই নাকি অস্বাভাবিক নয়। অসিত তো অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে—হাঁ। সুন্দরী দিব্যি কুণ্ঠাহীন, অসঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনাদের কি দেবে ?"

ঘরে আগাগোড়া রিপটাইছিল আদর আর আপ্যায়িতের—আবার খাঁটি সাহেবী ইডিয়ামে প্রশ্নটা হয়ে—ব্যাপারটাকে অসিতের কাছে করে তুললো—পুরোপুরি চমৎকার।

প্রশান্ত তার মুখস্থ করা বিলিতি Slang এ ধন্যবাদ দিয়ে মুখেমুখেই টিফিনের ফর্দ্দখানা দাখিল করলে—অসিত তো কেবল চেয়েই দেখছে শাকির দেহের কাণায় কাণায় যৌবন ঢেউএর মত উদ্দাম হয়ে উঠেছে আর আবেগটা তার চাপা আছে শাড়ী ব্লাউজের আঁটা—শাসনে। বলতে বলতেই Course মাফিক খাদ্য ও পানীয় টেবিলের ওপর এসে হাজির—অসিতটা এদিকে বেজায়—অন্যমনস্ক। প্রশান্ত তার পিঠের ওপর ছোট্টো একটা কীল মেরে চুপি চুপি ব'ললে।—Don't get silly my dear" তার খবদারিতে কিছু হুঁস হলে পাশে তাকিয়ে দেখে জন তিনেক কিশোরী বসে সেখানে খাচ্ছে—আর মুখতুলে অসিতের দিকে একবার অমনি একটু তাকিয়ে মুখটিপে হাসছে যেন।

অবশ্য সেটা যে অসিতের হঠাৎ বিহ্বল হ'য়ে যাবার উপলক্ষেই তারা হাস্‌ছিল সে কথা হলফ ক'রে বলা যায় না।

অসিতও এতক্ষণে সুবুদ্ধি "প্রোতেজের" মত প্রশান্তর ইঙ্গিতে টিফিন খেতে আরম্ভ ক'র্‌লে। মেয়ে তিনটী খেয়ে হিসেব চুকিয়ে দিয়ে হাসির সঙ্গে Landladyকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদেয় হ'ল—যাবার সময় প্রশান্তর চোখের দিকে এমন ক'রে অপাঙ্গটী বেঁকিয়ে গেল যেন তারা "জনক জনপদ বাসিনী।"

অসিতরাই তখন যুগল ঘরের ভেতর "মনার্ক অবঅল" যা কিছু "সার্ভে" করা যাচ্ছিল আর যা কিছু তো অসিতের কাছে সেই Landladyর আপাদ মস্তক সারা দেহটা আর প্রশান্তর কাছে—মনে মনে অবশ্য—এই কথটা যে এ সুন্দরীর চলাফেরা, হাবভাবকে নির্লজ্জ বল্‌লে নিশ্চয়ই অবিচার করা হবে।

খানিকক্ষণে খাওয়া শেষ ক'রে টাকা দেবার জন্যে কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দুজনে দাঁড়ালো। এবার অসিত আর তার ভেতর সওয়া হাত মোটে ব্যবধান মৃদু নিঃশ্বাস আর হাওয়ায় চঞ্চল আঁচল থেকে সুগন্ধ এসে অসিতের প্রেমিক প্রাণের লুকোনো পাতাটীতে অনেক রকম যা-তা হিজিবিজি কথা লিখে দিলে। পকেট থেকে একটা গিনি বার ক'রে সুন্দরীর প্রসারিত হাতখানার ওপর দিতে যাবার সময় অসিতেরও হাতখানা বিলক্ষণ কেঁপে গেল—সুন্দরী তা লক্ষ্য ক'র্‌লো ব'লেই বোধ হয় গিনিটা নিয়ে ঈষৎ একটু হেসে বাঙলায় ব'ল্লে :—"চার টাকা এগার আনার জন্যে শবরেণটা ভাঙাবেন? এটা দেখছি পুরোনো গিনি খাঁটী সোনা—এর পরে এ রকম গিনি পাওয়া শক্ত হবে।"

অসিত সেদিন গিনিটা ইচ্ছে ক'রেই এনেছিল আর পকেট থেকে নোট না তুলে সোনার টুক্‌রোটী তুলেছিলও ইচ্ছে করেই। কিন্তু সে মিঠে কথার সে জবাব আর দেবে কি? তার মনে হ'তে লাগলো সে Change না নিয়েই ফিরে যায়। কিন্তু তাতে হয় তো সুন্দরীও অপমান বোধ ক'র্‌বে—আর প্রশান্ত মেসে ফিরেই একখানা নাটক তৈরি ক'রে সবাইএর সামনে সেটার অভিনয় সুরু ক'রে তাকে অপদস্থ ক'র্‌বে। প্রশান্তই মৃদু হেসে হোটেলের কর্ত্রীর কথার জবাব দিলে—বল্লে :—ঠিক ব'লেছেন—আপনি দিন—আমি টাকাই দিচ্ছি।"

হোটেলের গিন্নি গিনিটা অসিতেরই হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটু হাস্‌লেন তারপর টাকা কটা "শেলফে" ফেলে পাঁচটা আনি দেবার জন্য এগিয়ে ধরলেন অসিতেরই দিকে। হাত বাড়িয়ে তা নিতে যেতেই অসিতের উড়নীর মুড়োটা উড়ে সেই কোমল হাতখানার ওপর গিয়ে প'ড়লো—সে অমনি তাড়াতাড়ি "beg your pardon madame" ব'লে চাদরটা টেনে নিয়ে একটু অপ্রতিভভাবেই তাঁর মুখের দিকে তাকালো। তিনিও সেই মধুর হাসি আবার হেসে ব'ল্লেন :—"না—না কিছু না—এর ভেতরে এমন একটা কিছু gallantry আছে—তাতো নয়।"

এবার মুখখানা সুন্দরীর লালাভ হয়ে উঠে আরো সুন্দর দেখালো। পাওনা দেনা মিটে গিয়েছে—আর তো থাকা ভদ্রতা হয় না—অগত্যা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল—যাবার সময় অসিত ঘাড়টা বেঁকিয়ে পেছন পানে' কি আর একবার নাই তাকালো ?

বাহিরের হাওয়া এসে গায় মুখে লাগ্‌লেও মনের খেই হারানো উষ্ণ অবস্থাটা মোটেই স্নিগ্ধ হলো না—অসিত প্রশান্তকে ব'লে ফেল্‌লো ;—"বেশ দেখ্‌তে কিন্তু রে !"

প্রশান্ত মুখের সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে বা'র ক'রে এনে এক গাল ধোঁয়া শুধু অসিতের মুখের ওপর উড়িয়ে দিলে। অসিত আবার বল্লে ;—"খাসা চোখ যোড়া সত্যি—কি কালো ভুরু।"

প্রশান্ত উত্তর দিলে—"খুব কালো। সত্যি—বেশ দেখ্‌তে। তা হ'লে এবার তোর এই থার্ড টাইম চিত্ত চুরি গেল ?"

"থার্ড কি বল্‌ছিস—এইটেই যেন মনে হ'চ্ছে—ফাষ্ট টাইম !"

"কিন্তু এবার লভ তোমার চ'ল্‌বে না—কারণ ক্লবটা আমার আবিষ্কার।"

"ব'য়ে গেছে তাতে loveএ পড়া তো তোমার অভ্যাস নয়।"

"লভে পড়া আমার ব্যবসা নয় ব'লেই এযাত্রা একদম হারিয়ে গেছি বুঝি !"

"এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা তোমার কিছুতেই উচিত নয় প্রশান্ত, তা হলে আমায় ডেকে এনেছিলে কেন ?"

এর মধ্যে ট্রাম এসে প'ল। দুজনে উঠে ব'সে সিগারেটই টেনে চ'ল্ল। চুপ চাপ

ছুজনেই—অসিত তো জেগে ব'সেই বুঝি স্বপ্ন দেখতে লাগলো হোটেলওয়ালী—সুন্দরী তার অমায়িক ব্যবহার, মিষ্টি কথা—আহা কি যেন সে কেমন কেমন—কিসের মতন--বেশ খাসা।

তারপর দিন গিরিডি থেকে এক চিঠি এল প্রশান্তর শালীর নাকি অসুখ—সে চিঠি পেয়েই গিরিডি চ'লে গেল। অসিত কিন্তু সন্ধেটাতে সোজা ওমরখইয়াম ক্লাবে হাজির—উপরো-উপরি রোজ। ওদিকে Law Collegeএ Proxy এদিকে মেসে ফিরতে রাত্তির দশটা। ওরা তো সব হল্লা হ'ক আর বায়াস্কোপ ও থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত এদিকে মনও দিলে না, খোঁজ পাবারও কাজেই কোনো সুযোগ হ'ল না।

দিন দুএই হোটেলের গিন্নির আলাপে, সৌজন্যে অসিতের সঙ্গে পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। সেদিন যেতেই তিনি অসিতকে নমস্কার দিয়ে বরণ ক'রে নিলেন; আসবার সময় good night ব'লে সম্ভাষণ ও শুভ ইচ্ছা জানিয়ে "কাল আবার দেখা পেলে সুখী হব" ইত্যাদি কথায় অসিতকে রাঙা ক'রে বিদায় দিলেন।

পরদিন অসিত একটা টকটকে লাল গোলাপফুল বুকে গুঁজে হোটেলে ঢুক্‌লো আসবার সময় দুটী কচি ডালের দুদিকে গুটীকত সবুজপাতার বুকে বন্দী সেটীকে শাকীর সুন্দর হাতে তুলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভাব্‌লো—আহা! শাকী যদি গোলাপটা তার বুকে ক'রেই রাত্তিরে ঘুমোয়!

পরদিন রাত্তির প্রায় দশটা। ক্লাব তখন নির্জ্জন হ'য়ে এসেছে, অন্য মেয়ে খদ্দেরও কেউ নেই কেবল একটী ছোট বছর আটেকের মেয়ে শাকীকে খুঁটিনাটী কাজে সাহায্য করছিল। অসিত আস্তে আস্তে কথা পাড়্‌তে যেতেই মনটা চট ক'রে একবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো, তবু সাহসে মরিয়া হ'য়ে সে বলে ফেল্‌লো:—"আপনার আর কে কে আছেন!" শাকী সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবেই একটুখানি মোটে হেসে উত্তর ক'র্‌লেন:—"আর কেউ না এই বোন্‌টী।"

"তা-তা"—একটু ইতস্ততঃ ক'রে অসিত ব'ল্‌লে—"এই রকম ক'রেই কি old maid life কাটাবেন!"

"তা উপায় কি বলুন—একজন হোটেলওয়ালী বিশেষতঃ বাঙলাদেশে। অন্য আইডিয়াই তো কিছু এখানকার সমাজে Shocking"

ব'লে শাকী মুখখানা একটু নত ক'রলেন—নেবে পড়া পাতা দুখানার নীচে চোখের কোণটা যেন ভিজে এলো অসিতেরও বুকটা তাতে সত্যি ব্যথা ক'রে উঠ্‌লো ; সে ব'ল্‌লে ;—"সমাজ—Old রবিস্—মানিনে আমি ওর যত nonsensical বাঁধি গৎ এ রকম সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার moral courage কারো কারো অবিশ্যি আছে।"

"আপনারও আছে তা হলে বোধ হয়"—

"সেটা নির্ভর করে শুধু আপনার কথার উপর"

সুন্দরী চট্ ক'রে চেপে গিয়ে ব'ল্‌লেন ;—আচ্ছা good night কাল একবার পায়ের ধুলো দেবেন—দুপুরে ?"—

"আপনার বাড়ীতে ?"

"হ্যাঁ দয়া করেন যদি"—

"আমার সৌভাগ্য—This is so very good of you—এইখানে ?"

"না কাল রববিার আমাদের বন্ধ—আমি এই ওপরেই থাকি—দুপুরে আপনার মত বন্ধু জুটলে অবসরটা গল্পে গুজবে বেশ উপভোগ করা যাবে।"

"আমি নিশ্চয় আস্‌বো।"

"ভুলবেন না তা হ'লে—নমস্কার।"

নমস্কার ব'লে অসিত বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ট্র্যামের রাস্তার দিকে ছুট্‌লো কেন না রাত্তির বেশী হয়ে গেছ্‌লো। ট্র্যামে উঠে ব'স্‌বার আগেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেল্‌লো যে রাজী হ'লে শাকীকে সে বিয়ে ক'র্‌বে। রাত্তিরে তার আর ঘুম হ'লো না।

অসিতের যে দামী রিষ্টওয়াচটার প্রশংসায় মেসে ছেলেরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তো আজ তার নিজের কাছেই মনে হ'তে লাগ্‌লো সেটা বুঝি ঘণ্টায় দশমিনিট শ্লো চ'ল্‌ছে—দুটো আর বাজে না। যা'হোক্ সময় তার হিসেব মত ঠিক্ ঠিকই ব'য়ে গেল—দুটোও বাজলো। অসিত পাতলা রেশমী পাঞ্জাবীটা আর মিহি চাদরখানা গিলে ক'রে আগে থেকেই ঠিক রেখেছিল। এইবার সেজেগুজে বেরিয়ে প'ল নায়কটী গো নয়—জামাইটী।

বরাবর মিউনিসিপাল মার্কেটে পৌছে বড় একটা রক্ত গোলাপের তোড়া কিনে ওমর্ বইয়ামক্লাবের বাড়ীটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। জান্‌লা-দোরগুলো সবই বন্ধ কোথায়ও

কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সময় তখন কাঁটায় কাঁটায় তিনটে—অসিত ভাব্ছে কি ক'রে কাকে ডেকে খবর নেওয়া যায় এমন সময় হঠাৎ ওপরের একটা জান্‌লা খুলে গেল—জারির ফাঁকে শাকী তার ফুলের মত মুখখানি আদ্ধেকটা বার' ক'রে দিয়ে ব'ল্‌লে "আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হোক বরাবর ওপরে—দরজাটা ঠেল্‌লেই খুলে যাবে।"

সিড়ি ধরে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে অসিত দেখে বাঁদিকে ড্রইং রুম বরাবর ভেতরে ঢুকে প'ল। কার্পেটপাতা মেজে, পেণ্টকরা দেয়'াল, দামী দামী ছবিতে চারিটী পাশই তার মনোজ্ঞ ক'রে সাজানো—ঘরখানি রূপে গৌরবে তক তক, ঝক ঝক ক'চ্ছে।

শাকী অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে তাকে অভিনন্দন দিয়ে একখানা মখমল-মোড়া সোফায় ব'স্‌তে ব'ল্‌লে। রকম-সকম দেখে কিন্তু অসিত এ'কেবারে অবাক হ'য়ে গেছলো। ড্রইং রুমের একপাশে একটী পিয়ানো আর একদিকে সারি সারি তিনটী আলমারী আগাগোড়া বই এ বোঝাই। অসিত দেখ্‌লো—সুন্দরী এ-হোটেলের গিন্নিটী শুধু অঙ্গে বা অপাঙ্গে নয়—মনে-জ্ঞানেও এঁর যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আর শালীনতা আছে। এত বই কি আর শাকী দেখাবার জন্য সাজিয়ে রেখেছেন? অবসর পেলেই পড়েন নিঃসন্দেহ।

অসিতকে ব'সতে বলেই তিনি সুইচটা টেনে মাথার ওপর পাখাখানা ছেড়ে দিলেন। তার দমকা বাতাসে—তরুণের চাদরখানা আর টেরির ভাঁজের লম্বা চুলগুলো উড়ে উঠ্‌লো সুন্দরীরও কপালের ওপর থেকে—কালো একগোছা চুল বাঁধন এড়িয়ে ঝুলে নেমে—গালের লালটা ঢেকে দিয়ে চ'ম্‌কা হাওয়ায় দুলে উঠ্‌লো। ঠোটটীতে মুচকীহাসি টুকুন টিপে ব'ল্লেন—"আপ্যায়িত হলুম—আপনি যে এসেছেন দয়া ক'রে এই রোদ্দুরে—ভয়ানক কষ্ট হ'য়েছে হয় ত।"

অসিত তো কত কথাই ব'ল্‌বে ব'লে এঁচে এসেছিল। সারাটাদিন রা'ত কেবল "রিহি-র্সার দ্যালই" দিয়েছিল মনে মনে। কিন্তু এইবার সাম্‌না সাম্‌নি—একেবারে তার ঘরের ভেতরে একা—Love এ পড়ার শিক্ষানবিশ হ'লেও তার সব কথাই যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল গলার ভৈতর আওয়াজ বুঝি স্তম্ভিত হ'য়ে যাবারই যোগাড়। কথা ব'ল্‌তে যেতেই বেচারীর পায়েরতলা সিরসির আর সারা গা মাথা ঘেমে ঘুমে ঝিম ঝিম ক'রে উঠ্‌লো। শাকী ব্যাপারটা

লক্ষ্য ক'রে মুচকী হাসিটুকু ঠোঁটেচেপে আ'বার ব'ল্লেন—"সত্যি এতদূর রাস্তা—" অসিত এবার পকেট থেকে গন্ধ মাখা রুমালখানা বা'র ক'রে মুখের ওপর থেকে ঘামটা মুছে এনে অনেক কষ্টে ব'ল্লে "না ;—এ আর দূর কি ?—এমন কিছু কষ্ট - না কিছু না"—

আবার সেই হাসি—অসিত পাগল হ'য়েই যাবে বুঝি। সুন্দরী হেসে ব'ল্লেন "আপনি সত্যি চমৎকার লোক—"

"আপনি যে চমৎকারের চেয়েও চমৎকার—আমার ইচ্ছে করে -"

অসিত আর বল্‌তে পার্‌লে না।

শান্তী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললেন—"আপনার যা ইচ্ছে করে তাকি আর হবার উপায় আছে—বাঁধন বড় শক্ত—এ আমাদের বাঁধনের ওপর বাঁধন দেওয়া—সমাজের, নিয়মের—মাথার দিব্যি গালা—অসিত তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্‌লে !—"

"আমি সমাজ মানিনে।"

"কিন্তু আমি তো মানি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পাশের দরজাটা খুলে গিয়ে সাম্‌নেই একেবারে অসিতের ঘাড়ের ওপরেই এক রকম—যে ? অঁ্যা ! প্রশান্তটা ? রাসকেল ! এমন সময় প্রশান্তটা এখানে কি ক'রে এলো—অবাক্।

অসিতকে হতভম্ব হবারও অবসর না দিয়ে প্রশান্ত হো হো ক'রে হেসে উঠে ব'ল্লে—ব'লেইছিলাম তো অসিত, যে তোর Imaginary লাভে পড়া একদিন সত্যি খাঁটি হ'য়ে উঠ্‌বে—উঠ্‌লো তো ? আজ তুমি মস্ত Romance এর বাহাদুর hero কিন্তু দুঃখ এই যে নাটকখানা Comedy না হ'য়ে খাঁটি Tragedy হ'য়ে গেল,—ওমরখইয়াম ক্লাবের সব নারী খ'ক্কের দেখেও কিছু ঠাওর করিতে পারে নি—প্রেমিকা ? allow me to introduce—My wife আমার বড় সাহেব—আর আমি ওমরখইয়াম্ ক্লাবের প্রোপ্রাইটার সম্প্রতি ঐ নামের একটী ক্লাব তুলি দিয়ে শ্বশুর এ বাড়ীখানা আমায় দিয়েছেন !

অসিত আর শুন্‌বে কোন্ মুখে—তড়াক ক'রে লাফিয়ে সিঁড়িতে এসে প'লো। প্রশান্ত বল্লে—"আরে হতভাগা, চা খেয়ে যা।" আরো চা? যোড়া যোড়া সিঁড়ি এক এক ধাপে পেরিয়ে একদম রাস্তায়—প্রশান্ত পেছনে পেছনে নেমে এসে বল্‌লো—"ওরে ফিরে আয় বোকা,—Comedy হবে—এঁর ছোটটী ঠিক এই রকমই!"

'কার কথা কেবা শোনে' অসিত ধর্ম্মতলা মুখে পূরোদমে ছুট।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ।

(Pope হইতে)

কৃপা করি ভগবান ভবিষ্যজীবনগ্রন্থে
রেখেছেন পৃষ্ঠাগুলি নয়ন-আড়ালে,
একখানি পত্র শুধু বর্ত্তমান চিত্র বহি
উন্মুক্ত সম্মুখে রহে সর্ব্ব দেশ-কালে।
অশরীরী আত্মা যাহা জানে, তা' জানে না নর
পশুরা জানে না পুন যা' জানে মানব
তা' না হ'লে জীবনের ব্যথাক্লিষ্ট জীর্ণ ভাব
বহন সহন কি গো হইত সম্ভব?

হের ঐ ছাগশিশু বলিদান তরে যারে
রাখিয়াছে যূপকাষ্ঠে করিয়া বন্ধন,
'মৃত্যু তার সন্নিকট' এ সত্য জানিত যদি
নাচিতে খেলিতে সে কি পারিত এমন?

নিরাতঙ্ক নিরুদ্বেগে উৎসর্গের বিল্বপত্র
চর্ব্বণ করিতে হেন দেখিতে উহারে ?
উত্তোলিত খড়্গধর ছেত্তার নির্ম্মম কর
লেহন করিত কি গো মৃত্যুর দুয়ারে ?

কৃপা করি ভগবান অনাগত জীবনের
অজ্ঞতা বিতরি মোদে করেন পালন,
নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মাঝে জীবনের সব কাজে
ভবিষ্যের সুখ-আশে করি সম্পাদন।
বীরের মহিমাময় সমরে শয়ন কিম্বা
সামান্য একটি তুচ্ছ অলির বিলয়
বিধিবন্ধ শৃঙ্খলিত সৌর জগতের ধ্বংস
অথবা সে পরমাণু অণুটির ক্ষয়,
সৃষ্টি লয় মন্বন্তর ইন্দ্রপাত যুগান্তর
কিম্বা জলবিম্বটির স্ফোটন মজ্জন
সবার নিয়ন্তা তিনি নির্ব্বিকার বিচারক
সকলি সমান নেত্রে করেন দর্শন।
পোষিয়া বিনম্র আশা কম্পিত পক্ষের ভরে
ধীরে ধীরে ব্যোমপথে হও রে উড্ডীন,
ভক্তিভরে পূজ তাঁয় রহ পুন প্রতীক্ষায়
হরিবে অজ্ঞতা সবি মৃত্যু এক দিন।
তোমারি মঙ্গল তরে পরম মঙ্গলময়
ভবিষ্য জীবনবার্ত্তা রাখেন গোপনে,
সুখ হতে মধুময়ী সুখের ভরসা আশা
সতত রাখেন তিনি সঞ্চিত জীবনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সাহিত্য।

কোন মাসিকে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন,—"ভারতের স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যেরূপ উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই যে আমরা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" আমার বোধহয় লেখক সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিয়াই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের শিক্ষা প্রণালীতে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে সত্য, দুইটী নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে; বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী লইয়া স্যাডলার কমিশন অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন, নবীন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া সকলেই ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু এই যে এত উদ্যোগ আয়োজন, ইহা কি আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিয়াছে, না পারিবে? এত করিয়াও আমরা এত পশ্চাতে পড়িয়া আছি যে অমন উচ্চ আশা এখনও করা চলে না। ভারতের সমগ্র অধিবাসী তারস্বরে বলিতেছেন,—"India must teach or die" হয় ভারত শিক্ষিত হউক না হয় ধ্বংস হউক।

কথাটা খাঁটি সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি শিক্ষার পরিচায়ক হইলে কথা ছিল না; ভারতে ওরূপ উপাধির অভাব নাই কিন্তু শিক্ষা বা শিক্ষিতের অর্থ অন্যরূপ। আমাদের প্রতিবাসী জাপানী বালকগণ যে দিন পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল, সে দিন হইতে তাহারা আপনাপন শিক্ষা দীক্ষা মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায় অর্পণ করিয়াছিল; সমগ্র জাপানে স্কুল, কলেজ, শিল্পাগার, কল, কারখানা খুলিয়া তাহাদের অশিক্ষিত দেশবাসীকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই অন্ন ও মৎসভোজী জাপান বিশ্ব-বাসীকে জানাইয়া ছিল যে, পাশ্চাত্য শক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে

পারে। ভারতবাসী কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত পথে চলিয়াছে বিলাতী শিক্ষা প্রাপ্ত ভারতবাসী বিলাতী ভাব ও ভাষাকেই বড় করিয়া দেখিয়া ধন্য,—মুখে স্বীকার না করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজের দেশকে নিজেদের সভ্যতাকে উচ্চ নজরে দেখিতে পারেন নাই তাহাদের মনপ্রাণ নয়ন ধাঁধিয়া দিয়াছে বিলাতী শিক্ষার বৈদ্যুতিক আলোক; নিজকে জাতীয়তাকে তাহারা, হারাইয়া ফেলিয়াছেন জাপান ও ভারতের বিলাত ফেরতের তফাৎ এইখানে! একজন জাতিকে বিদেশী প্রভায় উদ্ভাষিত করিয়া উজ্জ্বলতর করিতে চেষ্টিত—আর এক জন বেদেশী চাকচিক্যে অন্ধপ্রায় হইয়া নিজের দেশ, জাতির প্রকৃত মূর্তিটা হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ—তাহার উপকারের চেষ্টা ত দূরের কথা।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের অনেকটা শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন সত্য,—সে জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহাদের দেওয়া শিক্ষা, তাঁহাদেরই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। আমাদের দ্বারা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করাইয়া লইয়া, তাহার প্রসাদে তাঁহারা অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, আর প্রাণপন পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা পাইতেছি, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, বড়জোর ৪৫৲ টাকা,

যে শিক্ষায় বুদ্ধির বিকাশ হয় না, উদ্ভাবনীশক্তির উন্মেষ হয় না যে শিক্ষায় নিজের অভাব অভিযোগ দূর করিবার ক্ষমতা নাই; তাহা শিক্ষা নহে কুশিক্ষা! আর শিক্ষিত হইয়া দেশের বা উপকারই আমরা করিব কোথা হইতে, নিজের উদর পূরণ করাই দুঃসাধ্য হইয়া দাড়ায়। যখন উপাধির গণ্ডমালা গলায় ঝুলাইয়া শীণদেহ অল্পবুদ্ধি যুবক-সম্প্রদায় সমাজ ও সংসার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা ভাবিয়াই পায় না যে কি করিবে। অর্থহানি করিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া এতদিন তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে, এম্-এ, বি-এ, পাশ করিয়াছে, সুতরাং ৩০।৩৫ টাকা বেতনের চাকরি করিতে একেবারেই নারাজ; তাহারা এমনি নিরাশ হইয়া পড়ে যে, চাকরি ছাড়া উদর পূরণের যে আর কোন উপায় থাকিতে পারে, সে কথা তাহারা ধারণা করিতেও অক্ষম। বিশেষতঃ কেরাণীগিরি করা বাঙালী জাতটার যেন মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবল মাত্র আমাদের লেখা-পড়া শিখাইয়া, নিজেদের কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া দেয়, সে শিক্ষায় আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় না, আমরা নিজের পায়ে ভর

দিয়া দাঁড়াইতে শিখি না। স্কুল এবং কলেজগুলি কেবল পড়া মুখস্থ করাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাক্, চরিত্র নষ্ট হইয়া যাক্, কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকগণের সে দিকে দৃকপাত নাই, ছাত্রবর্গ কোনরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাক, ইহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা নয়, ইহা পরীক্ষা পাশ করিবার মেশিন মাত্র। ১৯১৪-১৫ খ্রীঃ অব্দের গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে এই পরীক্ষা পাশ করিবার মেশিনের যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ভারতের বিপুল জনসংখ্যার হিসাবে তাহাও অতি অল্প নগণ্য।

সমগ্র ভারতে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ১৩১৭১২, তন্মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে ২৭৪৭০টী স্কুল এবং উহাতে—১,০২৮৪৮৪ ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে। ভারতের সমগ্র প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৫৪,২৭৮৫০; ইহার মধ্যে ৫,৫৯৮৩১টি বালিকা ছাত্রী আছে। ইংরাজী মিডিল ও হাই স্কুলের সংখ্যা সমগ্র ভারতে মোট ৭৪৩১ এবং ছাত্র সংখ্যা ১০,৯৭৯২২ ছিল। টেক্নিক্যাল ও ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুল ১৯৮টি এবং শিক্ষার্থী ১১৭১৩ জন ছিল। আর্টস্কুল ৯টি ছাত্র সংখ্যা ১৪১১; মেডিকেলস্কুল ২৮টি, মেডিকেলকলেজ ৫টি এবং পশু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ৪টি স্কুল ছিল। ল-কলেজ ২২টি ও ছাত্রসংখ্যা ৪৪৭৬; কমার্শিয়াল স্কুল ৬১টি, ইহার মধ্যে ৩টি গভর্ণমেণ্টের, অন্যগুলি প্রাইভেট পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি হইয়াছে) এবং ১২৫টি কলেজ। ১৯০১-২ খ্রীঃঅব্দে বালিকা ছাত্রী সংখ্যা ৪৪৪৭০ ছিল, আর ১৯১৪-১৫ খ্রীঅব্দে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১০৭৮৭৩১ হইয়াছিল। আমাদের শিক্ষা দিন দিন যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে।*

এই শিক্ষা হইতে যে কোন লাভ নাই, একথা আমি বলি নাই, এই সামান্য শিক্ষা হইতে দেশের অনেক উপকার হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সামান্য শিক্ষাও এদেশের বালক বালিকা পায় না; অর্থাভাবে মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রাইমারী এডুকেশন

*—Vide Statisticat Abstract of British India. 1899-1908 to 1908-9. PP. 180

বিল মঞ্জুর হইল না। ভারতে ফ্রী পড়ান একরকম নাই বলিলেও চলে, কাজেই ইচ্ছা থাকা সত্বেও অসংখ্য দরিদ্র বালক অশিক্ষিত থাকিয়া যায়। এখানে স্কুল পাঠশালে ফ্রী শিক্ষা দেওয়া হয় না, অথচ আমেরিকায় কলেজে পর্যান্ত ফ্রী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, জাপানে রাজা-প্রজা উভয়েই প্রাণপণ চেষ্টায় দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন, আর ইংলণ্ড ত শিক্ষা দীক্ষায় সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; সমগ্র সভ্য-জগতের মধ্যে ভারতই এমন এক অভাগা দেশ যেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে কেহই বিশেষ মনোযোগ দেয় না এবং দরিদ্র বালকবালিকাগণকে ফ্রী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই, ফ্রী শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা, সম্প্রতি, সমগ্রভারতে স্কুল-কলেজের ফী বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সমগ্র সভ্যদেশে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে হিসাবে ভারতবর্ষে ছয়কোটী বিদ্যার্থী হওয়া উচিত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মোটে ৫৫ লক্ষ বালক-বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ বালকের শিক্ষা, মিডিল বা হাইস্কুলেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; সাড়ে পাঁচকোটী বালক বালিকাকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত অর্থ ও সামর্থ্য ভারতেই নাই; অথচ এই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আমরা শীঘ্রই উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিব।

সমস্ত সভ্যদেশের শিক্ষার সহিত ভারতের শিক্ষার তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহাদের সম্মুখে এ শিক্ষা অতি অল্প, তুচ্ছ! প্রত্যেক দেশের শিক্ষার একটা মোটামোটী হিসাব এইরূপ :—

দেশ	ছাত্রসংখ্যা,	প্রতি ছাত্রের মাসিক ব্যায়,	ছাত্রের বয়স,	দেশের জনসংখ্যা
আমেরিকা,	১,৬৮,০০,০০০	৪·০	৮ হইতে ১৬	৮,২০,০০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া,	৭৮,০০,০০০	৩·৬	৭ ,, ১৪	১,৫০,০০,০০০
সুইজারল্যাণ্ড,	৫,০২,০০০	৩·২	৬ ,, ১৪	৩৭,০০,০০০
যুক্তরাজ্য,	৭৫,০০,০০০	৩·০	৫ ,, ১৪	৪,৪২,০০,০০০
নাটাল,	২৬,৩৬০	৩·০	৬ ,, ১৪	৫,৯৪,০০০
জর্ম্মণী,	৯০,০০,০০০	২·৭	৬ ,, ১৪	৬,৫০,০০,০০০
ছয়টি দেশের ছাত্র সংখ্যা ৪,১৬২৮,০০০			জন সংখ্যা	২০,০২,৫৪,০০০
সমগ্র ভারতের ছাত্র সংখ্যা ৫৪,৪৭,৮৫০		০·২৫	জন সংখ্যা	৩১,৫০,০০,০০০

১৯১৪—১৫খ্রীঅব্দে যে সকল বালক বালিকা স্কুল যাইবার উপযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩৩·৯ জন বালক এবং ৬·৩ জন বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত। ভারতের প্রধান প্রদেশের শিক্ষার হিসাব এইরূপঃ—

বোম্বাই.	ছাত্র সংখ্যা	৩৬·২	ছাত্রী সংখ্যা	৭·৪
বঙ্গদেশ.	,,	৪০·৯	,,	৬·৮
মাদ্রাজ,	,,	৩৩·১	,,	৭·৪
বিহার ও উড়িষ্যা.	,,	২৬·০	,,	৩·৪
যুক্তপ্রদেশ	,,	১৭·৪	,,	১·৫

ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটী; এবং কলেজ প্রায় ১৫০টি। আমেরিকার জন সংখ্যা প্রায় নয় কোটী. এই অল্প জনসংখ্যার শিক্ষার জন্য সেখানে ৫২৫ কলেজ আছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য ১৯১২ অব্দে ১২টি এবং বর্ত্তমানে ১০টি কলেজ আছে, আমেরিকায় কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের জন্য ১৫০ শত কলেজ আছে। ভারতে ১৪০৩ জন স্ত্রীলোক কলেজে শিক্ষা পাইয়া থাকেন আর আমেরিকায় ১৭৩৩৭ জন স্ত্রীলোক কলেজের ছাত্রী। আমেরিকায় ৪,৩৪,৪৮০ জন স্ত্রীলোক স্কুলের ছাত্রী আর ভারতে ৯,৯৬,৩৪১ জন স্ত্রীলোক আঁকা বাঁকা অক্ষরে কোনরূপে পত্রাদি লিখিতে ও ধোপার হিসাব রাখিতে সক্ষম।*

মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একবার তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "ভারতের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮০০০ ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে; আর আমেরিকায় কেবল মাত্র ২৪০০০ প্রফেসার আছে।" ভারতে একলক্ষ লোকের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষা পাইয়া থাকেন আর দশলক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত বিজ্ঞানবেত্তা পাওয়া যায়। † আমেরিকা ও জর্ম্মণীর অল্পবয়স্ক বালকগণ ভারতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তাগণের অপেক্ষা বিজ্ঞান বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। ‡ রুষ ব্যতীত ভারতের জন সংখ্যা সমগ্র য়ুরোপ ও

* See S. A. B. I. 1914—15.

† Doctor P. C. Ray. D. Sc.

‡ Professor M. C. Sinha. M. Sc. (U. S. A and Germany)

আমেরিকার জনসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক ; এই জনপূর্ণ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় মোট আটটি, অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এইরূপঃ—

ইংলণ্ড (U. K.)	জনসংখ্যা ৪১০ লক্ষ	বিশ্ববিদ্যালয় ১৯ টী
জর্ম্মণী	,, ৬৪৫ লক্ষ	,, ২১টি
ইটালী	,, ৩২০ লক্ষ	,, ২১টি
ফ্রান্স	,, ৩৯০ লক্ষ	,, ১৫টি
আমেরিকা	,, ৮৫৮ লক্ষ	,, ১৪০টি
পাঁচটি সভ্যদেশের জনসংখ্যা ২৬২৩ লক্ষ	এবং বিশ্ববিদ্যালয়	২১৭টি

কেবল মাত্র ভারতের জনসংখ্যা ৩১৫০ লক্ষ আর বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৮টি তাহার মধ্যে দুইটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। সেক্সপিয়র, বায়রণ, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী প্রভৃতির নাটক ও কাব্যগ্রন্থপাঠ করিতে পারিলেই, তাহা শিক্ষা নামে অভিহিত হয়না, শিক্ষার সংঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, শক্তি, দেশসেবা, পরোপকার প্রভৃতির উপরও দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। মাননীয় রায় মহাশয় বলেন, "ভারতবর্ষে শতকরা ৫০ জন ছাত্রের পরিপাক শক্তি না থাকায় তাহাদের আহারে রুচি থাকে না এবং ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া শতকরা ২৫ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায় ; ভারতবর্ষের ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের দশা এমনি শোচনীয়। আমাদের দেশের পূজ্য নেতাগণের স্বাস্থ্যবিবরণ এইরূপঃ— ধর্ম্মাচার্য্য স্বামীবিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন,—জষ্টিস দ্বারকানাথের মৃত্যু ৩৯ বৎসর বয়সে হইয়াছিল, ৪২ বৎসর বয়সে সাহিত্যরত্ন দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়, ৪৯ বৎসর বয়সে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ৪৬ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস পাল, ৪৯ বৎসর বয়সে কৃষ্ণস্বামী ঐয়ার ৪৮ বৎসর বয়সে বিচারপতি তৈলঙ্গ এবং ৪৯ বৎসর বয়সে মাহাত্মা গোখলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। § কি শোচনীয় হৃদয়-দ্রাবক দশা! ভাল করিয়া দেশের সেবা করিবার পূর্ব্বেই, এই মহৎ হৃদয়গুলি অকালে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল ;

§ See the Indian Review. January, 1913.

অপরিণত বয়সে অপরিমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য এবং আয়ু উভয়ই নষ্ট হইতে থাকে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? এইবার পাশ্চাত্য জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

ডারুইন তাঁহার প্রসিদ্ধ Origin of Species নামক পুস্তক ৫২ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন, লর্ড কেলভিন ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সার উইলিয়ম ক্রুক্‌সের বয়স ৮০ বৎসর, তিনি যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক এডিসনের বয়স এখন ৬৯ বৎসর, তিনি বলেন আমি আরও দুইশত বৎসর বাঁচিব। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি যে পরিমাণে কার্য্য করিতেন, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ করিয়া থাকেন। মোট কথা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতকগুলি উপাধি পাইলে তাহাকে শিক্ষিত বা শিক্ষা বলে না, যে শিক্ষায় নিজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কোন হানি হয় না, যে শিক্ষায় মানবের মানসিক বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যে শিক্ষা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আনীত হয়, যে শিক্ষা ধনী-দরিদ্রকে সমান চক্ষে দেখে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা, আর যে শিক্ষায় নিজের উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয়, কেরাণীগিরির জন্য পরের খোষামোদ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা নয়, কুশিক্ষা। আবার একদল আছেন যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী, শিক্ষিতা স্ত্রীলোক যে সমাজ ও জাতির প্রভূত উপকার করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দাও,—এমন শিক্ষা দাও, যাহাতে নারীকে ঠিক নারীর মত, মাতার মত, সহধর্ম্মিণীর মত করিয়া তোলে। সে শিক্ষা যেন নারীকে পুরুষ ভাবাপন্ন না করিয়া ফেলে, সে শিক্ষা যেন কুশিক্ষার নামান্তর না হয়। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, নারীর মহিমা—তার সেবায়, স্নেহে, ভালবাসায় ত্যাগে আর মাতৃত্বে ! ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে ছাত্রজীবন এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহারা যেন নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের উপকার করিতে সক্ষম হয় ; তাহারা যেন চাকরির মোহ কাটাইয়া স্বাবলম্বন করিতে শেখে, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে।

জাতীয় সাহিত্য যে জাতীয় জীবন গঠনের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের সাহিত্য যদি আমরা আদর্শ-সাহিত্য রূপে গড়িয়া তুলিতে পারি, আমাদের

জাতীয় জীবনও যে ঠিক সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গের নব্য লেখক আমরা পাঠকের কথা একবার ভাবিয়া দেখি না, তাহারা যে কি ভাবে আমাদের লেখা পড়ে ও বুঝে তাহা আমরা জানি না, কাজেই আমাদের লিখিত পুস্তকের একটি সংস্করণ অৰ্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বিক্রয় হইতে থাকে। আমাদের লেখার আদর্শ, সেক্সপিয়র, শেলী, কীট্‌স্; জাতীয় ভাষায় আমরা ইংরাজী ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি, ফলে ইংরাজী বাঙ্গালা মিশ্রিত এক উৎকট ভাষার সৃষ্টি; মুষ্টিমেয় ইংরাজীনবীশ ছাড়া কাহার সাধ্য সে ভাষা বোঝে! খেয়ালের বশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা এক অভিনব সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছি, সে সাহিত্য "না ঘরকা না ঘাটকা।" আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য, জাতীয় সাহিত্য নয়, ইহা কতকগুলি সৌখিন লেখকের সখের সাহিত্য, এসাহিত্য আমরা নিজেদের জন্য—বন্ধু-বান্ধবের জন্য গড়িতেছি, কাজেই আমাদের রচিত পুস্তক আমাদেরই আল্‌মারির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। জন কয়েক শিক্ষিত বাঙ্গালী আমরা, হেম, নবীন, মাইকেলকে চিনি, কিন্তু দাশুরায়, মতিরায়, ব্রজরায়, সমগ্র বঙ্গের হৃদয় জুড়িয়া আছেন। নীলকণ্ঠ রামপ্রসাদের গান আমরা হাটে-মাঠে-ঘাটে শুনিতে পাই, কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির গান ফ্যাসান-বহুল নগরেই শ্রুত হয়। এক-একটা লেখকের লেখা দিন কতকের জন্য পাঠক-সমাজে বেশ আদর পাইতেছে, তারপর যখন পাঠকের সে নেশা ছুটিয়া গেল, অমনি সে লেখক ও লেখা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। কেন এমন হয়? কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, কঙ্কণ, নিধুবাবু, দাশুরায়, রামপ্রসাদ, কেন চিরনবীন হইয়া আছেন, আর এই শক্তিশালী শিক্ষিত লেখক-সম্প্রদায়ই বা কেন জাতির হৃদয়ে স্থান পাইতেছেন না? তার কারণ পুরাতন সাহিত্য সৌখিন সাহিত্য নয়, সে সাহিত্য জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়ান, সে সাহিত্য বুঝিতে কষ্ট হয় না, তাহাতে সরল ভাষায় সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন লেখকগণ জাতি ও সমাজকে চিনিতেন, তাই এই সাহিত্য-বিপ্লবের দিনেও তাঁহারা চিরনবীন, তাই আজও তাঁহাদের একখানি পুস্তকও অনাদৃত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। মিসেস হেনরী উডের এক একখানি পুস্তক পাঁচ সাতলক্ষ করিয়া বিক্রয় হইয়াছে বাঙ্গালার আধুনিক কোন উপন্যাস পাঁচ সাত হাজার বিক্রয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ধনী-দরিদ্র সকলেরই মায়ের পূজায় অধিকার, যাঁহার

যেমন শক্তি তিনি সেই উপচারে পূজা করিবেন, কিন্তু সে অর্ঘ্য যেন প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হয়। কাহারও এমন কথা বলা উচিত নয়, যা মায়ের কাছে বলা যায় না। বঙ্গসাহিত্যে আঙ্গুল গোণা ক'খানা মাসিক পত্র আছে, এইখান কয়েক মাসিকের মধ্যেই দলাদলি চলিতেছে। কয়েকখানি নামজাদা মাসিক অন্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ মাসিকের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন না, কারণ তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যদেশের কোন সাহিত্যসেবী এরূপ করেন কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। বর্ত্তমানে সাহিত্যক্ষেত্রে হিংসাদ্বেষের তাণ্ডবনৃত্য দেখা দিয়াছে, ইহা যে সাহিত্যের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় তাহা নিঃসন্দেহ। মতান্তর হইলেই মনান্তর হইল; এ সঙ্কীর্ণতা সাহিত্য মন্দির হইতে দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখক বা সাহিত্যিকগণের মধ্যে মতান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু তাই লইয়া মনান্তর হওয়া বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

চিররহস্য-সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এল র‍্যামির ঐ ধীরোচ্চারিত সুস্পষ্ট সতেজ কথাগুলির প্রবল আকস্মিকতায় ফেরাজ ঘুরিতে ঘুরিতে একখানা চেয়ারের উপর পড়িয়া গেল; তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু এবং মুখমণ্ডলে একটা নিঃসহায় মূর্চ্ছাতুর ভাব! কোনো কথাই সে বলিতে পারিল না—তাহার তৎকালীন সভীতি-বিস্ময়-ভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষাও বুঝি বা খুঁজিয়া পাইল না! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এল র‍্যামি তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই স্থির, তীব্র ও পরিপূর্ণ চাহনির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র ফেরাজ এমন একপ্রকার অস্ফুট চীৎকার করিয়া নয়নদ্বয়

হস্তাবৃত করিল যেন কোনো নিপতিত প্রায় মুষ্টির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই সে উদ্যত।

"না, না, তা' হবে না"—অবসন্ন ক্রুতকণ্ঠে সে বলিল—"কিছুতেই আমার ধারণাকে তোমার অধীন হ'তে দেব না—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করবো না। আমার চক্ষুকর্ণকে আর তুমি প্রতারিত করতে পারবে না—আমি সব পড়েছি—সব জানি—জানি, কেমন করে' এই ভেল্কি চালানো হ'চ্ছে!"

এল র‍্যামির কণ্ঠ হইতে একটা অধীর আকুল শব্দ বাহির হইয়া আসিল,—অস্থির চরণে কয়েকবার গৃহমধ্যে পদ-চারণা করিয়া সহসা তিনি ফেরাজের আসন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"শোন ফেরাজ"—স্থির কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আমি শপথ করে বল্‌ছি যে আমার শক্তির একটী কণাও তোমার ওপর ব্যবহার কর্‌ছিনে। যখন তা' করবো, তখন তোমাকে জানাবো,—যদি ইচ্ছে কর, তবে সে শক্তিকে বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নিও। না, কোনো রকম শক্তিই আপাততঃ আমি ব্যবহার করছি নে, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার, কিন্তু তুমি যখন জোর করে' আমার আজীবনের অনুষ্ঠান-রঙ্গ-গৃহে অনধিকার-প্রবেশ করছো, আর সে অনুষ্ঠান তোমার চক্ষে জঘন্য রহস্যময় নীচ ভেল্কি বলেই মনে হ'য়েছে, তখন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনে রাখাও তোমার উচিত। তুমি বলছো যে আমি দুর্বৃত্ত, আমার কার্য্য হত্যার চেয়েও হেয়—কিন্তু এ সমস্ত কথায় তোমার প্রগল্‌ভতা আর বাঁদরামি ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না; প্রকৃত বিষয়ে যখন তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ—বিশেষতঃ আমার সম্বন্ধে তোমার ঐ সমস্ত প্রলাপোক্তি যখন অজ্ঞতারই ফল, তখন তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করাই দরকার; অতএব যথোচিত উপদেশের অভাবে যে ত্রুটী ঘটেছে তা' আমি ক্ষমা করছি। নিজেকে আমি মন্দ লোক বলে মনে করিনে"—এইখানে একটু থামিয়া বিষণ্ণ করুণ-কণ্ঠে এল র‍্যামি আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ মন্দ হওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। আমি উচ্চাভিলাষী ও সন্দিগ্ধ স্বভাব; পৃথিবীর কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার বর্ত্তমান অবস্থা যে রকম দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা'তে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময় কিনা সে বিষয়ে বিশেষ কোনো মীমাংসাতে আজও আস্‌তে পারিনি—কিন্তু আমার কার্য্যাবলীর

মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসৎ অভিপ্রায় নেই। বোধহয় এ কথা বল্লে অন্যায় গর্ব্ব প্রকাশ করা হবে না যে, আমার জাতির মধ্যে যাঁরা সর্ব্বোত্তম, নিজেকে আমি তাঁদেরই মতন সুবিবেচক ও সৎ-স্বভাব সম্পন্ন বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু যাক্ সে কথা ; আমি আগেই বলেছি, যে গোপন রহস্য তোমার জ্ঞানের জন্যে অভিপ্রেত ছিল না, তা' তুমি জোর করে' জেনেছো—ফলে আমার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তোমার মনে জন্মেছে। যা'তে তা' না থাকে, সেই জন্যেই এ রহস্য আজ ব্যক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি,—যদিও, এ সব বিষয়ে তোমার মস্তিষ্ককে পীড়িত করায় আদৌ আমার ইচ্ছে ছিল না। এ যাবৎ তুমি খুবই সুখী ছিলে ফেরাজ—সুন্দর, সরল স্বপ্নময় কবি-জীবন-যাপনের এ সুখ বুঝি বা পৃথিবীতে সকল সুখের সেরা !"

এল্ ম্যামি থামিলেন, ক্ষোভ ও বিরক্ত বিমিশ্রিত একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, পরে ভ্রাতার সম্মুখে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"যখন আমাদের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয় তখন তুমি নিতান্তই নাবালক ; সে যে কত বড় ক্ষতি, তা' বোঝবার বয়েসও তখন তোমার হয় নি। তা' ছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর ভেষজ শাস্ত্রে আমাদের পিতার যে কি-অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, প্রাচ্যভূখণ্ডে এ সম্বন্ধে তাঁর খ্যাতি যে কতখানি সুবিস্তৃত হয়েছিল, তাও তুমি জানতে না। অল্প বয়সেই তিনি মারা যান —তাঁর মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যেই মাতাও তাঁর অনুগমন করেন,—আমি তখন প্রাপ্ত-যৌবন আর তুমি নিতান্তই শিশু—সুতরাং তোমাকে মানুষ করে' তোলবার ভার আমারই ওপর পড়ে। পিতৃদেবের দুর্ল্লভ গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ ক্ষুদ্র পাঠাগারটী অতঃপর আমারই অধিকারে আসে এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পাণ্ডুলিপিও আমি পাই। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার বিচিত্র বিশ্লেষণে ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপি পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত পাণ্ডুলিপি আর বই পড়তে, আমার মনের মধ্যে এমন সব বিচিত্র সম্ভাবনা জেগে উঠতে থাকে যে আবিষ্কারের দারুণ নেশায় তাদের মধ্যে আমি একেবারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি ; যতই সে-সব অধ্যয়ন করতাম, ততই ইচ্ছে হত যে, ঐ জ্ঞানানুশীলনের ভেতর দিয়ে মানব-বুদ্ধির অগম্য যা' কিছু অতিমানুষিক ব্যাপার আছে সে সমস্তই আয়ত্ত করে' ফেলি। প্রথমতঃ রাসায়নিক পরীক্ষায় মন দিলাম,—দু'একটা অসাধারণ রকমের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভও করলাম,—ক্রমেই উৎসাহ বাড়তে লাগলো—অবশেষে ঐ আহৃত শক্তির চর্চ্চা করবার জন্যে একটা

আধার আবশ্যক হ'লো। কিন্তু দেখলাম, এক তুমি ছাড়া এমন কাউকেই পাওয়া সম্ভব নয় যার ওপর সদাসর্ব্বদাই নজর রাখা চলে কিম্বা যখন তখন আত্মপ্রভাব বিস্তার করতে পারা যায়—অগত্যা আমার মহা পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে তোমাকেই সর্ব্ব প্রথম গ্রহণ করলাম।"

ফেরাজ আসোয়াস্তি-সূচক অঙ্গভঙ্গি করিল,—তাহার মুখমণ্ডলে একটা সন্দিগ্ধ অর্দ্ধ-অপ্রসন্ন ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তথাপি এল র‍্যামির প্রত্যেক কথাটী সে বিশেষ আগ্রহের সহিতই শুনিতে লাগিল।

"সে সময় তুমি নিতান্তই বালক"—এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু বলিষ্ঠ, চঞ্চল স্বভাব এবং বাল্য-সুলভ ক্রীড়া-কৌতুক আর দুষ্টুমিতে পরিপূর্ণ। অল্পে অল্পে আমি তোমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলাম—পুস্তক কিম্বা শিক্ষকের সাহায্যে নয়, সুদ্ধ আমার ইচ্ছাবলে। স্মরণ-শক্তি একেবারেই তোমার ছিল না—কবিতা কি সঙ্গীতের দিকে একটুও আসক্তি ছিল না—পড়্তে তুমি আসলেই চাইতে না, ওদিকে তোমার মনই ছিল না। পরের ঘোড়া ধরে ধরে চড়া, নদীতে নদীতে সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোঁড়া, সমবয়সীদের সঙ্গে রং তামাসা আর ঘুষোঘুষি করা, দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি,—এই সব ছিল তোমার আমোদ; এগুলো আমোদ-জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এর ভেতর মোটেই পাওয়া যায় না। ধীরভাবে বিচার করে বুঝলাম যে, তুমি একটী ক্রীড়াসক্ত সুন্দর জন্তু বিশেষ—শারীরিক গঠন অনিন্দ্য—'মন' বলে একটা পদার্থ কোনো একটা জায়গায় আছে, আর ঐ মনের পশ্চাতে 'আত্মা' বলেও একটা কিছু আছে—চাই কেবল সেই দুটোকে খুঁজে বের করা। এখন, তোমার গঠনের ঐ গোপন অংশদ্বয় অন্বেষণ করে বের করার ভার আমি গ্রহণ করলাম—শুধু গ্রহণ নয়, নিজের ইচ্ছা ও কল্পনার অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে তাদের যথাপথে চালিত করবার জন্যেও চেষ্টা করতে লাগলাম।"

ফেরাজের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—কিন্তু সে কথা কহিল না।

"বেশ মন দিয়ে শুন্‌ছো আশা করি?" এল র‍্যামি বলিলেন—"জেনে রেখো, এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ আলোচনা। আজকের পর, এ বিষয়ে যে-কোনো

আলাপই আমাদের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে যাবে, দ্বিতীয় কোনো প্রকার প্রশ্নেরই আর উত্তর দেব না। শুনছো তো?"

সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী সহকারে ফেরাজ চেষ্টাকৃত উত্তর দিল; বলিল—"শুন্‌ছি কিন্তু যা' শুন্‌ছি তা' আশ্চর্য্য,—ভয়ঙ্কর!"

"আশ্চর্য্য? ভয়ঙ্কর?" এল র‍্যামি প্রতিধ্বনি করিলেন। "কিসে? জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে আশ্চর্য্য বা ভয়ঙ্কর কি আছে? তবু—হয়তো তুমি মিথ্যে বলনি, শিশুর সরল অজ্ঞতাই হয়তো সর্ব্বোৎকৃষ্ট—কারণ জ্ঞানের অনির্দ্দিষ্ট অসীমতার মধ্যে একটা ভীষণ কিছু আছে; এ কথা যদি ঠিক হয় যে, ঈশ্বর বলে' একজন আছেন, যিনি অনন্তকাল ধরে' চিন্তা করছেন আর তাঁর সেই চিন্তাই বস্তু হ'য়ে উঠ্‌ছে, তা' হ'লে ঐ অনির্দ্দিষ্ট অসীমতা শেষ পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট বা অসীমই থেকে যাবে"।

বিহ্বল দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; পরে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"হাঁ, তারপর শোনো। তোমাকে পরীক্ষাধীন করবার সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কার্য্য আরম্ভ করে' দিলাম। তোমার শারীরিক স্বাস্থ্য যাতে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই আমার অভিপ্রেত ছিল,—স্থির করলাম, এ সুন্দর স্বাস্থ্য অটুট রাখ্‌বো। এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হ'লাম। জীবনকে তোমার কাছে শ্বাস প্রশ্বাসের মতই সহজ স্বচ্ছন্দ করে' তুললাম,—মুক্ত-পবন-হিল্লোলে প্রসারিত পল্লব শাল্মলী শাখাটির মত দিন দিন তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে বাড়্‌তে লাগলে। তারপর যা' করলাম তা' অধিকতর সূক্ষ্ম ও কঠিন—আমার সমস্ত চাতুর্য্য সমস্ত ধৈর্য্য সে কার্য্যে নিয়োগ কর্‌তে হ'ল—অবশেষে সফল-কামও হ'লাম। আমার কেন্দ্রীভূত প্রভাব বায়ুমণ্ডলের মত তোমাকে বেষ্টন করে রইল; তোমার গতিবিধি, তোমার নিদ্রা, তোমার জাগরণ, সমস্তই সে-শক্তিতলে নিয়ন্ত্রিত হ'তে লাগ্‌লো—এমন কি তোমার মস্তিষ্কের প্রত্যেকটী তন্ত্রী আমার মস্তিষ্কে অনুরণিত হ'তে লাগ্‌লো; এইরূপে, তোমার প্রবল পাশব-বৃত্তি-গুলো একে একে বশীভূত ও বিনম্র হ'য়ে, মানসিক শক্তির বিকাশ আরম্ভ হ'লো। তোমাকে কবি ও সুগায়ক করাই আমার সঙ্কল্প

ছিল—এ দুই-ই তুমি হ'য়ে উঠ্‌লে ; পাঠ-স্পৃহা তোমার মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো—ক্রমে যতই দিন যেতে লাগ্‌লো, তোমার মধ্যে মনীষার আভাষও ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌লো। অধিকন্তু দেখা গেল, তুমি সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে যথেষ্ট প্রফুল্ল ভাবাপন্ন—বিশেষত: সঙ্গীতের ওপর তোমার অনুরাগ এতই বেশী দাঁড়ালো যে ঐটীই যেন তোমার প্রধান অবলম্বন হ'য়ে পড়্‌লো, এইরূপে তোমার অজ্ঞাতসারে প্রভাব পরম্পরায় ম'জ্ তোমাকে আমার ইচ্ছানুরূপ করে' গড়ে তুলে পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লাম,—এ পরীক্ষা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-কিছুর সম্বন্ধে, যা'কে আমরা 'আত্মা' নামে অভিহিত করি। ইচ্ছা ছিল, এ জিনিষটাকেও আয়ত্তাধীন কর্‌বো—কিন্তু এখানে—এখানে,—কেমন কতকগুলো অস্পষ্ট বিরোধী শক্তির প্রতিবন্ধকতায়, আমি ব্যর্থকাম হ'তে লাগ্‌লাম"।

চেয়ারের দুই হাতার উপর ভর দিয়া ফেরাজ আর্দ্ধোত্থিতবৎ দাঁড়াইল,—অতিরিক্ত কৌতূহলে দ্বিধা-বিভিন্ন তাহার ওষ্ঠযুগল, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"ওঃ, সে অনেক রকমে"—বিষণ্ণদৃষ্টিতে ফেরাজের দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"আজও ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি, তা'র কারণ কি। দেখলাম ; কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট ছোট খাট ব্যাপারে তোমার আধ্যাত্ম-চেতনাকে আমার আজ্ঞাপালনে বাধ্য করতে পারি,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর, হয়তো দূরে থেকে আমার আন্তরিক অভিপ্রায়-মত তুমি নিকটে এসে হাজির হও—কিন্তু বড় বড় বিষয়ে তোমার স্বাধীনতা অব্যাহতই থেকে যায়। তোমার সমাধি-মুহূর্ত্ত খুবই দীর্ঘস্থায়ী হ'তে লাগ্‌লো—এর জন্যে অবশ্যই আমি প্রস্তুত ছিলাম, কারণ এ কতক-পরিমাণে আমারই কাজ—আর, ঐ সমাধিকালে, বোধ হতে লাগলো, যেন তোমার আত্মা এমন কোনো উচ্চশ্রেণীর স্বাধীনতার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যায় যা' আমাদের এই পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু সেই অচেতন অবস্থায় যা'-কিছুর সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘট্‌তো, তার কোনো কথাই পরে আর স্মরণ থাকতো না ; কেবল তোমার পিয়ানোর ঐ অপূর্ব্ব স্বরগুঞ্জন আর জন্ম-নক্ষত্র সম্বন্ধীয় ধারণাটা মাত্রই অপর লোক থেকে তুমি বহন করে আন্‌তে।"

ফেরাজের মুখের উপর দিয়া একটা আশ্চর্য্য দীপ্তি খেলিয়া গেল—ঈষৎ-হাস্যোদ্ভিন্ন-ওষ্ঠে সে চুপ করিয়া রহিল, কোনো কথা ক'হিল না।

এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন:—

"যখন দেখলাম, অপর জগতের সঠিক খবর তোমার ভেতর দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না তখন বুঝলাম যে আত্মা-সম্বন্ধে তোমাকে আমার আজ্ঞাধীন করতে পারিনি। কিন্তু তোমার মনের ওপর আমার প্রভুত্ব চলতে লাগলো; আর সে প্রভুত্ব আজও চলছে ফেরাজ!"—এই সময় ফেরাজ কোনো অবাধ্যতা-সূচক বাক্য-উচ্চারণে উদ্যত হইবা মাত্র তাহার ভ্রাতা পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"প্রার্থনা করি, এ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলতে কখনও যেন তুমি সক্ষম না হও; কারণ তা হলে, কাব্যজগত যাকে 'প্রতিভা' বলেন আর আধুনিক তৃণাদপি তুচ্ছ হতভাগ্য সমালোচকবর্গ যাকে 'উন্মত্ততা' বলে' প্রচার করে, সেই প্রতিভা বা উন্মত্ততা জগতকে পবিত্র ও আলোকিত করবার জন্যে মানবের অনুভূতিতে ভগবানের সেই একমাত্র দান, তুমি হারাবে। প্রতিভা ভগবানের দান বটে, কিন্তু তোমার প্রতিভা আমরাই দান ফেরাজ—এ জিনিষ আমিই তোমাকে দিয়েছি, আবার ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে নিতে পারি; স্বভাবতঃ তুমি যেমন সুন্দর পশুটী ছিলে—লর্ড মেলথর্প কি তাঁর সেই বিলাসী ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্যাগান যেমন আজ রয়েছে, ঠিক তেমনি কলা-সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন পশুবৎ অবস্থায় আবার তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারি।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ফেরাজ নীরবে শুনিতেছিল—এইবার সে অকস্মাৎ চেয়ার ছাড়িয়া স্পর্দ্ধাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"অসহ্য! অসহ্য!"—সে বলিল—"আর সহ্য করতে পারিনে এল র‍্যামি! না, আর কখনই সহ্য করবো না!"

"কি সহ্য করবে না?" শ্লেষ-দিগ্ধ কণ্ঠে তাহার ভ্রাতা বলিলেন—"স্থির হও, ব্যস্ত হ'য়োনা!—নাটকীয় আস্ফালনের বিশেষ কোনো প্রয়োজন এখনও ঘটেনি। কি সহ্য করতে পার না?"

"সকল বিষয়েই যে তোমার কাছে ঋণী থাকবো এ অসহ্য!" উত্তেজিত-কণ্ঠে ফেরাজ বলিতে লাগিল—"আমার চিন্তাটা পর্য্যন্তও নিজের নয়, সেটা পর্য্যন্তও তোমার প্রেরণা, এ আমি কেমন করে' সহ্য করবো? কেমন করে সহ্য করবো যে আমার কবিত্ব আমার

সঙ্গীত বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্তও তোমার দান ? কেমন করে’ সহ্য করবো যে আমার দেহ, মন, মস্তিষ্ক, শক্তি সমস্তই তোমার অধীন ?—উঃ, নাঃ, এ ভয়ঙ্কর—অসহ্য—অসম্ভব !”

এল র‍্যামি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে ভ্রাতার স্কন্ধোপরি একখানি হস্ত রক্ষা করিলেন—ফেরাজ শিহরিয়া উঠিয়া কেমন-যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল ; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি সখেদে বলিতে লাগিলেন :—

“আমার স্পর্শটা পর্য্যন্ত তোমার কাছে বিভীষিকা বলে’ মনে হ’চ্ছে—অথচ জ্ঞানতঃ তোমার কোনো প্রকার অপকার করা দূরে থাক, এ-যাবৎ জীবনকে তোমার কাছে সুখভোগ্য করে তোলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে এসেছে !··· বেশ ! তবে তাই হোক !—একটি মাত্র মুখের কথা খসাও ফেরাজ, আমার কাছে আর তোমাকে ঋণী থাকতে হবে না। এতকাল যা’-কিছু করেছি সে সমস্ত থেকেই আমি তোমায় মুক্তি দেব—প্রকৃতি তোমাকে যেমনটি গড়েছিল ঠিক তেমনি পাপাসক্ত লম্পট যুবকে পরিণত হ’য়ে আবার তুমি স্বেচ্ছামত অলস জীবন যাপন করতে পারবে—এমন কি, জীবনের সেই অবস্থাটার জন্যে অন্য কারুর কাছেই তুমি ঋণী হবে, আর সেজন্যে ঈশ্বরকে দায়ী করাও চলতে পারবে।”

যুবকের শির অবনত হইয়া পড়িল,—একটা লজ্জার ভাবে সঙ্কুচিত হইলেও, তখনও কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিরুদ্ধ জোর চালিতেছিল।

“আমি তোমার কি করেছি”—এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—“যে, ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটা মৃত স্ত্রীলোকের মুখ দেখতে পেয়েছো বলেই আজ একেবারে বিমুখ হ’তে চাও ? তোমার চিন্তারাজ্যে আমি শৃঙ্খলা এনে দিয়েছি, যে-কোনো পার্থিব উপাদান যা’ দিতে পারে না সেই অনাবিল আনন্দের সুধাপাত্র তোমার মুখে তুলে দিয়েছি যা’তে সুধু জীবনের আনন্দ স্বপ্নই প্রতিভাত হয়। এ সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তন করতে চাও ! বেশ, এবিষয়ে যদি একান্তই দৃঢ়নিশ্চয় হ’য়ে থাক তবে তাই হবে,—কিন্তু আর একবার ভাল করে’ ভেবে দেখ,—আমার স্পর্শ, আমার স্নেহ আমার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি থেকে বাইরে যাবার আগে একবার ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বিচার করতে চেষ্টা কর।”

তাঁহার স্বর অল্প কাঁপিয়া উঠিল ; কিন্তু অবিলম্বেই সে আবেগ দমন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

"বোস,—বেশ মন দিয়ে আমার গল্পের শেষ পর্য্যন্ত শোন। এ পর্য্যন্ত যা' কিছু বলে এসেছি তা' কেবল তোমারই সম্বন্ধে—কেমন করে' তোমার স্বভাবের আধ্যাত্ম-অংশে আমার পরীক্ষা নিস্ফল হয়, আর সে অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালন করবার জন্যে নুতনতর আধার অন্বেষণে আমি বাধ্য হই, তা'রই কথা শুধু বলেছি। ব্যক্তিগতভাবে তুমি যতদূর সংশ্লিষ্ট তা'তে অবশ্য এ নিষ্ফলতা বিশেষ স্পষ্ট নয়,—কারণ তোমার আত্মা অতি-প্রাকৃতিক স্বাধীনতার মধ্যে প্রায়ই ছাড়া পাচ্ছে, আর স্পষ্টভাবে আমার কাছে প্রকাশ করতে না পারলেও একটা অপার্থিব আনন্দের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘট্‌ছে। একটা নক্ষত্র-লোকের কথা তুমি বলে থাক—এমনভাবে বল যে মনে হয়, যেন বাস্তবিকই তা'র সঙ্গে তোমার জন্মগত সম্বন্ধ কিছু আছে,—কিন্তু সে ঐ পর্য্যন্তই, তা'র বেশী কিছুই বল্‌তে পার না; কাজেই বোধ হয় যে, উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টিতে তোমার অধিকার জন্মায় নি। এখন, আমার যা'তে প্রয়োজন ছিল তা' শুধু ঐ উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টিই নয়, পরন্তু সেই উচ্চতম চরমজ্ঞান যা' নাকি বস্তু ও আত্মার বিমিশ্রিত উপাদানের ভেতর দিয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব হ'তে পারে;—কত অক্লান্ত পরিশ্রম, কত দীর্ঘকাল যে এ জন্যে ব্যয় করতে হয়েছে তা' মনে করলেও আজ বিস্মিত হই। অবশেষে আমার দিন এল—এ দিন সকলেরই আসে; যারাই ধীরতা আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করতে পারে, তারাই এ শুভদিনের অধিকারী হয়।"

মুহূর্ত্তের জন্য তিনি থামিলেন—পরে, অধিকতর ক্ষিপ্রোচ্চারণে বলিলেন—

"হয়তো সে ঘটনাটার কথা তোমার মনে আছে যখন সীরিয়ার মরুভূমি পার হ'তে হ'তে একদিন আরব-পথিকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে?—সেই সব অতি দীন, অনশন-ক্লিষ্ট, রুগ্ন, শীর্ণ পিপাসাকাতর লোকগুলো?"

"খুব মনে আছে"—ভ্রাতার সম্মুখে পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিয়া ফেরাজ উত্তর করিল এবং পুনরুজ্জীবিত আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল।

"তাদের মধ্যে দুটী লোক প্রায় মরণাপন্ন ছিল"—এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক, বিধবা, নাম 'জ্যারোবা'—আর অপরটী এক অনাথা শিশু, বছর বারো বয়েস, নাম 'লিলিথ'। প্রবল জ্বর আর দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দু'জনেই মর্‌তে বসেছিল। আমি

তাঁদের রক্ষা-ভার গ্রহণ করি। জ্যারোবাকে বাঁচিয়ে তুললাম—আর সে, তাদের জাতি-গত উত্তেজনার প্রাবল্যে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে' ভগবানের নামে শপথ করলে যে, অতঃপর সে আমরণ আমার দাসীপনা ক'রে জীবন অতিবাহিত কর্ব্বে। বল্লে যে, পৃথিবীতে আপন বলতে তা'র আর কেউ নাই,—আমি যেন দয়া করে' তা'কে পরিচারিকারূপে গ্রহণ করি; তা' হলেই সে কৃতার্থ হবে এবং চিরদিন বিশ্বস্ত থেকে আমাদের পরিচর্য্যা করবে। প্রকৃতপক্ষে, কল্যকার ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তা'র এই সত্যানুরাগ অম্লানই ছিল। কিন্তু যাক্—তারপর শোন। লিলি নামে ঐ যে বালিকাটী, তা'র দেহ গঠন এতই ভঙ্গুর ছিল আর তা'র জীবন-দীপ এমনিই নিঃশেষ হ'য়ে এসেছিল যে, আমার অক্লান্ত যত্ন সত্ত্বেও সে ফির্ল না—মারা গেল। বুঝ্তে পাচ্ছ বেশ আশা করি,—সে মারা গেল।"

"মারা গেল!" অর্দ্ধস্ফুড়িতস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া ফেরাজ বলিল—"বেশ—তারপর?"

"আমারই হাতের ওপর"—যুগল-ভ্রূর অন্ধকারে হীরকোজ্জ্বল নয়নদ্বয় হইতে দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে করিতে, বর্ণনার আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"আমারই হাতের ওপর তা'র শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়, আমারই হাতের তা'র মৃত্যু-বিবর্ণ দেহখানি অসাড় হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু তার সেই দেহ আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠ্বার আগে, রক্ত থেকে সমস্ত উত্তাপ বেরিয়ে গিয়ে দেহখানিকে হিম করে' দেবার আগে, একটা আকস্মিক উদ্দাম ধারণা বিদ্যুতের মত আমার মনের মধ্যে চমকে ওঠে। "যদি এই বালিকার একটা আত্মা থাকে"—মনে মনে আমি বলি—"তবে এ-দেহ থেকে তা'র পলায়ন আমি অবশ্যই রোধ করবো! তা'কে আমার বাসনা ও ইচ্ছাশক্তির নূতনতর বার্ত্তাবহ-কেন্দ্র করে' রাখ্বো—এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে আমার আজ্ঞাধীন হ'য়ে আমার চরমতম কৌতূহল চরিতার্থ না করবে তত দিন, দ্বিতীয় প্রস্পেরোর মত, তা'কে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব না। ইতি মধ্যে তা'র এই নশ্বর দেহ-যন্ত্রটাকে কোনো রকম কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করে' সেই কেন্দ্র পথে মানব-বোধ্য ভাষার ভেতর দিয়ে, ঐ আত্মার বক্তব্য শুন্তে থাকবো।" সঙ্কল্প স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কার্য্য আরম্ভ করে দিলাম,—বালিকার সেই শবদেহের নিশ্চল অথচ উত্তপ্ত শিরার মধ্যে এমন কয়েক বিন্দু তরল পদার্থ সঞ্চারিত করলাম যা'র প্রয়োগ-প্রণালী কেবল

আমারই জানা আছে। তারপর আ'রব পথিকদের কাছ থেকে তা'কে গোর দেবার অধিকার সহজেই লাভ করলাম—যাত্রাপথে এই বিরক্তিকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় তা'রা খুবই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। সেইদিনই, হয়তো তোমার স্মরণ থাকতে পারে, তোমাকে কতকগুলো কাজের ভার দিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপে পাঠিয়ে দিলাম—সুবোধ বালকটীর মত তুমি চলে গেলে; হয়তো আশ্চর্য্য হয়েছিলে কিন্তু কিছুই সন্দেহ কর্ত্তে পার নি। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়, উত্তাপ কমে গিয়ে যখন চাঁদ উঠ্‌লো, তখন সেই পথিকেরা লিলিথের মৃতদেহ আর জ্যারোবাকে আমার কাছে ফেলে রেখে উদ্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়্‌লো;—জ্যারোবার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করেছিলাম, কারণ তা'র কাছ থেকে অনেক কাজ পাবার আশা ছিল। আসন্ন-মৃত্যুর গ্রাস থেকে আশ্চর্য্য উপায়ে ফিরে আসতে পারায় সে বেচারী তখন আমাকে কোনো একটা অবতার বলেই মনে করেছিল, আর আমিও বুঝেছিলাম যে তা'কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। আংশিকভাবে আমার সংকল্পের কথাও তাকে জানিয়েছিলাম,—শুনে, একদিকে যেমন সে ভীত হয় অপরদিকে তেম্‌নি আবার শ্রদ্ধান্বিতও হয়ে ওঠে; প্রাচ্য-ভূখণ্ডের যোগবল বিশ্বাস তা'র মজ্জাগত থাকায়, এম্‌নি একটা সংস্কার তা'র মনে বদ্ধমূল ছিল যে, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা, তাঁদের ইচ্ছায় সকল অসম্ভবই সম্ভব হ'তে পারে। এইভাবে, সেই মরু-শিবিরেই কয়েকদিন কেটে গেল,—আমি প্রায় সমস্তক্ষণই লিলিথের ঐ মৃতদেহ পার্শ্বে অতিবাহিত করতাম—মৃত, তবে কৃত্রিম উপায় বলে এক-হিসাবে আবার কতকটা জীবিতও বটে। যখন দেখা গেল যে আমার পরীক্ষা সফল হ'লেও হ'তে পারে, তখন আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া পর্য্যন্ত আগমন করবার উপায় করতে লাগলাম—পরে সেখান থেকে, এই ইংলণ্ডে এসেছি। ইংলণ্ডকেই বাসোপযোগী মনে করলাম এইজন্যে যে, পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর, আর সাধারণের অজ্ঞাতে কোনো বিশেষ একটা বিদ্যা অনুশীলনের পক্ষে এ সহর খুবই উপযোগী; প্রকৃতপক্ষে জনহীন মরুপ্রান্তরের চেয়েও এখানকার এই লোকারণ্যের মধ্যে, ইচ্ছা করলে, অধিক নির্জ্জনে থাকা যেতে পারে।... যাক্‌, আমার কথা এই পর্য্যন্ত; এখন সমস্তই তুমি শুনলে। মৃত লিলিথকে তুমি দেখেছ—কিন্তু জীবিত লিলিথও একজন আছে—সে, লিলিথের আত্মা,—একদিকে সে স্বাধীন, অপরদিকে সে বন্দী—কিন্তু উভয় অবস্থাতেই সে আত্মা আমার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যবৎ!"

সভীতি-সম্ভ্রমে ফেরাজ ভ্রাতার দিকে চাহিল। "এল র‍্যামি,"—কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—"যা' তুমি আজ বল্‌লে তা' আশ্চর্য্য, ভয়ানক, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না—কিন্তু, তোমার শক্তির কিছু কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি, সুতরাং বিশ্বাস কর্‌লাম। তবে ঐ যে তুমি বল্‌ছো যে লিলিথ মৃত, এটা নিশ্চয়ই তোমার ভুল; যখন তুমি তা'কে জীবন দান করেছো, তখন কেমন করে' সে 'মৃত' হতে পারে?"

"যে জীবন চিরনিদ্রিত, যা' জাগ্‌বে না, তা'কে কি তুমি 'জীবন' বল্‌তে পার?" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন।

"তা'কে কি তুমি জাগাবে না?" সাগ্রহে ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল; তাহার বক্ষ স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল।

"না,—কারণ, জাগরণ বল্‌তে সাধারণতঃ যা' বোঝায়, সে রকম জাগা যদি সে জাগে, তবে সে তা'র দ্বিতীয় মৃত্যুই হবে, উদ্ধারের আর কোনই উপায় থাক্‌বে না; প্রকৃত ভয়ই তো ঐখানে। জ্যারোবার কুশিক্ষা আর তা'র প্রলোভনে তোমার বিচলিত-বুদ্ধি হয়তো আমার জীবনের এই মহত্তম অনুষ্ঠানটীর পক্ষে খুবই সাংঘাতিক হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো—কিন্তু যাও, আমি তোমায় মার্জ্জনা করিলাম—কারণ, তুমি জান্‌তে না—আর সে—সে জেগে ওঠেনি।"

"না, জেগে ওঠেনি বটে," কোমলকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"কিন্তু—কিন্তু সে হেসেছিল!"

এল র‍্যামির নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল; স্থির দৃষ্টিতে তিনি ফেরাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার স্বভাব-শান্ত সংযত বাহ্যপ্রকৃতি এম্‌নি একটা অভ্যান্তরীন বিরক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল যে তাহা গোপন করা একরূপ অসম্ভবই হইয়া পড়িল। "সে হেসেছিল!"—সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী লিলিথ—সেই মরণে-জীবনময়ী লিলিথ, ফেরাজের মুখে প্রিয়-সম্বোধন শুনে হেসেছিল! অসম্ভব—অসম্ভব!—বিরক্তি গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া এল র‍্যামি সহসা টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কতকগুলো বই ও কাগজপত্র গুছাইতে অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

"এল র‍্যামি",—আনত মুখে ফেরাজ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"যদি সে মৃত্যুকালে সে বালিকাই ছিল, তবে আজ এমন যু—যুবতী হ'য়ে উঠ্‌লো কেমন করে?"

"কৃত্রিম সঞ্জীবন-শক্তি বলে,"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"উষ্ণ-গৃহ-তলে পুষ্প যেমন করে' বিকশিত হয়, স্ফটিকাধারের মধ্যে গোলাপ যেমন অল্পায়াসেই ফুটে ওঠে, তেম্‌নি করে।"

"তা' হ'লে সে জীবিত,"—উৎফুল্ল আগ্রহে ফেরাজ জানাইল—"নিশ্চয়ই জীবিত, কৃত্রিমই হোক্ আর স্বাভাবিকই হোক্, তা'র জীবনীশক্তি আছে। তোমার শক্তিবল আজও তা'কে বাঁচিয়ে রেখেছে—মনে কর্‌লে, একবার মনে করলেই এল র‍্যামি, তা'কে তুমি পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে পার—তা'র চেতনায়, আনন্দে, প্রেমে, তা'কে সম্পূর্ণ করে তুল্‌তে পার—তা'র সুপ্তি সুখ-স্বপ্নময়; 'মৃত' তুমি কোনোমতেই বল্‌তে পার না!"

বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আদেশ সূচক কণ্ঠস্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—

"স্তব্ধ হও, আর একটীও কথা না! বুঝেছি তোমার মনোভাব,—যদি ভাল চাও, তবে এ ইচ্ছা দমন কর! জ্যারোবার মন্ত্রণা, জ্যারোবার কুশিক্ষা এখনও তোমার মনের মধ্যে থাক্‌ছে। শোন,—লিলিথ মৃত,—তোমার কাছে মৃত—আর যে অর্থ তোমার অভিপ্রেত, তা'তে—আমার কাছেও সে মৃত।"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

গণিকা।

—:*:—

দেবের দেউল হঠাৎ হ'ল সুরার বিপণী
পট্‌কা গড়ে ফেললে ছিঁড়ে সাধুর জীবনী।
'গোরীপট্টে' গাঁথলে সোপান, চুন্নী মাণিকে,
বাদুঘরেই আন্‌লে দেবীর মূর্ত্তিখানিকে।

দুকূল কাটি' করলে নিশান এমন পাপী কে ?
সাপ খেলানর চুব্‌ড়ী করে সোনার ঝাঁপিকে।
সতীর সিঁদুর কৌটা নিলে জুতার মসীটা,
দেবের গলার মাল্য হ'ল ফাঁসির রশিটা।
বিকায় যে আজ ইষ্টমন্ত্র কথার হাটেতে
'নাগরদোলা' গড়লে কে হায় বাসর-খাটেতে।
বুঝবে কে হায় ওই পতিতার বুকের ব্যথাটী
গড়লে ছুরি কাল যে ভেঙ্গে 'কাজলতা'টী।
লক্ষ ব্যথায় বক্ষ আহা সইবে কত বা
'দানসাগরের' চাঁদির যোড়শ ছিন্ন শতধা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

'পঞ্চদশী'র 'ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ' অবলম্বনে।

এ সুখদুঃখের লীলাক্ষেত্রে বাসনার অতিক্রির নিজানন্দ যোগীরা অনুভব করেন, কিন্তু আর সবাইকার যে কি গতি হইবে তাহারই কথা তুলিতেছি!

অবিচ্ছিন্ন অসীম আনন্দ না চায় কে? এই আত্মানন্দ বিষয়েই যাজ্ঞবল্ক তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন "হে মৈত্রেয়ি পতির সুখের জন্য লোকে পতির কামনা করে না আপনারই সুখের জন্য লোকে পতি কামনা করে।

স্বামী বা স্ত্রী, ধন বা পুত্র, পশু বা শিশু, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, লোক বা দেবতা, এ সকলই নিজের সুখের জন্যই প্রিয় হয়!

পতির উপর স্ত্রীর, সাধারণতঃ যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা পতির সুখের জন্য নয়, কেবল আপনারই সুখের জন্য, আর ঐরূপ পত্নীর প্রতি পতির যে প্রীতি, তাহাও কেবল নিজের সুখের জন্য, একের অভাবে অন্যে "আমার কি হইবে" বলিয়াই হাহাকার করিয়া থাকে, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে নিজের সুখের অভাবের জন্যই ঐ হাহাকার!

পরিপূর্ণ সুখের বা আনন্দের স্বাদ যাহারা পায় নাই তাহারাই অল্প সুখের অভাবে নিজেকে হতভাগ্য বলিয়া হায় হায় করিয়া থাকে, বস্তুতঃ পূর্ণ সুখ বা আনন্দের ক্ষয় বা অভাব নাই!

টাকা-কড়ি ধন-রত্নের কোনো উপকার করা তো সম্ভব নয়, তবু লোকে যে তাহাদের পরম যত্নে রাখে সেও তো কেবল আপনারই উপকারের জন্যে!

মানুষে যে উচ্চ জাতীয় বলিয়া নিজকে পূজনীয়, মহৎ, মনে করে,—জাতি জিনিষটার তো কোনো চৈতন্য নাই, কেবল ঐ অহঙ্কার দ্বারা নিজেকে প্রীত করে মাত্র।

আমার স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক হউক এই বাঞ্ছা তো স্বর্গ বা ব্রহ্মলোককে কৃতার্থ করিতে নহে, ইহাও কেবল আপনারই ভোগের জন্য।

লোকে নিজের পাপনাশের জন্য ঠাকুরদেবতার পূজা করে, ইহাও ঠাকুরদেবতার জন্য নয় নিজের জন্য মাত্র।

লোকে যে কিছুর আদর করে, যত্ন করে সে কেবল নিজেরই সুখের জন্য; সমস্ত ব্যবহার একটু খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিবার জন্য এই রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া গেল, এই উদাহরণগুলির দিকে মন দিলেই বেশ স্পষ্ট কথা বোঝা যাইবে!

এই যে সকল কথায় সুখের কথা বলা হইল সকল সুখই তো সসীম, এ সব সুখেরই যে শেষ আছে, আরো পাঁচটা লইয়া জড়িত, আপনাতে আপনি যে অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন, আনন্দের কথা আছে, তাহা কেমন করিয়া হইবে?

এই যে বিন্দু বিন্দু সুখ, যাহা তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠের কাছে আসিতে শুকাইয়া যায়, এই বিন্দুর অতীত সে আনন্দের সিন্ধু কোথায়? কোথায় তার কারণ?—

অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ইচ্ছা, এই চারি কারণের অতীত সে আনন্দ অন্তঃকরণের বৃত্তি স্বরূপ। তার কোনো নিমিত্ত নাই, কারণ নাই!

ইহার উপর সুখই হউক বা দুঃখই হউক কোনো কিছুতেই এই পরম আনন্দ ক্ষয় প্রাপ্ত হন না! ইনিই আমাদের নিজের জিনিষ।

বাহিরের বিষয় লইয়া যে সুখ উপলব্ধি করি সে সুখ যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহা মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝিতেছে, ঐ সুখের বিষয়টি সরিয়া গেলেই অভাবের হাহাকারে পড়িতে হয়। ধন ফুরাইয়া যায়, ফুল ঝরিয়া যায় ;—রূপে রোগ আছে, যৌবনে বার্দ্ধক্য আছে, পুত্র, স্বামী স্ত্রী, বা মিত্র, ইহারা আরও নশ্বর মরণাধীন ভস্ম মুষ্টি মাত্র, কি লইয়া আমাদের আনন্দ, কি লইয়া আমাদের হাসি, আমরা আমার বলিয়া অহঙ্কার করি কিসের উপর।

আনন্দের ভাণ্ডার আমাদেরই আত্মা,—যেখান হইতে বিন্দু বিন্দু আনন্দ লইয়া আমরা শোক, দুঃখ, তাপ, এই সব সংগ্রহ করি, ধনবান পিতার কুসন্তানের মত অর্থ ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষণিক তৃপ্তির মোহে আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলি। তবে কি না সর্ব্বলোকের পরম পিতার ভাণ্ডার অফুরন্ত তাই শেষ করিতে পারি না!

বাসনার সুখ যে কেমন করিয়া দুঃখের উৎপত্তি করে তাহাও নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তান না জন্মিলে লোকের মনে পুত্র-বাসনা উদয় হয়, এই বাসনা অপূর্ণ থাকিলেও মনের ক্ষোভ চিরদিন থাকে, পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ সন্তান জন্মিলে, তার বাল্যকালে গ্রহ রোগাদির জন্য, কুমার বয়সে বিদ্যা না হওয়ার জন্য, পিতামাতাকেই দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়,—আর ইহার উপর পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয় তো সে দুঃখের কি শেষ আছে?

তা ছাড়া হয় তো পুত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই হইল, তথাপি তাহার মরণাশঙ্কা তো ঘুচিবার নয়, হারাইবার ভয় যে পিতামাতাকে সর্ব্বদাই পীড়িত করে, অথচ পুত্র জন্মিবা মাত্র লোকে আনন্দ অনুভব করে। এই সকল বিবেচনা করিয়া যে আনন্দের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই সেই অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

এই নিজদেহজাত আত্মজকেও সুখী করা বা দুঃখী করা লোকের ইচ্ছাধীন নহে, জীবিত রাখা বা না রাখাও কাহারো ইচ্ছাধীন নয়, ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে তাহা কেবল নিয়ন্তাই জানেন, কবির কথায় আমরা—

কি অশ্রুর শ্বশুরের ও দেবরের মত এমন পশুর অধম, নির্ম্মম লোক হয়, —এটা যেন অতি-রঞ্জিত—পরক্ষণেই মনে পড়ে বাঙ্গলার বর্ত্তমান দুরবস্থা,—পারিপার্শ্বিক কত ঘটনা,—এ সকল দৃশ্য হৃদিবিদারক,—অস্বাভাবিক হইলেও বাঙ্গলার বর্ত্তমান অবস্থায় আর অসম্ভব নহে। যে দেশে শিক্ষার অর্থে অর্থ--পরকে পীড়ন করিয়া অর্থ আদায়ের যন্ত্র স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শের চিহ্ন; অর্থের পরিমাণে কন্যার গুণাগুণ,—কন্যার দরিদ্র পিতাকে চির দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তবে বিবাহ, কুটুম্বিতার সূচনা,—সে দেশে আর কোন নিষ্ঠুর নির্ম্মম চিত্র অসম্ভব? যেখানে এক বধূর জীবনান্তে আর একটি বধূর আবির্ভাবের সহিত প্রচুর অর্থ সমাগমের সম্ভাবনা, যেখানে বধূর প্রতি স্নেহভালবাসা আর কি হইতে পারে? হিন্দুর গৌরব ছিল এককালে যে পরিণয়ব্যাপারে আজ তাহাই হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা হেয়তম ব্যাপার!

মাত্রা কোন দিকেই ঠিক নাই,—আত্মঅবস্থা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা, বাঙ্গলায় স্বভাব-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখিয়া কেহই কার্য্য করিতে রাজী নন,—ফ্যাসানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি আমরা।

নায়িকা অশ্রুর পিতা উকীল; তিনি আদর করিয়া মেয়েকে বিলাতী মেমের শিক্ষা দিয়াই কৃতার্থ! অশ্রুর বয়স তখন ৮ বৎসর। সে ঘোড়সোয়ারের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, বাঁকা টুপি মাথায় দিয়া, হাতে একগাছা চাবুক লইয়া, পৃষ্ঠে বেণীটি দুলাইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়; গৃহকার্য্যেও সে নিপুণা; তাহার হুকুম খাটিবার জন্য নিরন্তর দুইটি ঝি চাকর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সে সর্ব্বদা ঝি চাকরের কোলে পিঠে চড়িয়া বেড়াইত। পিতার ইহাতে অশেষ আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু কন্যা ভবিষ্যতে কিরূপ সংসারে, কিরূপ রুচির লোকের হাতে পড়িবে, তাহা যখন বাঙ্গলার পিতার জানা নাই, হাত একেবারেই নাই, তখন এ শিক্ষা যে ভবিষ্যতের অশেষ দুঃখের কারণ তাহাও বুঝাইতে হয় এই দুঃখ। অশ্রুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল; সে পড়িয়াছিল এক কঞ্জুষ সবজজের ঘরে, নামে সে বড় হাকিম, কাজে দরিদ্রের অধিক দরিদ্র সে,—অর্থের অধীশ্বর হইয়াও সে ব্যয়বিমুখ,—বিচারক হইয়াও সে অত্যাচারী; অর্থের মায়ায় সে নিজ সন্তান, পুত্র, পুত্রবধূকে, শিশু পৌত্রপৌত্রীকে নির্ম্মমভাবে পেষণ করিতেও কুণ্ঠিত নহে! মনুষ্যরূপী রাক্ষস সে!

সন্তানের প্রতি ভালবাসা পর্য্যন্ত সবজজ বাবুর অর্থের জন্য। নায়ক প্রভাত, তাঁহার প্রথম পুত্র। বি-এ, পড়ে, পাশের পরিমাণে কন্যার পিতার নিকট আদায় করিয়া সবজজ তৃপ্ত ও বৈবাহিকের নিকট ভবিষ্যতে আদায়ের আশায় প্রথমে উৎফুল্ল ছিলেন, কিন্তু কাল অচিরেই বৈবাহিককে তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। অশ্রুর অদৃষ্ট! প্রভাত সেবারে বি-এ, ফেল করিল, আর ত তাহাকে দিয়া অর্থ আদায়ের আশা নাই, পিতা সবজজ

বলিলেন "পড়ার খরচ আর দিতে পারিব না।" প্রভাত আমড়া বৃক্ষে আম্র ফল, মিষ্ট রসাল। সে কত কষ্টে পর বারে বি-এ, পাশ করিল। কিন্তু পাঠ্য অবস্থাতেই ছেলেমেয়ে হইয়া তাহার অবস্থা কাহিল করিয়া তুলিয়াছিল, পিতাও তাহাদের ভার বহনে অনিচ্ছুক, সুতরাং তাহাকে সেই অবস্থাতেই চাকুরে হইতে হইয়াছিল, যেমন নিত্য এ বাঙ্গলায় ঘটিতেছে, সে চাকুরী করে ও ল পড়ে! শেষে হইল উকিল কিন্তু অশ্রুর অদৃষ্টে সে সুখ সহিল না—সেও ওলাউঠায় অকালে গেলেন। যাইবার সময় পত্নীকে বলিয়া গেল—স্বামীর ভিটা ধরিয়া থাকিতে!

অশ্রু স্বামীর শেষ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল,—অবশ্য অশ্রুতে অহরহ ভাসিয়া অনাহারে, অসুস্থতায়, শ্বশুর মহাশয়ের অমানুষিক অত্যাচার সে সহ্য করিয়া স্বামীর ভিটায় পড়িয়াছিল কিন্তু মানুষের প্রাণে শরীরে আর কত সহ্য হয়; অশ্রুর শরীর অত্যাচারে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাকে রোগশয্যার আশ্রয় লইতে হইল। সবজজ পুত্রবধূর চিকিৎসার কোনরূপ বন্দোবস্ত করা দূরে থাকুক পাছে বধূ ও-বাড়ীতে থাকিলে তাহার অন্তিম-ব্যবস্থার জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়, সেই ভয়ে বাড়ীতে রোগী থাকিলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সে সেদিন রোগীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া 'কর্কশকণ্ঠে' কড়া হুকুম জারী করিল "দেখ বউ মা, আমার এ বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না। আমি বলে গেলাম আজই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, সন্ধ্যে অবধি সময় দিলাম, তার পরও যদি থাক, তা হ'লে অপমান হয়ে বেরুতে হবে।"

ভগবান তাহাই করিলেন। যে ভগবান সতীর অন্তর অত দুঃখ কষ্টেও স্বামীর প্রতি অবিচলিত রাখিয়াছিলেন তিনিই তাহার স্বামীর অন্তিম আদেশ পালন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সন্ধ্যার সময় অশ্রুর স্বামীর ভিটা ছাড়িবার আদেশ হইয়াছিল; সে তাহার পূর্ব্বেই সকল দুঃখকষ্ট আদেশ-প্রত্যাদেশের হস্ত এড়াইয়া ঊর্দ্ধলোকে স্বামীর ভিটায় আশ্রয় লইল!

অশ্রুর অশ্রু শুকাইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলার অশ্রু শুকাইবে কবে! যে দেশে কল্পনাতেও এমন চিত্র অঙ্কিত হয় সে দেশে আর নরকে তফাৎ কোথা!

ফণীন্দ্র বাবু বাঙ্গলার পাঠকপাঠিকার হৃদয় করুণার্দ্র করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ভাষা তাঁহার সরল, বলিবার ভঙ্গিতে কোন জটিলতা নাই, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'সাধারণ' পাঠক বলিলাম, কেন না আজকাল বাঙ্গলায় চরিত্রবিশ্লেষাত্মক উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে, শিক্ষিতের পক্ষে তাহাই অধিকতর আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দেশের অধিবাসীর আজও শতকরা ৫টী মাত্র পঠনে সমর্থ সে দেশে "স্বামীর ভিটা"র ধরণের উপন্যাসের যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে।
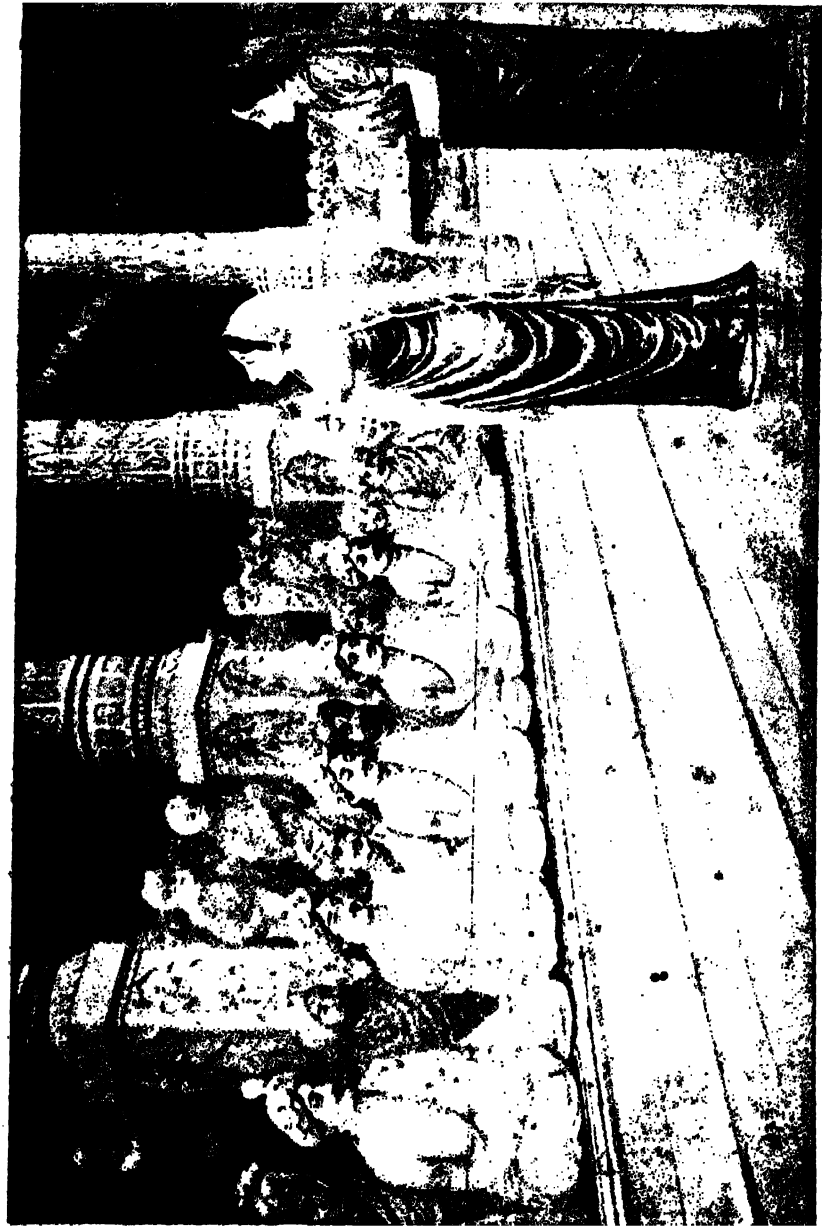
"দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

স্বত্বাধিকারিণী কুচবিহার মহারাণী স্থনীতি দেবী সি, আই, ই, মহোদয়ার সৌজন্যে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

৪র্থ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল। { ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

নূতন হাওয়া।

—:✻:—

আজ্‌কে আমার গায়ে এ কি

নূতন হাওয়া লাগ্‌ল গো,

নবীন করে আবার যেন

পরাণ আমার জাগ্‌ল গো ?

আকুল করে হৃদয়খানি

উঠ্‌ল বেজে কাহার বাণী,

কোন্ সে প্রেমের দোল্‌না দোলায়

চিত্তখানি দুল্‌ল গো ?

উঠ্‌ল বেজে কোন্ বাঁশরী
গোপনতম অন্তরে,
আমায় যেন জাগিয়ে দিল
কি এক মধুর মন্তরে!
হরণ করি শঙ্কা শত
ঘুচিয়ে দিল বেদন্ যত;
দুঃখ-হরা পরশ তাহার
মর্ম্মে শুধুই সন্তরে!

নিরাশ প্রাণে আবার একি
সুখের জোয়ার বইল গো,
নূতন হাওয়ার তালে তালে
প্রেমের তরী ছুট্‌ল গো।
কে গো আমার হৃদয়মাঝে
এলে এমন মোহন সাজে,—
একলা আমার বিজন পথে
সঙ্গী হতে চাইল গো?

শ্রীভক্তিসুধা রায়

চিররহস্য সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর উভয়ের মধ্যে একটা দীর্ঘ স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। চিন্তামগ্ন ফেরাজ লজ্জা-নত-শিরে চেয়ারের উপর উপবিষ্ট; স্বেচ্ছায় ভ্রাতার গোপন-কক্ষে অনধিকার-প্রবেশের জন্য একদিকে যেমন সে ক্ষুব্ধ, অপরদিকে তেমনি একটা ক্রুদ্ধ গর্ব্বে তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! এতবড় আশ্চর্য্য কাহিনী কি জন্য এল র‍্যামি এতকাল তাহার নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল?—তা' যদি সে রাখিতে পারে তবে জোর করিয়া তাহা জানায় এমনই কি অন্যায় হইয়াছে? বিশেষতঃ, লিলিথের মুখখানি ফেরাজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, সে-মুখ যেন তাহার বুকের ভিতর অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে,—কি নিটোল, নিখুঁত, উজ্জ্বলপ্রভ সে আননখানি! যেন কোনো অপ্সরা নন্দন-কানন ছাড়িয়া আসিয়া সজ্জা-সুন্দর কক্ষতলে ঘুমাইয়া আছে!

এ-যাবৎ-শ্রুত সমগ্র কাহিনীটা মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে ফেরাজ আকুল হইয়া উঠিল—আহা, আর একবার কি সে সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যের অপরূপ মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইবে না? নিশ্চয়ই পাইবে! জ্যারোবা তাহার বন্ধু হইবে,—নয়ন ভরিয়া সে অপার্থিব লাবণ্য-সুধা পান করিবার জন্য জ্যারোবা তাহাকে সাহায্য করিবে,—সেই তপ্তকাঞ্চনাভ নবনীত কোমল সুগোল করপল্লবখানির স্পর্শসুখলাভে জ্যারোবা তাহার সহায় হইবে! এমনি সমস্ত চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া ফেরাজ লক্ষ্যই করিল না যে, এল র‍্যামি ইতিমধ্যে তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া তাঁহার সেই আশ্চর্য্য আরবা কেতাবটার পাতা উল্টাইতেছেন।

গৃহ নিস্তব্ধ; কর্ম্মচঞ্চল লণ্ডননগরীর অবিশ্রান্ত জন-কোলাহল ও গাড়ীঘোড়ার শব্দ বাহির হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। কুটীর টুকরার দখলস্বত্ব লইয়া চড়ুই পাখীদের ভিতর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের কিচিরমিচির শব্দে বাতাস মুখরিত হইয়া

উঠিতেছে। আরাম-কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া ফেরাজ বারকতক হাই তুলিল, ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিতেছিল,—কিন্তু এ-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবা মাত্র সে স্থির করিল যে ভ্রাতার কোনো প্রকার প্রভাবই হয়তো এই নিদ্রার কারণ,—সঙ্গে সঙ্গেই সে সংবেগে উঠিয়া বসিল, এবং ললাটের উপরকার কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিয়া উভয় হস্তে একবার চোখদুটী রগড়াইয়া লইল। তাহার এই চকিত-ভাব-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া, এল র‍্যাম ধীরে ধীরে সেদিকে ফিরিলেন এবং বিষণ্ণ-মধুর হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ফেরাজ, সমস্ত বৃত্তান্ত শোন্‌বার পর এখনও কি মনে হ'চ্ছে যে তোমার ভাই নিতান্তই খারাপ লোক ? স্বচ্ছন্দে বল,—ভয় ক'র না।"

কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া ফেরাজ আকুল হইয়া উঠিল। পরে ইতস্ততঃ সহকারে উত্তর করিল—"কি-যে মনে কর্‌বো তা' ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে,—তোমার পরীক্ষা অবশ্য খুবই বিস্ময়কর কিন্তু—আগেই বলেছি—আমার কাছে, এটা ভয়ঙ্কর বলেই বোধ হ'চ্ছে।"

"জীবন ভয়ঙ্কর—মৃত্যু ভয়ঙ্কর—প্রেম ভয়ঙ্কর—ঈশ্বর ভয়ঙ্কর ; প্রকৃতির প্রত্যেকটী তারই 'ভয়ঙ্করের' সুরে স্পন্দিত হ'চ্ছে, যা' অনাগত, তা'র সম্ভাবনা ভয়ঙ্কর ; যা' পরিজ্ঞাত, তা'র বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর !"

এল র‍্যামির গভীর গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ কক্ষব্যাপী বায়ুমণ্ডলে নাচিয়া উঠিল, নয়নদ্বয়ে এমন একটা আশ্চর্য্য দীপ্ত প্রকাশ পাইল, যেন, সে-দীপ্তির অন্তরালে অগ্নিশিখা লুক্কায়িত।

"এদিকে এস, ফেরাজ," —তিনি বলিতে লাগিলেন—"ও রকম সতর্কভাবে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার মানে কি ? কোমরে অত বড় একখানা ছোরা ঝুল্‌ছে, তবু এত ভয় ? এগিয়ে এস,—আমি শপথ করে বল্‌ছি যে, তোমাকে সতর্ক করে' দেবার আগে আমার কণামাত্র প্রভাবও তোমায় স্পর্শ কর্‌বে না। এস !"

ফেরাজ অনুমতি-পালন করিল—কিন্তু ধীরে ধীরে, অনির্দ্দিষ্ট চরণপাতে। এল র‍্যামি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আগমনভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—পরে, সম্মুখে উন্মুক্ত গ্রন্থখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"কাল এই বইখানা তুমি আমার টেবিলের ওপর দেখ্‌তে পেয়েছিলে, আর তা' পড়্‌তে চেষ্টা করেছিলে—কেমন, তাই নয় ?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"বেশ,—কিন্তু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছো কি এ থেকে ?" একপ্রকার আশ্চর্য্য হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ, পেরেছি। বুঝেছি, কেমন করে' কৌশলে চেতনাকে প্রতারিত কর্‌তে পারা যায়,"—কতকটা উষ্ণ ও ক্ষুব্ধতার সহিত ফেরাজ উত্তর দিল—"কেমন করে' একজন নিপুণ ঐন্দ্রজালিক (অর্থাৎ তোমার মতন) মানুষের চক্ষুকর্ণকে বোকা বনিয়ে এমন সব দৃশ্য বা শব্দ দেখাতে কি শোনাতে পারে যা'দের আসলেই অস্তিত্ব নেই, যা'রা অবাস্তব।"

"ঠিক ; এই জায়গাটা শোন ;"—এল র‍্যামি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—"বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে, মহারাজ, মেম্পিস-সহর বাহিরের পুরোহিতবর্গকে রাজধানীতে সমবেত করিতেন এবং উক্ত সহরের রাজপথে বিপুল জন-সমাগম হইত। অতঃপর ঐ পুরোহিতেরা একে একে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিত এবং তৎপূর্ব্বে ঢক্কানিনাদ-শব্দে জন-সংঘকে একত্র করা হইত। প্রত্যেক পুরোহিতই আপনাপন জ্ঞান ও যাদুবিদ্যার বিশেষ বিশেষ অলৌকিক কৌতুক প্রদর্শন করিত। তাহাদের মধ্যে কাহারও মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে প্রদীপ্ত দেখিতে পাইয়া, পরিদর্শক-মণ্ডলী সে-দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিত না। কাহাকেও বা সবুজ, পীত, লোহিতাদি বর্ণের বহুবিচিত্র মণিমানিক্য-খচিত-পরিচ্ছদে সজ্জিত বলিয়া বোধ হইত। কেহ বা সর্প-পরিবেষ্টিত সিংহবাহনে, কেহ বা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত অঙ্গে, কেহ বা লেলিহান অগ্নি-শিখা-বেষ্টিত কলেবরে উপস্থিত হইত—এবং দর্শক-সম্প্রদায় সভয়ে পিছাইয়া যাইত। কেহ বা আবার, শিরোপরি উড্ডীয়-মান ভীষণচঞ্চু শত শত শকুনি-গৃধিনী লইয়া দেখা দিত। সংক্ষেপে যে-যাহা জানিত তাহাই দেখাইত ;—কিন্তু সে সমস্তই মায়িক, দৃষ্টিবিভ্রম-উৎপাদক-মাত্র—বিন্দুমাত্রও বাস্তবতা পরশূন্য। রাজার সমক্ষে উপনীত হইয়া তাহারা জানাইত ;—"আপনি হয়তো অমুক

অমুক মনে করেছিলেন, কিন্তু তা' নয়, আসলে সেগুলো এই এই ব্যাপার *।'—এই শেষ কথাক'টাই হ'চ্ছে যাদু বিদ্যার গোড়ার কথা—" গ্রন্থ হইতে চোখ তুলিয়া এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"এ বিদ্যায় নূতন ব্রতী যারা, তা'রাও একথা জানে; আরও জানে, যে, আকৃতি-গত বা শারীরিক সকল প্রকার স্বাস্থ্য বা পীড়ার একমাত্র কেন্দ্রই হ'চ্ছে কল্পনা। যাক্—আর কিছু পড়েছিলে ?"

অর্দ্ধ-স্বাগতঃ ভাবে ফেরাজ জানাইল—"না।"

"দুঃখের বিষয়!"—সস্নেহে ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"কেমন ক'রে যাদু-দৃশ্য প্রদর্শন করা হয় তা' জানা, আর কার্য্যতঃ যাদু করা, এ দু'টোর মধ্যে তফাৎ অনেক। যাক্—আগে তোমাকে যা' বলেছি, আবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিই; বারণ কর্‌ছি, আমার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অতঃপর কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন ক'র না—লিলিথের নাম কখনও উচ্চারণ ক'র না—যে-ঘরে তা'র শরীর রক্ষিত, ভবিষ্যতে কখনও সে ঘরের সন্নিকটে যেও না বা সেখানে প্রবেশ ক'র না। বুঝ্‌তে পার্‌ছো আমার কথা? বারণ কর্‌ছি আমি!"

অবাধ্য ক্রোধে ফেরাজের নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল—প্রবল আত্ম-গর্ব্বে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

"তুমি বারণ কর্‌ছো!" স্পর্দ্ধাভরে সে বলিল—"আমাকে বারণ কর্‌বার কি অধিকার আছে তোমার? কি কর্‌বে তুমি, যদি আমি এ আজ্ঞা-পালনে অস্বীকৃত হই?"

এল র‍্যামি গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—পূর্ব্বোক্ত আরবী কেতাব-খানার উপর তাঁহার বামহস্ত নিবদ্ধ রহিল।

"অস্বীকৃত হওয়া তোমার সাধ্যাতীত"—তিনি বলিলেন—"কারণ অস্বীকার করতে আমি দেব না। আজ্ঞা-পালন কর্‌তেই হবে তোমাকে, কারণ আমি তোমায় বাধ্য কর্‌বো। অধিকন্তু, ভগবানের নামে তুমি শপথ কর্‌বে যে, কি আমার কাছে কি অন্য কারুর কাছে,

* "The Egyptian Account of the Pyramids"—written in the Arabic by Murabi the son of Japhiphus—date about 1400.

আমার ঐ মহা-পরীক্ষা সম্বন্ধে একটী অক্ষরও কখনও উচ্চারণ কর্‌বে না,—শপথ কর্‌বে যে, লিলিথের নাম কখনও তোমার ওষ্ঠাগ্রে দেখা দেবে না—"

বাধা দিয়া ফেরাজ এইখানে উন্মত্তবৎ চীৎকার করিল—"না, না, শপথ আমি কর্‌বো না, এল র‍্যামি! লিলিথের নাম আমার কাছে অতি মধুর!—কেন তবে সে-নাম উচ্চারণ কর্‌বো না—কেন তা'র নাম গান কর্‌বো না—আমার সকল প্রার্থনায় কি জন্যে সে-নাম স্মরণ পর্য্যন্ত কর্‌তে পাবো না?"

একটা ভয়ঙ্কর দৃষ্টি এল র‍্যামির মুখমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল; তাঁহার কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষুদ্বয় আকুঞ্চিত হইয়া আসিল, এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে এক অপূর্ব্ব দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী প্রকাশ পাইল।

"পাবে না, তা'র কারণ অসংখ্য"—তীক্ষ্ণ অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তা'র মধ্যে একটা কারণ এই যে, লিলিথের আত্মা, লিলিথের দেহ আমার সম্পত্তি, এ'তে তোমার একবিন্দুও অধিকার নেই। তোমার গানে তা'র কোনো প্রয়োজন নেই—তোমার প্রার্থনা ততোধিক অনাবশ্যক তা'র পক্ষে। নির্ব্বোধ যুবক!—লিলিথের নাম ভুল্‌তে হবে তোমার,—শপথ কর্‌তে বাধ্য তুমি, কারণ, আমি অনুমতি কর্‌ছি। সাধ্য থাকে আমার শক্তি প্রতিরোধ কর,—এইবার!—নাও, প্রস্তুত?"

বলিতে বলিতে এল র‍্যামি সম্পূর্ণ সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন—তাঁহার দৈর্ঘ্য যেন সহসা বাড়িয়া উঠিল—নয়নদ্বয় অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল! সেই বিদ্যুত-দৃষ্টি-তলে দাঁড়াইয়া ফেরাজ বুঝিল যে, এই অলৌকিক উপাদান-সংগঠিত ব্যক্তিটীর মহাশক্তির প্রতিরোধ-চেষ্টা করা তাহার পক্ষে কতখানি সম্ভব। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু বৃথা, বৃথা,—প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার শক্তি যেন উবিয়া যাইতেছিল—বাধা দিবার সামর্থ্য যেন ক্রমাগতই অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিতেছিল।

"শপথ কর!" আদেশ-সূচককণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"ভগবানের নামে শপথ কর যে আমার গোপনীয়তা প্রাণপণে রক্ষা কর্‌বে—তোমার ইষ্টদেবীর নামে শপথ কর! এই ধর্ম্মগ্রন্থ হাতে ক'রে শপথ কর!"

একখানি স্বর্ণাঙ্কিত সুন্দর গ্রন্থ ফেরাজের সম্মুখে প্রসারিত হইল।

যন্ত্রচালিতবৎ, অথচ শ্রদ্ধানম্রচিত্তে সে তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া উপবেশন করিল এবং সাগ্রহে গ্রন্থখানি চুম্বন করিয়া বলিল ;—"শপথ করছি, এল র‍্যামি, শপথ করছি !"—কিন্তু কথা কয়টী উচ্চারণ করিবার সময় নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠ যেন ধরিয়া আসিল —অস্ফুট ভাষায় সে বলিল—"লিলিথের নাম বিস্মৃত হব !—কখনও না !"

"ভগবানের নামে !" এল র‍্যামি বলিলেন।

"হ্যাঁ, ভগবানের নামে।"

"ইষ্টদেবীর নামে !"

ফেরাজ কাঁপিয়া উঠিল। যে বিশেষ ধর্ম্ম-সংস্কারের মধ্যে তাহারা মানুষ তাহাতে এ-শপথ বড় ভয়ানক। তথাপি, ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল—"ইষ্টদেবীর নামে।"

ধর্ম্মগ্রন্থখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, ক্রোধ-উপশম-সূচক কোমল স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন —"উত্তম ; এ-ধরণের শপথ স্বর্গে লিপিবদ্ধ হয়, মনে রেখো,—যে-লোক সত্য ভঙ্গ করে, ঈশ্বরের চক্ষে সে অভিশপ্ত ! কিন্তু তুমি,—তুমি তোমার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে ফেরাজ,— আর...যদি আমি ইচ্ছা করি তবে লিলিথের নাম তুমি বিস্মৃতও হবে !"

নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে ফেরাজ দাঁড়াইয়া রহিল,—কি-যেন সে বলিতে চাহে, অথচ কোনো-কারণে মনোভাব প্রকাশের ভাষা যোগাইতেছে না। তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে— ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন শপথ সে কেন করিল ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাহার বিদ্রোহী হইবার অধিকার আছে—নিশ্চয়, নিশ্চয়—কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ? তাহার ভ্রাতা, তাহার বন্ধু, তাহার এতদিনের অভিভাবক এল র‍্যামির বিরুদ্ধে কি ? এরূপ চিন্তা মনোমধ্যে জাগিবামাত্র, লজ্জায়, অনুতাপে, স্নেহ-স্মৃতিতে ফেরাজের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—প্রসারিত করে ভ্রাতার দিকে অগ্রসর হইয়া বিনীত-স্বরে সে বলিল ;—"মার্জ্জনা কর, ভাই,—তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছি, সে জন্যে আমি অনুতপ্ত। যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বলবে, আমি তাই করবো— কিন্তু দোহাই তোমার, লিলিথের নামটী আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না, এ-নাম

বিস্মৃত হ'তে অনুরোধ ক'র না,—নামটী বড় মিষ্ট বড় মধুরআমার কাছে,—কি-এমন তোমার এসে যাবে, এল র‍্যামি, যদি কখনও কখনও সে-নাম স্মরণকরে' আমি তৃপ্তি পাই ? আর যে কথা বলবে, আমি তাই শুন্‌বো,—আর—আর আমার বিগত-অন্যায়ের জন্যে আমি তোমার ক্ষমা চাচ্ছি।"

"চাহিবামাত্রই ক্ষমা করেছি, ফেরাজ"—এল র‍্যামি বলিলেন—"ছেলেমানুষ তুমি ; যত কঠোর আমাকে মনে কর, সত্যই আমি তত কঠোর নই। যৌবনের চাঞ্চল্য ক্ষমা করাই যে উচিৎ—কারণ, এ যৌবন বড়ই কোমল, বড়ই ক্ষণস্থায়ী। তোমার কবিত্ব, তোমার স্বপ্ন-কল্পনাতেই বিভোর থাক, প্রিয়তম,—চিন্তার গরল থেকে চিরদিন শুধু অমৃতটুকুই বেছে নাও,—আর, যদি সন্তুষ্ট থাক্‌তে পার, তবে এখও তোমার জীবন-পরিচালনায় আমাকে সাহায্য করতে দাও। যদি তা' না পার, তা' হ'লে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো খুবই সহজ,—হাসিমুখে সস্নেহে বিদায় গ্রহণ কর,—তুমিও তোমার আকাঙ্ক্ষিত পথে যাও, আমিও আমার নির্দ্ধারিত পথে চলি,—কে বল্‌তে পারে যে সেই-পথেই তুমি অধিকতর সুখী হবে না ?"

অশ্রুভারনত কৃষ্ণতার চক্ষু দুটী তুলিয়া ফেরাজ এল র‍্যামির দিকে চাহিল।

"তুমি কি আমাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে ?" ভগ্নকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল।

নিশ্চয়ই না ! আমি তোমাকে কোথাও পাঠাবো না—কিন্তু তুমি হয়তো যেতে চাইতে পার।"

"কখনও না !" দৃঢ়কণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"আমার মনে হয়, শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার কাছেই আমি থাক্‌বো।"

দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শেষ কথাগুলি সে উচ্চারণ করিল এবং এল র‍্যামি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

"শেষ দিন পর্য্যন্ত ! কিসের শেষ ?"

"হয় জীবনের, না হয় মৃত্যুর, না হয় অন্য-কিছুর ;" চেষ্টাকৃত লঘুতার সহিত ফেরাজ উত্তর করিল—"ফলে, শেষ একটা অবশ্যই আছে যখন নাকি আরম্ভ ছিল।"

"সেটা বিশেষ সমস্যার কথা !" এল র‍্যামি বলিলেন—"জীবজগতের মহাপ্রশ্নই হ'চ্ছে, 'আরম্ভ' কোথাও কখনও ছিল কি না ? শেষ কোথাও কোনোখানে আছে কি না ?"

ফেরাজের ভঙ্গীতে একটা হতাশা পরিব্যক্ত হইল।

"তোমার প্রশ্ন বড়ই গভীর"—অবসন্ন কণ্ঠে সে বলিল—"প্রায়ই আমার মনে হয় যে তোমার জিজ্ঞাসা বড়ই গভীর। আমি তোমাকে অনুসরণ করতে পারিনে—ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি।...এখন আমাকে তোমার কোনো দরকার আছে? যদি না থাকে তো বল, আমি আমার ঘরে যাই। কিছুক্ষণ আমি এখন একলা থাক্‌তে চাই, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, বা কেমন করে' তাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারি সে সম্বন্ধে খানিকক্ষণ ভাব্‌তে চাই।"

"বেশ কথা; চিন্তার উপযোগী বিষয় যদি কিছু থাকে, তবে তা' এই!"—স্নেহ-মধুর হাস্যে কথা কয়টী বলিয়া এল র‍্যামি ভ্রাতাকে বিদায় দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে ফেরাজ তাঁহার করপল্লবের উপর আপনার কোমল অঙ্গুলিগুলি কয়েক মুহূর্ত্ত রক্ষা করিল; পরক্ষণেই চকিত বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল।...একি! বাতাস সহসা এমন গাঢ় হইয়া উঠিল কি করিয়া? মধুর গোলাপ-গন্ধে ঘরখানি এমন ভরপুর হইয়া উঠিতেছে কেন? কোথা হইতে ঐ দূরাগত স্বপ্ন-সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে?"

বিভোর হইয়া ফেরাজ শুনিতে লাগিল; প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা ঐ নিখুঁত মধুর লীলায়িত স্বর লহরী এখনই ভাষা হইয়া উঠিবে! সে ভ্রাতার হস্ত ছাড়িয়া দিল; সঙ্গীতও যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া হইয়া পরিশেষে মিলাইয়া গেল!

বুঝিতে পারিবামাত্র সচকিতে সরিয়া আসিয়া ফেরাজ সগর্ব্বে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—তাহার নয়নে বিদ্যুত-বহ্নি!

"আবার সেই অপার্থিব সঙ্গীত!" সে বলিয়া উঠিল—"আবার সে সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছি,—তুমিও কোন্ তা' না বুঝিছো এল র‍্যামি! বুঝেছি, এ সেই কাল্পনিক গান, যা'র স্রষ্টা তোমারই শক্তি। আশ্চর্য্য,—সুন্দর,—এল র‍্যামি, নিশ্চয়ই তুমি অদ্বিতীয় শক্তিমান!... হ্যাঁ, আমি ক্লান্ত—আমি বিশ্রাম চাই; তোমার প্রদত্ত ঐ স্বপ্নই আমি শিরোধার্য্য করবো; কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে সত্যও যে জগতে আছে, এ কথাও আমি ভুল্‌বো না ভাই, লিলিথের নাম আমি ভুল্‌বো না!"

ফেরাজ হাসিল। তাহার সই নির্ভীক হাসা, সগর্ব্ব ভঙ্গী ও অনায়াস স্বাধীন-ভাবটী এমন সুন্দর মানাইল, যেন পটে আঁকা ছবিখানি হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! সস্নেহে অভিবাদন করিয়া লীলাভরে দ্বারপথে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিয়া গেল—"দরকার পড়্‌লে ডেকো।"

"আজ আর দরকার হবে না" বলিয়া এল র‍্যামি প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—সে চলিয়া গেল।

বই মুড়িয়া এবং তদুপরি হস্তরক্ষা করিয়া এল র‍্যামি শূন্যদৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আপন মনে বলিতে লাগিলেন;—

"বায়ুমণ্ডলে একি অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাষ? হৃদয়ের ভিতর এ কি চাঞ্চল্য? তবে কি ভাগ্য দেবতা বিমুখ হইতেছেন? ষড়রিপু-তাড়িত সাধারণ মানবের মত আমিও কি তবে কতকগুলো নিত্যচঞ্চল উপাদানের সমষ্টিমাত্র? এ সব কি? লিলিথ না হয় অপরের কণ্ঠ শুনিয়া হাসাই করিয়াছিল—কিন্তু কোন অধিকারে এই তুচ্ছ কারণে আমি আত্মপীড়া ঘটাইতে চাই?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঠিক এই সময় কক্ষদ্বারে মৃদু-করাঘাত-শব্দ শুনিয়া এল র‍্যামি উহা উন্মুক্ত করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন—সম্মুখে জ্যারোবা দণ্ডায়মানা। তাহার বিশীর্ণ মুখমণ্ডলে কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না—অধিকন্তু দেখা গেল যে, তাহার কোটরাগত চক্ষুর্দ্বয় জয়োল্লাসে উদ্দীপ্ত এবং সর্ব্বাঙ্গে একটা সগর্ব্ব মর্য্যাদার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ তাহার চোখমুখের ভঙ্গী এবং তৎকালীন ব্যবহার এমনি একপ্রকার জমকালো দাম্ভিক ভাব প্রকাশ করিতেছিল যে, এল র‍্যামি ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিলেন,—এতখানি অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরও যে সে এরূপ স্পর্দ্ধাভরে তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার নিকট নিতান্তই ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিনি জ্যারোবাকে দেখিয়া লইলেন,—এবং সেও নিঃশঙ্কদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভেতরে যেতে পারি কি ?"—তীক্ষ্ণকণ্ঠে জ্যারোবা বলিল—"বেচারা ফেরাজ যে তার কাহিনী তোমার কাছে বিবৃত করেছে তা'তে আর সন্দেহই নেই—এখন আমার কাহিনীও তোমাকে শুন্‌তে হ'চ্চে।"

ঘৃণাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, এল র‍্যামি টেবিলের নিকট প্রত্যাগমন করতঃ আপন আসনে উপবেশন করিলেন। জ্যারোবাও, তাঁহার এই নির্বাক আচরণসম্ভূত ক্রোধের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া এল র‍্যামির টেবিল-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নাও, আমার সম্বন্ধে কি তোমার লেখ্‌বার আছে লেখ"—কাগজ ও পেন্‌সিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল—"যতখানি মন্দ বল্‌তে পার বল। আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি ? স্বীকার। ছ'ছটা বছর তোমার হুকুম তামিল করে' এসে শেষে অবাধ্য হয়েছি ? তাও ঠিক। আর কি বল্‌তে চাও ?"

নিদারুণ অবমাননায় ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া, তীব্র ভর্ৎসনা-পূর্ণ নয়নে এল র‍্যামি তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেন্‌সিল টানিয়া লইয়া সবেগে লিখিলেন—

"আর কিছুই না—বিশ্বাস-ঘাতকতার অতিরিক্ত কিছুই নয় ! যে পবিত্র ভার তোমার ওপর অর্পিত হয়েছিল তা'র সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা তুমি ! শপথ করে' সে শপথ রক্ষা না করার অপরাধে অপরাধিনী তুমি !"

"না, না, তা' নই"—আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল—"তোমার সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্রও অপরাধিনী নই, এল র‍্যামি ; মুক্তকণ্ঠে একথা বল্‌ছি ! তোমার প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করার চেয়ে আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে অনেক সোজা। রক্ষা কর্‌বার মত না হলেও, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ,—এ সৎকার্য্যের বিনিময়ে আমার শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি ঢেলে দিতে প্রস্তুত। না, না, জ্যারোবা অপরাধিনী নয়—সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ !"

উন্মত্ত আবেগে হস্তদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া পরক্ষণেই সে সজোরে উহা আপন-বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে সানুনয়-স্বরে বলিতে লাগিল—

"শোন এল র‍্যামি—শোন, প্রাচ্য-যাদু বিশারদ জ্ঞানীপ্রবর,—আমার কথা শোন! আমি যা' করেছি তা' তোমার পক্ষে ভালই,—হাঁ খুবই ভাল! তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি,—শুধু এই জন্যেই অবিশ্বাসিনী হয়েছি যে, এর থেকে তুমি আবিষ্কার করতে পারবে, কোথায় কেমন করে তোমার কার্য্যের মহত্তম পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। তোমাকে সুখী করবার জন্যেই আমি স্বেচ্ছায় পাপের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি,—এ আমার প্রাণের কথা, আমার মর্ম্মের কথা, ভগবানের অস্তিত্ব যেমন সত্যি এও তেম্নি সত্যি কথা!"

এল র‍্যামি তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন; তাঁহার মুখে-চোখে একটা অদম্য কৌতূহল প্রকাশ পাইতে লাগিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিলেও বাহিরে তাঁহাকে প্রশান্তই দেখাইতেছিল কিন্তু দারুণ কৌতূহলে শিরাসমূহ যেন টনটন করিতেছিল; তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না যে, কি আকস্মিক অপূর্ব্ব ধারণায় জ্যারোবা আপনাকে এতখানি স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছে, এবং এম্নি একটা ভাব প্রকাশ করিতেছে, যেন তার ঐ আশ্চর্য্য রহস্যটা প্রকাশ করিবামাত্র স্বর্গমর্ত্ত্য একেবারে বিস্ময়ে 'থ' হইয়া যাইবে। চেষ্টায় মনোভাব দমন করিয়া তিনি পুনরায় লিখিলেন—

"অবাধ্য হবার কোনোই কারণ ঘটেনি। তোমার কৈফিয়ৎ নিরর্থক—আমি ওসব শুনতে চাইনে। লিলিথের কথা বল,—খবর কি তা'র?"

"খবর!" ঘৃণাভরে জ্যারোবা বলিয়া উঠিল—"কি খবর আর থাকতে পারে? চিরদিন যেমন তা'র শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে, চিরদিন যেমন সে ঘুমোয়, আজও তেম্নি শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে, আজও তেমনি ঘুমোচ্ছে—একটুও নড়েনি। ফেরাজকে যে আমি সে রক্ত দেখিয়েছি তা'তে কোনোই ক্ষতি হয়নি—যা' হয়েছে তা' শুধু তোমারই মধ্যে 'পরিবর্ত্তন এল র‍্যামি, শুধু তোমারই মধ্যে!"

চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া এল র‍্যামি সবেগে জ্যারোবার দিকে অগ্রসর হইলেন,—পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে সে বধির—অগত্যা অধীর আক্রোশে ওষ্ঠদংশন করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িলেন।

"ফেরাজের কথা তুমি শুনেছো" —অবর্ণনীয় উল্লাসে চোখমুখ উদ্দীপ্ত করিয়া জ্যারোবা বলিতে লাগিল—"এইবার আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে যাবতীয় মানবভাষার বিরুদ্ধে বধির করেছেন, —ধন্যবাদ যে, কোনো প্রকার তিরস্কার বা অভিশাপ আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে অক্ষম। তোমার ও যাদুবিদ্যা, যা' রক্তকে হিম করে দেয় বা আত্মাকে স্বপ্নরাজ্যে পাঠায়, তোমার ও যাদুবিদ্যার কিছুই আমি জানিনে বটে এল রামি—কিন্তু আমিও একটা বিদ্যা জানি; সে বিদ্যা হৃদয়ের—বাসনার—সে বিদ্যা সেই স্বাভাবিক মোহিনী শক্তির যা' চক্ষের নিমেষে সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারে!"

হস্তদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া পুনরায় সে উহা বক্ষ-নিবদ্ধ করিল, এবং অর্দ্ধ ব্যঙ্গভরে একটা মোলায়েম রকম নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিল ;—

"শোন, পণ্ডিতপ্রবর এল রামি!—শোন কলা-বিজ্ঞান-বল-দর্পী গর্ব্বিত প্রকৃতি-নিয়ামক!—এত বিদ্যার রাজা হয়েও, কখনো কি তুমি নিজের রিপুগুলোর গুঞ্জন বুঝতে চেষ্টা করেছ?—এমনভাবে কি তাদের ধ্বংস-সাধন করতে পেরেছো, যা'তে ভবিষ্যতে কখনও তা'রা আর প্রবল হয়ে না ওঠে? —না, তা পারনি। মরু-গহ্বরে লুক্কায়িত কুণ্ডলাকৃতি সর্পগুলোরই মত তা'রা ঘুমিয়ে থাকে —কিন্তু একটীমাত্র অসাবধান চরণ-স্পর্শ কিম্বা লোষ্ট্র-পতন-শব্দে দেহ বিস্তার করে' মণিমণ্ডিত ফনা তুলে' দংশন করে! আমি, জ্যারোবা, স্বয়ং এই জায়গাটায় তাদের প্রভাব উপলব্ধি করেছি—" বক্ষের উপর হাতদুটোকে আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিতে লাগিল—"আমার শোণিতে শোণিতে তাদের বিষের জ্বালা অনুভব করেছি—মধুর সে বিষ—জীবনের চেয়েও মধুর!—সে-দংশন আমার জীবনকে আনন্দে ভরে দিয়েছিল,—আনন্দের সেরা আনন্দ!—তেমনটী আর পেলাম না। কিন্তু যাক্, আমার কথায় কাজ কি—এখন তোমার কথাই বলি ;—তোমার কথা—জীবনে যে নিঃসঙ্গ নিরানন্দ,—ভবিষ্যতে যা'র আলোকের রেখামাত্র নেই, তা'র কথা। যেদিন আমি মরুবালুকায় মরণাপন্ন ছিলাম আর তুমি আমাকে নবজীবন প্রদান করেছিলে, সেদিন শপথ করেছিলাম যে আমৃত্যু বিশ্বাসী থেকে তোমার সেবা করবো। ভগবান জানেন, এল রামি, সে শপথ

আমি রক্ষা করে' আসছি—যে-জীবন আমাকে দান করেছো তা'র বিনিময়ে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য-গ্রহণ কর—লিলিথের প্রেম অধিকার কর !"

এল র‍্যামি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন,—তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় বিবর্ণ,—হাত-পা কাঁপিতেছে। যদি সেই মুহূর্ত্তে আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতেন তাহা হইলে একটীমাত্র চেষ্টায় জ্যারোবাকে বোবা করিয়া দিয়া চিরদিনের মত তাহার ঐ অনবশ বাগ্মীতা হয়তো তিনি রুদ্ধ করিয়া দিতেন,—কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, তাঁহার আত্ম-সংযম-কেন্দ্র যেন সে সময় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, চিন্তা-সমুদ্র ঘূর্ণীবেগে আলোড়িত হইতেছিল। এই অস্বাভাবিক আবেগের জন্য আপনাকে তিনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন ; প্রগল্ভ-বাক্ বৃদ্ধাটার উপর মনে মনে আগুন হইয়া উঠিলেও, বাহ্যতঃ তাহা বড় প্রকাশ করিলেন না,—কেবল, নিরস্ত হইবার জন্য, এক প্রকার ক্রুদ্ধ অথচ আদেশসূচক ইঙ্গিত করিলেন।

"না, থাম্‌তে আমি পারবো না, থাম্‌বো না"—অবিচলিতকণ্ঠে সে বলিল—"কেননা, আজ না বল্‌লে ভবিষ্যতে আর বলা হবে না। লিলিথের প্রেম ! কল্পনা কর, এল র‍্যামি ! তা'র সেই সুঠাম বাহু খানির যৌবন-মদির আলিঙ্গন—সেই গোলাপী ঠোঁট দুটীর মধুর চুম্বন-সুধা—সেই মৃগ-নয়নের কোমল সরলতা পরিপূর্ণ চাহনি,—এ সমস্তই তোমার, সমস্তই,—শুদ্ধ যদি একবার ইচ্ছা কর। শোন ! আজ প্রায় ছ' বছর কিম্বা তা'র চেয়েও বেশী দিন ধরে তা'কে আমি পাহারা দিচ্ছি—আর সেই সঙ্গে তোমাকেও পাহারা দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছাবলে এ-যাবৎ সে মরণোপ-জীবন্ত নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছে—আর সে-নিদ্রার মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে শৈশব থেকে যৌবন-সীমান্তেও পদার্পণ করেছে। কিন্তু তুমি এমনি পাষাণ-কঠোর এম্‌নি অসার-চেতা যে, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধতা কি প্রেমানুভূতি দূরে থাক্, এ-যাবৎ তা'কে তোমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রমাত্র করে' রেখে দিয়েছো ! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য এল র‍্যামি,—আমি অনেক ভেবেছি এ সম্বন্ধে অনেক প্রার্থনা করেছি ;—এতদিন পরে বুঝিবা ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, বুঝিবা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত ক'রেছেন !"

উচ্ছ্বসিত আবেগে সে করতালি দিয়া উঠিল—পরে পুনরায় বলিতে লাগিল :—

"বালিকা লিলিথ মারা গেল ; কিন্তু তুমি, এল র‍্যামি, তুমি তা'কে আবার বাঁচিয়ে তুল্‌লে। আজও সে বেঁচে আছে—হাঁ আজও, যদিও তা'কে মৃত বলে' প্রচার করাই

তোমার খেয়াল-সঙ্গত। সে যুবতী—তুমি পুরুষ; আর তা'কে এ-রকম জীবনে-মরণে করে' রেখো না, আর তা'কে অমন চিরান্ধকারে ডুবিয়ে রেখো না,—এখনও সাবধান হও, নইলে তোমার নৃশংসতার জন্যে ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হবে; কারো সাধ্য নেই যে সে-অভিশাপ প্রতিরোধ করে। আমি, জ্যারোবা, আমি শপথ করেছি, যে, লিলিথ প্রেমানন্দ উপভোগ কর্‌বে!—আর তুমি, এল র‍্যামি, তুমিই তা'র প্রণয়ী হবে! এই পবিত্র পরিণামের জন্যে তাকেই আমি নিযুক্ত করেছি যার অগ্নিবাণ সুপ্ত-কামনাকে বহ্নিময় করে' তোলে। কে সে, শুন্‌বে? .. ..” জ্যারোবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং এল র‍্যামির প্রায় কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপাকণ্ঠে জানাইল—“ঈর্ষা!”

এল র‍্যামি হাসিলেন,—তাঁহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ হাস্য জ্যারোবার এতক্ষণের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাটাকে তীব্রতম ঘৃণার আঘাতে যেন ধরাশায়ী করিয়া দিতে চাহিল। সে কিন্তু বিন্দুমাত্রও দমিল না, বরং বর্দ্ধিত উৎসাহে আরম্ভ করিল:—

“ঈর্ষা! ইতিপূর্ব্বেই এ কীট তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়েছ এল র‍্যামি! কেন? কারণ আর একজনের দৃষ্টি লিলিথের ওপর পড়েছে! এটা আমারই কাজ! আমিই ফেরাজকে সে কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলাম—আমিই তা'কে লিলিথের শয়ন-পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে বসতে বলেছিলাম—আমিই তা'কে সেই হাতখানি স্পর্শ করবার অধিকার দিয়েছিলাম—আর, শুনতে না পেলেও বুঝেছিলাম, সে তা'কে জাগরিত হ'বার জন্য অনুরোধ কর্‌ছে। বৃথা—বৃথা! শবদেহকে জাগ্‌তে বল্‌লেও সমানই ফল ফল্‌তো!—আমি জান্‌তাম যে, ফেরাজের আহ্বান তা'কে নড়াতেও পার্‌বে না,—জান্‌তাম, যে, তা'র নিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞাধীন। কিন্তু আমি—আমি তা'কে সেই অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর্‌তে আর সে-রূপের পূজা কর্‌তে দিয়েছিলাম; সমস্ত প্রাণশক্তি চক্ষে কেন্দ্রীভূত করে' সে-সৌন্দর্য্য যুবক যেন পান করেছিল—তা'কে ভালবেসেছিল। আরও শোন এল র‍্যামি,—ফেরাজ যখন হস্ত স্পর্শ ক'রে তখন সে হেসেছিল; এতে বোঝা যায় যে, না নড়্‌লেও সে অনুভব করেছিল; অনুভব করেছিল যে, সে-স্পর্শ তোমার নয়; বুঝেছো এল র‍্যামি, তোমার নয়!—একদিন যেমন সে তোমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল আজ আর ঠিক তেমনটী নেই!”

এই পর্যন্ত বলিয়া জয়োল্লাসে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিবামাত্র, এল র‍্যামি এতই আকস্মিক বেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন যে বোধ হইল, যেন এখনি তাহাকে ঘর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন !—কিন্তু না, সহসা সংযত হইয়া তিনি কাগজ পেনসিল টানিয়া লইলেন এবং লিখিলেন :—

"এতক্ষণ আশাতীত ধৈর্য্যের সঙ্গে তোমার প্রলাপ শুনেছি। নির্ব্বোধ বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক তুমি—তোমার খেয়ালের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তোমার অবাধ্যতা আমার সারাজীবনের পরিশ্রম পণ্ড করতে পারতো—এইতেই যে কোনো ক্ষতি না হয়েছে এমনও নয়। যাও, কর্ত্তব্য-কার্য্যে মন দাও গিয়ে,—সাবধান থেকো, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার প্রবৃত্তি না আসে। এ বিষয়ে যদি দ্বিতীয় কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে পাই, তা' হ'লে আগেকারই মত নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব অবস্থায় আবার তোমাকে সেই মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসব। যাও,—তোমার অজ্ঞতার পরিচয়-লাভে আর আমার রুচি নেই।"

জ্যারোবা পড়িল, তাহার মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখা দিল,—কিন্তু তখনও স্মতের স্বাধীন ও সগর্ব্ব ভাব তাহার প্রত্যেক রেখা-ভঙ্গীতে ফুটিয়া রহিল। যাহা হউক, সবিনয়েই সে মস্তক অবনত করিল—পরে ধীর পরিচ্ছন্ন স্বরে বলিল—

"এল র‍্যামি বিজ্ঞ,—এল র‍্যামি শক্তিশালী,—কিন্তু জ্যারোবার কথাগুলি যেন তাঁর মনে থাকে। জ্যারোবাও প্রাচ্য প্রণালীতে প্রাচ্য কলায় অভিজ্ঞা। কি উচ্চতম, কি নিম্নতম, সকলের কাছেই কখনও কখনও অদৃষ্টের আহ্বান বাণী স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। জীবন বা মৃত্যুর যেমন একটা বিশেষ নিয়ম আছে, প্রেমেরও তেমনি একটা নিয়ম আছে। ঐ-নিয়ম যদি না থাকতো তবে ব্রহ্মাণ্ড নিস্পন্দ হ'য়ে যেত। তবে, এল র‍্যামি যদি আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও শক্তিমান প্রমাণ করতে পারেন, করুন !"

—অতঃপর, প্রাচ্যপ্রথানুযায়ী সেলাম করিয়া ত্বরিতপদে সে কক্ষত্যাগ করিল এবং দ্বারটী নিঃশব্দে রুদ্ধ করিয়া গেল। এল র‍্যামি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং জ্যারোবার সহিত কথোপকথন কালে লিখিত কাগজগুলো অন্যমনস্কভাবে ছিঁড়িতে লাগিলেন ; তাঁহার

বিস্ময় ও আত্মধিকার বৃত্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে নিজের তৎকালীন চিন্তাটুকু সম্বন্ধেও আর সচেতন ছিলেন না।

"কি নির্ব্বোধ, কি হস্তীমূর্খ আমি!" তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"কথা কহিবার অগ্রে কেন তাহার বাক্‌শক্তি অপহরণ করিলাম না? কোথায় ছিল আমার শক্তি, কোথায় ছিল আমার নৈপুণ্য? চক্ষের নিমেষে তাহাকে তো নিশ্চয়ই তড়িতাহত করিয়া মাটীতে লুটাইয়া দিতে পারিতাম!—কিন্তু না, সে একে স্ত্রীলোক তাহাতে বৃদ্ধা। আশ্চর্য্য যে, এই সমস্ত স্ত্রীজাতি প্রায়ই এমন ভাবে প্রেমের কথা বলিয়া থাকে যেন বিশ্বসংসারে উহাই একমাত্র সার বস্তু!...লিলিথের প্রেম! হায় রে! কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস-সক্ষম শবদেহের প্রেম!...কিন্তু লিলিথের আত্মার কি? তা'র কি ভালবাসা আছে—ঘৃণা আছে—অনুভূতি আছে? নিশ্চয়ই না। সে একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বচ্ছতা একটা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পরদা যা' নির্ব্বিকারে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিফলিত করিতে সক্ষম। ইহাই তো আত্মা, অন্ততঃ আমার বিশ্বাসমতে—একটা অবিনশ্বর বিভূতি, যাহার নিজের কোনো আকার নাই অথচ সর্ব্বপ্রকার আকারই ধারণ করিতে সক্ষম,- সুখদুঃখানুভূতির অতীত, অথচ স্ফটিক পাত্র যেমন বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত করে সেইরূপ সকল প্রকার অনুভূতির আভাষ-বিস্তারে সুপটু। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।"

তিনি অস্থিরভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন,—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতে বাহির হইয়া আসিল।

"না—" অস্ফুট ভাষায়, যেন কোনো স্বগত প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"না, এখন তা'র কাছে যাওয়া হবে না,—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কখনই নয়। আটচল্লিশ ঘণ্টার অপনুপস্থিতিই যখন আমার অভিপ্রেত ছিল তখন ঐ আটচল্লিশ ঘণ্টাই অপেক্ষা করা চাই। তারপর যাব—তারপর সে সমস্তই বল্‌বে—বুঝ্‌তে পারবো, কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু...'সমস্ত প্রাণশক্তি চক্ষে কেন্দ্রীভূত করে' সে সৌন্দর্য্য ফেরাজ পান করেছিল—তা'কে ভাল বেসে ছিল'! ...ভালবাসা!......এ কথাটাই যেন লিলিথের কুমারী-আত্মার পক্ষে অপমানকর!"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

খেপীর বাপের বাড়ীর তত্ত্ব।

জ্যৈষ্ঠেতে গাছ ভরে টক্ টকে পাকা আম
দীঘি ভরা পদ্মের চাকি,
গাছভরা তালবীজ কস্‌কসে কালো জাম
যষ্ঠীর দিন যায় রাখি।

(২)

শরতের শশধর পিতারি সে অনুচর
আসে তার সুধাভার নিয়ে,
দুর্ব্বার মখমল শিউলি রঙিন বাস
বোধনের দিন যায় দিয়ে।

(৩)

শীতের গোলাপী লেপ রূপালি চাদরখান
কপি লেবু আদরের চিপে,
গোমুখীর হিম জল নামাবলী কম্বল
কুম্ভের মেলা থেকে কিনে।

(৪)

বালিকা বিধবা আমি অভাব কিছুই নাই
প্রকৃতির আমি দীন বধূ,
পিতার আদুরে মেয়ে তত্ত্বের ত্রুটী নাই
আস্বাদে সাধ নাই শুধু।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ঝুলন-স্মৃতি।

—:*:—

বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব উৎসব উৎস আজও ত্রিপুর রাজ অন্তঃপুরে চলিতেছে। আজ ঝুলন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়া ঘরের মেয়েরা মহা উৎসাহে আণ্ডাবাচ্চা লইয়া রাজবাটী চলিয়া গিয়াছে, আর ছেলেরা, যুবক ও বালকবৃন্দ কেহবা ফুটবলে মাতিয়া পড়িয়াছে, কেহবা বড়্শি হাতে 'কমলাসাগরে' মাছ ধরিতে গিয়াছে। বাকী কি রবে কখন তাহার ঠিকানা নাই। বাড়ীখানা পরিত্যক্ত বাড়ীর ন্যায় হইয়াছে। মনে হইল শেষ রাত্রে হয় ত স্ত্রী পুরুষ উভয় দলই উৎসব সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিবে। আমি এ দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা অবস্থায় পড়িয়া আছি। কি করিয়া এই রজত-ধবল-চন্দ্রিমা তরঙ্গায়িত চিত্তদোদুল সময় কাটাই তাই ভাবিতেছি।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'ঝুলন' নামক গীতিগ্রন্থখানা হাতে তুলিয়া লইলাম এবং পড়িতে পড়িতে মনে হইল আমি সেই বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে বসিয়া আছি। কাণফোঁড়া নথির ন্যায় "ঝুলন-মঙ্গল গীতির" Proof দেখিয়া যাইতেছি আর বীরচন্দ্রের বাৎসল্যভাবের উৎস আমার প্রতি ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ হেন চাঁদ্নি রাত্রে আমি একজন রাজর্ষির সেবা করিয়াছিলাম তাহাই ওতঃপ্রোতভাবে আমার হৃদয়কে দোলাইতেছে। অদ্যকার ঝুলনকে মধুময় করিয়াছে। বীরচন্দ্র মাণিক্য আজ স্বর্গে। আজ স্বর্গ মর্ত্ত এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মহত্বগৌরব প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি, স্বর্গেরসুরে কে হৃদয় তার ঝঙ্কৃত করিয়া গাহিতেছে—"দে দোল—দে দোল!"

ঝুলন নামক ক্ষুদ্র গীতি-কাব্যখানি ব্রজেরভাবে ও ব্রজবুলিতে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত। আর বীরচন্দ্রের মত সুকণ্ঠে গীত হইত। বীরচন্দ্র আত্মহারা হইতেন এবং ভাবে গদ গদ হইয়া তিনি ভাবস্রোতে ভাসমান হইতেন। তাঁহার কবিতায় যাহা গীত হইতেছে তাহাতে তাঁহার মর্ত্তলোকের জীবন-ইতিহাস ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করুক, লিখকের এই মনোভিলাষ।

ভাদরের চাঁদের জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রিতে যে দুটী ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিতে পারে এ কথা পূর্ব্বে মনেও করি নাই। ভাবে গদ গদ ভাবুকের ভাব এবং রাজ্যের জন্য কঠোর কর্ত্তব্য পালন এই দুইটি বীরচন্দ্রের জীবনে অতি আশ্চর্য্য ভাবে এক হইয়া গিয়াছিল তাহাই বর্ণন করিতেছি।

গৃহদেবতা এবং অর্চ্চামূর্ত্তি বৃন্দাবনচন্দ্রে রাজা মিছিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য ঝুলন যাত্রা। ঝুলন মঙ্গল গীত গাহিবার জন্য বীরচন্দ্র আজ রাজবেশ ছাড়িয়া ভক্তের বেশে সুসজ্জিত হইলেন। তখন রাত্র ৯টা। রাজ-পার্শ্বসহচর A. D. C. আমি, করজোরে দণ্ডায়মান আছি,—জানিবার জন্য এ অধমের প্রতি কি আজ্ঞা থাকিতে পারে? মুখে বাক্য স্ফুট করিতে পারি না। বীরচন্দ্র যে আমার শিক্ষা গুরু। কিন্তু বীরচন্দ্র সদানন্দ পুরুষ। তাঁহার পার্শ্বে শত শত শতদল পুষ্প এবং তৎসহ রহিয়াছে চন্দন চর্চ্চিত তুলসীর গুচ্ছ। তিনি যাইবেন বৃন্দাবনচন্দ্রের অর্চ্চনার জন্য। সুন্দর কোঁচান শুভ্র গরদ ধুতি, অঙ্গে একখানা চাদর, পাখাটানার সঙ্গে সঙ্গে উড়িতেছে। বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন মনে গুন্ গুন্ স্বরে স্বরালাপ করিতেছেন। সুহাসিতে আমাকে আদেশ দিলেন "টেবিলের উপর কাগজোড়া, আমার ঝুলন-মঙ্গল গীতির মুদ্রাযন্ত্রের Press Copy আছে, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া পড়িস্। চন্দ্রবিন্দু যে স্থানে দরকার নাই এবং যে স্থানে দিতে হইবে কম্পোজিটর তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাহা দেখিয়া আমার রাগ হয়, মনে করি অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু বেচারিদের অন্ন যায়, সে জন্য পারি না। কাজেই তুই দেখিস এবং লাল কালীতে সংশোধন করিয়া নিস্।"

আমি রাজাদেশ পালন করিলাম। গুরুর আদেশ বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিলাম। অদ্য রজনী আমাকে শুইতে হইবে রাজনিকেতনে; কারণ রাজবাড়ীর কোন উৎসব ও বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে রাজদ্বারে হাজির থাকিতে হয়। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং এখন পর্য্যন্ত ঠাকুর লোকেরা তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হঠাৎ একটা আদেশ দিলেন,—"হোঁ কাল ১০টার সময় Political Agent (পলিটিক্যাল এজেন্ট) আসিবার কথা আছে। তিনি কুমিল্লা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন কিনা আমি জানি না। বাগানের ঘরে

আমাদের দেখা হইবে। যথাযথরূপে সব ঠিক করিয়া রাখিস্ এবং অন্য কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে দিস্ না।" এই আদেশ দিয়াই তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আমিও কাপড়েঁাড়া পথিখানা লইয়া পার্শ্বস্থ ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলাম। প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া ঝুলন-মঙ্গলগীতি পাঠে রত হইলাম। অদ্য সেদিনকার সে আনন্দ-রাত্রির কথা স্মরণে ও মরমে প্রবেশ করিয়া কাতরে পরাণ কাঁদাইতেছে। ঠিক আমারই বয়সে বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন উপনীত হইয়াছিলেন। আমি তখন ২৪ বৎসরের যুবক। সেইদিন আর অদ্যকার দিন তুলনা করিয়া দেখিলে অদ্য রাত্রের সেই নির্জ্জন বাড়ীর নিস্তব্ধতায় বীরচন্দ্র মাণিক্যের জীবনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যেই মহানুভবকে অনুভব করিবার আজ প্রশস্ত অবসর।

অন্তঃপুরে সমবেত আত্মীয়া মহিলাগণের সঙ্গে বীরচন্দ্র গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ;—

"দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ,
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।
সুরঙ্গ হিন্দোল অতি ঝলমল,
ঝুলায় ভকত মিলিয়া,
সঘন আনন্দে করু জয়ধ্বনি,
যতেক নদিয়া বাসিয়া।
করু নব রসে গৌর কিশোর,
কুটিল কটাখ রঙ্গিয়া,
নদিয়া নাগরী হেরি ও মাধুরী
বিবশ বদনে মাতিয়া।
ঝুলতহি পহুঁ আনন্দ হিল্লোলে
কত কোটী কাম জিনিয়া,
পহুঁ গুণ গান্ আনন্দে গাওত,
দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া।"

এখন বীরচন্দ্র স্বর্গীয়া ভানুমতী দেবীকে স্মরণ করিয়া যে গান গাহিয়াছিলেন সঙ্গীতের সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া আনন্দে শুনিতে লাগিলাম।

"দেবি ! তুমিত স্বরগ পুরে
জানি নাকো কত দূরে
কোন অমরার দেশে,
  করিতেছ বাস।
পশিতে কি পারে তথা
মানবের আশালতা
বিরহের অশ্রুজল
  প্রাণভরা ভালবাসা।
হেথা আমি আছি পরে
হৃদয়ের ভাঙ্গাঘরে
গুণিতেছি সারাদিন
  জীবনের বেলা।
যেন সে উপলদেশে
সাথী হীন একাবাসে
জানি না কবে ফুরাবে
  এ মরতের খেলা।"

প্রথমা পত্নী মানবলীলা সংবরণ করিবার পর তিনি তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার সবগুলি মুদ্রিত হয় নাই; কয়েকখানা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ২০ কি ৩০ খণ্ডমাত্র। পরিজনের হাতে হাতেই তাহা রহিয়া গিয়াছিল এবং পরিজনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও গতায়ু হইয়াছে। সেবক জানিয়া আদর করিয়া যে কয়েক খণ্ড আমাকে দিয়াছিলেন তাহাও বন্ধু বান্ধবগণ লুটিয়া লইয়াছেন। এখনও ফেরৎ পাই নাই। কেবলমাত্র এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা আমার হাতে

আছে তাহাই বক্ষে ধারণ করিয়া অদাকার নিশিতে বীরচন্দ্রকে স্মৃতিতে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারই মুষ্টি ভিক্ষার নিদর্শন পাইতেছি। গান বেশ জমিয়া উঠিল।

"বরষা সময়ে চাঁদনা রাতি,
ঘণ আবরণে মলিনা ভাতি।
নবজলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুর ডাকয়ে হরষে।
তমালের ডালে শিখিকুল নাচে,
রমনী হৃদয় রমণ যাচে।
গরজে বারিদ. চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এহেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস,
যুগল মিলন নিরখিত আশ।"

এইরূপে বীরচন্দ্র ঝুলন উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া পরিয়াছিলেন। আমি তখনও গানের সঙ্গে পদ মিলাইয়া প্রায় আত্মহারা হইয়াছিলাম। বীরচন্দ্রের দরবারে বৈষ্ণব কবিতা, বিশেষ মহাজন পদাবলী সর্ব্বদা মুখরিত হইত। কাজেই ক্ষুদ্র চড়ুই পাখীর মত আমি বৈষ্ণব পদাবলীর ছিটা ফোটা রস সংগ্রহ করিয়া আনিতাম। কিন্তু সেদিনকার সেই রজনীতে আমাকে বৈষ্ণব সুধারস পানে বাস্তবিক মাতাল করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় হঠাৎ একজন পেয়াদা আসিয়া সোর গোল বাধাইয়া দিয়াছিল। আমি বাহিরে গিয়া দেখি একখানা লেপাফা হস্তে Mr. Greer Political Agent এর জরুরী পত্র লইয়া উপস্থিত এবং এরাত্রেই জবাব চাই ইহাও জানাইয়াছিল। পত্রখানা হাতে করিয়া আমি অনধিকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। Greer সাহেবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। Comilla Club এ তাঁহার সহিত প্রথমে আলাপ পরিচয় জন্মে। তৎপরে আমার শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে

আলাপাদি হয়। তিনি শুনিতে পাইলেন আমি একজন ভাল Photographer (ফোটোগ্রাফার) ফোটোগ্রাফি শিক্ষা করা Greer সাহেবের একটা বাতিক ছিল। কাজেই উভয় একজাতীয় Hobby Horse এ চড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল এবং আমিও তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে ছিলাম। প্রভু [illegible] এক্ষণে অন্তঃপুরে Religeous meditation এ গভীর ভাবে নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে তাঁহাকে disturb করা কাহারও উচিত নয়। বিশেষতঃ রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ। স্ত্রীলোক হইলেও তাহা করিতে পারেনা। কাজেই প্রাতঃকাল পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।" আপদ দূর করিয়া দিয়া আমি সম্পদের আশ্রয় লইলাম। আবার আমি পাঠে রত হইলাম প্রফুল্লিত মনে। ঘটকা-যন্ত্র দৃষ্টে জানিতে পারিলাম ইতি মধ্যে ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ১১ টা হইতে ৩টা পর্যন্ত এই ৪ ঘটা কাল আমি মতোয়ারা হইয়াছিলাম। মনে করিলাম "Time is made for Slaves." আমি কাহারও গোলাম নহি। চিন্তা কি? আবার ঢাল, আবার পান কর। তখন শুনিলাম ঝুলন মঙ্গল গীত সহ ঝুলন উৎসব প্রায় শেষ হইতেছে। তখন বীরচন্দ্র পরিজন সহ গাহিতেছিলেন।

"থামাইয়া দোলা রাধাশ্যাম দুহুঁ,
শ্রমজলে ভাসি যায়,
শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে
মৃদুল চামর বায়।
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল
কুসুম আসনে রাই,
রাই বামে করি বসল নাগর,
সুখের অবধি নাই।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সেবায় মগন
যে যেমন ভাল জানে,
কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল,
উপহার কেহুঁ আনে।

কর্পূর বাসিত সুরস তাম্বুল
বিশাখা দিল যে মুখে,
সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র
পদ-সেবা করে সুখে।"

শেষ ঝুলন-মঙ্গলগীত গাওয়া হইয়া গেল. শুনিলাম—

"সুবাসে বাসিত সুখের নিকুঞ্জ
গুঞ্জরে মধুপ তায়,
শ্যাম রাই পানে তৃষিত নয়নে
রাই শ্যাম পানে চায়।

বুঝিল চতুরা বিশাখা ললিতা
বলিল মুচকি হাসি,
শ্যাম সিন্ধু মাঝে রেখে এ রতন,
আসি বঁধূ তবে আসি।

রেখো বুকে বুকে যক্ষের যতনে
মোদের এ ধন রাই,
কা'ল এসে বঁধু দেখো দেখো যেন,
খুঁজে এ রতন পাই।

দারিদ্র মাণিক পাইল নাগর,
বসিল ঘেসিয়া কাছে,
হাসি সখীগণ ত্বরা পলাইল,
বীরচন্দ্র সব পাছে।"

এবার বীরচন্দ্রের পালা। চক্ষে দেখি নাই। মরমে শুনিয়াছি, মরমে লাগিয়াছে এবং সে দৃশ্য আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী (এক্ষণে স্বর্গীয়া)। মহারাণী মনমোহিনী দেবী বাম পার্শ্বে এবং পরিজন, মহিলা এবং কন্যাগণ একত্র হইয়া গান

ধরিয়াছিলেন স্বয়ং বীরচন্দ্র মাণিক্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। রাজর্ষি তাঁহার এই শেষ প্রার্থনা, তাঁহার মর্ত্ত্য লোকের অবস্থা ও ব্যবস্থা সঙ্গীতে পরিপাটী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

'অহে রাধাশ্যাম,
আজিকি সুখের দিন ঝুলন মঙ্গল হে,
    ভাব মাখা সরস চাহনি,
যুগল অধরে হাসি শ্রীঅঙ্গে পুলক নাথ,
    মন সহ ঝুলন দোলনি।
রাধাশ্যাম,
আগে এসুখের দিনে অভাগিয়া কত হে,
    পূজিয়াছি ওই রাঙা পায়,
দুনয়নে সুখ-ধারা বহিত হিলোলে নাথ,
    প্রেম ঢেউ খেলিত হিয়ায়।
রাধাশ্যাম,
বিধাতা ব্যাধের মত আসি চুপি চুপি হে,
    সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
দারুণ সন্ধান তার শূণ্য সব দিক নাথ,
    এবে একা আঁধারে দাড়ায়ে।
রাধাশ্যাম,
বাসনা-বাঁশরী তানে বিধি নিরদয় হে,
    পরাণ কুরঙ্গে ভুলাইল,
আনি বিশেষ দেশে পুন বেড়াজালে নাথ,
    ঘেরি বাণ মরমে হানিল।
রাধাশ্যাম,
পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ায় অনল হে,
    ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,

উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,
বিষয়ের পাষাণ শিকলে।
রাধাশ্যাম,
কাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে,
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,
যে ক'দিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ,
থাকি যেন যুগল সেবায়।"

বীরচন্দ্র কুঞ্জ ভাঙ্গা করিয়া নিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এবং সুধারসের শেষ পাত্র চুম্বন করিয়া। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ ব্যক্তিই বলিতে পারে;—

"মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে?"

পাখার বাতাস চলিতে লাগিল। সুবাসিত জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আসিয়া উপস্থিত হইল। রজতনির্ম্মিত জলাধার লইয়া পরিচারক উপস্থিত। তাঁহার বস্ত্রত্যাগের পর নববস্ত্র লইয়া ভৃত্যবর্গ উপস্থিত। নিজ হস্তে ভিজা গামছাখানা লইয়া শ্রীমুখের স্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিতেছেন। এমন সময় আমি Greer সাহেবের পত্রখানা লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার শ্রীহস্তে উঠাইয়া দিলাম। নিজ হস্তে রচিত হস্তীদন্তের Paper cutter লইয়া তিনি লেপাফাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং পাঠ করিয়া সম্মুখস্থ দেরাজের মধ্যে পুড়িয়া রাখিলেন। তখন আমার চিন্তা হইল আমি যে Greer সাহেবকে উত্তর লিখিয়া দিয়াছি এ অনধিকারচর্চ্চার জন্য আমি দায়ী। কাজেই কবুলা জবাব দেওয়াই এ ক্ষেত্রে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমি আবার জোর হস্তে তাঁহাকে জানিতে দিলাম আমার উত্তরের কারণ ও বিষয়। তখন মহারাজ একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন "তুই তোর কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিস্। আমার উত্তর লিখিয়া আন্। তাহার পর এখনই লোক দিয়া পাঠাইয়া দিস্। আগামী কাল ১০টার পরিবর্ত্তে ১২ঘটিকার সময় আমার সহিত দেখা হইবে।" আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ আমার বিশ্রামাগারে যাইয়া যথাযথ ভাবে মহারাজার আদেশমত লিখিয়া লইলাম।

দস্তখতের জন্য "শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ" পেশ করিলাম। তিনি তাহাতে দস্তখত দিয়া দিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি তাঁহার সেই শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত মছলন্দে শুইয়া পড়িলেন এবং আলো নিবাইয়া দিয়া Punkha-pullerকে জোরে পাখা টানিতে আদেশ দিলেন। আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। বাসামুখে যাইতে যাইতে আমার চিন্তা হইল কি পত্র আসিয়াছে এবং প্রাতঃকালে কি কর্ম্মই হইবে তাহা আমি আদৌ জানি না। কিন্তু এ কথা জানি বীরচন্দ্র যেমন বৈষ্ণব উৎসব করেন সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই পাকা অভিনেতা কোন ঘটনাতেই নিজে ধরা দেন না। নির্ব্বাক নিষ্কম্পের ন্যায় সর্ব্বদা দুঃখ এবং সুখের ফুল লইয়া আপন মনে মালা গাঁথিতে পারেন। আশ্চর্য্য মালাকার, আশ্চর্য্য রকমে তাঁহার স্বভাব এবং আশ্চর্য্য রকমে তিনি বাজীকর। উৎসবান্তে রাজঅন্তঃপুর হইতে মহিলা দর্শকবৃন্দ বাড়ী ফিরিতেছে। রাস্তাময় যেন গোলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জনৈক রসিকা গান ধরিয়াছেন—

"রাই জাগ, রাই জাগ,
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকেরি কোলে"

আমার মনিব যে মাণিক। এদিকে দেবলয়ে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ীতে মঙ্গল-আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর ইত্যাদি বাজিতে লাগিল। আমি বাড়ী ফিরিলাম এবং পরিচারককে "Pick me up" নামক মাতালের ঔষধ ও ১বোতল Soda water আনিবার জন্য হুকুম করিলাম। আজ প্রকৃতই আমি মাতাল। আমার ঘাড়ের উপর মাথা রাখিতে পারিতেছি না। হৃদয় উৎফুল্লিত। কিন্তু চিন্তা আসিয়া লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। ঘুমাইবার ভাণও চক্ষে নাই। এদিকে অরুণোদয় কাল উপস্থিত। পূর্ব্বাকাশ যেন সোনা ফলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই রক্তিম রঙ্গে আকাশটা লাল হইয়া উঠিতেছে। ভাবিলাম আজ আমার কর্ত্তব্য উপস্থিত। ছায়া পূর্ব্বগামী। আমার হৃদয়ের ছায়াও রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। সে রঙ্গের রঙ্গ ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে নিবেদিতব্য।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

ফোয়ারা।

—ঃ*ঃ—

মাল্‌কোশ—একতালা।*

স্ফটিক তরুর স্বচ্ছ শাখায়
মুক্তারি ফল ধর্‌চে রে,—
উজল তরল উৎসটি ঐ
অরুণ-আলোয় ঝর্‌চে রে!
তপন-ফলিত স্বপ্নরাশি
ফুলের মতই তুল্‌চে হাসি,—
সাত-রাঙা ফুল মন্দারেরি
আনন্দে প্রাণ ভরচে রে!
উৎসারিত রজতবারি
উচ্চে উঠে চঞ্চলি,'
ছড়িয়ে দিয়ে রামধনু রঙ্‌
পড়্‌চে নীচে ছলছলি'।
দেখ্‌সে নূতন ছন্দ যতি,—
পান্না, চুণী—ঝল্‌সে মোতি!—
বনদেবীর কণ্ঠমালার
পুষ্পমণি ঝর্‌চে রে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

———

* ঔড়ব জাতি। মধ্যম্ বাদী। রেখাব, পঞ্চম, বর্জ্জিত। গান্ধার, নিখাদ, দৈবত—কোমল॥

স্বরলিপি ।

—:*:—

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

অস্থায়ী ।

০ ১ ২´ ৩
II {সসা সসা । | ণ্া দণ্া । I সা -মা মা | মা মা -া |
স্ফ´ টিক্ ০ ত রুর্ ০ স্ব চ্ ছ শা খা য়

০ ১ ২´ ৩
| মা -া মা | মা জ্ঞজ্ঞা । I মমা দা -া | ণা -দা -মা } |
মু ক্ তা রি ফল্ ০ ধর্ চে ০ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| মা মমা । | জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা । I মা -া দা | ণা -দা র্সা |
উ জল্ ০ ত রল্ ০ উ ৎ স টি ০ ত্রৈ

০ ১ ২´ ৩
| র্সা ণণা । | দা মা -া I জ্ঞজ্ঞা মা -া | মা -া -সা II
অ রুণ্ ০ আ লো য় ক র্ চে ০ রে ০ ০

অন্তরা ।

০ ১ ২´ ৩
II {মা মা -দা | ণা ণা -র্সা I র্সা -া র্সা | ণা র্সা -া |
ত প ন্ ফ লি ত স্ব প্ ন রা শি ০

০ ১ ২´ ৩
| ণা র্সর্সা । | র্মা র্মা র্মা I র্জ্ঞর্জ্ঞা র্মা -া | র্সা র্সা -া } |
কু লেয় ০ ম ত ই তু ল্ চে ০ হা সি ০

০ ১ ২´ ৩
| মা -া মা | মা জ্ঞজ্ঞা া I মা -া দা | ণা -দা র্সা |
সা ত্ র্ঙা ভা ফুল্ • ম ন্ দা রে • রি

০ ১ ২´ ৩
| র্সা ণা -া | দা মমা -া I জ্ঞা -া মা | মা -সা -া II
আ ন ন্ দে প্রাণ্ • ভ র্ চে রে • •

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II{সা -া সা | ণ্া -া দ্া I ণ্া সসা া | মা -া মা |
উ ৎ সা রি • ত র জত্ • বা • রি

০ ১ ২´ ৩
| মা -া মা | জ্ঞা -া জ্ঞা I মা -দা ণা | ণা -দা -মা } |
উ চ্ চে উ • ঠে চ ঞ্চ চ লি • •

০ ১ ২´ ৩
| মা মা মা | জ্ঞা -া জ্ঞা I মমা া দা | পদা র্সা -া |
ছ ডি য়ে দি • য়ে রান • ধ নু• র ঙ্

০ ১ ২´ ৩
| র্সর্সা া ণা | দা -া মা I জ্ঞা -া মা | মা -সা -া |
পড়্ • বে নী • চে ছ ল্ ছ লি • •

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
| {মা -া দা | ণা দদা া I র্সা -া র্সা | সা া র্সা |
যে থা সে নু ভন্ • ছ ন্ দ ধ • স্তি

০ ১ ২´ ৩
| ণা -া র্সা | র্মা -া র্মা I র্জ্ঞর্জ্ঞা র্মা -া | র্সা -া র্সা } |
পা ন্ না চু • নী ব স্ সে • মো • স্তি

০　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　　৩
| মা　মা　-া | মা　জ্ঞা　-া I মা　-া　দা | ণা　র্সা　-া |
ব　ন　•　দে　বী　র　ক　ন্　ঠ　মা　লা　য়্

০　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　　৩
| র্সা　-া　ণা | দা　মা　-া I জ্ঞা　-া　মা | মা　-সা　-া II II
পু　ষ্　প　ম　ণি　•　ঝ　ম্　চে　রে　•　•

আগমনী।

(১)

কার্ত্তিক মাস, বেশ শিশিরপাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; চাষাদের ক্ষেতে আলুর মধমলী পাতা ও কপির কচি কচি ডালগুলির উপর যেন বেশ এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায়; গ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সামনের কাঞ্চনেরা ছোট ছোট বাগানে সীম লতার বেগুনে বা সাদা রংএর ছোট ছোট ফুলে মাচা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!

গাঁয়ের জমিদার বাবুর প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন খুব সমারোহ,—উৎসব উপলক্ষে একদল যাত্রাও আসিয়াছে। ছোট একটা তাম্বুর ছাউনীর আশে পাশে রাতজাগা কালীমাড়া মুখ লইয়া, সস্তা দামের উৎকট-গন্ধ চুরুট টানিতে টানিতে যাত্রাদলের অকালপক্ক ছোকরাগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জমিদারের বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গণে একপাল লোক চেঁচামেচি জুড়িয়া প্রচুর কোলাহলের মাঝে সামিয়ানা টাঙাইতেছিল। উঠানে ঘাসের উপর খানকতক চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো তখনো গোছানো হয় নাই। গ্রামের ছোট স্কুলঘরখানিতে যে কয়খানি চেয়ার বেঞ্চ ছিল, তাও ক্রমশঃ আসিয়া পড়িতেছে।

এলোমেলো করিয়া ছড়ানো চেয়ার বেঞ্চগুলার উপর উঠিয়া কয়েকটী ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছে ও পরম উল্লাসে হাসিতেছে।

৫

একটী ছোট মেয়ে পা ঝুলাইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, তার চেয়ারের সামনে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া, একটী লোক মেয়েটির সঙ্গে মাথামুণ্ড গল্প করিতে করিতে হাসিতেছিল; মেয়েটিও খুব শিষ্টভাবে তার গল্প মন দিয়া শুনিতেছিল; উহাদের গল্প করা দেখিয়া বোঝা যায় যে, লোকটীর ছেলেভুলানোর ক্ষমতা আছে।

এই লোকটীও যাত্রাদলেরই একজন। তবে অকালপক্ক বালক নয়; বরং বলিষ্ঠগঠনের উন্নতকায় যুবক। এই লোকটীর অনেকখানি ঝাঁজ, অনেক আবদার সহ্য করিয়া, তবে অধিকারী মহাশয় ইহার অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। এই লোকটী সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষপাতিত্বের কোনো কথা কেউ বলিলে অধিকারী বলিতেন "আরে বাপু, গুণ থাকিলেই গুমোর বাড়ে"।

বাস্তবিক যাত্রাদলের উপযুক্ত যথেষ্ট গুণ তার ছিল। লোকটা অসাধারণ সুকণ্ঠ ও নিপুণ বাদ্যকর; তা ছাড়া মেজাজ ভাল থাকিলে সব কাজেই সমান ওস্তাদ। এই একটী লোকের দক্ষতাতেই অল্পদিনের মধ্যেই দলটার বেশ সুনাম রটিয়াছিল। ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তার সমান হৃদ্যতা, লেখাপড়ায় ডিক্রীর কোনো ছাপ গায়ে না থাকিলেও বুঝা যাইত সে অশিক্ষিত নয়, উপরন্তু বেশ ভদ্র।

লোকটীর নাম সতীনাথ। খুব লম্বা চওড়া,—"রজতগিরিনিভং—রজোকম্বোজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তি—গলায় খুব একগোছা শুভ্র পৈতা, প্রায়ই সেটা দুই পাট করিয়া মালার মত ঝুলিত।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর উৎরাইয়া গিয়াছে, শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি সপ্তমী; সোণার কাস্তের মত এতটুকু চাঁদের ফালি সমস্ত পশ্চিম দিকটা ম্লান আলোকে কান্নার উপর হাসির মত মধুরতায় ভরিয়া দিয়া তরঙ্গিত মেঘসাগরে ডুবিতেছিল।

সতীনাথ কলিকোপগ্রস্ত নল সাজিয়া আসরে দাঁড়াইয়াছিল। বুকভরা তার মেডেলের আধিক্য ছিল না, কারণ মহারাজা নল তখন নির্ব্বাসিত, বনবাসী। একজন দর্শক ভদ্র লোক নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"লোকটাকে থাসা মানিয়েছে,—নয় ?"

তাঁর পাশেই একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গোছের বুড়ো মানুষ বসিয়াছিলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বার্দ্ধক্যক্ষীণদৃষ্টি একটু তীক্ষ্ন করিয়া, দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"ও লোকটা যেন

আমার চেনা চেনা মনে হচ্চে,—ওর নাম বলতে পারেন আমায়? লোকটা আমাদের সতী নয় তো!"

"তা হবে,—ওর নামও ঐ রকমই, সতী কি সত্য,—এই হবে।"

পালা শেষ হইতে হইতে রাতটুকুও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শেষরাত্রে শীতার্দ্র বাতাসে সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। নক্ষত্রভূষিত আকাশের ঘন রং ফিকা হইয়া আসিতেছিল। সতীনাথ একখানা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া একটু নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিল। তন্দ্রায় দুচক্ষু জুড়িয়া আসিয়াছিল মাত্র,—এমন সময়ে ওই বুড়ো মানুষটী গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"সতীনাথ—অ সতীনাথ"

সতীনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল, সারারাত্রির পর একটু বিশ্রামের সময় তাকে অ যাতন করিতে আসিয়াছে, সে যদি যাত্রাদলের কোনো ছোকরা হইত, তাহা হইলে সে তখনি তার মাথাটা গুঁড়াইয়া দিতে বসিত, কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখিল পূর্ব্বদিক পরিষ্কার—ভোর হইয়া গিয়াছে; আর তার সামনে দাঁড়াইয়া তার নিজের গ্রামের সার্ব্বভৌম মশায়!

সতীনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁর পায়ের ধুলা লইল। মনে মনে ভাবিল "এ আপদ আবার কোথা থেকে জুটলো!"

সার্ব্বভৌম মশায় অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "তুমি আজকাল এই করছো বুঝি?" সতীনাথ মাথা নীচু করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল, কিছু বলিল না। সার্ব্বভৌম মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন—"তা ভালো। কিন্তু বাড়ীতে তোমার মা যে ভেবে চিন্তে মরতে বসেছেন, তাঁদের এক আধখানা চিঠি পত্র দিলেও তো পারো।"

সতীনাথ এ কথারও কোনো উত্তর দিল না। সে বরাবর এমনি করিয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই কাটাইয়াছে। বারো বৎসর বয়সে বছর ছয় সাতেকের মেয়ে জ্ঞানদার সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছিল, কারণ তার মায়ের অনেকগুলি সন্তান, জন্মিয়া মারা যাওয়ার পর সে জন্মিয়াছিল, তাই তার মা তাকে পরের কপালে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, যদি বাঁচে! তা সে জ্ঞানদার অদৃষ্টের জোরে বাঁচিয়াছিল, তবে বাড়ীতে টিঁকিতে পারিত না।

বাড়ীর ভাবনা ভাবিয়া নিজের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি মাটী করিবার পাত্র সে ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই সে আরাম পাইত !

বছরখানেক পূর্ব্বে সে বাড়ীতে গিয়া কয়েক মাস ছিল। জ্ঞানদা তখন বেশ ডাগর হইয়া তার মনের মত লোকই হইয়াছে, বাড়ী থাকিয়া স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে তার ভালও লাগিতেছিল, কিন্তু আহার ব্যাপারটা কিছুতেই নিশ্চিন্তভাবে চলে না, ঘরে নিত্য অভাব,— মায়ের তাগাদায় উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে আবার বাহির হইয়া পড়িতে হইয়াছিল তবে স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়।

তারপর এই এখানে খাইয়াদাইয়া যা কিছু সে পায়, দুহাতে উড়াইয়া সে পরম আনন্দে আছে. বেশ দুপয়সার প্রত্যাশা থাকিলে পাঁচ জনে খাতিরও করে; এখানে তার কোনো ভাবনা চিন্তা নাই। বাড়ীতে খবর দেওয়া সে দরকার মনে করে না, পাছে তারা খরচ দেওয়ার জন্য ত্যক্ত বিরক্ত করে। তার মা ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির,—গ্রামশুদ্ধ লোককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে,—যদি কেউ যে কোথাও সতীনাথকে দেখিতে পান, তো তাকে যেন বাড়ী ফিরিবার অনুরোধ করেন।

সেইজন্যই গ্রামে ফিরিবার জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয় তাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাকে বাড়ী যাইবার জন্য। অনেকক্ষণ বাদানুবাদ হইলেও সতীনাথ ফিরিতে রাজি হইল না। তখন সার্ব্বভৌম মশায় বলিলেন "তোর মেয়ে হয়েছে একবার দেখ্‌বিনে ?

এইবার সতীনাথ যেন দ্বিধায় পড়িল, নীরবে খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল "আচ্ছা যাবো একবার।"

সার্ব্বভৌম একটু হাসিয়া বলিলেন "পাগল কোথাকার !" সতীনাথও কি ভাবিয়া মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল !

(২)

ছোলা মটর, সরিষার ক্ষেতের মাঝখানকার সরু পথ দিয়া সতীনাথ হন্ হন্ করিয়া বাড়ী চলিয়াছে। অগ্রাণ মাস, সকল ক্ষেতের ধান কাটা তখনো শেষ হয় নাই. এক একটা ক্ষেতে পাকা ধান মা লক্ষ্মীর লুণ্ঠিত অঞ্চলের মত বাতাসের হিল্লোলে দুলিতেছিল।

সতীনাথ এক একবার তাই চাহিয়া দেখিতেছিল। একবার একবার আপন মনে দু এক ছত্র গানও গাহিতেছিল। তার হাতে ক্যাম্বিসের একটি ছোট ব্যাগ, বগলে মোড়ান ছাতি, চার দিককার রৌদ্র পড়িয়া গিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাই আর ছাতি মেলাইবার দরকার হয় নাই।

কাছাকাছি চাষা-পাড়ায় সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। ধূপের ধোঁয়া আর সাঁজালের ধোঁয়া একাকার হইয়া গোধূলি-ধূসর আকাশের রং ঘন করিয়া তুলিল। একটা নিবিড় বাঁশ ঝাড়ের কাছে দুইটা শৃগাল সম্ভবতঃ শাঁখের কীর্ত্তন গাহিতে বাহির হইয়াছিল, মানুষ দেখিয়া পলাইয়া গেল।

সে যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন শীতের সন্ধ্যা ঘন হইয়া গিয়াছে, সে তার বন্ধ দুয়ারে ঘা দিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "মা"।

একটি তরুণী অত্যন্ত মৃদুপদে আসিয়া দুয়ারটা খুলিয়া দিয়াই মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া দিয়া স্মিতমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। সদ্য মাতৃত্ব লাভের একটি বিশীর্ণ মাধুর্য্য-চিহ্ন তার যৌবনের উচ্ছল চাঞ্চল্যের উপর বিজয়পতাকা আঁকিয়া দিয়াছে। পলক মাত্র তার পানে চাহিয়া সতীনাথ বলিল "মা কোথায়? মা।"

তরুণী উত্তর দিল না, ঘরের ভিতর হইতে তার মা বাইরে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"সতু নাকি?

সতীনাথ মাকে প্রণাম করিয়া উৎসুক নেত্রে বাড়ীর চারদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল!

ইতিমধ্যে জ্ঞানদা তার পা ধুইবার জল, গামছা ইত্যাদি সব গুছাইয়া রাখিয়া গেল; কিন্তু কই, বাড়ীর কোনো নূতন জিনিষ তো এখনো চোখে পড়িল না! যেমন নির্জ্জন, নির্জ্জীব ছিল বাড়ীটা, এখনো সে তো ঠিক তেমনিই আছে!

রাত্রে যখন সে শুইতে গেল, তখন গরীবের ঘরের রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোয় বিছানার দিকে চাহিয়া সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না!

তাদের আগেকার ছোট বিছানাটি এখন আয়তনে আরো খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে,—সেই বেণীর ভাগের মাঝখানে ঘর আলোকরা, পদ্ম ফুলটির মতো একটি সুপুষ্ট সুন্দর ক্ষুদ্র শিশু ঘুমাইয়া আছে, ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি তখনো তার টুকটুকে ছোট মুখে পুরিয়া থাকিয়া থাকিয়া চুষিতেছে !

সতীনাথ পরম তৃপ্তিতে দেখিতে দেখিতে শিশুটির পাশে বসিয়া তার ঘুমন্ত মুখখানি পরম স্নেহে চুম্বন করিল,—মেয়ে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া প্রথমটা কাঁদিবার উদ্যোগই করিতেছিল, কিন্তু মাথার কাছে আলো দেখিয়া পা দাপাইয়া খেলা করিতে করিতে একবার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে সতীনাথের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সতীনাথের মনে হইল সে যেন পৃথিবী নূতন এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কাকে ডাকিয়া যে এমন জিনিষ দেখায় ভাবিয়া পাইতেছিল না !

জ্ঞানদা ঘরে ঢুকিয়া মাথার কাপড় কপাল অবধি তুলিয়া দিয়া বলিল "ওহরি ! মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেছে বুঝি !" সতীনাথ বলিল "আমিই জাগিয়ে দিলাম যে !"

জ্ঞানদা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "কেন, কেন তুমি আমার মেয়েকে জাগাতে গেলে ?"

সতীনাথ একটু হাসিয়া বলিল "আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমার ও মেয়ে—"

জ্ঞানদা তার সে কথার রহস্য বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া বলিল "ইস্ তোমার মেয়ে—এক ফোঁটা দুধ কোনো দিন কিনে দিলে না, আমি বুকের রক্ত খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি,—সর্ব্বনাশী হ'য়ে ত ম'রছিল, একটু ছেঁড়া জামাও ওর নেই,—ভারী ওঁর মেয়ে"—মুখে একটু হাসিয়া সতীনাথ সরিয়া বসিয়া বলিল "না, আমার মেয়ে কেন হ'তে যাবে, এই নাও তোমারই মেয়ে"—

কিন্তু জ্ঞানদার কথা ক'টা তীব্র কষাঘাতের মত তার বুকের মাঝে ঝাঁকিয়া দিল। মোহের ঘোর, স্ফূর্ত্তির নেশা, সকল যায়গাতেই একটা আঘাত লাগিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এর আগেও কতবার এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক ঝগড়া হইয়াছে, স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া ও উশৃঙ্খলতা লইয়া বকাবকির পর জ্ঞানদা কত উপবাসই

করিয়াছে, কিন্তু খেয়ালী সতীনাথকে সে অভিমান দিয়া বাঁধিতে পারে নাই, বিরক্ত করিয়াছে মাত্র !

কিন্তু সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের প্রভাব পিতা হইয়া সে এড়াইতে পারিল না ! সারাটা রাত্রি সে জাগিয়া জাগিয়া ভাবিল। তারপর কখন একটুখানি ঘুম আসিয়াছিল স্বপ্নে দেখিল ; যেন সে, সেই যাত্রার দলের তাঁবুর ছাউনীর মধ্যে বসিয়া নির্ব্বিবাদে তামাক টানিতেছে, আর চারিদিকে দুঃসহ শীতে কুয়াসায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

একটা লোক একটি শিশুকে বুকে করিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, সেও যেন হুঁকা নামাইয়া তাকে ধরিতে ছুটিল, কিন্তু স্বপ্নে পা বাধিয়া যায়, তাই সে পড়িয়া গেল, শিশুটিও ধপ্ করিয়া তার সামনে পড়িল, কিন্তু এ কি ! এ যে মৃতপ্রায়,—শীতে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট শক্ত কাঠ হইয়া গিয়াছে, যেন খোল —কি অসহ্য দৃশ্য,— তার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল—সে চোখ রগড়াইতেই দেখিল—উঃ এ যে তারই খুকীটি !

লেপের মাঝেও সতীনাথের দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। চমকিয়া চাহিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিল, তবু ভালো, স্বপ্ন ! লেপ তুলিয়া দেখিল, খুকী তার মায়ের বুকের কাছে বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে ! সতীনাথের বুকে যেন জোয়ারের উচ্ছ্বাসে স্নেহের প্লাবন বহিয়া আসিল।

(৩)

অধিকারী মশায় বারংবারের চিঠির জবাব না পাইয়া ভয়ানক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সতীনাথের গ্রামের নাম তাঁর জানাছিল, তিনি একটি ছেলেকে পাঠাইয়া দিলেন, সতীনাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, এই ছেলেটি অকৃতকার্য্য হইলে হয় তো বা তিনি নিজেই বাহির হইবেন, এতখানি গরজ তাঁর ছিল।

যেদিন দলের ছেলেটিকে দেখিয়াই তার সঙ্গে যাইবার জন্য সতীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—জ্ঞানদা সেই দিনই ভোর হইতে সন্ধ্যা অবধি মেয়ে কোলে করিয়া পরের বাড়ী গিয়া বসিয়া রহিল, শাশুড়ীও তাকে বাড়ী আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন না। কারণ ছেলের উপর বউএর চেয়ে বেশী প্রসন্ন তিনি কোনো দিনই ছিলেন না।

অন্যবার হইলে সতীনাথ ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই চলিয়া যাইত, এবার আর তা পারিল না। যে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাকেও একেবারে জবাব দিয়া বিদায় করিতে পারিল না, স্বাধীনতার নেশা ঘুচাইতেও মায়া হইতেছিল। পরের দিনে যাইবার আশ্বাসে নিজেও থাকিল লোকটাকেও রাখিল।

সন্ধ্যার পরও বাড়ীর কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া জ্ঞানদা আস্তে আস্তে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। কোলে মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাকে শোওয়াইতে হইবে।

বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল ভাঁড়ার ঘরের ছোট প্রদীপটি জ্বালিয়া শাশুড়ী সন্ধ্যা করিতেছেন, আর সব ঘর অন্ধকার, বাড়ী একেবারে নীরব নিস্তব্ধ!

স্বামী চলিয়াই গিয়াছেন, না হোক্ তার মিথ্যা অভিমান এই, মনে করিয়া ম্লান মুখে সে রান্না ঘরের প্রদীপটা আনিয়া জলন্ত প্রদীপের আগুণে ধরাইয়া শুইবার ঘরে ঢুকিল।

আনমনে মেয়েকে বিছানায় শোয়াইতে গিয়া হঠাৎ একটা প্রবল নিঃশ্বাসের শব্দে সে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল বিছানার আর এক কোণে দেয়ালের গায়ে হেলিয়া সতীনাথ, প করিয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া তার ম্লান মুখে যেন আনন্দের আলোর দীপ্তি দেখা গেল, নিজেরও অজানায় তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও হয়তো আসিয়াছিল কিন্তু সে তা চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল

"কৈ গো, গেলে না যে বড়, কি হল?"

সতীনাথ নিজেও একটু হাসিল, কিছু বলিল না। জ্ঞানদা বলিল 'শরীর ভালো আছে তো! অন্ধকারে একা বসেছিলে কেন?"

"এমনিই, শরীর ভালোই আছে, আমার শরীর কখনো মন্দ হতে দেখেছো তুমি!"

জ্ঞানদা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল 'আহা, কি যে বল, তার ঠিক নেই

"কোন কথারই বা আমার ঠিক আছে,—কিন্তু বুঝেও তোমরা বোঝ না, এই তো আমার দুঃখ"

"কিসের দুঃখ, যাওয়া হল না তাই বুঝি? তা গেলেই তো পারতে এবার তো আমি তোমাকে আটকাতে যাই নি, কেন গেলে না?"

জ্ঞানদার রুদ্ধ-কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল সে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, পাষাণের কাছে সেও পাষাণ হইয়াই থাকিবে, কাদা হইয়া হারিবেনা।

সত্যই এবার জ্ঞানদা যাওয়া সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই তবু সেই তাকে আটকাইয়াছে, কেন অন্য বারের সে তোষামোদ খোসামোদ কম করিয়াছে বলিয়াই কি না সে এবার বাঁধিবার উপকরণ পাইয়াছে বলিয়া এই কথাটি তখন তারা দুইজনেই ভাবিতেছিল।

একটু পরে জ্ঞানদার তরকারী সাঁতলাইবার শব্দে সতীনাথ বাহির হইয়া বলিল "মা, আমি বাইরে যাচ্ছি, খুকীকে দেখো তোমরা।"

জ্ঞানদা অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে বলিল "খুকীকে যেন উনিই চব্বিশ ঘণ্টা দেখে থাকেন!"

সতীনাথের খড়মের শব্দ বাড়ীর বাইরে গিয়া থামিল,—সেখানে তার সেই অধিকারীর দুতটি আরো একটি বন্ধু জুটাইয়া গল্প করিতেছিল,—সতীনাথকে আসিতে দেখিয়া সে গল্পের স্রোত থামাইয়া বলিল "দলে থাকতে কার সাধ্যি বোঝে সতুদা, যে তুমি এমন ভয়ানক কুণো মানুষ,—সারাদিনই ঘরের কোণে ব'সে আছ" সতীনাথ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলিল "হুঁ,— অন্যায় হ'য়ে গেছে!" লোকটি হাসিয়া বলিল "তোমার বাড়ী এলাম সতুদা, তা তুমি কিছু খাওয়ালে না! দাও না কিছু মিষ্টি খাইয়ে আজ, চল।" সতীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিল, মিষ্টি খাওয়াইতে গেলে, কিছু খাইতেও হইবে—সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"না ভাই, হাতে পয়সা নেই।"

"ও সব তোমার চালাকী রাখ,—তুমি না তিন মাসের বাকী মাইনে হাতে ক'রে এসেচো, তা বুঝি আমি জানিনে, চল খাওয়াবে।"

সতীনাথ মাথা নীচু করিল, মেয়েকে সে এক ফোঁটা দুধ কিনিয়া দেয় নাই পরকে খুসী করার সাধ কি আর তার মানায়?

"কি হ'ল সতুদা,—আবার মত বদ্‌লাচ্ছো নাকি? ভাব'চো কি?"

"না, মত টত আর বদ্‌লাবো কি? কাল যাওয়াই ঠিক করেছি"

"তাই বল, দাদা।"

সতীনাথ হাসিয়া বলিল "তোমরা আমাকে কি মনে ক'রছো সব? "কিছু না" বলিয়া লোকটি পাশের নূতন বন্ধুটির সঙ্গে আবার গল্পে মন দিতে বসিল, সতীনাথও আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিতে লাগিল।

ছুটিয়া যাওয়া নিশ্চিন্ততা, তাই যেন সে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়! নিষ্পরোয়া সুখ শান্তিটা চোখের সামনে চলিয়া যাইবে, এইটাই যেন তার ভয়! তারপর সে কি করিবে,—সংসারটা যে তার অচেনা! অজানা!

(৪)

বেশ করিয়া গুছাইয়া তার ক্যাম্বিসের ব্যাগটি বোঝাই করিয়া সতীনাথ যাবার যোগাড় করিয়া রাখিতেছিল! তার মা অপ্রসন্নমুখে তাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিছুতে না পারিয়া তিনি রাগে চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমি ভিক্ষে ক'রে কাশী চ'লে যাবো, তা'পর তোর মেয়ে বৌয়ের কপালে যা থাকে তাই হবে!"

সতীনাথ তাতেও টলিল না বরং একটু একটু হাসিতে লাগিল! কেন না সে জানিত মা তা কখনোই পারিবেন না, তিনিও জ্ঞানদাকে ছ'বছরের মেয়ে আনিয়া বড় করিয়াছেন! মা বকিয়া ঝকিয়া স্নান করিতে ঘাটে চলিয়া গেলেন!

সতীনাথ ঘরে ঢুকিয়া জ্ঞানদাকে বলিল "কি রকম! ঘরে ব'সে আছ যে! মেয়ে নিয়ে পরের বাড়ী গিয়ে ব'স্‌লে না আজ!"

জ্ঞানদা বলিল "আমার খুকীটার আজ গা টা গরম লাগ্‌চে, খেলাও ক'রছে না",—

"গরম লাগ্‌চে? কই দেখি" সতীনাথের মুখ উৎকণ্ঠাকুল!

"একটু খানির জন্যে আর কি তুমি দেখ্‌বে! ঘুমুচ্চে, ঘুমুক।

জ্ঞানদার কথায় কান না দিয়া সতীনাথ মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া চমকাইল, খুকীর কচি গা বেশ তাতিয়া উঠিয়াছে সে অসাড়ে ঘুমাইতেছে,—জ্বর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সতীনাথ বলিল। "এই দ্যাখ, ঠাণ্ডায় জল সকে অবধি বাইরে রেখে এই ক'রলে তুমি কি হবে এখন!"

জ্ঞানদা স্বামীর উদ্বেগ দেখিয়া খুসী হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। নতমুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর বলিল "থাক এখানে একটু, আমি রান্না চড়িয়ে আসি, নইলে তোমায় ভাত দিতে পারবো না যে!"

বিরক্ত হইয়া সতীনাথ বলিল "চাইনে আমি তোমার ভাত খেতে, আমার ওপর রাগ তুল্‌লে তুমি মেয়েটার ওপর দিয়ে!"

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই খুকীর জ্বর আরো বাড়িয়া চলিল। সে নেতাইয়া পড়িল! এখন চিকিৎসক চাই! গ্রামান্তরে ডাক্তার আছেন তাঁকে আনিবার জন্য জ্ঞানদা ব্যস্ত হইল...বলিল "ওগো মেয়ে যে চোখ খোলে না, তুমি যাও ডাক্তারের কাছে, আমি টাকা দিচ্চি, না হয়।"

বন্ধকরা ব্যাগটি খুলিয়া ট্রেন ভাড়ার টাকা বাহির করিয়া লইয়া সতীনাথ উর্দ্ধশ্বাসে যখন ভিন্ন গ্রামের রাস্তায় ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছিল তখন অধিকারীর ছেলেটি বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বলিল "কি দাদা এদিকে কোথায় চল্‌লে,—এর পর ট্রেণ পাবে না, তা ব'লে দিচ্চি!

সতীনাথ তখন রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হইয়াছে, তার তখন ডাক্তার পাওয়ারই দরকার!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

অর্ঘ্য।

—:*:—

তুমি যে আমার সাধনার ধন
জীবনের ধ্রুবতারা,—
নিখিল জগতে পেয়েছি তোমায়
প্রেম-অমৃত ধারা।

তুমি যে আমার হৃদয়কুঞ্জে
সুরভি কুসুমরাশি,—
যা' কিছু ধরায় সব চেয়ে শুধু
তোমারেই ভালবাসি।
তুমি যে আমার দুখের মাঝারে
সুখের উজল আলো
আপনা হইতে দু'হাতে তোমারি
করুণা—আশীষ ঢালো।
তুমি যে আমার তৃষিত বক্ষে
সুশীতল বারি সম,
সংসার-মরু মাঝারে সতত
গাঢ় ছায়া মনোরম।
তুমি যে আমার চিরসাথী সম
নিভৃত কুটীর মাঝে,
তোমারি বিমল জ্যোতিটী সদাই
হৃদয়-মুকুরে রাজে।
বিশ্বে যে আমি নিঃস্ব বড়ই
কি দিব তোমারে আজ্।
অঁরপিতে পদে এ দীন অর্ঘ্য
এনেছি হৃদয়-রাজ।

শ্রীগোপিকাকান্ত দে

অর্চ্চনা।

—:*:—

(কবি কথায়)

আনন্দ যাঁর সন্ধ্যা প্রভাত এঁকে যায় কত বর্ণে,
নিবিড় নীরব অন্ধ-তিমিরে রৌদ্রোজ্জ্বল স্বর্ণে,
যুগে যুগে যিনি জয়-ঝঙ্কৃত মহা ওঙ্কার মন্ত্রে,
নিখিল-ভুবন-হৃদয় মাঝারে ভক্ত প্রাণের তন্ত্রে,
উপমারহিত বিশ্বের শিব, চিরসুন্দর শান্ত,
চিরমঙ্গল, সত্যস্বরূপ, ভক্তহৃদয়কান্ত,

পূজা তাঁহার আজ,—আনন্দময়ীর অর্চ্চনা ! এই নিরানন্দ দেশে,—হাহাকারের মাঝখানে ? মহাচাঞ্চল্যে চিরসুন্দর শান্তের প্রতিষ্ঠা ? পূজা ? মানুষ যেখানে হইয়াছে মৃত্যু আলিঙ্গনে বাধ্য, আতঙ্কিত, মনপ্রাণদেহ যেখানে অপ্রকৃতিস্থ, বিকৃত, বিক্ষিপ্ত, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য, সেখানে আবার আনন্দ ! মহাশ্মশান,—শত সহস্র সন্তান ভস্মে পরিণত, মাতৃহৃদয়ের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে যে মৃত্যু-মন্দির অবিরত মুখরিত, তাহাতে জগদম্বা অম্বিকার আনন্দ-উৎসব ! একি রাক্ষসী-লীলা ! দেবী-যুদ্ধ কি যুগে যুগে ! আদিতে ও অন্তে ? ইহার কি শেষ নাই ? সেই কোন কবে, বিশ্বভুবনের ঘোর দুর্দ্দিনে, অজ্ঞানমোহের অন্ধকারে জগজ্জ্যোতিঃ যখন নির্ব্বাপিত প্রায়, দৈত্যের দম্ভ, অসুরের অসুরত্ব শুম্ভ নিশুম্ভের জয়জয়াকার —দেবতা ও মানব প্রতিপদে দলিত নির্জ্জিত হইয়া যখন সন্তানের একমাত্র স্মরেণ্য তোর স্নেহময় ক্রোড় আকুল হইয়া তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল,—সন্তান তখন তোর স্নেহ লাভ করে নাই একবিন্দুও অন্ততঃ মা, তোর বাহ্যিক ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই একটুকুও—যখন তাহারা আতঙ্কে অস্থির,—তুই কি না তখন বিলাস বিভ্রমে মাতোয়ারা ! সাজসজ্জার চরম করিয়া ভুবনমোহিনী,—অসুরের মনপ্রাণ হরণে ব্যস্ত ! সন্তান মাতার সে বেশ হেরিয়া অধোবদনে মিশিতে চাহিয়াছিল ধরিত্রীর বক্ষে ! হতাশে বলিয়াছিল 'হায় মা মমতাহীনা পাষাণি ! তখনও

ভ্রুক্ষেপ করিস নাই মৃতকল্প সন্তানের ভাবের দিকে,—কি কঠোর নির্ম্মম মূর্ত্তিতে তখন মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলি,—জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কোমল বৃত্তি মাতৃশক্তিকে! ঘোর নারকীয় দৃশ্যের অন্তরে অন্তরে অন্তরের অমৃত বহাইয়াছিলি কিনা জানি না। মাতৃশক্তির অবমাননাভয়ে সন্তান যখন ব্রীড়ানত, তখন কি না কি গভীর মন্ত্রে, সন্তান হইয়াছিল আহূত, যেন বা আহুতি দিতে—যোগ দিতে অসুরের যুদ্ধে,—সন্তানের শক্তিহীন বাহু সহজে কি উত্থিত হইতে চায়! গত্যন্তরই বা ছিল কি; মাতৃ আদেশ—জীবনদাতৃর আদেশ অনুজ্ঞা, সে কে অগ্রাহ্য করিতে পারে, প্রকৃত সন্তান যে তাহাকে ত বুঝিতেই হইবে মাতাই জগতের সার,—শান্তিলাভ করিবার একমাত্র ঠাঁই,—তিনি যে অবস্থায় যে ভাবে যাহাই আদেশ করেন তাঁহা মঙ্গলের, আপাতঃ সুখের না হক আনন্দের,—হউক তাহা শোণিত তর্পণ তাণ্ডবনৃত্য তবুও—হক খেলা সে খেলায় যোগ দিতে হবে। সত্যই তখন তোর আদেশে আহ্বানে মনে হইয়াছিল—

শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।

অলস অসার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীকে তখন আর জীবন-প্রবাহ বলিয়া মনে হয় নাই, অন্তর যদিও তোর আহ্বানের ঠিক অর্থ ধরিতে পারে নাই, বুঝে নাই তবুও অনুভব করিয়াছিল—

অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উড়ে পড়ে তার শাসনে।
ঐ কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর আসনে

কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর। তাহা অনুভব করিয়াছিল সন্তান মাতৃ-আহ্বানে। বিপুল গম্ভীর মধুর মন্ত্রে বাজিয়া উঠিয়াছিল সে রণ বাজনা, চিত্ত তখন বিস্মৃত হইয়া আপনা, সকল বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নব সঙ্গীত নূতন ছন্দে জীবন শক্তি উদ্ভূত করিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল কর্ম্ম প্রাঙ্গণে—রণক্ষেত্রে!

কেবল অসুর যাহারা,—অসুয়াকে যাহারা শক্তিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া বিশ্বশক্তির অবমাননা করিয়া সুখী হইতে চাহিয়াছিল, তাহারাই অমন তেজিয়ান দেবতানরেরত্রাস হইলেও পরিণামে লাভ করিয়াছিল পরাজয়! পরাজয়? না, তাহা নহে অশান্ত অজ্ঞানাচ্ছায় তাহারা লভিয়াছিল চিরসুন্দর শান্ত, রামায়ণের রাক্ষসদের মত রামের হস্তে মরিয়াও বৈকুণ্ঠ লাভ! মৃত মুণ্ড অসুর অসুয়া বজ্জিত হইয়া মাল্যাকারে সন্তানের চিরআকাঙ্ক্ষিত মাতৃবক্ষে স্থান পাইয়াছিল, অমৃতস্পর্শে হইয়াছিল অমর; মাতৃশক্তিকে লজ্জা দিতে যাহারা প্রাণপণ করিয়াছিল প্রাণান্তে তাহাদেরই করপল্লব হইয়াছিল মাতার লজ্জা নিবারণ আচবরণ!

কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার! বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার আত্মার এই ঐকান্তিক প্রয়াস—মহা দ্বন্দ্বযুদ্ধ—মাতৃইচ্ছায়—আহ্বানে! শিব ও রুদ্রের এই অপূর্ব্ব সম্মেলন! মৃত্যু-প্রান্তরে পূজা, আনন্দময়ীর অর্চ্চনা এই দ্বন্দ্বে! অঙ্কুরেই ইহার প্রকাশ—ক্রমে পরিণতি!

"অঙ্কুর ত এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়্তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না, এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম।" এ অবস্থাটা আপাতঃ-সুখের নহে আদবেই,—আরাম নাই উহাতে একটুকুও;—কেবল তাঁর আহ্বান, মান্য করিয়া চলা, মার কার্য্য—যোগ দিতে হইবে, সকলকেই সকলটিতেই এই কর্ত্তব্য পালনের আত্মপ্রসাদ মাত্র আদিতে; নতুবা কে চায় বল, সংসারের এমন নিরানন্দ দিনে আনন্দে মাতিতে—বলিতে কি ইচ্ছা হয় না?—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরী,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস্ হরে
আমার যামিনী?

জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ
কেন আসে মর্ম্মছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান !

এ আহ্বান—মাতৃ-আদেশ—দেবীর বাণী। যামিনীর প্রাণী আমরা—ইচ্ছা হয় কি চির-আলস্য অবসাদসুখ বিসর্জ্জন দিতে! শক্তিহীন এ দেশ এ শক্তির আহ্বানে কি সহজে সাড়া দিতে পারে! এ ডাক যে কর্ম্মক্ষেত্রের রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সুখের নয়—কর্ত্তব্যের।

নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ শেষ, এবারে বিশ্ব-মানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্ম-পর্ব্ব। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা—তাঁহার পূজা অর্চ্চনা! সুখ কোথা ইহার আদিতে, আনন্দের পূজায় সুখের বরং বলি,—আনন্দ ইহার লক্ষ্য! 'সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত! সুখ, শরীরে কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এই জন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এই জন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য; আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ, বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষয়কে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই

সমান !' আনন্দময়ীর অর্চ্চনায় তবে আর বাধা কোথায় ? সুখদুঃখ যাঁর সমান, শ্মশান ও মন্দির যাঁর এক, যিনি অমৃতা,—

মৃত্যুরে করেছ শুভ অয়ি শুচিস্মিতা,
অশুভ করেছ দূর জ্বালাইয়া চিতা,
ভাঙ্গিয়াছ মৃত্যুভয়, জীবনের সীমা ;
মৃত্যুরে করেছ পূত, কল্যাণীপ্রতিমা।

কল্যাণ যাঁর সর্ব্বত্র, সর্ব্ব বিষয়ে—

রূপ যেখানে অরূপ হ'ল,
মিলিয়ে গেছে সকল আলো,
মন যেখানে মন হারাল,
অকারণেই লাগ্‌ল ভাল
রিক্ত এ জীবন—

বন্ধনের মধ্যেও যাঁহার প্রসাদে মুক্তির প্রকাশ, রুদ্রের বিষাণ, শক্তির শাণিত কৃপাণ, প্রেমিকের বাঁশরী যাঁহার হস্তে একাকার—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান !
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণ মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সেই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্ ॥

শরৎ-প্রকৃতির সঙ্গে ওইখানেই সত্যকার আনন্দের যোগ। মৃতসঞ্জীবনী সুধায় মঙ্গলময়ীর অর্চ্চনা। সুখের ত্যাগে দুঃখের অনুরাগে মার পূজা। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েচে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের শোধ সে করচে। এই নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই ত তার শ্রী, এই ত তার উৎসব, এতেই ত সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেচে, আনন্দময় করেচে। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করেছে, তাতে পদে পদে বাধা, কিন্তু তাকে যদি বাধাই ব'ল তবে শেষ কথা বলা হয় না। সেই বাধাতেই সৌন্দর্য্য—তাতেই আনন্দ! আনন্দে মৃত্যু ও জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ, বিপরীতের বিরোধ এবং সকলের সমাধান—সে যে—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই ত তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত তোমার স্নেহ
সব ফুরালে বাকী রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যে প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

তুমি সবার মাঝে অবিভৎ। তোমাতে সর্ব্ব দ্বন্দ্বের শেষ। সত্য অমৃত, আনন্দের প্রকাশ। সে আনন্দের অধিকার সব অবস্থায়—সর্ব্ব স্থানে—আনন্দময়ীর পূজা সর্ব্বত্র—স্বর্গে মর্ত্তো নরকে। সিদ্ধ সে সাবিত্রীর মত যমের হাত হ'তে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেচে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্য-লোকে ভূমিষ্ঠ হয়েচে, তাই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেচে। তার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা ও অসীম এক হয়ে গেছে,—অভয় বাণী তার প্রাণে-মনে, আর কি আছে ভয়?—

আজকে হ'তে জগৎ মাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

অভয়ার বরে, সুখতুঃখের সাম্যক্ষেত্রে মা মঙ্গলময়ীর পূজায় আর বাধা কি? আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে যে—

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান!
দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করবোরে পার দুঃখের তরী
ঢেউয়ের পরে ধরব পাড়ি যায় যদি যাক্ প্রাণ।
আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।

এ পুলক-মগন আনন্দ-প্রবাহে আতঙ্কের কথা—নিরুৎসাহের বাণী শুনিয়া জীবন-তরী বাঁধিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারো নাই,—এখনও ত্রাস!

কে ডাকে রে পিছন হতে কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।

ভয়ে আর আজ ভয় নাই,—

পালের রসি ধর্‌ব কসি চল্‌ব গেয়ে গান।
আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান॥
জগতে আনন্দ যজ্ঞে আজকে নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানব-জীবন।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে
জানি নে কোন বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে,
শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয় আনন্দ গান গা রে।

নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে,
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে হবে গো এই বার
আমার এই মলিন অহঙ্কার।

মার পূজার জন্য প্রস্তুত হ'।—

স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার
ওরে আয় সময় নেই যে আর।

এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ
এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান
নয়নে এসেছে হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে—

আজ সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ বিস্মৃত হইয়া একাগ্র মনে আনন্দময়ীর অর্চনা করিয়া বল—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী জাগ্রত জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—

বিশ্বভুবনে তাঁহার আজ প্রতিষ্ঠা, তিনি যে সর্ব্বত্র, তিনি যে সকলের, প্রাণের প্রতি বাক্যই তাঁহার পূজার মন্ত্র,—সংস্কারে, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে, নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে তিনি যে আজ বদ্ধ নন—এ মহা-আনন্দের দিনে মাতৃ-অর্চ্চনায় ছুটে আয় সকলে—

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন থাকিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,

নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে !
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করচে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটতে যেথায় পথ
খাটচে বারো মাস
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাহার লেগেচে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়
আয় রে ধূলার পরে !
রাখোরে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক্ ধূলাবালি
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক্ ঝরে ॥

শরীরের রক্ত জল করিয়া মাতার কর্ম্মযজ্ঞে প্রাণের মন্দিরে মন্দিরে মাতার প্রতি সন্তানের যে অসীম অনুরাগ তাহাতে মাতা আজ অর্চ্চিত হউন—শারদীয় উৎসব সার্থক হউক আনন্দময়ী মার আশীর্ব্বাদে !

একটি নমস্কারে মাতা, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।
ঘনের ভারে নম্র নত একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবন-দ্বারে
একটি নমস্কারে।

আজ,— তোমার জয়ে জয়ী আমি তোমার মানে মান,
তোমার পূজায় বিশ্বপূজ্য ধন্য দেহপ্রাণ।

বৃদ্ধ।

বিজয়া।*

আবো[১] এই বছর মাইয়াটা[২] মোর মরিয়া
বড় দুস্কু[৩] হইছে আবো
বাচ্চা[৪] ছাওয়াটাক[৫] ধরিয়া[৬]।

আবো উত্তর ঘরত[৭] সোন্দেয়া[৮]
মুঁই কান্দিছোঁও[৯] বসিয়া—
লাল ফোতার[১০] পাইৎটা দেখিয়া।

আবো মোর মাইয়া ভাল মানুস[১১]
ডোগাত[১২] থুইছে[১৩] আমের আমসি
খ্যাতাত বরি বাঁধি থুইছে চাওমারা বড়সী।

আবো মুঁই গাঁও হাল-বাড়ী[১৪] †
ছাওয়া কান্দে টারী-টারী[১৫],
হায় রে বাব্বা বাব্বা করিয়া।
বড় দুস্কু হইছে আবো বাচ্চ ছাওয়াটাক ধরিয়া ॥
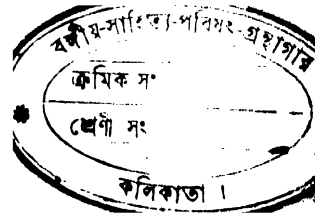
---

* কোচবিহারের ভাষায় দেশীয় চটকা সুরে দোতারার সহিত গীত; সুরটি অতিকরুণ।
১ ঠানদি, ২ স্ত্রী, ৩ দুঃখ, ৪ শিশু, ৫ ছেলে, ৬ লইয়া, ৭ ঘরে, ৮ ঢুকিয়া, ৯ কাঁদিয়াছি, ১০ পরিধেয় বস্ত্র, ১১ মানুষ, ১২ হাঁড়ি, ১৩ রাখিত, ১৪ কৃষিক্ষেত্র, ১৫ পাড়ায় পাড়ায়।

† পাঠান্তর— আবো, মুঁই গেছু হাল ববার, ছাওয়া কেঁড়ায় কান্দিয়া।

প্রিয়তমা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি বেশী হইয়াছে। হর্পমার্শেলের ঘর নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যারণ বলিলেন, লিয়েন, আমার ঘরে চল।"

"কেন? না,—তোমার কিছু বলিবার আছে কি?"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "নিষ্ঠুর!—হঁ, কথাও আছে, কিন্তু তুমি—আমায় সব কথা বলিবে কি না তাও বুঝিতে পারিতেছি না।—"

"তোমায় বলিব না, এমন কথা আমার কি থাকিতে পারে রাওয়েল?"

মৃদু হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তবে তোমার ঘরেই চল।"

"সেই ভাল।" বলিয়া লিয়েন অগ্রসর হইতেই ব্যারণ তাহার পার্শ্বে আসিয়া হাত টানিয়া লইলেন। লজ্জিত হাস্যে জুলিয়েন বলিল, "ব্যারণ মাইনো!"—

"আমার নাম ধরিয়া ডাক প্রিয়তমে!"

"তোমার নাম ধরিয়াই ত ডাকি, কিন্তু তুমি—একটু ধৈর্য্যের সহিত—"

"ধৈর্য্য ভাল তাহাই হইবে।" বলিতে বলিতে ব্যারণ তাহাকে আবার নিকটে টানিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "আজকার রাত্রিটা তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছে, না লিয়েন? কিন্তু এ—ঝড়ের রাত্রি আমার পক্ষে—"

"গ্রাম কথা বলিতে তুমি একটি ওস্তাদ। আমার ঘরে যাইবে বলিলে না?"

"হাঁ চল।" লিয়েন স্বামীর বাহু ছাড়াইবার প্রয়াস করিলেও পারিল না, তখন পরস্পরে বাহুবদ্ধ ভাবেই শয়ন গৃহের দিকে চলিল।—

লিয়েনের বক্ষে মৃদু আলোক জ্বলিতেছে, সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত দুই চারিটি ফুলের গন্ধে ঘরখানিতে একটি স্নিগ্ধতার ভাব আসিয়াছে। সেখানে আসিয়াই ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!"

লিয়েন বলিল "কি ?"

"কিছু না, তোমার এই ঘরখানি আমার বড় ভাল লাগে লিয়েন।—এই মিষ্ট গন্ধ এই সুন্দর আলো,—মনে হয় এমন বুঝি কখনও দেখি নাই।"

"তাই বটে! বস, আমি গায়ের এগুলা রাখিয়া আসি।" লিয়েন পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেলে ব্যারণ আপনার নিজের কথাই ভাবিতেছিল, সারা জীবনের সমস্ত ছুটাছুটির পর প্রাণটি যে আজ এই স্নিগ্ধ সুন্দর মধুগন্ধী গৃহ-কোণটিতে আশ্রয় পাইল,—ভাবিতে সেই পথভ্রষ্ট ব্যথিতের আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরে লিয়েন আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "মাইনো, তুমি আজ কাল বড় বেশ বেশি গম্ভীর হইয়াছ, নয় ?"

"সম্ভব, কিন্তু কেন বল দেখি ?"

"তাহা আমি কি জানি! তবে মনে হয় বরফের পাহাড়ের কাছে আসিলে—"

"পাষাণও গলিবার চেষ্টা করে, কেমন এই ত ?"

হাসিয়া লিয়েন বলিল,—"দূর, তা কেন ? উঁচু হিম পাহাড়ের কোলে দাঁড়াইলে বড় আলো ও কালো দেখায়, আমি তাই বলিতেছিলাম।—"

"তুমি ভুল বলিতেছিলে লিয়েন, একটা খুব বেশি উঁচু-বড়-বিস্তৃত, এমনি কিছুর সামনে না দাঁড়াইলে, মানুষ নিজের মধ্যের বৃহৎ জিনিষটাকেও চিনিতে পারে না।—আমি চিরদিন ধরিয়া।"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "যাও যাও—তুমি আজ বড় বেশি বকিতেছ রাওয়েল, আমি কি বলিলাম তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই ই—শুধু বাজে কথা!"

হাসিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "তবে কি বলিতে চাও তাই বল।"

"না বলিব না, তুমি যখন বুঝিলেই না—"

প্রিয়তমার ওষ্ঠ-প্রান্তে মধুর অভিমানরেখার আনন্দচিহ্নে রাওয়েলের স্থির হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, স্বভাবমধুর প্রচুর হাস্যে মুখখানি রঞ্জিত করিয়া তিনি বলিলেন, "একটু বুঝাইয়া দিলেই বা, জান ত আমি এমনি—"

লিয়েনের অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য যেন সবখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে চপলহাস্যে বলিল, "আর বুঝাইতে হইবে না, আমার কাজ শেষ হইয়াছে; তুমি হাসিয়াছ।"

"তাই নাকি? আমার হাসির ত তবে মূল্য আছে দেখিতেছি, যাও আর হাসিব না।"

"কতক্ষণ যতক্ষণ এই বরফের কাছে আছ ততটুকু সময়ই ত?—

ব্যারণ মুখ তুলিয়া এক দৃষ্টিতে স্ত্রীর সেই অনুরাগপ্রফুল্ল হাস্যময় মুখের প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "যা বলিয়াছ লিয়েন, আমার অতীতজীবনে এমনি লঘু হাসি, অন্তঃসারশূন্য প্রাণহীন—হাসিতে হাসিয়াছি! কিন্তু জান কি তুমি, এই হাসি এক এক সময় আমার মর্ম্মের কোন স্থান ছিন্নভিন্ন করিয়া বাহির হইত?"

মুখ হেঁট করিয়া লিয়েন বলিল, "সে জন্য আমি কি করিতে পারি বল?"

"কিছু না, শুধু মনে রাখিও আমি সুখেই জীবন কাটাই নাই ও ক্ষণিক সুখের লোভে তোমার নিকটে আসি নাই; তোমার স্থির বলিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল অন্তরের নিকট আমি আশ্রয়প্রার্থী,—শান্তি, একটু স্বস্তি লিয়েন্, দিতে পারিবে ত?"

"রাওয়েল্!"

"বল, আমি যে ধারণাও করিতে পারিতেছি না যে তুমি আমার ও তোমার গত কথা হতে, সব ভুলিয়া আমায় ক্ষমার আশ্বাস কি করিয়া দিবে, একি সম্ভব লিয়েন?—"

লিয়েনের গণ্ডদ্বয়ে রক্তবর্ণ ফুটিয়া পড়িতেছিল, চক্ষুর দৃষ্টি ভূলগ্ন। একটু থামিয়া অতি মৃদুস্বরে সে বলিল, "তুমি যে আমার স্বামী রাওয়েল্।"

"স্বামী? স্বামীর সকল অপরাধই কি ক্ষমা করা যায়?"

"যায় যায়, আমার কথা বিশ্বাস কর,—যায়!"

"স্বামীর আবার অপরাধ,—তাহাকে আবার কি ক্ষমা, কিসের জন্য?"

"অকারণে? শুধু স্বামী বলিয়া?"

কাতর কণ্ঠে লিয়েন বলিল "হাঁ গো হাঁ! —সে তোমায় আমি কি করিয়া বুঝাইব? আমি নিজেই বুঝিতে পারি না যে!"

"কি বুঝিতে পার না?"

"কেমন করিয়া এমন হইল,—কোন অপরাধ খুঁজিয়া পাই না, সব দোষ সব ত্রুটী যেন মায়ার মত মিলাইয়া যায়— যদি জানিতে না চাও তবে, বলিতে পারিব না; আমায় ক্ষমা কর।"

ব্যারণ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে লিয়েনের প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবও অবাক্‌। কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "ক্ষমা কে করিবে—আমি? লিয়েন, এত নম্র—শুধু যদি তোমার ক্ষমা পাইবার যোগ্যতাও থাকিত—"

"আর না, তোমার পায়ে পড়ি—এ সব কথা ছাড়িয়া দাও এবার।—অতীতকে আমি ভুলিয়াছি তুমিও আর সে কথা তুলিও না।"

এবার হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "ভাল, তাহাতে আমারই সুবিধা।—কিন্তু একটি কথা, তাহার পর আর কোন দিন"—

"বল না কি কথা—তাহার জন্য সঙ্কোচ করিতেছ কেন?"

ইতস্তত ভাবে মৃদু হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন "এই আজিকার কথাই বলিতেছি। তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে তোমার উপর তখন যে দোষগুলা দেওয়া হয়, আমি তাহার একবর্ণও বিশ্বাস করি নাই, শুধু সেই অল্প আলোর মধ্যে তোমায় তেমন স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল।—কি হইয়াছিল লিয়েন? আমায় বলিতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"না সে সব কথা তোমার জানা উচিত, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসে যতদূর সম্ভব বলে, আমি সমস্তই তোমায় জানাইব।" পরে সে ধীরে ধীরে সকল ঘটনা আমূল বলিয়া চলিল।— ফ্রেলিনের নিকট যাহা শুনিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই উইলের ক্রোড়পত্রের প্রতি সন্দেহ, পরে খোলা আলমারির মধ্যে তাহা পাইয়া পরীক্ষা ও তাহার ফল, সকল কথাই বলিল;—অবশেষে কাগজ রাখিতে যাইবার সময় পাদরীর আক্রমণের কথা বলিতে তাহার

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, ভয়ে ও ঘৃণায় তাহার স্বর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।—নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যারণ বলিলেন,—"তোমায় এই সব পিশাচের নিকট রাখিয়া আমি সেই মায়াবিনীর মন রাখিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলাম লিয়েন!—তারপর?"

চোখের জল মুছিয়া লিয়েন শেষ কথাগুলিও বলিল। পাদরি যেভাবে ডচেস্ ও ব্যারণ সংক্রান্ত গল্প করে, তাহার র জানিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে সে কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করে ও কেমন অবস্থায় পড়িয়া তাহা আগুনে ফেলিয়া পোড়ায়, পরে হপমান আসিলে যাহা যাহা হয় সমস্তই জানাইল।

ব্যারণ এতক্ষণ জড়-পুত্তলীর ন্যায় স্তব্ধ ভাবে তাহার কথা শুনিতে ছিলেন, লিয়েনের বাক্যাবসানে তিনি আসন ছাড়িয়া দ্বারাভিমুখে চলিলেন। লিয়েনও তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া হাত চাপিয়া বলিল, "কোথায় চলিলে?"

'ছাড়'—, সে পাপিষ্ঠ এখনও আমার বাড়ীতে—আমার টেবিলে বসিয়া আমারই অন্নে—হাত ছাড় লিয়েন!"

'না এখনি নয়; একটু ধৈর্য্য প্রিয়তম, তুমি অবোধ নও"

"না না তা হয় না জুলিয়েন, মাইনোরা অত সহিষ্ণু নয়,—আমার পিস্তল—"

তোমার পায়ে ধরি আমার কথা রাখ, এই একটি কথা রাখ' আমার! মাইনোদের জানি আমি, কিন্তু ধৈর্য্য মানুষের উচ্চতা ভিন্ন দৈন্য নয় তা জান ত? তুমি যদি একটু ভাব,' খানিকক্ষণ সময় লও, দেখিবে তাহার ফল ভাল হইবে।"

"ও: লিয়েন, তুমি কি সেই নষ্টবুদ্ধি দুর্ম্মতি ভণ্ড পাদরীকে ক্ষমা করিতে পার?"

"না তা পারিব না কিন্তু শাস্তি বা প্রতিশোধ দিবার পূর্ব্বও একবার চিন্তা করিতে চাই, মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে চাই এবং কোন অবস্থাতেই ধৈর্য্য হারাইতে চাই না।" বলিতে বলিতে লিয়েন দক্ষিণ বাহু তুলিয়া স্বামীর কণ্ঠ দেশ বেষ্টন করিল।

রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের ন্যায় ক্রুদ্ধরোষে শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ব্যারণ স্ত্রীর প্রতিই দৃষ্টি স্থির রাখিলেন, জুলিয়েনের সুন্দর মুখখানিতে যেন স্বর্গের ছায়া ভাসিতেছিল; ক্ষমা ও করুণতার অপরাজেয় শান্তি তাহার ললাটে মহিমার রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ওষ্ঠপ্রান্তে

বেদনার স্নিগ্ধতা, নয়নে সকরুণ বিনয়। দেখিতে দেখিতে ব্যারণের মুখভাব কোমল হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার জীবনের পৃষ্ঠায় নারীচিত্রে এমন ক্ষমাময় ত্যাগশীল মূর্ত্তি তিনি কখনও কল্পনা করেন নাই, সে প্রবাপ্ত সৌন্দর্য্য মধুর বিশাল হৃদয়ের নৈকট্যে ও স্পর্শে ক্রুদ্ধ ব্যারণের উষ্ণতা শীতল স্থির হইতেছিল। অনেকক্ষণ একইভাবে থাকার পর অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে জানিতাম না জুলিয়েন, মানুষ যে এত ঘটনার মধ্যে এমন অটল সহিষ্ণুতায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারে, ইহা আমার ধারণাতেও আসিত না। তুমি স্থির হও, আমি এখনই কোন অর্থান ঘটাইব না; তোমার আদর্শ আমাকে অনেক সত্যই বিচলিত করিয়াছে।"

সাদরে স্বামীর করস্পর্শ করিয়া জিয়েন বলিল, "ধৈর্য্যের পূর্ণতা তোমার নিজের মধ্যেই প্রচুর আছে, তুমি হয় ত তাহা জান না রাওয়েল্‌ "

"এবং তুমিই তাহা আবিষ্কার করিলে, আমার যাহা কিছু ভাল—তা তোমার সম্মুখে প্রকাশে দেখা দিয়াছে, নতুবা ব্যারন মাইলোর সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের যা ধারণা, তা শোন নাই কি ?"

রাওয়েল্‌ তখন জিয়েনকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সে উত্তর দিল, "শুনিয়াছি—শুনিয়াছি; তোমায় যে কেহ ভাল না বাসে—তাহাই আমার জানা নাই, যদি—"

"যদি কি জিয়েন তুমি কি ভাব সে সব ভালবাসার মূল্য আমি জানি না? রূপ যৌবন—সুখ সম্ভোগই যে সকল প্রেমের প্রাণ, সেখানে মানুষের হৃদয় অনেক নীচে পড়িয়া যায়, জান না ?"

"কি জানি, যাও—আমার আর কিছু ভাল লাগে না, শুধু"

"শুধু—কি শুধু বল ?"

"শুধু—তুমি, কেবল তুমি—রাওয়েল্‌ ?"

"আর তুমি ? সেখানে তুমিও—সর্ব্বস্ব আমার ?"

দুইটী মুক্তবেগ ধারা যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল, পৃথিবীর কোন বাধা আর তাহাদের পৃথক করিতে পারিবে না। তাহাদের দিহ একেবারে চিহ্ন মুছিয়া এক হইয়া গিয়াছে

বাহিরে ঝড় থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না।

বারেন বলিলেন, "কেন নিরেন, এখনও তুমি এ ভাবে থাকিতে চাও কেন ?"

নিরেন বলিল—"আর দিন কয়,—বেশী দিন না—তবু দুদিন এইভাবেই থাক্, আজিকার সন্ধ্যার ঘটনার পর—কি হইতেছে দেখি, তার পর—"

"হইবে আবার কি ? তবে তুমি যখন বলিতেছ, তাহাই করিব।"

"ধন্যবাদ বন্ধু !"

"আবার ঐ কথা,—নিরেন ?"

চপল হাসির সহিত নিরেন বলিল, "কেন বন্ধু বলিলে দোষ কি ? তুমি কি আমার সকলের চেয়ে ভাল—সব চেয়ে বড় বন্ধু নও ?"

"সে যাই হোক্ তুমি আমায় বন্ধু বলিয়া ডাকিতে পাইবে না ?"

"ইস্ তাই বৈকি, খুব ডাকিব, যখন খুসি তখনি ডাকিব।"

"তাহা হইলে ঝগড়া হইবে দেখিও"

"তখন আমি রাগ করিয়া রুডস্‌ড়র্ক চলিয়া যাইব !"

"সেটি তোমার বিদ্যা, কিন্তু তার পরই যে আমারও বিদ্যা প্রকাশ হইবে,—তোমার পিছনে ছুটিয়া আমিও আমেরিকের দরবারে হাজির হইব ?"

হাসির প্লাবনে তাহার বারেণের শেষ কথাটী স্খলিত হইয়া মিলাইয়া গেল। এই আনন্দের মুকুরটীতে নিরেনের মধুর হাসির ধারা মিলাইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর, বারেন গম্ভীর পদবিক্ষেপে সম্মুখের দীর্ঘ বারান্দা দিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। পরিচারকগণ আজিকার কোন ঘটনাই জানিত না, তবে এতক্ষণ ধরিয়া বারেণের গৃহে তিনি উপস্থিত আছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিল ; কিন্তু

এখন প্রভুর মুখভাব গতিভঙ্গি দেখিয়া তাহারা অনুমান করিল, যে কারণেই তিনি সেখানে থাকুন না কেন, সেজন্য প্রভুপত্নীর কোন সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে না।

ব্যারণ চলিয়া গেলেন, তিনি দেখেন নাই কিন্তু হলঘরের পার্শ্বের ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষটির অর্দ্ধমুক্ত বাতায়ন-পথে আর একটা আঁধার মুখ দেখা যাইতেছিল। তাহার দুই চক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় জ্বলন্ত দৃষ্টি, সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে যেন নিশাচর ভীষণ প্রেতের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে পাদরী হিউগো।

ব্যারণের ভাব দেখিয়া পাদরীর ধারণা হইল যে জুলিয়েন স্বামীকে তাহার কথা কিছু বলে নাই, নতুবা পত্নীর অপমানের পর এমন প্রশান্ত ভাব এত নিশ্চিন্ত, স্থিরতা, রাভেন্‌মাইণ্ডের স্বধর্ম্ম নয়। তাঁহার সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া ভণ্ড পাদরী অতি দ্রুতপদে লিয়েনের জানালার নিকট আসিয়া দেখিল, সে তখন একমনে কি লিখিতেছে। তাহার মুখেও সেই অবিচলিত প্রশান্তি, আকস্মিক বেদনা বা বিরক্তির চিহ্নমাত্রও নাই। হিউগো সহজে ভাবিল, এতটা যে ঘটিল, তাহার জন্য কি ইহারা সামান্য বচসা করার প্রয়োজনও বোধ করে নাই? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এত ব্যবধান?" আর সে ব্যবধান যে পূর্ব্ববৎ অচল—সুদৃঢ়ই আছে, তাহা ভাবিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে হপ্‌ল্যাশেলের নিকট ফিরিয়া গেল।

লিয়েন তখন আল্‌বিককে আপনার এই সুখের সংবাদ জানাইতেছিল। তাহার পর উঠিয়া বাক্স আলমারী খুলিয়া যত যা যাত্রার আয়োজন করিয়াছিল সমস্তই চিহ্নশূন্যভাবে নষ্ট করিয়া দিল, পরদিন যেন কেহ এ ব্যাপার বুঝিতে না পারে। সব শেষে একবার সমস্ত দিনের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিতে করিতে শয্যা গ্রহণ করিল। রাত্রিতে তাহার সে নিশ্চিন্ত বিশ্রান্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মিঠে বঁধু।

মধুময় বঁধু তব মিঠাই বেবাক,
পেটে পেটে ঢাকা তব জিলিপির পাক।
চোখদুটো রাগে ভরা
যেন মিশ্রী ছান বড়া
গোল্লায় পাঠাইতে জান কত তাক।
মিছরীর ছুরী যেন
কথাগুলি মিঠে হেন
ফোঁপরা হৃদয় খানি যেন মৌচাক,
মগজের খোলে খোলে
রসের ভিয়েন চলে
তাত রসি বাসে ঘুরে বোল্‌তার ঝাঁক

বেতালভট্ট।

শেষবোঝা।

—:*:—

দেনার দায়ে ব্যতিব্যস্ত গঙ্গারাম বসু এইবার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

গঙ্গারাম বাবু এক শত টাকা বেতনের ঢাকা ট্রেজারীতে ট্রেজারার। ইহা ছাড়া দেশে তাঁহার আরও ৫০৲ ৬০৲ টাকা আয়ের একখানি জীর্ণ ভদ্রাসন, তাহাও মহাজনের কবলে আবদ্ধ।

সংসারে গঙ্গারাম নিজে ও তাঁহার স্ত্রী ভবতারিণী ও মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে চারিটী বংশধর ও পাঁচটী কন্যা।

দশ টাকা মণের চাউলের দিনে এক শত টাকা উপার্জ্জনে ৮।১০টী লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগান যে কি ব্যাপার তাহা কি বুঝাইবার; তাহার উপর কুটুম্ব-কুটুম্বিতার দাবী। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আজকাল যে অবস্থা। বৈবাহিকরা "উপযুক্ত" বৈবাহিকের নিকট রীতিমত তত্ত্বতলাস না পাইয়া মেয়েদের উপর খড়্গহস্ত। ছেলেদের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অর্থচিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, ছেলেদের দেখিবার সময় ও ইচ্ছা কম— তাহারা গুণ্ডামী করিয়া চুরুট ফুঁকিয়া আড্ডা দিয়া ফেরে। গৃহিণী ভবতারিণী প্রতিদিন তাঁহার স্বভাবগত কণ্ঠে কাংশপাত্রের ঝঙ্কারবৎ অভাব ও দৈন্য স্বামীকে ভাল করিয়া বুঝাইতে ত্রুটী করেন না। আর বৃদ্ধ গঙ্গারাম হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অভাব অভিযোগ পাওনাদারের তাগাদা, মহাজনের চোখ রাঙানী নীরবে সহ্য করিয়া মরণের প্রতীক্ষা করিয়া দিন কাটান।

নীরবে থাকিতে চাহিলেও সমাজ তাহা দেয় কৈ? তাঁহার যে আয়! একটি কন্যা তখনও কুমারী এত অভাব-অনাটনের মধ্যেও মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে। তাই গঙ্গারামও তাঁহার 'শেষ বোঝা' মৃণালকে পাত্রস্থ করিতে ব্যস্ত। বিবাহ—সাত পাক—সে না হইলে সমাজে যে তিষ্ঠান দায়!

(২)

সত্যই 'মৃণালের' বিবাহ। হাজার টাকা নগদ দক্ষিণা স্বীকার করিয়া গঙ্গারাম কন্যাদায় মুক্ত হইতে চলিয়াছেন;—সমাজের দায় একেই বলে! বিবাহ-সভা-সৌষ্ঠব করিয়া বরপক্ষ সমাসীন। কন্যাকর্ত্তা কন্যা পাত্রস্থ করিতে অগ্রসর হইতেই, বরকর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, এ বিবাহ হইবে না,—কিছুতেই না।"

সভা স্তব্ধ।

পুনরায় বজ্র পতনের মত বিকট শব্দ করিয়া বরের পিতা বলিলেন, "উঠিয়া আর অমূল্য উঠিয়া আয়!"

পাত্রের নাম অমূল্য।

'কি হইল' 'কি হইল' বলিয়া সভার সমস্ত লোক অমূল্যের পিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "দেখুন গঙ্গারামবাবুর এ মেয়ের সম্বন্ধে এখন অনেকটা কথা শুনিতেছি আমরা তার বিন্দুমাত্রও জানতে পারি নাই; এখন জানিয়া শুনিয়া নিজে দেখিয়া আমি শিবরাম রায়ের পৌত্র নীলকণ্ঠ রায়ের পুত্র হরলাল, আমি উপস্থিত থাকিতে—এমন অধর্ম্মের কাজ করিতে পারিব না। না কখনও না! উঠে আইস সব।" বলিয়াই তিনি দাঁড়াইলেন! অন্দরে কাঁদাকাটি আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ গঙ্গারাম তাহার উপবাসক্লিষ্ট দেহভার লইয়া আর মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সভাস্থলে মূর্চ্ছিত হইলেন।

যাহা হৌক ঘটকের বুদ্ধিতে হরলাল বসুর এ বুদ্ধি নিন্দা করিবার নহে; ব্যর্থও হয় নাই, মধ্যস্থ ভদ্রলোকদের সুবন্দোবস্তে আর এক হাজার টাকা নগদ বেশী পাইয়া কুলীন পুত্র অমূল্যচরণ মৃণালকে বিবাহ করিয়া তাহার নারী জন্ম সার্থক করিল।

চাপা-কান্না ও বুকভরা ব্যথার মাঝখানে একটা শোকের মতো মৃণালের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল, বর ক'নে বাসর ঘরে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর খাওয়া দাওয়া কোন মতে শেষ করিয়া অনাহারে চোরের মত গঙ্গারাম বহির্ব্বাটীর একখানি নির্জ্জন ছোট্ট ঘরে মাথা গুঁজিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন, তপ্ত অশ্রু শ্রাবণের ধারার মত তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অভিশপ্ত হিন্দুসমাজকে পবিত্র করিতে লাগিল। আবেগ ভরা কান্নার মাঝে কেবলই তাহার মনে উঠিতেছি—'হায়, ভগবান কি পাপে আমার দণ্ড!'

(৩)

'শুভ' বিবাহের পর মাত্র তিনটি দিন—৭২ ঘণ্টা অতীত না হইতেই একি হইল! গঙ্গারাম হাজতে,—অত ব্যয় বাহুল্য করিয়া যিনি কন্যাদানের মহাপুণ্য অর্জ্জন করিলেন তাঁহাকে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না,—বরং ডুবাইল তাঁহাকে দুরপনেয় কলঙ্কে,—সমাজের নরক পার হইতে তাঁহাকে যে নারকীয় অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল—তাহার ফলে তাঁহার এই হাজত। তিনি ট্রেজারী হইতে ২০০৲ টাকা না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—চৌর্য্য অপরাধ—গঙ্গারাম সে অপরাধ অস্বীকার করেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খুব ভাল লোক ছিলেন, তিনি এতদিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গঙ্গারামের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন—"আজই যদি তুমি টাকাগুলি পূরণ করিয়া দাও, তা হইলে তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।"

আজীবন পূত নৈষ্ঠিক ধর্ম্মভীরু গঙ্গারাম বড় দুঃখেই ট্রেজারীর টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, মেয়ের বিবাহের সমাজের পাওনা কড়ায়গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে জীবনের উপার্জ্জিত মান সম্ভ্রম সুনাম বিসর্জ্জন দিয়া নীরবে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে—আর উদার হিন্দু সমাজ একবার তাঁর পানে চাহিয়া দেখাও শ্রেয় মনে করিলেন না। বৃদ্ধের আজ দশটাকারও সংস্থান নাই,—সে কোথা হইতে টাকা ফিরাইয়া দিবে! সুতরাং সাহেব নিরুপায় হইয়া তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিলেন।

গঙ্গারামের বিচার আরম্ভ হইল। হাকিমের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার ছয় মাসের সপরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম হইল। তাহা শুনিয়া কেহ বলিল—

"আহা লোকটা বড় ঠেকে এমন কাণ্ড করেছে।"

অপর একজন বলিল—"হ্যাঁ, বটেই ত! হাজার হোক কন্যাদায়।" কেহ বলিল—"না, মশাই, ওসব ভণ্ডামী। একটু ধার্ম্মিকের ভেক্ না ধরলে কি চুরি বিদ্যা চলে?"

"তাইত! সাহস দেখ—ট্রেজারীতে চুরি—ওটা কি এক দিনের অভ্যাসে হয় হে। চোর চোর—নিশ্চয় পাকা চোর।"

আট দশ দিন কারাভোগের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে গঙ্গারামকে রোগশয্যার আশ্রয় লইতে হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এমন করিয়া কন্যাদায়ের শেষ বোঝা নামাইতে গিয়া আরো কি কেহ তাহার মত অশ্রু সিক্ত শয্যায় শুইয়া—মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে?"

পর দিন গঙ্গারামের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে গঙ্গারামের কথা বলিবার শক্তি লোপ পাইল। শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। এমন সময় বৃদ্ধ প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পার করেছি! পার করেছি। কন্যাদায় হতে মুক্ত হ'য়েছি।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ চোখ দুটীকে খুব বড় বড় করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাহার স্ত্রী ভবতারিণী, পুত্র হরেরাম ও শেষ বোঝা মৃণাল দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ একটু ভাল করিয়া ক্ষীণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, 'মৃণাল বিধবা।'

এক বার শিহরিয়া উঠিলেন—অন্তরফাটা শব্দ হইল।

হায় হায়, গেল বুঝি ;—মূর্চ্ছা—চোখেমুখে জল দে—জল দে—আর কাহাকে জল দিবে! বৃদ্ধ তখন তার শেষ বোঝার সহিত জীবনের বোঝা চিরতরে নামাইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

বিদায়।

—:*:—

ওই যে দূরে সরযূ নদী তীরে
সন্ধ্যা নেমে আসিছে ধীরে ধীরে,
পল্লী দূরে যায় না দেখা আর
তিমির মোহে বিশ্ব যেন তন্দ্রালস-ভার।
বিজন পথে মোর
আঁধার শুধু জাগিয়া রবে ঘোর।

ঘাটের পথে পল্লীবধূ সবে
কলস ল'য়ে ফিরিছে কলরবে,
ভাসায়ে দীপ সরযূ-নদী জলে
কেহ বা শুভ মাগিয়া আসে আঁচল দিয়া গলে।

সরম মাখি পায়
সিক্তবাসে কেহ বা গৃহে যায়।

করুণ স্বরে কি জানি কারে ডাকি'
বকুল শাখে ফিরিয়া গেছে পাখী,
চক্রবালে এখনো দেখা যায়
দূরের পাখী মিলায়ে আসে ধূসর রেখা প্রায়।
ফিরিছে সবে ঘরে ;—
ত্যজিয়া গৃহ চলেছি চিরতরে।

জানি না আমি কোন সে দূরদেশে
যাত্রা মোর ফুরাবে অবশেষে ;—
হয়তো ঘন আঁধার পথ মাঝে
থামিয়া যাবে ব্যকুল ব্যথা বক্ষে যাহা বাজে।
ঘুমায়ে চিরতরে
মিলিবে তা'রে—পাইনি যারে ঘরে।

কভু কি দীন পথিকটীর লাগি'
বক্ষে তব বেদনা রবে জাগি'?
শুনিয়া মম নীরব অবসান
নয়ন তব করিবে নাকি অশ্রুধারা দান?
তোমারি আঁখি জলে
ধন্য হবে মরণ পলে পলে!

বিদায় কালে মিনতি শুধু আজ—
চরণে দলি' সরম ক্রুটী লাজ
নীরব সাঁঝে নিরালা কভু থাকি'
অধমে স্মরি' আঁচল কোণে মুছিয়ো দুটী আঁখি।
তা' হলে পরপরে
শান্তি পাবে আত্মা বারে বারে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

স্বাস্থ্যের-কথা।

শরৎকাল। ঘরে ঘরে আজ আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দস্রোত প্রবহিত হইবার কথা; কিন্তু কার্য্যতঃ আজ বাঙ্গালা হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই সুখের দিনে আমাদিগের প্রাণ প্রার্থনা করে সুখ,—প্রিয় পরিজন আত্মীয়স্বজন সকলকে সাজাইয়া, সকলকে নীরোগ স্বাস্থ্যসুখে সুখী দেখিয়া নিজে সুখী হইতে। কিন্তু বাঙ্গলার এমন দুরদৃষ্ট যে অসনবসনের সংস্থান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্দ্ধ অনশন ক্লিষ্ট প্রায়-পরিচ্ছদহীন বঙ্গের অধিবাসীর দেহপ্রাণ রক্ষা এ দুর্দ্দিনে যে দুষ্কর। একে নাই অর্থ তাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি না জানায় আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি। মৃত্যু কি ভীষণভাবে বাঙ্গলাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহা শিশুর মৃত্যুহারে, যুবতীর যক্ষায় ও সুতিকায় যুবকের অম্লপিত্তে নানা প্রকার আধিব্যাধিতে নিত্য প্রকাশ। শরৎকাল সময়টা আনন্দের হইলেও এ ঋতু পরিবর্ত্তন সময়ে অতি সাবধানতা অবলম্বন না করিলে ইহা নিরানন্দে পরিণত হইবার সম্ভাবনা পদে পদে। শীতের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে বাঙ্গলার

মৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কথায় আছে কাহারও পৌষ মাস কাহারও সর্ব্বনাশ। পৌষ মাস প্রায়ই পুরাতন রোগীকে প্রাণ হারাইতে হয়। কার্ত্তিকে বঙ্গের এই মহামারীর সূচনা। বর্ষা হইয়া গিয়াছে, গ্রামের খাল ডোবায় জল সঞ্চয় হইয়াছে। কার্ত্তিকে তাহাতে ডালপালা আবর্জ্জনা পড়িয়া বিশেষতঃ ডোবায় পাট জাগ দেওয়ায় ম্যালেরিয়া-বহনকারী মশার উৎপত্তির কারণ হইবে। গ্রামে গ্রামে এই সময় ম্যালেরিয়ার কি ভীষণ প্রাদুর্ভাব! সময় থাকিতে ম্যালেরিয়া বহনকারী মশার বিনাশসাধনে তৎপর না হইলে বাঙ্গলার মৃত্যুহার কিছুতেই কমিবার নহে। ঔষধ নহে পূর্ব্বে সাবধান না হইলে শেষের চেষ্টার কোন ফল নাই। এখন হইতে গ্রামবাসী (১) যাহাতে শরীরে কার্ত্তিকের হিম না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হন। (২) যতদূর যাহার বাড়ীর নিকট খাল ডোবায় জল জমিয়াছে তাহা পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টিত হউন। মশা যেন তাহাতে বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে। কেরোসিন তেল জলে ঢালিয়া দিলে মশার বিনাশ হয়। অবস্থায় না কুলায় গ্রামে চাঁদা করিয়া কেরোসিন কিনিয়া যাহাতে ইহা সুসম্পন্ন হয় তাহা করা উচিত। সকলে মিলিয়া এইটুকু ব্যয় করিলে উগ্র চিকিৎসার ব্যয় হইতে কমে হইবে। (৩) যেমন করিয়াই হউক মশার দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেই হইবে। তা পুরাতন কাপড় দিয়া মশারী তৈয়ার করিয়াই হোক বা যেমনেই হোক। (৪) এই সময়ে তিক্তসার দ্রব্য সময়ে সময়ে ভক্ষণ করিবেন। (৫) জ্বরের ভাব বোধ হইলে বা গ্রামে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে কুইনিন্ নিয়মিত ব্যবহার করিবেন; সর্দ্দি সামান্য ভাবে লাগিলে উপেক্ষা করিবে না; ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হইতে পারিলে ভাল নতুবা কর্পূরসহ সরিষার তৈল গরম গরম বক্ষে ও কণ্ঠে মালিশ করিতে ভুলিবেন না। (৬) পুরাতন গব্যঘৃত ব্যবহৃত হইতে পারে। (৭) তুলসীর পাতার রস একতোলা আদার রস ও মধুর সহিত পান করিলে সর্দ্দিরভাব অনেক কাটিয়া যাইবে। (৮) জ্বর হইলে বেলের পাতার রস ইহার সহিত সেব্য। (৯) পেট যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। (১০) শিশুর সর্দ্দি হইলে ছোট পেঁয়াজের রস মধু ও দণ্ডকলসের ফুলের মধু সেবন করাইবেন। (১১) জ্বরের সহিত যদি গায়ের ব্যথা থাকে সর্দ্দিপ্রবল হয় রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে, গা ঘামে তাহা হইলে হোমিও প্যাথিক ব্রাইয়োনিয়া ৩০ শক্তির এক ফোঁটাকে দুই

দাগ করিয়া দিনে ২।৩ বার সেবন করিবে। গায়ের ব্যথা যদি নড়িলে চড়িলে ভাল বোধ হয় তবে রাস্টক্স ৩০ সি দিনে ২।৩ বার সেব্য। বমি বমি ভাব থাকিলে ইপিকাক ৩০। (১২) ম্যালেরিয়া প্রকাশ পাইলে কুইনিনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উহা ব্যবহার করিতে কথনই দ্বিধা করিবেন না। কুইনিনের সহিত নিম্নলিখিত পাচনটী ব্যবহার করিলে ফল হইবে—

শুলফ;—ক্ষেৎপাপড়া, ধনিয়া, নতি, মুথা প্রত্যেক পর ৵০ তোলা হিসাবে লইয়া / থাকিতে নামাইয়া তাহাতে বিট লবণ প্রক্ষেপ দিয়া সেব্য। বৈকালে উহার সঠি ৵০ পোয়া সেব্য। পেটের অসুখ থাকিলে ইহা ব্যবহার করিবেন না। সর্দ্দি প্রবল থাকিলেও নহে।

অনেক সময় আমরা সামান্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বিপদগ্রস্ত হই; বিপদ একবার কাঁধের উপর চাপিয়া না পড়িলে সজাগ হইতে চাই না। আমাদের এই—স্বভাব দোষে বাঙ্গালা সর্ব্ববিষয়ে ডুবিতেছে। সময় থাকিতে যাহা প্রতীকার অতি সহজেই হইতে পারে, অসময়ে তাহাই সাংঘাতিকে পরিণত হয়। এই ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গলাকে উৎসন্ন করিল অথচ আমরা ইহার প্রতিকার কল্পে কিছুই করি না। তাই শরতের প্রারম্ভে সাবধান হইলে এই রাক্ষসের হস্ত হইতে আমরা অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইব। স্বাস্থ্যের নিয়ম জানিয়া চলাই রোগের হস্তে নিস্তার পাইবার উপায়। অসুস্থ হইবামাত্র সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু বাঙ্গলার এমনই দুরদৃষ্ট যে এমন শতশত গ্রাম রহিয়াছে যাহাতে হাতুড়ে চিকিৎসকেরও অস্তিত্ব নাই। বাঙ্গলার ডাক্তারী বিদ্যালয়ে যে অবস্থা তাহাতে যে সত্বর বাঙ্গলার চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহার আশাও কম। অতএব আমাদের উচিত সকলেরই স্বাস্থ্যের মোটামুটি নিয়মগুলির সহিত পরিচিত হওয়া। অজ্ঞ নরনারীর সংখ্যা ত এদেশে কম নহে—প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রধান ব্রতই হওয়া উচিত যে তাঁহারা দেশে শিক্ষা বিস্তারের সহিত দেশবাসীকে স্বাস্থ্যের নিয়ম পরিজ্ঞাত করান। তাহা হইলেই না মা আনন্দময়ীর আগমন যথার্থই আনন্দের কারণ হইবে নতুবা এই শরতে ও শীতে বাঙ্গলার যে হাহাকার সেই হাহাকারই।

বৃদ্ধ।

বিসর্জ্জন।

—:#:—

ছোট তরফের পূজায় এবার ভারি ধুম। যে মোকর্দ্দমাটার জের টানিতে জমীদারবাবু সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিলেন, জেদ বজায় রাখিতে, পরিশোধ করিবার ক্ষমতার অধিক ঋণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, মানসম্ভ্রম যাহার হারজিতের উপর নির্ভর করিতেছিল, সেই মোকর্দ্দমার বিলাত আপীলের চূড়ান্ত বিচারে ছোট তরফেরই জয় হইয়াছে,—মায় খরচা ডিক্রি! ষোল আনার উপর আরও দুই আনা! ইহা হইতেও আরও একটা আনন্দ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, জমীদার-গৃহিনী এতকাল পর পর কেবলি সাত সাতটী কন্যা রত্নই স্বামীকে উপহার দিয়া মোকর্দ্দমাটার মতই রত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইবার ব্যবস্থাই করিয়া আসিয়াছেন, এতকাল পরে এবারে অষ্টম গর্ভে নন্দদুলালের আবির্ভাব, কি সুন্দর খোকাটি তাঁর, বংশধরের মত বংশধর;—আনন্দের কি আর সীমা আছে! ইহার উপর আরও একটা আনন্দের কাউ ছিল। তোমরা সেটা শুনিয়া নাক সিটকাইয়া বলিবে ছি! ছিই বল আর যাই বল, সেইটাই হইতেছে এ সংসারের আনন্দের মূল; হ'ক ঈর্ষা,—সেই ঈর্ষার পরিতৃপ্তিতেই এ দেশে অট্টহাস্য, সংসারের প্রার্থিতই তাই! আনন্দবাবু, বড় তরফের জমীদার,—বাবুর খুড়তুতো ভাই, ছোট তরফের দুর্দ্ধর্ষ শত্রু নিপাতে গিয়াছে, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মারা গিয়াছে প্রায় দশ মাস পূর্ব্বে;—বিলাত আপীলের ফলটা শুনিবার পর পরই,—শক্তিশেল আর কাহাকে বলে! এ হেন ত্রয়স্পর্শে মনের মত ফল লাভ করিয়াও যদি আনন্দময়ীর অর্চ্চনায় মহাসমারোহ না করা হয় তবে আর হইবে কবে! এবারে সব বরাদ্দই বেশী বেশী। অন্য বারে পূজায় হইত ছয়টা ঢাক, এবারে ষোলটা; পাঁঠা পঞ্চাশ,' মহাঅষ্টমীর বলি দুটা মহিষ—রক্তের তুফান, কি আনন্দ!

লোকজনের সোরগোল, আমোদপ্রমোদের চূড়ান্ত, ভোজ্যভোজনের বিপুল আয়োজন, সে এক বিরাট কাণ্ড!

এমন আনন্দ-তাণ্ডব, রাজাপ্রজা উৎসবে মাতোয়ারা! তবু জমীদারী কাছারীর বিশেষত্বটির ব্যাঘাত ঘটিবার নহে। শাসন সংরক্ষণ,—জমীদারের বিপক্ষে যে, অবাধ্য,

তাহার বিন্-দাঁত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা এ বংশে সনাতন, তাহাও চলিয়াছে সমভাবে। কিন্নু সর্দ্দার, বড় তরফের প্রজা, এখন ছোট তরফের, তবু টানটা তার সম্পূর্ণ বড় তরফের দিকে! বেটা বড় তরফের গোলামের অধিক গোলাম, মুচীমুদ্দফরাসের কাজ করিতেছে সেখানে। আর কিনা ছোট তরফে একগাছা খড় ভাঙ্গিতেও মানীর মান যায়; দশ জন প্রজার মত পূজায় বেগারটা দিতেও অপমান! পাজিটা স্পষ্ট বলে কিনা,—"একি আমার আমোদ কর্‌বার সময়! বড় তরফের খোকার অসুখ,—আমি না হ'লে কে তার ঔষধ পত্র আনে! এদের আর দেখ্‌বার আছে কে! হায়, আল্লা, যে বাড়ীতে লোক জনের লেখাজোখা ছিল না,—তাঁদের আজ এই অবস্থা! আমি যাব আমোদ করতে;—নুন খেয়ে নিমকহারামী কর্‌তে কিন্নু কখনো পারবে না!"

'পারবে না;—এ নিমকের যে বড় জোর দেখ্‌ছি! দেখা যাবে কার নিমকটারই ধার বেশী! কি আস্পর্দ্ধা বেটার! জমীদারের হুকুম অমান্য,—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা,—এর প্রতিকার চাই এই দণ্ডেই!'

জমীদারবাবু আগুন! কিন্নুকে পদদলিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বিধিমতে! পাইকের পর পাইক পাঠাইয়া তাহাকে কাছারীতে ধরিয়া আনা হইয়াছে। পাইকগুলোর অন্ধ বিশ্বাস,—হস্তী মুর্খগুলো কিন্নুকে ভাবে মহাগুরু ওস্তাদ! সামান্য লেঠেল তার উপর আবার ভক্তি! বেটা আবার করেন ঝাড়-ফেঁাক,—ওঝা! কত বুজরুকি!

পাইকদের কেহই কিন্নুর গাত্রস্পর্শ করে নাই,—বুড়ো কাছারীতে উপস্থিত হইয়াছে আপনিই! জমীদারবাবু স্বয়ং তাহার বিচারক! কথায় কথায় অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিয়াও তাঁহার রাগ মিটে নাই,—হুকুম দিয়াছেন—কুড়ি ঘা জুতার! পাইকেরা সব সে কার্য্যে অসম্মত,—বাবুর রাগ চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে! বাবু রাগ সামলাইতে না পারিয়া পূজার নতুন জুতা নিজ হাতে কিন্নুর পিঠে টুকরা টুকরা করিয়াছেন; তবুও পাজিটা বড় তরফ ছাড়িতে অস্বীকার!

তিন দিন সে জমীদারের কাছারীতে আটক। সপ্তমী অষ্টমী নবমী! অন্নযজ্ঞের মাঝখানে তাহাকে কাটাইতে হইয়াছে কেবল অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিয়া! তবু তার জেদ অটুট!

জমীদার তাহার শয়তানিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন! কি করা যায়,—ইংরেজের আমল, নৈলে মা মহামায়ার অর্চনার পূর্ণ আহুতি হইতে পারিত নরমাংসে! দিনকাল ভাল নয়, আর কিনুকে আটক রাখা চলে না, লোকটার বাধা-লোক অনেক, কে কোথায় কি সংবাদ দিয়া গোল বাধাইবে ঠিক নাই!

এ কয় দিন লোকগুলোর মন ছিল অন্য দিকে! ঢাকের বিকট বাদ্যে, পাঁঠার প্রাণান্তক চীৎকারে, ধূপধূনার অন্ধকারে, রক্ত গন্ধে যে রাক্ষস লীলা ঢাকা পড়িয়াছিল দশমীর অবসাদে; তাহা চাপা পড়িবার নয়। দশমীতে কিনুর খালাস!

খালাস! লোকটার ছয়মাসের অন্নজলের শেষ, বাছাকে বুঝিতে হইয়াছে মাসের কয় দিন, জমীদারের অবাধ্য হওয়ায় ফল কি! কিন্তু কি কঠিন প্রাণ ওর, কাছিমের চেয়েও কঠিন—এমন মারপিট তবুও তিন তিনটা দিন এক ফোঁটা জলও ছুঁইল না। সেই জেদ—নোয়াইয়া পড়িয়াছে তবু ভাঙ্গিল না। আর করা যায় কি, খুনের দাবিটা ত আর যে সে নয়!

জমীদার বলিলেন, "ভাগ্য তোর ভাল, তাই প্রাণে এবার বেঁচে গেলি, আবার যদি অবাধ্য হস, হাড়মাস এক সঙ্গে থাকবে না, ক্ষমা করলাম এবারে।"

কিনু অত কষ্টেও হাসিয়া বলিল "হুজুরের দয়া।"

জমীদার রাগে লাল হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "বটে আবার ঠাট্টা।"

কিনু হাসিয়া বলিল "ঠাট্টা নয় হুজুর! খুব ঠিক কথা! এত করেও যার তৃপ্তি হয় নাই, ভাইয়ের মৃত্যুতে যেখানে আনন্দ, রক্তের নদী বইয়ে যেখানে আনন্দময়ীর পূজা, শত্রুর শিশু ছেলেটার উপরও যেখানে এমন আক্রোশ, ঔষধপত্র বন্ধ করে তার জীবন নেবার চেষ্টা--সেখানে প্রাণে প্রাণে আমাকে ছেড়ে দেওয়া দয়া নয় ত কি?"

"মুখে মুখে উত্তর!" জমীদার লাথি ঝাড়িলেন।

কিনু বলিল "সেলাম হুজুর, মুনিবের ভাই, এক রক্ত—তাই অনেক রেহাই দিয়াছি—সেলাম আসি!"

কিনু এক হুঙ্কার ছাড়িল—যেন মেঘের গর্জ্জন--ডাকাতের মহারা, ঐ শরীরে তখনও অমন শক্তি ছিল। সকলে স্তব্ধ—যেন দিশাহারা!

কিনু সে স্থান পরিত্যাগ করিল ; ধীরে ধীরে —দেহে তার শক্তি নাই, চলাফেরায় তবু তার দৈন্য নাই, সে চলিল বাধা দিলনা কেহ।

জমীদার রোষকষাইত নেত্রে কিনুর পানে একবার চাহিলেন, নিরুপায় !

তখন দিবা প্রায় অবসান ; বিজয়ার বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, মা শিবানী ফিরিতেছেন নিজ গৃহে—বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে ?

কিনু নিজগৃহে না ফিরিয়া বরাবর চলিল—বড়তরফে !

(২)

ডাকিল—"মা"।

উত্তর হইল "এসেছ বাছা ! তোর জন্যই—"

উত্তর শেষ হইতে না দিয়াই আবার প্রশ্ন হইল "খোকা কেমন আছে ?"

মা বলিলেন "ভাল আছে বাছা ! কি কষ্টই না তোর এবছরকার দিন গেল বাবা, আমার জন্যই তোর এ শাস্তি কিনু—"

কিনু বলিল "বছরকার দিনে কাঁদছ কেন মা ! ছেলেকে তোর কে ধরে রাখতে পারে বল ; নিজের জোরেই এই ত চলে এলেম, ধরে রাখবার সাধ্য হ'ল কার ? কর্ত্তা বলতেন মনে যে হটেনি, সে কিছুতেই হটবে না।"

কর্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবু তাঁকে বুক ভেঙ্গে যেতে হল।"

কিনু তাড়াতাড়ি বল্লে "না না তিনি তাতে যান নি মা ! সংসারের কাণ্ডকারখানাটা তিনি সইতে পারলেন না, উইলটা সদ্য সদ্য জাল—তাই কিনা টিকে গেল বিলাত আপিলে।

কর্ত্রী বলিলেন "তবু টিকল ত !"

কিনু উত্তেজিত হইয়া বলিল "মানুষের বিচারে টিকল বলেই কি ভগবানের বিচারে টিকবে মা, কখনি নয়, সত্যি একদিন প্রকাশ পাবেই।"

কর্ত্রী উদ্দেশ্যহীন ভাবে উচ্চারণ করিলেন "আর হয়েছে !" একটু থামিয়া বলিলেন—"কিনু বাড়ী যাস্ নি ?"

কিনু উৎকণ্ঠায় বলিল "কেন কারো অসুখ নাকি ?"

কর্ত্রী উত্তর দিলেন "এখন ভাল, এ-কটা দিন তোর মেয়েটার বড় অসুখ গিয়েছে, কি ভীষণ জ্বর, গায়ে ধান দিলে খৈ ফুটে!"

কিনু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল 'তাইত! তবে এখন আসি মা, বাড়ীতেই যাই।'

কর্ত্রী বলিলেন 'বলিস কি! চোখ মুখে কালী পড়েছে, পেটে পেটে এক, কিছু না খেয়ে কি যাওয়া হয়! মেয়ে ত এখন বেশ আছে!''

কিনু হাসিয়া বলিল "ভাবনা ত তার জন্য আমার খুব—তুমিই ত তাদের জন্য আছ মা! তাই ভাবছি পূজা এবার হল না বলে কতই কাতর হয়েছিলে মা; আমিও থাকলেম তখন ও-ভাবে ওখানে; সকল কষ্ট ছাপিয়ে সেই কথাই এই কয় দিন আমার মনে উঠেছে, এখন দেখছি ভালই হয়েছে, আমি ত জানি তোমাকে, মেয়েটার অসুখে, তার চিন্তায় মা তোমার অন্য চিন্তা মনে ছিল না, পূজা কেটেছে ভাল, এবারে আমাদের এই পূজা,—আল্লা চোখের জলে সঙ্কল্প!'

বড় তরফের খোকা পাঁচবৎসরের শিশু, কিনুর সাড়া পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। কিনু তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া ডাকিল "দাদু!"

কিনুর আর তখন নিজের গৃহে যাওয়া হইল না; তিন দিবসের নিরম্বু-উপবাসের পর তার আজ মার হাতে পারণ!

(৩)

বিজয়া দশমীর রাত্রি, প্রায় দ্বিযাম। চাঁদের কিরণে চারিদিক ফুট্‌ফুটে;—ঘাসে, গাছের পাতায় শিশির বিন্দু ঝকঝক করিতেছে! প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ কিন্তু পূজার জের তখনও মিটে নাই; বাইচ তখনো চলিতেছে! ছোটতরফের 'সিংহ-চেহারা,' প্রকাণ্ড ছিপ নানাবর্ণের পাতাকায় সজ্জিত; মাস্তুল হইতে দাঁড়ের টানায় ত্রিকোণ লম্বা নিশান; মাঝে মাঝে তার লাল নীল সাদা লণ্ঠনে আলোক, যেন আলোক রথ! নৌকার সম্মুখ ভাগে 'সারিগান চলিয়াছে; গায়কের করুণ সুর, নৃত্যরত তাহাদের নুপুর ধ্বনি তালে তালে মুখরিত হইয়া বাঁশীর সুরের সহিত মিলিয়া মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় তখনো ভাসিয়া আসিতেছে। বাবু আজ বাইচে রজনী ভোর করিবেন। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! অন্যান্য বার নিয়ম ছিল বিজয়ার পাটন হইতে ফিরিয়া সকলে বড়তরফের প্রতিমার মণ্ডপ প্রাঙ্গনে মিলিত হইতেন; কোলাকুলি মিষ্ট মুখ হইত! দলাদলি মামলা মোকর্দ্দমার সঙ্গে সে মিলন প্রথা গত কয়েক বৎসর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—তবু যে যে দলে ছিল সে বিজয়ায় মিলিত হইত সেই দলে, ছোট বড় অবাধে কোল দিয়া সব কৃতার্থ হইত। এবারের

আনন্দাতিশয্যে ছোটকর্ত্তা রাত্রি থাকিতে বাড়ীতে ফিরেন কিনা সন্দেহ। "সিদ্ধি" প্রভৃতির প্রবাহ এবার প্রবাহিনী বক্ষে!

ছোট তরফে তাই সে দিন লোকজনের অভাব, প্রায় সকলেই 'পটনে।' মাত্র কয়েকটি পাইক পাহারায় ছিল। অত আমোদআহ্লাদের পর লোকজনহীন বাড়ীখানা যেন নীরবে কাঁদিতেছে—সর্ব্বত্রই অশ্রু রেখা!

বড় তরফের ত কথাই নাই! কি দিন ছিল, আর উঁদের এ কি দিন! কি আমোদটাই না হইত বিজয়ায়, সকলে পাটন হইতে ফিরিলে কি সে কোলাকুলির ধুম, মিষ্টি মুখের পালা! আর আজ! চোখের জল কি বাঁধ মানে! শোক যেন নূতন হইয়া বড় কর্ত্রীকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, ইচ্ছা হইতেছিল ডাক ছাড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদেন! কিন্তু নিকট মিার মনের অবস্থা অজ্ঞাত ছিল না। সে, তাঁহাকে অন্যমনস্ক রাখিতে কেবলই বকিয়া যাইতেছিল! তার বাবা আনাই ভবিষ্যত অপর কথা,—তার নিজের অতীত কাহিনী, বাড়ীর পারিবারিক ছোট খাটো ঘটনা!

এত দুঃখে মার নিকট তাহার প্রফুল্ল ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টাটা স্পষ্ট ধরা পড়িলেও, সুতনি তাহাতে শান্তি পাইতেছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু তাঁর আজও আছে, সে আজও তাঁকে সুখী করিতে চায়, আপনার হইতেও সে আপনার, দুঃখের দিনে এ আত্মীয়তার মূল্য কম নয়!

খোকা কিনুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিনুর পরিশ্রম-জর্জ্জরিত বেদনা-ক্লিষ্ট দেহ বিশ্রাম মাগিতেছিল, কর্ত্রী অবসন্ন মনে অবসন্ন দেহে চাহিতেছিলেন ভূমিতে লুটাইতে; তথাপি উভয়ের কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই, বুকের বাক্যের শেষ ছিল না; মা ও ছেলেতে তখন প্রগাঢ় মিলন! বাহিরের অন্য দিকে কি আর তখন লক্ষ থাকে!

কাতর কণ্ঠে ডাকিল কে 'সর্দ্দারের পো!' একবার দুইবার তিনবার। কিনু পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়াই সনব্যস্তে শশব্যস্ত হইয়া খোকাকে বিছানায় রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এঁ সেকি—ছোট মা—এমন সময়!"

বড় কর্ত্রীও আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন; তিনি তাড়াতাড়ি জায়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন "তাই ত বোন, এতরাতে আজই এসেছ! এমন ভাগ্য আমার, বিজয়ায় দিদির কথা তুমি ভোল নি তবে! এত রাতে আসার দরকার কি ছিল বোন!"

তাই ত আজ যে বিজয়া, সমস্ত ভুলিয়া প্রণাম, আশীর্ব্বাদের দিন! ছোট কর্ত্রীর তাহা এতক্ষণ স্মরণ ছিল না! দিদির কথায় তাঁর মনে হইল,—"তাইত! এখন এঁদের আশীর্ব্বাদ চাইই ত।"

ছোটকর্ত্রীর দিদি পাখা নোয়াইতে যেই যাইতেছেন,—তীক্ষ্ণদৃষ্টি কিন্তু ছোট তরফের কর্ত্রীর সঙ্গে কেহ আসে নাই লক্ষ্য করিয়া, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "ছোট মা, সঙ্গে এসেছে কে? কেথা সে?

প্রণাম আশীর্বাদের অবসর হইল না,—মাতৃ হৃদয় যে বিপদে আত্মহারা হইয়া অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া একা নিঃশঙ্কা এ শত্রু পুরীতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার তীব্র আঘাত তাঁহাকে আকুল করিল। ছোট কর্ত্রী ব্যগ্র কাতর কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "সর্দ্দারের পো শীগ্‌গির চল—বড় বিপদে আমি ছুটে এসেছি, একা দোকার জ্ঞান রাখি নাই, চল সর্দ্দারের পো, এক লহমার্দ্ধও দেরী সইছে না, খোকার যে আমার বড় অসুখ,—স্বপ্ন দেখেছি তুমি তাকে না ঝাড়লে বাছা আমার অসুখ ভাল হবে না।"

বড় কর্ত্রী আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন "বল কি? খোকার অসুখ! সবাই পাটনে গেছেন, তাঁরা কি এ কথা জানেনা!"

ক্রন্দনের স্বরে ছোট মা বলিলেন—"অদৃষ্ট আমার, ভাল ছেলে কোলে নিয়ে শুয়েছি, কত কথা মনে হচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলেম কখনবা; স্বপ্নে দেখি—খোকার অসুখ, ভারি অসুখ, কি কষ্টটাই পাচ্ছে সে। কে যেন বল্লে কিন্তু সর্দ্দারকে ডেকে ঝাড়ফোঁক কর, নৈলে এবারে রক্ষা নেই।' ঘুমেতেন মনে হল এ কয় দিন সর্দ্দারকে নিয়ে এরা সব যা করেছে, ভেবেছি চিন্তেছি তাই, তাই বা এ দুঃস্বপ্ন!"

'সাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল, হায় হায়, সত্যই আমার কপালে একি! খোকা আমার গোঁ গোঁ করছে; কি কত কষ্টে একটু তাকে সুস্থ করে ঝির কোলে দিয়ে নিজেই তাই এ রাতে একা ছুটে এসেছি—সর্দ্দার যদি অন্যের কথায় না যায়! ওর উপর ত কম জুলুম হয় নি! আমার বাছার মুখ চেয়ে সব ভুলে যাও সর্দ্দার, আমরা অপরাধী—দুধের ছেলে সে কি জানে—চল সর্দ্দার দেরী কর না আর—যাবে ত?"

কিনু বলিল "কেন মা, আপনার বিপদ; আমি যাব না? আমি কি আপনারও তাঁবেদার নই?"

কিনু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। বড়কর্ত্রী ও ছোট কর্ত্রী তাহার অনুগমন করিলেন।

গৃহের দ্বার হইতেই সাগ্রহে বড় কর্ত্রী প্রশ্ন করিলেন "ছেলে এখন কেমন?"

বিজড়িত কণ্ঠে দাসী কি উত্তর দিল বুঝা গেল না। তাড়াতাড়ি তাঁহারা গৃহে প্রবেশ

এ কি, কুসুমকলি লুটাইয়া পড়িয়াছে! নিস্পন্দ—অসাড়,—মুখে এখনও যেন হাসি! মাতা প্রাণফাটা স্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন; মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিলেন—"খোকা—খোকা, বাবা আমার—একবার তাকা!"

বড় কর্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন, বিনা মেঘে কি ভীষণ বজ্রাঘাত!

'একি হ'ল রে'—অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইতেই মাতা লুণ্ঠিত হইলেন। ইহার পরও কি সংজ্ঞা থাকে?

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

চেয়ে থাকা।

চেয়ে থাকি, ওগো, আমি শুধু চেয়ে থাকি
সারা বেলা, কোন্ দূর—সুদূরের পানে
কিযে চাই, কেন চাই—চাহি কোন্ ভানে
জানি না সে, মেলি শুধু রহি মুগ্ধ আঁখি।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে ভেসে চলে,
কি জানি সে কোথা দিয়ে কোন্ দেশে যায়,
বিহগ সারাটি দিন কি যে গান গায়,
সমীরণ কাণে কাণে কি কথাটি বলে!
আঁধারে কখন্ বিশ্ব ফেলিয়াছে ছেয়ে—
দিবা সে কখন্ কর্ম্ম করি সমাপন,
চুপে চুপে গেছে চলি আবাসে আপন;—
দৃষ্টি নাহি চলে আর, আছি তবু চেয়ে!
চক্ষু যায় জ্বলে, চক্ষু পূরে আসে জলে,
তবু চেয়ে আছি, ও গো, প্রাণপণ বলে!

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।